প্রথম প্রকাশ
১৮ শ্রাবণ ১৩৭৮

*

ভারতে প্রাপ্তিস্থান
বুক সেন্টার
৭৬ বউবাজার স্ট্রিট
কলকাতা ১২

*

প্রকাশক
এ. এম. খান মজলিশ
নলেজ হোম
১৪৬ গভর্নমেন্ট নিউমার্কেট
ঢাকা ৫

*

মুদ্রক
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা
ঢাকা ২

*

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী
[স্ব] সায়রা সৈয়দ

সূচীপত্র

আমাদের অঞ্চল ও আমার ছেলেবেলা

শাসন কাজের সুবিধার জন্য কোন রাজ্যকে আজকাল যেমন জেলা, মহকুমা, থানা প্রভৃতির সীমানায় বিভক্ত দেখা যায়, আগে এখনকার প্রায় এক একটা থানা বা অনেকটা মহকুমার আয়তনে ছিল একটা করে পরগনা। তখন আমাদের এই বাংলায় দক্ষিণ রাঢ়ে ভুরশুট নামে একটা বিখ্যাত পরগনা ছিল। ভুরি ভুরি শ্রেষ্ঠী বা ব্যবসায়ীর বাস ছিল বলেই নাকি এই পরগনার নাম হয়েছিল ভুরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরশুট।

ভুরশুট শুধু শ্রেষ্ঠী বা ব্যবসায়ীদের জন্যই নয়, রাজা রানী এবং কবি সাহিত্যিকদের জন্যও বিখ্যাত ছিল। দশম শতাব্দীতে ভুরশুটে যখন পাণ্ডুদাস নামে এক কায়স্থ রাজা রাজত্ব করতেন, তখন তাঁর নির্দেশে এক অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রীধর ভট্ট বৈশেষিক দর্শনের উপর টীকাগ্রন্থ 'ন্যায় কন্দলী' রচনা করেছিলেন। শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী' ছিল তখনকার বৌদ্ধ নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ প্রথম আস্তিক্যবাদী আলোচনা। শ্রীধরের এই গ্রন্থ তখন বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

শ্রীধর তাঁর 'ন্যায়কন্দলী' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ৯১৩ শকে অর্থাৎ ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ভুরশুট তখন সংস্কৃত চর্চার জন্যও বিখ্যাত ছিল।

আমার জন্মভূমি আনুলিয়া গ্রাম এই ভুরশুট পরগনারই অন্তর্গত। এখন আর পরগনার প্রচলন নেই, তাই আমাদের গ্রাম বর্তমানে হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্ভুক্ত।

আমাদেয় গ্রাম থেকে ৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে হাওড়া জেলার আমতা থানাতেই ডিহি ভুরশুট নামে আজও একটা গ্রাম আছে। ডিহি শব্দের অর্থ জমিদারির প্রধান কাছারি বা সদর কাছারি। অনুমান করা যেতে পারে, আগে ভুরশুটের কোন রাজার রাজধানী ছিল হয়ত এই ডিহি ভুরশুটেই। এই গ্রামে আমি একাধিক বার গেছি। ডিহি ভুরশুট এখন একটা সাধারণ গ্রাম মাত্র।

ভুরশুটে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ প্রবল প্রতাপেয় সহিত রাজত্ব করে গেছেন। এই রাজবংশের দুটি শাখা ভুরশুটের ভবানীপুরে ও পেঁড়োয় রাজধানী করে রাজত্ব করতেন।

দুই রাজধানীর দূরত্ব ছিল ৪ কিলোমিটারের মত। দুই রাজধানীতেই গড় ছিল। সেই গড়ের চিহ্ন যেমন আজ আর নেই, সেই দুটি রাজধানীও আজ দুটি সাধারণ গ্রামে পরিণত।

ষোড়শ শতাব্দীতে সম্ভবতঃ এই পেঁড়ো গ্রামেই রানী ভবশংকরী বা রায় বাঘিনী জন্মেছিলেন। ভবশংকরীর পিতা খ্যাতনামা যোদ্ধা দীননাথ চৌধুরী পেঁড়োর গড়ের দুর্গের অধিনায়ক ছিলেন। ভবশংকরী অল্পবয়সে মাতৃহারা হয়ে পিতার সঙ্গে সঙ্গে থেকে অস্ত্রচালনায় ও অশ্বারোহণে নিপুণা হয়েছিলেন। এখানকার রাজা রুদ্র নারায়ণের সঙ্গে ভবশংকরীর বিবাহ হয়। বিবাহের কয়েক বছর পরে তিনি বিধবা হন। তখন তিনি নিজেই রাজ্য পরিচালনা করতেন। তাঁর একটি পুত্র ছিল।

পাঠান সেনাপতি ওসমান তাঁর সৈন্যদের নিয়ে আমতার ৬ কিলোমিটার উত্তরে পেঁড়োর রাজ্য আক্রমণ করতে রওনা হলে, রানী ভবশংকরীর পেঁড়োর এক কিলোমিটার দক্ষিণে কাষ্টসাঙ্গড়া গ্রামে যে সেনানিবাস ছিল, সেখানকার সৈন্যদের নিয়ে ঐখানে তিনি পাঠান সেনাপতি ওসমানের গতিরোধ করেন এবং যুদ্ধে তাঁকে পরাস্ত করেন।

পাঠানদের যুদ্ধে পরাস্ত করলে মোগল সম্রাট আকবর তাঁর অধীনস্থ অম্বররাজ মানসিংহ মারফৎ প্রচুর উপঢৌকন ও রায় বাঘিনী উপাধি দিয়ে রানী ভবশংকরীর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। এতে রানী খুব খুশী হয়েছিলেন।

কাষ্টসাঙ্গাড়া গ্রামের এক প্রান্তে ছোট একটি মাঠের মধ্যে এক প্রকাণ্ড দীঘি এবং দীঘির চার পাড়ের প্রশস্ত উচ্চভূমি 'সিপাহীবেড়' নাম নিয়ে আজও সেই অতীতের সাক্ষ্য হয়ে রয়েছে।

পেঁড়োর ব্রাহ্মণ রাজবংশের শেষ রাজা ছিলেন নরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ইনি ছিলেন—অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের পিতা।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় এক সময় বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বর্ধমানের মহারানী সম্বন্ধে কিছু কটু মন্তব্য করেছিলেন। মহারানী সেই মন্তব্যর কথা জানতে পেরে তাঁর দুই সেনাপতির সঙ্গে প্রচুর সৈন্য পাঠিয়ে পেঁড়ো এবং ভবানীপুরের দুই রাজ্যই জয় করে নিয়েছিলেন।

পেঁড়োর কিছুটা দক্ষিণে কোটালপাড়া নামে আজও একটা গ্রাম আছে। মনে হয় পেঁড়ো এবং ভবানীপুরের বিশেষ করে পেঁড়োর রাজা-রানীদের রাজ্যের কোটাল বা প্রহরীদের বাসস্থান ছিল এই গ্রাম।

কোটালপাড়ার পশ্চিমে অদূরেই রসপুর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই রসপুর গ্রামের অধিবাসী কবি রামকৃষ্ণ রায় তাঁর সুবৃহৎ 'শিবায়ন' কাব্য এই গ্রামে বসেই লিখেছিলেন। এ কালের এক গবেষক ও লেখক

পাঁচুগোপাল রায় এই রামকৃষ্ণ রায়েরই বংশধর। পাঁচুগোপালবাবু বলেন—ভুরশুট পরগনা যেখানে শেষ হ'ল, তার ঠিক পরেই অন্য পরগনায় আমাদের রসপুর।

রসপুরও আজ হাওড়া জেলায় আমতা থানায় অন্তর্গত। এই রসপুর গ্রামেই জন্মেছিলেন—ভারতে ইংরাজ আমলে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশিষ্ট বিপ্লবী শ্রীশ মিত্র। তিনি ছিলেন ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য কলকাতার বিখ্যাত অস্ত্রব্যবসায়ী রডা কোম্পানীর অস্ত্র অপহরণের অন্যতম প্রধান নায়ক।

রসপুর গ্রামের সামান্য দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে আমতা থানাতেই একটি গ্রাম নারিট। কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের জন্মভূমি এই গ্রাম।

একটু আগেই যে কাষ্টসাঙ্গড়া গ্রামের কথা বলেছি, সেই কাষ্টসাঙ্গড়া হ'ল আজকের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি দিনেশ দাসের পৈতৃকভূমি। এই গ্রামের সংলগ্ন খোশালপুর গ্রামে এক সময় দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন কলকাতার পুণ্যশ্লোকা রানী রাসমণির শ্বশুর মশায় প্রীতিরাম দাস।

পেঁড়োর পূর্বদিকে লাগোয়া গ্রাম বসন্তপুর। এই গ্রামে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে সদ্ভাবে বসবাস করে আসছেন। মধুমালতী, হাতেম তাই, জৈগুণের পুঁথি, আমির হামজা-২য় খণ্ড কাব্যগুলির লেখক সৈয়দ হামজা (আনুমানিক ১৭৩৩-১৮০৭ খ্রীঃ) নিজ গ্রাম ভুরশুট পরগনার উদানা থেকে এসে এই বসন্তপুরে ১৮ বৎসর বাস করেছিলেন। সম্ভবতঃ কবি সৈয়দ হামজা তাঁর উপরোক্ত কাব্যগুলি এই বসন্তপুর গ্রামে বসেই রচনা করেছিলেন।[২]

বসন্তপুর গ্রামের ৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে কবি সৈয়দ হামজার সাহিত্য-গুরু জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুঁথি, ইউসুফ জোলায়খা, আমীর হামজা-১ম খণ্ড কাব্যগুলির রচয়িতা শাহ গরীবুল্লাহ হাওড়া জেলার হাফেজপুর গ্রামে জন্মে ছিলেন।[৩] শাহ গরীবুল্লাহ ধর্মসাধকও ছিলেন। হাওড়া জেলাতেই বসন্তপুর থেকে ৩ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে মুন্সিরহাটের কাছে নাইকুলি গ্রামে শাহ গরীবুল্লাহর মাজার শরীফ (সমাধি সৌধ) আছে। সেখানে প্রতি বৎসর ১১ই কার্তিক তারিখে তাঁর মহাপ্রয়াণ দিবসে উরুস উৎসব (ধর্মীয় অনুষ্ঠান) হয়ে থাকে।

পেঁড়োর ৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে আমাদের গ্রাম আনুলিয়া। এবার আমাদের গ্রাম এবং এর সংলগ্ন দুটি গ্রাম সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলি, এই সঙ্গে আমার ছেলেবেলা প্রসঙ্গেও কিছু বলছি—

আমার জন্মভূমি আনুলিয়া গ্রামের পশ্চিমে ও উত্তরে দুটি গ্রাম যথাক্রমে —রামচন্দ্রপুর ও বানেশ্বরপুর।

আমার জন্মের বহু আগে রামচন্দ্রপুরের পালবংশীয়রা ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত ধনী জমিদার, আর এই গ্রামেরই মিত্রবংশের এক ব্যক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংলণ্ডে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন। পরে পালেদের জমিদারী ও প্রতাপ যেমন ছিল না, ঐ মিত্ররাও তেমনি গ্রাম ছেড়ে বরাবরের জন্য কলিকাতাবাসী হয়েছিলেন।

রামচন্দ্রপুর হাটতলাকে কেন্দ্র করে আমাদের এই তিনটি গ্রাম এমনি পাশাপাশি অবস্থিত যে, দেখলেই মনে হবে যেন একটি বড় গ্রামের তিনটি পল্লী। হাটতলায় হাট বসত বুধ ও শনি বারে। তখন এখানে ছিল মাত্র বিভিন্ন রকমের কয়েকটি দোকান।

পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সেদিনের সেই হাট আজ প্রতি দিনের এক বড় বাজারে পরিণত হয়েছে। আর হাটতলা এবং হাটতলা ছাড়িয়েও আশে-পাশে এত সব নানা ধরণের দোকান বসেছে যে, জায়গাটা যেন একটা ছোটখাট শহরের আকার নিয়েছে। এই সঙ্গে আজ এখানে গ্রামে আসা বিজলী তো আছেই।

এখন আমাদের এখানে এই তিনটি গ্রামের নামে বানেশ্বরপুরে একটি উন্নতমানের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আনুলিয়ায় একটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও একটি ডাকঘর, রামচন্দ্রপুরে একটি সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও একটি সরকারের গ্রামীণ পাঠাগার এবং তিনটি গ্রামেই একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। রামচন্দ্রপুরে আনুলিয়া, রামচন্দ্রপুর ও কাঁসরা—এই তিন গ্রামের নামে একটি জুনিয়ার হাই স্কুলও আছে।

আমাদের এখান থেকে ৪ কিলোমিটার করে দূরে দূরে দুটি ডিগ্রি কলেজ —আমতায় রামসদয় কলেজ এবং পেঁড়োর নিকটে পুরাশ গ্রামে পুরাশ-কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয় হয়েছে।

আমাদের ছেলেবেলায় এত সব কিছুই ছিল না। ছিল মাত্র রামচন্দ্রপুর হাটতলায় আমাদের তিনখানা গ্রামের পরিচালনায় বানেশ্বরপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সঙ্গে একটি পাঠশালা। আর আনুলিয়ার মহাকাল তলায় ছিল একটি পাঠশালা। মহাকাল তলার এই পাঠশালাতেই আমার হাতেখড়ি হয়েছিল। এই পাঠশালার পড়া শেষ করে বানেশ্বরপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছু দিন পড়ি। তখন পাড়ায় স্কুলে যাওয়ায় আমার কোন সঙ্গী ছিল না বলে, অদূরে পিসিমার কাছে কিছুদিন থেকে তাঁদের গ্রামের কুরিট উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উচ্চ প্রাথমিক পাস করি। পরে আবার নিজেদের বাড়িতে চলে আসি।

তখন এখানকার ছেলেরা উচ্চ প্রাথমিক পাস করে, হয় ৩ কিলোমিটার

দক্ষিণে আমতা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে, নয়ত ৩ কিলোমিটার উত্তরে পেঁড়োর সংলগ্ন হরিশপুর গ্রামে অবস্থিত রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ইনিস্টিটিশনে পড়তে যেত। আর আজ সারা হাওড়া জেলায় যেখানে ১৪ টি ডিগ্রি কলেজ হয়েছে, আমাদের ছেলেবেলায়, ছেলেবেলায়ই বা বলি কেন, আমার ৩১ বছর বয়সে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত হাওড়া জেলায় ছিল মাত্র একটি—নরসিংহ দত্ত কলেজ।

তখন আমাদের এখান থেকে হরিশপুরেই হোক বা আমতাতেই হোক; পড়তে যেতে হলে খুবই কষ্ট করে যেতে হ'ত, বিশেষ করে আমতায় যাতায়াতের তো রীতিমতই কষ্ট ছিল।

আমি পড়তাম আমতার স্কুলে। আজ আমতায় যাওয়ার জন্য গ্রামের মধ্য দিয়ে রাজপথ (পিচের পথ) তৈরি হয়েছে। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় এবং তার পরেও বহু বছর পর্যন্ত তখনকার নীচু মাটির পথ গ্রীষ্মকালে যেমন থাকত গরুর গাড়ী চলার জন্য ধুলোয় ভরা, তেমনি বর্ষায় হ'ত কাদায় ভর্তি। বর্ষায় শুধু কাদাই নয়, আমাদের গ্রামের পর থেকে প্রায় অর্ধেকটা পথই জলে ডুবে থাকত, জল হ'ত এক হাঁটু থেকে এক কোমর পর্যন্ত। শালতিতে (এক রকমের যাত্রীবাহী নৌকা) চেপে যাতায়াত করতে হ'ত, ভাড়া ছিল এক পয়সা অথবা দেড় পয়সা। তখন আধ পয়সা চালু ছিল এবং ৬৪ পয়সায় এক টাকা হ'ত।

আমাদের গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে বলরামপুর পুলের কাছে এই রাস্তা পাশের বিশাল কেদোর মাঠের চেয়েও নীচু হয়ে গিয়েছিল। কোন কোন বছরে এই জায়গাটায় মাঘ ফাল্গুন মাস পর্যন্ত জল থাকতো। বর্ষা কালে আমতার স্কুল থেকে ফেরার সময় শালতি পাওয়া না গেলে ঐ প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ এক হাঁটু থেকে এক কোমর পর্যন্ত জল ভেঙ্গে বাড়ি ফিরতে হ'ত। তখন বর্ষার সময় কেদোর মাঠ প্রায় প্রতি বছরই ডুবে সমুদ্রবৎ হয়ে থাকতো। মাঝে মাঝে গুজব-ও রটতো এ বছর মাঠে কুমির এসেছে।

সুদীর্ঘ কালের সেই অবহেলিত জেলা বোর্ডের রাস্তা যা স্থানীয় লোকের নিকট কোম্পানীর বাঁধ নামে পরিচিত, আজ পিচ রাস্তায় পরিণত হয়েছে। কিভাবে আজকার এই রাস্তা হ'ল, সে এক বিরাট ইতিহাস। এই পাকা রাস্তা এবং আগে যে আমাদের এখানকার হাসপাতাল, ডাকঘর, বিদ্যালয় প্রভৃতির কথা বলেছি, এর প্রায় প্রতিটির সঙ্গেই বর্তমান লেখকের কমবেশী ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পরে এই বইয়ে অন্য অধ্যায়ে সে সব কথা বলেছি।

স্কুল কলেজের শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, আমাদের ছেলেবেলায় এখানে তেমন ছিল না ঠিকই, তবে সাধারণের জন্য লোকশিক্ষার প্রচুর প্রচলন ছিল।

তখন কবি, যাত্রা, তর্জা, পাঁচালী, কথকতা, পুতুল নাচ, রামায়ণ গান

ইত্যাদি লেগেই থাকতো। আনুলিয়া গ্রামের এক স্বনামখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন, নাম যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তী। আমার জন্মের ১৫/১৬ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাই তাঁকে দেখিনি বটে, তবে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের দেখেছি এবং নানা ছোট খাটো অনুষ্ঠানে তাঁদের কবিগানও শুনেছি।

মনসার ভাসান, শীতলার গান, সত্যপীরের পাঁচালী প্রভৃতির খ্যাতনামা গায়ক নিরঞ্জন আচার্য জন্মেছিলেন বানেশ্বরপুর গ্রামে। আমার ছোট বেলায় এবং যৌবনকালেও আমাদের পাড়ায় বহুবার এঁর গান শুনেছি।

রামচন্দ্রপুর চড়কতলার মাঠে প্রতি বছর ১লা বৈশাখ সকালে বেশ জাঁকালো মেলা হয়। ছেলেবেলায় দেখেছি, এই মেলার একপাশে রামচন্দ্রপুরের ভাণ্ডারীরা বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে নিজেদের রচিত গানের আসর বসাতেন। এই সব গান সাধারণতঃ দেশের বা এই অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী অবলম্বনেই তাঁরা রচনা করতেন। দেখেছি, কালীপদ ভাণ্ডারী আসর জাঁকিয়ে গান করছেন, আর তাঁদেরই বংশের কেউ হারমোনিয়াম, কেউ বাঁয়া তবলা ইত্যাদি নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করছেন। পেঁড়োর নিকটে একটি গ্রামে রতিকান্ত মণ্ডল নামে একজন বিখ্যাত তর্জা গায়ক ছিলেন। ছেলেবেলায় গ্রামে এঁর তর্জাগান শুনেছি। পরে বড় হয়ে কলকাতায় বেতারেও এঁর তর্জাগান শুনি।

তখন এ অঞ্চলে প্রায় প্রতি গ্রামেই এক বা একাধিক করে যাত্রার দল ছিল এবং প্রায়ই গ্রামে গ্রামে যাত্রা হ'ত। হাটতলায় দেখেছি পুতুল নাচ। হরিশপুর স্কুলের শিক্ষক অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ একবার এই হাটতলাতেই ব্যায়ামবিদদের এনে ব্যায়াম প্রদর্শনের এবং হস্ত শিল্পের প্রদর্শনীও করেছিলেন। রামচন্দ্রপুরে একবার দেখেছি কলকাতার এক পেশাদার গায়িকা এসে বেশ কয়েকদিন সন্ধ্যার পর থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত ভাগবত পাঠ করেছিলেন। এছাড়া গ্রামে গ্রামে তখন কথকতা ও রামায়ণ পাঠ এবং অষ্টপ্রহর ষোলপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন হ'তই।

এ সবের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল কবিগান বা কবির লড়াই। তার পরেই ছিল তর্জার লড়াই। এই কবি বা তর্জার লড়াই-এর আসরে সাধারণতঃ দু'টি করে দল থাকে। কবির দলের কবি জামার উপর কোমরে উড়ানি বেঁধে খোলা আসরে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রথমে দেবদেবীর ও গুরুর বন্দনা করতেন। পরে ঘুরে ঘুরে হাত নেড়ে কবিতায় মিল দিয়ে, ছড়া কেটে প্রতিপক্ষকে প্রশ্ন করতেন। অপর পক্ষ আবার ঠিক এমনি ভাবেই কবিতায় ও ছড়ায় আগের কবির প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সঙ্গে ঢোল ও কাঁসি কখন মৃদু তালে কখনও জোর তালে বাজত।

আনুলিয়া মহাকাল তলায় কবিগানের আসরে দেখেছি, কবিরা গুরু বন্দনার সময় আনুলিয়ার কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীরও বন্দনা করতেন।

কবিয়ালদের আসরে কবির লড়াই জমিয়ে তুলবার জন্য উদ্যোক্তারা অনেক সময় আসরের একদিকে দশ টাকার নোট, অপর দিকে এক কাঁদি কাঁচকলা টাঙিয়ে দিতেন। এর অর্থ যিনি লড়াইয়ে জিতবেন তিনি পাবেন ঐ টাকা, আর যিনি হারবেন তিনি পাবেন কাঁচকলা।

কবি গানের ন্যায় তর্জাগানও তখন অনেকটা ঐ ধরণেরই ছিল। এই কবি তর্জার লড়াইয়ে একপক্ষ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি থেকেও নানা কূট প্রশ্ন বেছে নিয়ে অপর পক্ষকে হারাবার চেষ্টা করতেন।

আমরা দেখেছি, আমাদের এই অঞ্চলের প্রাচীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারত-চন্দ্রের রচনাতেও বেশ হেঁয়ালি আছে। আর আমাদের এখানকার কবিয়াল ও তর্জাওয়ালারা এবং তাঁদের শিষ্য প্রশিষ্যরা তো এক একজন কূট প্রশ্নসমূহের ঘাঁটিবিশেষ ছিলেন। তাই আমাদের এই কবিওয়ালা ও তর্জাওয়ালা প্রভাবিত এলাকায় আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি, ধাঁ ধাঁ, হেঁয়ালি, ঠকানো প্রশ্ন, এমনকি নানা ধরণের কঠিন কঠিন অঙ্ক পর্যন্তও লোকের মুখে মুখেই ফিরত।

তখন এই সব প্রশ্নবানের সব চেয়ে প্রয়োগ দেখা যেত, বিবাহ বাড়িতে বরযাত্রীদের উপরেই। এ সম্পর্কে আমার নিজের অভিজ্ঞতার একটা কাহিনী এখানে বলছি—

আমার বয়স তখন বছর ১৩। আমতা স্কুলে ফিফ্থ ক্লাসে পড়ি। তখনকার ফিফ্থ ক্লাস হ'ল এখনকার ক্লাস সিক্স বা ষষ্ট শ্রেণী। তখন হাই স্কুলে উপর থেকে নীচের দিকে ক্লাস গননা হ'ত এইভাবে—ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস, ফিফ্থ, ক্লাস, সিক্থ ক্লাস, সেভেন্থ, ক্লাস, এইট্থ ক্লাস···

ফিফ্থ ক্লাসে পড়ার সময়, আমি একবার আমাদের পাড়ার একজনের বিবাহে বরযাত্রী গিয়ে ছিলাম খোশালপুরের নিকটে সাচক্ গ্রামে। আমরা বরযাত্রী দলে ছিলাম প্রায় ত্রিশ জন। বয়সে আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ।

আমাদের এই দলে আমাদের গ্রামের কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্তীর তিন শিষ্য বেচারাম দাস, মতিলাল পাল এবং অমূল্য চরণ পাত্রও ছিলেন। এঁরা তিনজনেই তখন বৃদ্ধ। সব চেয়ে বৃদ্ধ বেচারাম দাস। এঁর সম্বন্ধে একটা কথা বলার আছে, সেটা হল—কেউ কেউ কথা বলার সময় মুদ্রাদোষ বশতঃ যেমন—'তোমার গিয়ে', 'ধরনা কেন', 'বুঝলে কিনা' প্রভৃতি বলে থাকেন, তেমনি আমাদের এই বেচারাম দাস কথা বলার সময় বড় বেশী 'মনে কর' 'মনে কর' বলতেন। এজন্য লোকে এঁর অসাক্ষাতে এঁকে 'মনে কর' নামেই অভিহিত করতেন,। গ্রাম সম্পর্কে ইনি আমার দাদা মশায় হতেন। তাই এঁর অগোচরে আমিও কখন কখন এঁকে মনেকর দাদামশায়ও বলতাম।

যাই হোক্ যে কথা বলছিলাম, সন্ধ্যার কিছুটা পরেই আমরা বরযাত্রীরা বরসহ কনের বাপের বাড়িতে গিয়ে পেঁছিলাম। একটু পরেই বর চলে গেলেন

বাড়ির ভিতরে বিয়ের আসরে। আমরা বরযাত্রীরা রইলাম বাইরের আসরে।

আমাদের চা পর্ব সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় তিনটি যুবক আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন আমাদের বললো—আজ আমরা আপনাদের একটা প্রশ্ন করবো। আশা করি, আপনারা প্রশ্নের উত্তরটা দেবেন।

এই বলেই যুবকটি বললো—এক গয়লার ২৫ টা গরু ছিল। প্রত্যেকটা গরুরই একটা করে নম্বর ছিল। ১ থেকে ২৫ পর্যন্ত প্রতিটি গরুকে চিনবার জন্য প্রত্যেক গরুর গলায় একটা করে নম্বর দেওয়া টিনের চাক্তি দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝোলানো থাকতো। এই ২৫টা গরুর ১নম্বর ১সের, ২নম্বর ২সের, ৩নম্বর ৩সের এইভাবে ২৫নম্বর ২৫সের দুধ দিত।

গয়লার ছিল ৫ ছেলে। গয়লার মৃত্যুর পর তাঁর ৫ছেলে পৃথক অন্ন হয়ে গেল। দুধের পরিমাণ যাতে সমান হয়, এইভাবে হিসাব করে তারা ৫ভাই প্রত্যেকে ৫টা করে গরু নিল। এখন আপনারা বলুন কে কে কোন্ কোন্ নম্বরের গরু নিয়েছিল ?

এই বলেই প্রশ্নকর্তা ও তার দল চলে গেল। আমাদের দলনেতা মনেকর দাদামশায় তখন তামাক খাচ্ছিলেন, তিনি প্রশ্ন শুনেই তামাক খাওয়া বন্ধ করে হুঁকো রেখে দিলেন এবং চিন্তায় ডুবে গিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমাদের দলের অন্যান্য সকলের অবস্থাও তাই। কারও মুখে আর একটা কথাও নেই, সকলেই চুপ ও চিন্তিত।

এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। শেষে দলের অবস্থা দেখে আমি পিছন থেকে মনেকর দাদামশায়ের কাছে আগিয়ে গিয়ে তাঁকে বললাম—দাদামশায়, আমি ওদের প্রশ্নের উত্তরটা দোব ? নিশ্চিন্ত হোন, আমি একেবারে সঠিক উত্তরই দোব।

দাদামশায় যেন প্রাণ ফিরে পেয়ে আনন্দিত হয়ে আমাকে বললেন—ভায়া ! মনে কর, ঠিক উত্তর দিতে পারবে তো ?

বললাম—হ্যাঁ, পারবো !

তখন দাদামশায় প্রশ্নকর্তাদের ডাকলেন। তারা একটু পাশেই থেকে আমাদের অবস্থা লক্ষ্য করছিল। তারা এলে দাদামশায় বললেন—এখন মনে কর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমার এই ভায়াই মনে কর দিচ্ছে।

আমি প্রশ্নকর্তাদের কাছ থেকে একটু কাগজ ও একটা উড্ পেন্সিল চেয়ে নিয়ে (তখন গাঁয়েঘরে ফাউনটেন পেন পাওয়া যেত না, আর ডট্পেন তো তখন

ওঠেই নে) তাতে ঘর কেটে লিখে এইভাবে উত্তরটা দিলাম-

১	৬	৭	৮	৯
১০	২	১১	১২	১৩
১৪	১৫	৩	১৬	১৭
১৮	১৯	২০	৪	২১
২২	২৩	২৪	২৫	৫

৬৫ ৬৫ ৬৫ ৬৫

দেখিয়ে দিলাম, প্রত্যেকের ভাগে ৬৫ সের করে দুধ ছিল এবং কে কে কোন্ কোন্ নম্বরের গরু নিয়ে ছিল। প্রশ্নকর্তারা আশাও করতে পারেনি যে, ঐরূপ একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারবো। তারা উত্তর পেয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে বললো—হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে।

মনেকর দাদামশায় আমার পিঠে স্নেহের মৃদু করাঘাত করে বললেন—ভায়া, তুমিই মনে কর আজ আমাদের মান রাখলে।

এরপর দাদামশায় কন্যাপক্ষীয়দের সম্বোধন করে বললেন—এবার মনে কর, এক ছিলিম তামাক দিন, অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হয়নি।

এই সময় আমি দাদামশায়কে বললাম—দাদামশায় ওরা তো আমাদের হারাবার জন্য একটা অঙ্ক দিয়েছিল, এবার আমি একটা অঙ্ক ওদের দোব ?

দাদা মশায় বললেন—ভাই পারবে ? পারবে মনে কর ওদের হারাতে ?

বললাম—দেখি তো চেষ্টা করে।

তখন দাদামশায় কন্যাপক্ষীয় সেই প্রশ্নকর্তাদের ডেকে বললেন—আপনারা তো আমাদের একটা প্রশ্ন দিয়েছিলেন, তার উত্তর পেয়েছেন। এখন আমার এই ভায়া মনে কর আপনাদের একটা প্রশ্ন করবেন, আপনারা তার উত্তর দিন।

পরে আমাকে বললেন—ভায়া, তাহলে মনে কর তোমার প্রশ্নটা বল।

আমি বললাম—এক মুদির এক মণ ওজনের একট পাথর ছিল, সেই পাথরটা হঠাৎ একদিন ভেঙ্গে চার টুকরো হয়ে যায়। টুকরোগুলো এমন ভাবে হয়ে ছিল যে, ১ সের থেকে ৪০ সের পর্যন্ত মাল ওজন করবার জন্য মুদির আর কোন বাটখারার দরকার হত না। সে সেইগুলো দিয়েই প্রয়োজন বোধে পাল্লায় হের ফের করে ওজন করতো, যেমন—কেউ হয়তো ৮ সের জিনিস চাইল, যদি একটা পাথর ১০ সের ও একটা পাথর ২ সের ওজনের হয়ে থাকে, তাহলে সে পাল্লায় বাটখারার দিকে ১০ সের পাথর এবং মালের দিকে মালের সঙ্গে ২সের পাথরটা দিয়ে ওজন করতো। এইভাবেই সে

চালাতো। এখন বলুন, পাথর ৪ টার ওজন কত কত ছিল ?

আমার এই প্রশ্নটাও সহজ ছিল না। কন্যাপক্ষীয়রা অনেকেই এবার আমার প্রশ্ন শুনে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসে গেলেন। অনেক সময় ধরে অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু উত্তর বার করতে পারলেন না।

রাত দুপুর পার হয়ে গেল, আমাদের বরযাত্রীদের প্রায় সকলেরই তখন ক্ষুধায় নাড়ী চোঁ চোঁ করছে। তবুও তারা ক্ষুধা সহ্য করছে জয়ের আনন্দেই। একটায় তাদের জয় হয়েছে, আর একটা প্রশ্নে তারা জয়ের মুখে।

এমন সময়, আমাদের কানে এল, ওদিকে পাত্রীর পিতা এবং তাঁর কয়েকজন আত্মীয় তাঁদের পক্ষের প্রশ্নকর্তাদের বলছেন– আর কেন ? এবার তোমরা পরাজয় স্বীকার কর। কখন বিয়ের কাজ মিটে গেছে। রান্না তরিতরকারী সব জুড়িয়ে বরফ হয়ে গেল। সেই সন্ধ্যের আগেকার রান্না, বরযাত্রীরা খাবে কখন ?

এরপরেই দেখা গেল, কয়েকজন এসে বেশ বিনীত ভাবেই বললেন– আমরা পরাজয় স্বীকার করছি। উত্তরটা আমাদের বলে দিন।

এই সময় বেশ একটু উঁচু গলাতেই আমাকে সম্বোধন করে দাদামশায় বললেন—ভায়া !

আমি বললাম—এই যে দাদামশায়, আমি উত্তর বলে দিচ্ছি, বলেই বললাম—পাথর চারটের ওজন ছিল—১, ৩, ৯ ও ২৭ সের।

আমার উত্তর শুনে কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাগজ পেন্সিল নিয়ে কষে দেখে বললেন—ঠিক হয়েছে। এখন আপনারা খেতে চলুন। আমরা পরাজয় স্বীকার করলাম।

এই শুনে আমাদের দলের সকলের কী আনন্দ ! দাদামশায় এবার উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের সকলকে বললেন—এখন তাহলে মনে কর খেতেই যাওয়া যাক্। চল, রাতও মনে কর অনেক হ'ল।

আমরা সকলে দাদামশায়কে অনুসরণ করে বাড়ির ভিতরে গেলাম।

আমি এতক্ষণ আমার গ্রামের পশ্চিমে, উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কয়েকটি গ্রামের কথা বলেছি। আমার গ্রামের পূর্বে বা দক্ষিণে কোন গ্রামের কথা বলিনি, তার কারণ আমাদের গ্রামের পূর্ব দিকে ও দক্ষিণ দিকে বহুদূর পর্যন্ত কোন গ্রাম নেই। আছে ১০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য ও ৪ কিলোমিটার প্রস্থ ৪০ বর্গকিলোমিটারের এক প্রকাণ্ড কাদুয়ার বা কেদোর মাঠ।

প্রধানতঃ ধানই এই মাঠের একমাত্র ফসল। বৈশাখের খর রৌদ্রে, ঘোর বর্ষায়, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তে ঋতুতে ঋতুতে এই বিশাল মাঠ এক এক

রূপ ধারণ করে। কখন নয়নাভিরাম, কখনও মনোমুগ্ধকর, কখনবা বন্যার সময় ভয়ংকর।

আমার বাড়ির বৈঠকখানা থেকেই দেখা যায়, এই বিশাল মাঠের দূরে পূর্ব দিকের অনেকটার এবং দক্ষিণের প্রায় সমস্তটারই চক্রবাল রেখা। সিধা পূর্বদিকে মাঠের গায়ে যে চক্রবাল রেখা, কবিগুরুর ভাষায়—অবারিত মাঠ, গগন ললাট যেখানে পদধূলি গ্রহণ করছে-এর লাগোয়াই যে গ্রাম তার নাম মাজু। মাজু বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৮শ অধিবেশন হয়েছিল। সম্মিলনের মূল সভাপতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অনিবার্যকারণ বশতঃ সম্মিলনে উপস্থিত হতে না পারায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন।

মাজুর সেই সাহিত্য সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ঐ গ্রামের ডঃ সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ., দক্তের-এস্‌-লেতর (প্যারি), বেদান্ততীর্থ, শাস্ত্রী। ইনি বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাত-নামা অধ্যাপক ছিলেন। সুবোধবাবু তাঁর লিখিত অভিভাষণের প্রথমেই বলে ছিলেন—সর্ব প্রথমেই হাওড়া জেলার গৌরবরবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের নাম মনে আসে। এই মণ্ডপের পশ্চিমের বিশাল প্রান্তর দূর দিগন্তে যেখানে অস্পষ্ট নারিকেল তালীবনের নীল রেখায় মিলাইয়া গিয়াছে, ঐখানে পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র রায়ের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রাসাদ ও গড় ছিল। কবির শৈশবকাল ঐখানেই কাটিয়া ছিল। (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, ১৮শ অধিবেশন ঃ কার্য বিবরণী-পৃঃ ৩)

আমার বাড়ির বৈঠকখানায় বসে দক্ষিণে মাঠের শেষে যে চক্রবাল রেখা দেখা যায় তার লাগোয়া রয়েছে—জালালসি, পানপুর, ভাণ্ডারগাছা প্রভৃতি গ্রাম।

দেশ বিভাগের আগে অখণ্ড বাংলার এবং দেশ বিভাগের পরেও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের উচ্চ পদস্থ, অত্যন্ত প্রভাবশালী অফিসার (রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার) সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি. এস-এর বাড়ি এই ভাণ্ডারগাছায়।

আমার জন্মের বহু আগে থেকেই, আমার ৫০ বছর বয়স পর্যন্তও হাওড়া থেকে আমতা মার্টিন কোম্পানীর যে ছোট রেল ছিল, সেই রেললাইন এই মাঠের একেবারে গা দিয়ে মাজু, জালালসি ইত্যাদি হয়ে আমতায় গিয়ে পেঁছিত। আমতার পূর্ব দিকেই কেদোর মাঠ।

হাওড়া জেলা কংগ্রেসের এক সময়ের নেতা, আজকের মার্কসবাদী কমিউ-নিষ্ট পার্টির সর্বভারতীয় নেতা ও বিশিষ্ট সাংসদ, স্বাধীনতা সংগ্রামী সমর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি এই আমতায়। সমরবাবু আমার বিশেষ পরিচিত। আমতা হাই স্কুলে আমার চেয়ে কয়েক ক্লাস উঁচুতে পড়তেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে লিখেছেন—'আমরা যখন জন্মেছি তখনো এমন-সব লোক দেখা যেত, যারা সমর্থ বয়সে ছিল ডাকাতের দলে। মস্ত মস্ত সব লাঠিয়াল, সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠিখেলার সাকরেদ। তাদের নাম শুনলেই লোকে সেলাম করত, প্রায়ই ডাকাতি তখন গোঁয়ারের মতো নিছক খুনখারাপির ব্যাপার ছিল না। তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা, তেমনি দরাজ মন। এদিকে ভদ্রলোকের ঘরেও লাঠি দিয়ে লাঠি ঠেকাবার আখড়া বসে গিয়েছিল। যারা নাম করে ছিল ডাকাতরাও তাদের মানত ওস্তাদ বলে, এড়িয়ে চলত তাদের সীমানা।...

শোনা যেত রঘু ডাকাত, বিশু ডাকাতের কথা। তারা আগে থাকতে খবর দিয়ে ডাকাতি করত, ইতরপনা করত না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার রক্ত যেত হিম হয়ে। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধর্মে ছিল মানা। একবার একজন মেয়ে খাঁড়া হাতে কালী সেজে উলটে ডাকাতের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করেছিল।'

রবীন্দ্রনাথের জন্মের ৪৫ বছর পরে আমার জন্ম। তবুও আমার ছেলে-বেলায় আমাদের অঞ্চলে শুনেছি এবং কিছুটা দেখেছিও এইরূপ ডাকাত ও লাঠিয়ালদের। এরা এদের লাঠি খেলা গুণের জন্যই, এক সময়ে ডাকাতি করে থাকলেও লোকের কাছে ঘৃণার পাত্র ছিল না।

আমি যখন আমতা হাই স্কুলে থার্ড ক্লাসে এখনকার অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি, তখন এমনি একজন এক সময়ের ডাকাত ও লাঠিয়ালের কাছে কিছুদিন লাঠি খেলা শিখেছিলাম। তখন এর বয়স প্রায় ৬০ / ৬৫ বছর। এই লাঠিয়ালের চেয়ে এর বাবা ছিল আরো খুব বড় ও নামকরা লাঠিয়াল এবং আরও বড় ডাকাত। তার নাম ছিল মুকুন্দ সর্দার। মুকুন্দ সর্দারকে আমি দেখিনি, তবে ছেলেবেলায় তার অনেক কাহিনী শুনেছি। এখন সেই মুকুন্দ সর্দারের কথা কিছু বলছি—

মুকুন্দ তার গায়ের অসীম ক্ষমতা ও লাঠির জোরে অনেক সময় দলবল না নিয়ে একাই ডাকাতি করত। ডাকাত মুকুন্দর একটা গুণ-গুণই বলি-ছিল এই যে, সে আমাদের অঞ্চলের ২০/২৫টা গ্রামে কোনদিন ডাকাতি করে নি। আর তার নামে বা তার প্রভাবে অন্য ডাকাতরাও আমাদের এ অঞ্চলে ডাকাতি করতে সাহস করে নি। অন্য ডাকাতরা মুকুন্দ সর্দারকে সম্মান দিয়ে তাদের ওস্তাদ বলেই মানতো।

এই যে আমাদের অঞ্চলে ডাকাতি হ'ত না, এজন্য মুকুন্দ অবশ্য আমাদের অঞ্চল থেকে একটা বক্‌শিস্ বা বৃত্তি আদায় করত। সেই বৃত্তি আদায়টা ছিল এইরূপ—আমাদের অঞ্চলে তখন একটা প্রথা ছিল, আজও আছে—এখান-কার কোন গ্রামের কোন কন্যার বিবাহ হলে, বিবাহের পরদিন সকালে বরপক্ষ

বা পাত্রপক্ষ স্থানীয় প্রথা অনুসারে প্রার্থী হয়ে আসা গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ, গ্রামের হরিনামকীর্তনকারী বৈষ্ণব, স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি প্রভৃতিকে কিছু কিছু অর্থ দিয়ে থাকেন। ঐ সময় মুকুন্দর ছেলেকেও দেখেছি, তার পিতার আমলের পাহারাওয়ালার বৃত্তি হিসাবে কিছু টাকা নিয়ে যেত।

মুকুন্দ সর্দারের বাড়ি ছিল আমাদের গ্রামের অদূরে বলরামপুর গ্রামে। এই গ্রামে ছিল আমার পিতৃদেব তারিণীচরণ রায়ের মাতুলালয়।

বাবা শৈশবে পিতৃহারা হন। ফলে ঠাকুরমা বাবাকে নিয়ে তাঁর বাপের বাড়িতে চলে যান। বাবার মামাদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই ভাল। বাবা সেখানেই লেখাপড়া শেখেন এবং অনেক বয়স পর্যন্ত মামার বাড়িতে থেকে পরে গ্রামে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন।

ঐ মুকুন্দ সর্দার ছিল বাবার মামাদের একরূপ প্রতিবেশী। বাবা মুকুন্দকে দেখেছেন, তার অনেক কাহিনীও জানতেন। বাবার মুখে শোনা মুকুন্দ সর্দারের একটা ঘটনা এখানে বলছি—

মুকুন্দ রাত্রে ঘরে ঘুমুচ্ছিল। আগের রাত্রে ডাকাতি করেছে। ঘুম ভাঙ্গলে ভোর বেলায় কিভাবে সে জানতে পারল, পুলিশ বাহিনী এসে তার বাড়ি ঘেরাও করে রয়েছে। মুকুন্দ বুঝল রাত্রি শেষ হয়ে সকাল হলেই পুলিশ তার বাড়িতে ঢুকে খানাতল্লাসী আরম্ভ করবে। এই ভেবে মুকুন্দ তখনই তার ডাকাতি করা টাকাকড়ি ও সোনার গহনা ইত্যাদি একটা বাক্সয় ভরে সেটা তালা বন্ধ করে তাদের বাড়ির পিছনের বড় পুকুরটার এক জায়গায় পুতে রেখে এল। রেখে এসে বাড়িতেও সে কথা জানিয়ে দিল।

মুকুন্দদের বাড়ির পিছনের ঐ পুকুরটা একটা মস্ত বড় গোলাকার পুকুর। বাবার মামার বাড়িতে গিয়ে সে পুকুর আমিও বহুবার দেখেছি। আজও সে পুকুর রয়েছে। পুকুরের চার পাশেই আম, তেঁতুল, খিরিশ, কদম প্রভৃতি পাতাভরা বিরাট বিরাট গাছ।

মুকুন্দ যখন পুকুরে নেমে ঐ গহনা ইত্যাদির বাক্স পুকুরের পাঁকে পুতে রাখছিল, সেই সময় পুকুরের অপর পাড়ে মস্ত এক তেঁতুল গাছের পাতাময় মাথার ডালে বসে থাকা একটি বালক ঐটা লক্ষ্য করেছিল। ছেলেটি এই প্রকাণ্ড পুকুরের এক পাড়ের একটি বাড়ির ছেলে।

ছেলেটির অত ভোরে গাছের মগডালে উঠে পাতার মধ্যে লুকিয়ে থাকার হেতু—সকালে পাঠশালা যাবার ভয়ে। পড়া বলতে না পারলে গুরুমশায় ভীষণ বেত্রাঘাত করেন, শুধু বেত মারাই নয়, গুরুমশায় অন্যান্য শাস্তিও দেন। অথচ ছেলেটি পড়া পারে না। পাঠশালায় না গেলে পাঠশালার চার পাঁচজন সর্দার পোড়ো বা শিরপোড়ো এসে তাকে চ্যাংদোলা করে ধরে নিয়ে যাবে। কান্নাকাটি বা কোন অজুহাত তারা শুনবে না। আর ঐ অবস্থায়

পাঠশালায় গেলে, গুরুমশায়ও বেতের প্রহারে প্রহারে তাকে সম্বর্ধনা জানাবে। তাই সে ভোরেই এখানে এসে লুকিয়ে বসে আছে, যাতে না শিরপোড়োরা এসে তাকে খুঁজে পায়।

কোন ছাত্র ইচ্ছা করে পাঠশালায় না গেলে গুরুমশায় সর্দার পড়ুয়াদের পাঠিয়ে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, ঐ দৃশ্য আমার ছেলেবেলায়ও দেখেছি।

ছেলেটি গাছের উঁচু ডালে পাতার আড়ালে বসে আছে। তখন চারদিক অনেকটা ফর্সা হয়ে এসেছে, আকাশে শেষ রাতের চাঁদের আলোও কিছুটা ছিল, ছেলেটি হঠাৎ দেখতে পেল মুকুন্দ সর্দার একটা বাক্স নিয়ে ঐ পুকুরের হাঁটু খানেক জলে নেবে কি যেন করছে। তারপর ছেলেটি দেখল—মুকুন্দ সর্দার শুধু-হাতে জল থেকে উঠে গেল। ছেলেটি বুঝল, মুকুন্দ সর্দার বাক্সটা জলে ডুবিয়ে রেখে অথবা কাদায় পুতে রেখে গেল।

একটু পরেই সকাল হ'ল। এই সময় সে গাছে বসেই দেখতে পেল—মুকুন্দর বাড়ির চারদিকে বেশ কয়েকজন পুলিশ। আর শুনতেও পেল—মুকুন্দর বাড়ির ভিতরে পুলিশ ঢুকে চিৎকার করছে—মুকুন্দ কোথায়?

তখন ছেলেটি বুঝল, মুকুন্দ তাহলে পুলিশ এসেছে জানতে পেরেই, ধরা পড়ার আগে তার চুরিকরা সোনার গহনা ও টাকাকড়ি বাক্সয় রেখে ঐ জায়গায় জলে ডুবিয়ে রেখে গেল।

ছেলেটি গাছে বসেই দেখতে পেল, মুকুন্দ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ তাকে তার বার বাড়িতে এনে দাঁড় করিয়েছে।

ছেলেটি ভাবল, মুকুন্দ নিশ্চয়ই পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে সে যে পুকুরে তার চুরি করা টাকাকড়ি রেখে গেল—একথা বাড়ির কাউকে না কাউকে বলেছে।

এই ভেবে ছেলেটি তখনই গাছ থেকে নেমে এল। নেমে এসে পুকুরের জলে নেমে কখন নিঃশব্দে সাঁতার কেটে, কখন বা ডুব দিয়ে দিয়ে মুকুন্দর সেই বাক্স লুকিয়ে রাখার জায়গায় গেল। গিয়ে খুঁজে খুঁজে বাক্সটা পেয়েও গেল। তখন সে ঐ বাক্সটা নিয়ে এক গলা ভোর জল দিয়ে হেঁটে হেঁটে পুকুরের অপর পাড়ে তার নিজের বাড়ির কাছে এল এবং তাল বুঝে লোক চক্ষুর আড়ালে সেই বাক্সটা নিয়ে ছুটে সে তার বাড়ির ভিতরে চলে এল। এসেই বাক্সটা তার বাবা মা-র হাতে দিল এবং ব্যাপারটা খুলে বললো।

ছেলেটি ভিজে কাপড় ছাড়লে, সে ও তার বাবা মা তিন জনে একটা ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে বাক্স ভেঙে দেখল—প্রচুর সোনার গহনা এবং নগদ টাকা।

ওদিকে মুকুন্দকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে, তার ছেলে পুকুরের জলে নেমে ঐ বাক্সর জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু বৃথাই।

চুরি প্রমাণ না হওয়ায় মুকুন্দ কিছুদিন হাজতে থেকে বাড়িতে ফিরে এল। ফিরে এসে সেও কতদিন কত খুঁজল; কিন্তু খুঁজলে আর কি হবে?

এদিকে চোরের উপর বাটপাড়ি করা ঐ ছেলেটির দৌলতে তার বাবা বেশ বড় লোক হয়ে গেল। তবে লোকটি বেশ চতুর ছিল, তাই ভিতরে ভিতরে সে বড় লোক হয়ে গেলেও, বাইরে তার কিছুই প্রকাশ দেখাল না।

আর নিজের ছেলেকে গুরুমশায়ের মারধরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, সে একদিন গুরুমশায়ের কাছে গিয়ে বলে এসেছিল—আমার ছেলে আর এখানে পড়বে না, ওর মাথাও মোটা, ওর দ্বারা পড়াশুনা হবে না। তাই কোন একটা হাতের কাজ শেখাবার জন্য আমার এক আত্মীয় সঙ্গে ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে দোব।

আমাদের অঞ্চল থেকে মুকুন্দ সর্দারের মৃত্যুর পর তার ছেলে ডাকাতি-নিবারক বৃত্তি নিলেও আমি ছেলেবেলায় একবার দেখেছি, আমাদের বাড়ির পাশেই আমার এক আত্মীয়র বাড়িতে এক বেশ বড় ধরণের ডাকাতের দল ঢুকেছিল। সেদিন গভীর রাত্রে জ্বলন্ত প্রচণ্ড আলোয় সামান্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে ডাকাত দলের কাণ্ড কারখানা দেখে ছিলাম। তখন ইংরেজ আমল। ডাকাতরা এখনকার মত বন্দুক ও গুলিগালা নিয়ে ডাকাতি করত না। কারণ, বন্দুক পাওয়া তখন সহজ ছিল না। সেই ডাকাতির কাহিনীটি এখন বলি—

আমার ঠাকুরদারা ছিলেন তিন ভাই। আমার ঠাকুরদার ছোট ভাইয়ের অর্থাৎ আমার ছোট ঠাকুরদার এক জামাই তখনকার সাহেবদের চটকলে কনট্রাক্টরি করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিলেন। তিনি আমাদের বাড়ির পাশেই বিরাট একটা ফাঁকা জায়গা কিনে সেখানে প্রকাণ্ড দুতলা পাকা বাড়ি, পাকা রান্না ঘর, পাকা ঢেঁকিশালা, পাকা গোয়ালঘর ইত্যাদি করেন। বাড়ির দু'পাশে সানবাঁধানো ঘাটওয়ালা দুটা পুকুর করেন। আর বাড়ির আশপাশের বিস্তৃত চত্বরেও নীচু প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেন।

আমার এই পিসেমশায়ের অর্থভাগ্যেরে কথা লোকের মুখে মুখে তখন প্রচারিত হ'ত। এইরূপ প্রচারের ফলেই তাঁর বাড়িতে সেবার ডাকাত পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে লিখেছেন—যেদিন তাঁদের বাড়িতে ডাকাতের খেলা দেখানো হয়, সেদিন এক ডাকাত লম্বা লাঠিতে ভর দিয়ে দুতলায় উঠেছিল।

আমার পিসেমশায়ের বাড়িতে বোধ করি সেদিন এক ডাকাত লাঠিতে ভর

করেই লাফিয়ে বাড়ির ঘেরা উঁচু প্রাচীরের উপর উঠেছিল। তারপর সেখান থেকে লাফিয়ে বাড়ির উঠানে নেমে বাড়ির বার দরজার খিল খুলে দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—তাঁদের বাড়িতে এক ডাকাত ঢেঁকিতে চাদর বেঁধে ঢেঁকির খেলা দেখিয়ে ছিল।

আমার পিসিমাদের বাড়িতে সেদিন কয়েকজন ডাকাত ঢেঁকিশাল থেকে ঢেঁকি তুলে নিয়ে গিয়ে সেই ঢেঁকি ধরে ঢেঁকির ঘা দিয়ে দিয়ে দালানের বন্ধ দরজা ভেঙ্গেছিল।

পিসেমশায় সে রাত্রে বাড়িতে ছিলেন না। তিনি সেদিন তাঁর কর্মস্থল টিটাগড়ে ছিলেন।

ঢেঁকির ঘা দিয়ে দালানের কপাট ভাঙ্গার শব্দ এবং ডাকাতদলেরও কোলাহল শুনে, আমার পিসিমা তাঁর একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ ও বাড়ির অন্যান্য লোকজনদের নিয়ে একেবারে দুতলার ছাদে চলে যান। সেখানে যাবার আগে দুতলায় ওঠার সিঁড়ির কপাটে খিল এবং দুতলার ছাদের কপাটে শিকল তুলে দেন। পিসিমা ছাদে উঠে চীৎকার করে পাড়ায় তাঁর দাদাদের নাম ধরে অমুক দাদাগো, অমুক দাদাগো বাঁচাও বাঁচাও করে ডাকতে লাগলেন।

পাড়াগাঁয়ের নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে পিসিমার ছাদের সেই চীৎকার অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছিল। ফলে দেখতে দেখতে অনেক লোকও এসে গেল। কিন্তু লোক এলে কি হবে, কেউই ডাকাতদের কাছে এগুতে পারল না। অদূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই ডাকাতদের ডাকাতি দেখতে লাগল। আমার পিসিমা তখনও সমানে চীৎকার করে চলেছেন।

এই ডাকাতি দেখতে সেরাত্রে বাড়ির সকলের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম—ডাকাতরা পিসিমাদের বাড়ির বাইরের একটা আম গাছের ডালে অনেক থলে জড়িয়ে তাতে কেরোসিন ঢেলে জেলে প্রচণ্ড আলোয় আলোকিত করেছে। শুনলাম, বাড়ির অন্যদিকেও এইভাবে প্রচণ্ড আলো করেছে। দেখলাম—বাইরে কয়েকজন ডাকাত খুব লাঠি ঘোরাচ্ছে। কেউ কেউ বাড়ির ভিতর থেকে থালা এনে সেগুলো ঘুরিয়ে দাঁড়ানো আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

ডাকাতদলের একটা অংশ বাইরে এইভাবে লাঠি ঘুরিয়ে ও থালা ছুঁড়ে লোককে তাদের কাছে যেতে দিচ্ছিল না। বাকি অংশ একতলায় পিসিমাদের যে ঘরে লোহার প্রকাণ্ড সিন্দুকে বা আয়রণ সেফে প্রচুর সোনার গহনা ও টাকা ছিল, সিন্দুকের চাবি না পেয়ে, সঙ্গে আনা ছেনি ও হাতুড়ি দিয়ে সেই সিন্দুক ভাঙতে চেষ্টা করছিল। সিন্দুক ভাঙ্গার শব্দও আমাদের কানে আসতে লাগল।

এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। লোহার হাতুড়ির শব্দ সমানে চলছে, আমরাও সেই শব্দ শুনছি। হঠাৎ হাতুড়ির শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। এমন সময়

বাড়ির ভিতরের ডাকাতরা বাইরে এসে সঙ্গীদের ডাকল। ডেকে বললো—চলো চলো, পালাই চলো। ভোর হয়ে এসেছে। এদের বাড়ির দেয়াল ঘড়িতে ঢঙ্ ঢঙ্ করে চারটে বেজে গেল। কিছুই পাওয়া গেল না। উল্টে শেষে কি ধরা পড়বো। চল সব পালাই—এই বলে ডাকাতের দল আমাদের বাড়ির দক্ষিণে যে দিগন্ত বিস্তৃত কেদোর মাঠ আছে, অন্ধকারে সেই মাঠের মধ্যে মিশে গেল।

ডাকাতদল চলে গেলে, আমরা যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ডাকাতদের ডাকাতি দেখছিলাম, এবার সকলে পিসিমাদের বাড়ির ভিতরে গেলাম। পিসিমাকে ডাকা হলে তিনিও নেমে এলেন।

সকলে মিলে সিন্দুক থাকার ঘরে গিয়ে দেখলাম, ইস্পাতের সিন্দুকের কিছুই করতে পারে নি, উপরে কয়েকটা ছেনির চিহ্ন পড়েছে মাত্র।

আমরা ঐ ঘরের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম—ঘড়িতে তখন সত্যিই চারটা বেজে গিয়ে টিক্ টিক্ করে ঘড়ি চলছে।

এই দেয়াল ঘড়িতে তখন চারটা বাজলেও, আসলে তখন রাত্রি প্রায় একটা। কিছুদিন ধরে এই ঘড়িটা ঠিক সময় দিত না, ঘড়ি না হয়ে ঘোড়া হয়েই চলতো। এ ঘড়ির সময়ের দিকে বাড়ির কেউ তাকিয়েও দেখত না। এই অবহেলিত ঘড়িই সেদিন ১টার জায়গায় ৪টা হয়ে ডাকাত দলকে ভাগিয়ে ছিল, যা বহু মানুষ একত্র হয়েও পারেনি।

বাকি রাতটা সকলে মিলে নানা আলোচনা করে, যেমন—কারা চুরি করতে এসেছিল, কে চোরেদের সন্ধান দিল, ইত্যাদিতে কাটাল।

সকাল হলে একজন এসে খবর দিল—পাশের বাগানে একটা ছোট কালী-ঠাকুর আর বেশ কয়েকটা মদের বোতল পড়ে রয়েছে।

এই কথায় সকলেই বুঝল—ডাকাতরা ডাকাতি করতে আসার আগে, ঐ বাগানে কালীপুজো করেছিল। আর যে মদ খেয়েছিল, তারই বোতল।

পিসিমাদের বাড়ির বাইরে ডাকাতদের আনা একটা কেরোসিনের টিনও পড়েছিল।

পরে আমাদের পাড়ার একজন ডাকাতদের পুজো করা ঐ কালীমূর্তিটি এনে একটা পুকুরের জলে বিসর্জন দিয়েছিল বা ফেলে দিয়েছিল।

বাংলা দেশের অসংখ্য জায়গায় আজও মহা আড়ম্বরে ডাকাতে কালী পুজিত হচ্ছে দেখা যায়। ডাকাতরা ডাকাতি করার আগে এই সব কালীর পুজো করেছিল। তারপর ডাকাতি করে কালীকে ফেলে চলে যায়। কিন্তু কালীভক্ত হিন্দু বাঙালী ঐ সব কালী কুড়িয়ে এনে মন্দির করে তাতে কালীকে প্রতিষ্ঠিত করে পুজো করে আসছে।

হিন্দুর এত দেব দেবী থাকতে ডাকাতরা অন্যদের ছেড়ে কেবল কালীরই পূজো করে কেন ? তাও ডাকাতি করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। তাহলে কি দেবী কালী নিরপরাধী লোকের সর্বনাশকারী তাঁর এই ভক্ত ডাকাতদের কিছু প্রশ্রয় দেন ?

দেবী কালী ডাকাতদের প্রশ্রয় দেন কি দেন না, জানি না। তবে এ কথা পড়েছি এবং শুনেওছি যে, ডাকাতরা ডাকাতি কালে বা ডাকাতির আগে কালী-মূর্তির কোনরূপ নকলও দেখলে, এমন কি শুধু কালী নাম শুনলেও আনন্দে বিগলিত হয়। এ ধরণের দুটা উদাহরণ দিচ্ছি—প্রথমটা রবীন্দ্রনাথের সেই লেখা 'একবার একজন মেয়ে খাঁড়া হাতে কালী সেজে উলটে ডাকাতদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করেছিল।'

দ্বিতীয়টা আমার মাতৃদেবী নগেন্দ্রবালা দেবীর মুখে শোনা একটা সত্য ঘটনা। সেই ঘটনাটা এখানে বলছি—

বইয়ে আগে এই অধ্যায়েই কোটালপাড়া গ্রামের কথা বলেছি। এই কোটাল-পাড়ায় আমার মামার বাড়ি।

আমার মা তাঁর বাপের বাড়ির অদূরে কোটালপাড়া গ্রামেরই কালী নামে একটি বালকের কাহিনী আমাদের ভাইবোনদের কয়েকবার শুনিয়ে ছিলেন। আমরা ভাইবোনরা হলাম যথাক্রমে—পাঁচুবালা, গোপাল, সাবিত্রী, যমুনা, রানু ও দিলীপ। মা তাঁর শৈশবে তাঁর বাপের বাড়িতেই এই কাহিনীটি শুনে ছিলেন। কাহিনীটি হ'ল—

কোটালপাড়ার পশ্চিমে রসপুর গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে ঐ কালী ভৃত্যের কাজ করতো। কালীর নাম কালীপদ বা কালিদাস যাই হোক্, লোকে তাকে কালী বলেই ডাকতো, আর সেও নিজেকে কালী বলেই পরিচয় দিত।

কালী রসপুরেই তার বাবুদের বাড়িতে থাকতো খেতো। কদাচিৎ কখন কোটালপাড়ায় নিজের বাড়িতে আসতো। কালী বাবুদের বাড়িতে একাই ভৃত্য ছিল, রাত্রে খাওয়ার পর সে বাবুদের বা'র বাড়ির বৈঠকখানায় একা শুয়ে থাকতো।

একদিন রাত্রে কালী বৈঠকখানায় শুয়ে আছে, তখন প্রায় রাত দুপুর। এমন সময় বৈঠকখানার উঠানে কাদের কথাবার্তা শুনে কালীর ঘুম ভেঙে গেল। কালী ঘর থেকে বারান্দায় এসে লোকগুলোকে দেখে বুঝলো এরা ডাকাত, বাবুদের বাড়িতে ডাকাতি করবার জন্যই এসেছে।

কালী চোর চোর করে চেঁচাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় একজন ডাকাত কালীকে দেখতে পেয়ে বেশ চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল—কে ?

কালী ভয়ে ভয়ে বললো—আমি কালী।

এই কালী নাম শুনেই ডাকাতরা খুব খুশী হ'ল, তারা ভাবল—আজ

নিশ্চয়ই কিছু মিলবে। তখন ডাকাত দলের যে সর্দার সে জয় মা কালী বলে, এই ভৃত্য কালীকে বললো—কালী তুমি নির্ভয়ে এইখানে থাক। আমরা যাবার সময় তোমাকে কিছু দিয়ে যাব। সে সবই তোমার হবে। আমাদের কাজের আরম্ভে তুমি আমাদের শুভনাম 'কালী' শুনিয়েছ।

কালী ভয়েও বটে এবং আশা নিরাশাতেও বটে, সেই ঘরে শুয়ে রইল।

বেশ কিছুটা সময় বাদে ডাকাত দলের সেই সর্দার কালীকে ডেকে টাকা ও সোনায় ভরা একটা ছোট পুঁটুলি তার হাতে দিয়ে গেল। ডাকাতরা চলে গেলে, কালীও সেই পুঁটুলী নিয়ে দ্রুত বাড়ি চলে এল। কোটালপাড়ায় বাড়িতে সেইসব রেখে ভোরেই কালী আবার তার মনিবের বাড়িতে ফিরে গেল।

সকলে কালীকে জিজ্ঞাসা করল—তুই এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

সে বললো—সদরের উঠোনে ডাকাতদের কথাবার্তা শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি চোর চোর বলে ডাকতে যাব কি, ডাকাতরা আমাকে দেখেই তেড়ে মারতে এল। আমি প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাই।

এখন এই চারদিক একটু ফরসা হতে আসছি।

কালী বাবুদের বাড়ির বহুদিনের পুরনো এবং বিশ্বাসী চাকর। তাই সকলে কালীর কথা বিশ্বাস করল।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—খাঁড়া হাতে কালী-সাজা একটি মেয়েকে দেখে ডাকাতরা প্রণামী দিয়েছিল। আমার মা'র বলা এই কাহিনীতে দেখছি, ডাকাতরা ডাকাতির আগে শুধু 'কালী' নাম শুনেই ঐ কালীকে 'প্রণামী' দিয়ে গিয়েছিল।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ। আমি তখন আমতা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ফিফ্‌থ ক্লাসে (বর্তমানের ক্লাস সিক্স বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে) পড়ি। সেই সময় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সারা ভারত জুড়ে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হ'ল।

আমার বয়স তখন বছর ১৩। সেই বয়সে ঐ আইন অমান্য আন্দোলন কি এবং কেন—সে সম্বন্ধে কতক জেনে ও কতক না জেনে, অপরের দেখে অপরের সঙ্গে আমি বালকোচিত বা ছেলে মানুষী হিসাবে ঐ মহান্ আইন অমান্য আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলাম।

এই আইন অমান্য আন্দোলনের সময় যে আইন অমান্যটা তখন সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেটা হ'ল—লবণ আইন ভঙ্গ।

এই সময় লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য গান্ধীজী তাঁর সবরমতী আশ্রম থেকে সদলে সুদীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে সমুদ্র তীরে ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য সেখানে গিয়ে সমুদ্র থেকে জল নিয়ে নুণ তৈরি করবেন।

তখন ভারতে ইংরাজ শাসনের আমলে নিজের প্রয়োজনেও ভারতবাসীর সামান্য নুণ তৈরি করার অধিকার ছিল না। নুণ তৈরি এবং নুণের মূল ব্যবসা ছিল শাসক ইংরাজ সরকারের হাতে। তাই দেশের কেউ নুণ তৈরি করলেই ইংরাজের আইনে সে হ'ত দণ্ডনীয় অপরাধী।

গান্ধীজীর এই আন্দোলনের সময়েই ভারতবাসী প্রথম জানতে পারল যে, তাদের নিজেদের নুণ তৈরি করার অধিকারটুকুও ইংরাজ সরকার কেড়ে নিয়েছে।

এই আন্দোলনে মত্ত হয়ে তখন দেশের সমুদ্রতীরবাসী জনগণ সমুদ্র জল নিয়ে নুণ তৈরি করতে লাগল এবং দলে দলে কারা বরণ করল। আর গান্ধীজী তো ডাণ্ডীতে সদলে কারাবরণ করলেন-ই।

মনে পড়ে ঐ সময় আমরা পাড়ার ক'জন সমবয়সী আমাদের গ্রামের নোণা মাঠের মাটি চেঁচে এনে সেই মাটি জলে গুলে প্রথমে নোণা জল তৈরি করতাম। তারপর জল থিতিয়ে গেলে তলার মাটি বাদ দিয়ে উপরের জলটুকু নিয়ে উনুনের আগুনে জ্বাল দিতাম। তাতে প্রায় কাদা কাদা রঙের এক আধ চামচ নুণ হ'ত। সেটাকে আবার পরিষ্কার ন্যাকড়ায় মুড়ে ঘুঁটের শুকনো ছাইয়ের মধ্যে রেখে শুকনো করে নিতাম এবং ঐ নুণের রংটা যাতে কিছুটা সাদা হয়, তারও চেষ্টা করতাম।

এখন মনে হয়, সেদিনের আমাদের ঐ নুণ তৈরির কাজটা যদিও ছেলে-খেলায় মতই ছিল, তবুও তখন ঐ কাজে প্রচুর উৎসাহ ও আনন্দ পেয়েছিলাম এবং ভবিষ্যতের স্বাধীনতা লাভের আশায় তখন আমাদের বালক মন ভরে ছিল।

এই লবণ আইন ভঙ্গের সময়েই দেখেছি, ইতিপূর্বে কংগ্রেস কর্মীদের জন্য ঘোষিত গান্ধীজীর বিলাতী বর্জন, খাদি প্রচার, মাদক বর্জন, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি নির্দেশগুলি নিয়েও লোকে মেতেছে।

গান্ধীজীর নির্দেশিত বিলাতী বর্জনের মধ্যে ছিল বিলাতী বস্ত্র, বিলাতী প্রসাধন দ্রব্য, বিলাতী ঔষধপত্র, এমন কি সেই সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষাও বর্জন করা।

ইংরাজি বর্জন নীতির আওতায় প'ড়ে তখন দেশের প্রায় সমস্ত হাই স্কুলে ও কলেজে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের আমতার হাই স্কুলও বন্ধ হয়ে গেল, কেউ আর স্কুলে পড়তে গেল না।

আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার দুবছর আগে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলায় উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করে সরকারী বৃত্তি পেয়েছিলাম। বৃত্তি ছিল দু বছরের অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময়ের জন্য।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময়েই ইংরাজি শিক্ষা বর্জন হিসাবে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক মাস পরে দেশের নেতৃবৃন্দ স্থির করলেন, দেশের সমস্ত স্কুল একেবারে বন্ধ না করে এম. ই. বা মধ্য ইংরাজি স্কুল পর্যন্ত চালু থাকুক। ষষ্ঠ শ্রেণী ছিল তখনকার এম. ই. স্কুলের শেষ ক্লাস। অতএব আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম।

ঐ বছর সরকারী বৃত্তির টাকা নেওয়ার সময় দেখলাম, যে ক'মাস ইংরাজি বর্জন বলে স্কুল বর্জন করেছিলাম, সরকার সেই ক'মাসের বৃত্তির টাকা কেটে নিয়েছে।

এখন ভাবি দেশের মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিয়ে কোনদিন কারাবরণ করি নি বটে, তবে বালক বয়সে আইন অমান্য আন্দোলনে ইংরাজি বর্জনের সামিল হয়ে ঐ যে ক'মাসের সরকারী বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম, সেটাই আমার প্রতি সরকারের শাস্তি বলে ঘোষিত হয়েছিল।

খাদি প্রচারের জন্য তখন সারা দেশের মত আমাদের অঞ্চলেও চরকা এবং তকলীর প্রচুর প্রচলন দেখেছি। চরকা অনেক বাড়িতে না থাকলেও, একাধিক তকলী প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ছিল। তকলী বহুকাল আগেই একরূপ অন্তর্হিত হওয়ায়, তকলী জিনিসটা কি এবং তকলীতে কিভাবে সুতা কাটা হ'ত তা আজকের অনেকেই জানেন না। তাই তকলী সম্বন্ধে এখানে দু'একটা কথা বলছি।

৫/৬ ইঞ্চি মাপের মত একটা লম্বা পিতলের সরু রড বা কাঠি নিয়ে তার মাথার দিকটা পিটে চ্যাপটা করে তাতে একটা খাঁজ কেটে দেওয়া হ'ত। আর ঐ পিতলের সরু রড বা কাঠির একেবারে নীচে অনেকটা একটা রূপার টাকার আকারের এবং প্রায় ঐরূপ ওজনেরই একটা পিতলের চাক্‌তি লাগানো থাকতো।

তখন সুতো কাটার জন্য পাঁজ করা কিছুটা লম্বা ও গোল আকারের তুলোর ফালি পাওয়া যেত। একটা সমতল জায়গায় তকলীটা খাড়া করে রেখে তকলীর মাথায় ঐ পাঁজ করা তুলোর কিছুটা লাগিয়ে, বাঁ হাতে সেই তুলো ধরে রেখে, ডান হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের সাহায্যে তকলীতে পাক দিলে তকলী বাঁই বাঁই করে ঘুরবে, ঐ সঙ্গে বাঁ হাতে ধরে রাখা তুলোটা উপরের দিকে তুলতে থাকলে সুতোও তৈরি হতে থাকবে। তারপর সেই সুতোকে আবার তকলীতে পাক দিয়ে তকলীর নীচের চাক্‌তির কাছে গুটিয়ে নিতে হবে। এই গুটোনো সুতোর প্রান্তটা আবার তকলীর মাথায় নিয়ে আগের মত তকলী ঘুরালে আবার সুতো হবে।

সেই আইন অমান্য আন্দোলন কালে সময়ে অসময়ে তকলীতে অনেক

সুতো কেটেছি। তক্‌লী এবং পাঁজ করা তুলো তখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো।

ফিপ্‌থ ক্লাসে আমাদের বাংলা পড়াতেন মেদিনীপুরের স্বদেশীভাবাপন্ন এক শিক্ষক মশায়। তাঁর ক্লাসে বসেও পড়া শুনতে শুনতে তক্‌লীতে সুতো কাটতাম। বাড়িতে আমার এক জ্ঞাতি দাদার একটা চরকা ছিল। সেই চরকায়ও কখন কখন সুতো কেটেছি।

এবার ঐ আইন অমান্য আন্দোলনের সময় অস্পৃশ্যতা বর্জনের কথা। মনে পড়ে, গ্রামের হাটতলায় গ্রামের বয়স্করা একটা বিরাট পংক্তি ভোজনের ব্যবস্থা করে ছিলেন। তাতে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকল জাতির লোকে মিলে একত্রে বসে খেয়ে ছিলাম। পরিবেশন করেছিল গ্রামের একজন মুচি বা চর্মকার।

অবশ্য সেদিন এই কাজে গ্রামের কয়েকজন গোঁড়া সমাজপতি বিরূপতা করেছিলেন, কিন্তু তা টেকেনি।

হিন্দু সমাজের তথা-কথিত অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য কোন কোন জাতির প্রতি উচ্চবর্ণের কোন কোন লোকের এমনি সব মারাত্মক কুসংস্কার ছিল যে, তা ভাবলেও অবাক্‌ হতে হয়। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় আমরা যখন স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলে মিলে পংক্তি ভোজন করি, তার কিছুদিন আগের একটা ঘটনা এখানে বলছি—

আমতার স্কুল ছিল আমার বাড়ি থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে। আমাদের গ্রামের দক্ষিণ পাড়া থেকে আমি তখন একাই আমতায় পড়তে যেতাম। আমাদের পাশের গ্রামের চার পাঁচজন ছাত্র ছিল স্কুলে আমার সহপাঠী। গ্রীষ্মের সময়ে কি মর্ণিং স্কুলে, আর অন্য সময়ে কি বেলার স্কুলে যাওয়ার সময় আমি একাই যেতাম বটে, তবে ফেরার সময় ঐ সহপাঠী বন্ধুরা মিলে একত্রে দল বেঁধে আসতাম।

একবার মর্ণিং স্কুলের সময়কার একটা দিনের ঘটনা—

আমতা আমাদের অঞ্চলের একটা বড় শহরের মতই বলতে হবে। এখানে মস্ত বড় বাজার, দামোদর নদের তীরে বন্দর, থানা, রেজেস্ট্রি অফিস, পোষ্ট অফিস, মুন্সেফ কোর্ট প্রভৃতি রয়েছে। তাই আশপাশের অঞ্চলের বহু মানুষকেই প্রায়ই আমতায় যাতায়াত করতে হয়।

যে সময়কার কথা বলছি, তখন আমি আমতার স্কুলে সিক্‌থ ক্লাসের বা আজকের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। সেদিন মর্ণিং স্কুলের ছুটির পর আমরা সবাই মিলে বাড়ি ফিরছি। স্কুল থেকে কিছুটা পথ এসেছি। বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা কি কিছু কম।

আমরা ফিরছি, কিন্তু আমাদের অঞ্চলের বহু মানুষ তখন নিজ নিজ কাজে আমতায় যাচ্ছে। পথে তাদের সঙ্গে সামনা-সামনি দেখা হচ্ছে। মুখোমুখি দেখা হওয়ায় অনেকেই আমাদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে। সাধারণ মামুলি কথা।

আগেই বলেছি, উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম। এখনকার মাধ্যমিক পরীক্ষার ন্যায় তখনকার উচ্চ প্রাথমিকের শেষ শ্রেণীর অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর সকল ছাত্রকেই সরকারের পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা দিতে হ'ত। ঐ পরীক্ষায় পাস করলে তবেই উচ্চ ইংরাজি অথবা মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া যেত। যাই হোক্, ঐ বৃত্তি পাওয়ার ফল হয়েছিল এই যে, শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, আশেপাশের গ্রাম গুলিতেও আমার একটা সুনাম হয়ে গিয়েছিল এবং কয়েকটা গ্রামের অনেকে আমাকে চিনতোও। সেদিন ফেরার পথে বিপরীতমুখী পরিচিত যে সব পথচারী আমাদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিল, তারা কেবল আমার সঙ্গেই কথা বলছিল। প্রায় প্রতিদিনই এই রকমই হ'ত।

এর ফলে দলের শীতল আমাকে বললো, যত লোক দেখছি, কেবল তোর সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছে। পথে এ রকম পাশাপাশি আর যাওয়া হবে না। তুই দলে সবার শেষে থাক, আমি থাকি সবার আগে। আর সবাই থাক মাঝে। এইভাবে আগু পিছু হয়ে যাই আয়। এবার দেখ্‌বি লোকে আমার সঙ্গেই কথা বলবে এবং যা জিজ্ঞাসা করার আমাকেই জিজ্ঞাসা করবে।

ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ। যা হোক এইভাবেই চলেছি। শীতলদের পাড়ার একজন মাঝ বয়সী লোক হন্‌হন্ করে এগিয়ে আসছে। লোকটি শীতলের তো বটেই, আমাদেরও সকলেরই পরিচিত ছিল।

লোকটি শীতলের সামনে এসে গেল। সে হঠাৎ শীতলকে দেখেই তার মাথায় খোলা ছাতাটা হেলিয়ে তার নিজের মুখটা আড়াল করার অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টি গোচর না করার চেষ্টা করল। কিন্তু তাহলে কি হবে আমরা সবাই আগেই তাকে দেখেছি। তাই একটা পরিচিত লোক পেয়েও সে শীতলের সঙ্গে কথা বলছে না দেখে শীতল অগত্যা নিজেই তাকে জিজ্ঞাসা করল, ঐ মামুলি কথাই—কি গো কোথায় যাচ্ছো ?

যেই না এই কথা বলা, লোকটি ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে—তবে রে, ব'লে ছাতাটা মুড়ে সেটা নিয়ে শীতলকে মারতে তেড়ে গেল।

প্রাণ বাঁচানোর জন্য শীতল দৌড় দিল। লোকটি ছাতা উঁচিয়ে শীতলের পিছনে পিছনে ছুটল। এই দেখে আমরা সকলেই হতভম্ভ। শীতলকে বাঁচাতে আমরাও সকলেই ছুটলাম লোকটিকে ধরতে। গিয়ে আমি বললাম—কি হয়েছে ? ওকে অমন করে মারতে যাচ্ছেন কেন ?

মারতে যাব না? কোর্টে আজ আমার মামলার দিন। ওকে দেখে ফেললাম। তাই অযাত্রা হ'ল ভেবে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তা ঐ ছোট জাতটা কিনা আমাকে আবার ডাকল।

এই বলেই লোকটি আর না দাঁড়িয়ে মামলায় হাজিরা দেবার জন্য আগের চেয়েও জোরে পথ হেঁটে আমতার দিকে চলে গেল।

দেখলাম শীতল তখনও মারের ভয়ে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। শীতলকে ডাকলাম।

শীতল ছিল আমাদের হিন্দু সমাজের তথাকথিত এক অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত। অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না, তবে আমি হাওড়া জেলার উচ্চবর্ণের কিছু গোঁড়া ব্যক্তির মধ্যে দেখেছি, একটা অত্যন্ত কুসংস্কার বা বদ্ ধারণা ছিল (হয়ত আজও আছে) যে, শীতলদের জাতের লোককে দেখে কোন শুভ কার্যে যাত্রা করলে সে যাত্রা ফলদায়ক হয় না। এই প্রচলিত কু ধারণার জন্যই সেদিন লোকটি ক্ষেপে গিয়েছিল। না হলে লোকটি আসলে অতটা খারাপ ছিল না। বহু বছর আগের দেখা, ঐ অস্পৃশ্যতা ও ছুঁৎমার্গিতা এবং ঐ নিয়ে সমাজের উচ্চবর্ণের মুষ্টিমের কয়েকজনের সৃষ্ট নিদারুণ ঐ কুসংস্কারের পাপ আজও কি হিন্দু সমাজ থেকে দূরীভূত হয়েছে?

প্রসঙ্গ কথা

১. ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখকরা এবং আরও কেউ কেউ তাঁদের বইয়ে ভারতচন্দ্রের জন্মস্থানের কথা সঠিক লেখেন নি। ১৩৫৭ সালের কার্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মস্থান' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে তাতে এ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম। এখানে সেই প্রবন্ধ থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

'কলকাতা থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে হাওড়া জেলায় আমতা থানার মধ্যে কবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান পেঁড়ো গ্রাম অবস্থিত। হাওড়া-আমতা লাইট রেলপথের মুন্সিরহাট স্টেশনে নেমে পাঁচ মাইল পশ্চিমে গেলেই এই গ্রাম। যে কোনও সাহিত্য সেবী যাঁরা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লিখতে চান, তাঁরা যাতায়াতে সামান্য মাত্র এক টাকা দু'আনা রেলভাড়া খরচ করলেই কবির জন্মস্থানটা দেখে আসতে পারেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা এমন কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই কষ্টটুকু করতে নারাজ। অথচ তাঁরা ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ভুল

সংবাদ দিনের পর দিন পরিবেশন করছেন। এমনকি এঁরাও আবার এক এক জনে এক এক রকম কথা লিখছেন। কেউ বলছেন—হুগলি জেলার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন। কেউ বলছেন—বর্ধমান জেলার পেঁড়ো গ্রামে। আবার কেউ বলছেন—দক্ষিণ রাঢ়ে ভুরশুট পরগনায় পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে। নিম্নে এ সবের কিছু কিছু উদ্ধৃত করা গেল—

প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক্। কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাবই সব চেয়ে বেশী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তকে প্রতি বছরই ভারতচন্দ্রের কবিতা সংকলিত হয়। সেইজন্য কবিতার মাথায় সংক্ষেপে কবির পরিচয় আছে। সেখানে লেখা আছে—'রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় হুগলি জেলার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।'

পেঁড়ো বসন্তপুর নামে কোন গ্রাম হুগলি জেলার মধ্যে কোথাও নেই। এই পেঁড়ো বসন্তপুর যে হাওড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তা জানেন না। ফলে না জেনে একটা ভুল সংবাদ ছাত্রদের শিখিয়ে যাচ্ছেন। আর একটা কথা এই যে, পেঁড়ো-বসন্তপুর একটা গ্রাম নয়। পেঁড়োর ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত বসন্তপুর পৃথক অন্য একটি গ্রাম। পেঁড়োর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সাধারণতঃ একই জেলায় বা কাছা-কাছি এক নামের একাধিক গ্রাম থাকলে যাতে বুঝতে কষ্ট না হয়, সেজন্য বক্তব্য গ্রামটাকে বোঝাতে সেই গ্রামের সঙ্গে আশপাশের আর একটা গ্রামের নাম করা হয়ে থাকে। পেঁড়ো নামে কোথাও যখন আর কোন গ্রাম নেই, তখন বসন্তপুর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বরং পেঁড়োর সঙ্গে বসন্তপুর যোগ করায় ছাত্ররা ভাবতে পারে যে 'পেঁড়ো বসন্তপুর' একটি গ্রাম।

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন—'ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অনুমান ১৭১২ খ্রীঃ ভুরশুট পরগনাস্থ হুগলির অন্তর্ভুক্ত পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।'

পরগনা জেলার অংশ। যেমন জেলার অংশ মহকুমা। ভুরশুট পরগনাস্থ হুগলী বা হুগলী জেলা সঙ্গতিহীন।

এই প্রসঙ্গে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার মাজু গ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ১৮শ অধিবেশনের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। মাজু সম্মিলনের উদ্যোক্তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের স্মৃতি জাগরিত করা। এই সম্মিলনের মূল সভাপতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনিবার্য কারণবশত সম্মিলনে যোগ দিতে না পারায় দীনেশবাবু সভাপতিত্ব করেছিলেন।

সেদিন দীনেশবাবুও সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে সর্ব প্রথমেই বলেছিলেন—

'মাজু হইতে বঙ্গের কবি-সম্রাট ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মভূমি বেশী দূরবর্তী নহে। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বতঃই তাঁহার উদ্দেশ্যে মস্তক অবনত হইতেছে।' (বঃ সাঃ সঃ ১৮শ অধিবেশন, কার্যবিবরণী পৃঃ ২৯)। এই কথার পর আরও প্রায় ৫০টি বাক্যে দীনেশবাবু সেদিন সভায় ভারতচন্দ্রের প্রশস্তি করে ছিলেন।

এখন আমাদের বক্তব্য এই যে, দীনেশবাবু সমস্ত জেনে এবং দেখেই এসে-ছিলেন যে, হাওড়া জেলায় আমতা থানার মধ্যে এই 'পেঁড়ো' গ্রামটি অবস্থিত। অথচ তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলা বিভাগের সর্বময় কর্তা হয়েও প্রবেশিকা বাঙ্গলা পুস্তকের উল্লিখিত ভুল সংশোধন করলেন না। তা ছাড়া মাজু সম্মিলনের পর তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' পরবর্তী সংস্করণগুলিতেও ঐ ভুল সংশোধন করলেন না। যা ছিল তাই রেখে দিলেন।

দীনেশবাবুর পর আর একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও লেখকের কথা ধরা যাক। তিনি ডঃ সুকুমার সেন। সুকুমারবাবু 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' নামে যে বইখানি লিখেছেন, তাতে ভারতচন্দ্রের জন্মস্থানের কথা লিখতে গিয়ে তিনি আর কোন জেলারই উল্লেখ করেন নি। তিনি লিখেছেন—'কবির পৈতৃক নিবাস ছিল দক্ষিণরাঢ়ে ভুরশুট পরগনার পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে।'

আজকের দিনে জেলার কথা না ব'লে পরগনার উল্লেখ দুর্বোধ্য। বর্তমানে পরগনার প্রচলন না থাকায়, কেবল পরগনার কথা বললে কেউই বুঝতে পারবে না যে জায়গাটি কোথায়। অতএব বাঙ্গলার একজন শ্রেষ্ঠ কবির কথা লিখতে গিয়ে তাঁর জন্মস্থান সম্বন্ধে এরূপ উল্লেখ সমীচীন হয়েছে বলে মনে হয় না।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে একখানি ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় ভারতচন্দ্রের জীবনীতে আবার পেঁড়ো গ্রামকে দেখা যাচ্ছে,—বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ভুরশুট পরগনার মধ্যে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—পেঁড়ো গ্রাম হাওড়া জেলার মধ্যে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এই সব সাহিত্যিকরা বর্ধমান ও হুগলী জেলার নাম করছেন কেন? এর প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, ভারতচন্দ্রের জন্মের সময় এই পেঁড়ো গ্রাম বর্ধমানেরই অন্তর্গত ছিল। তখন হাওড়া নামে কোন জেলা ছিল না। পরে পেঁড়ো আবার বর্ধমান থেকে পৃথক হয়ে হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর শেষে হাওড়া জেলার মধ্যে আসে।

বেশ বোঝা গেল যে আমতা থানার মধ্যেকার পেঁড়ো গ্রাম হাওড়া জেলার অন্তর্গত হওয়ার পূর্বে যথাক্রমে বর্ধমান ও হুগলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এখন আমাদের কথা হচ্ছে—আজ হাওড়া পৃথক জেলা হওয়ায় এবং পেঁড়ো হাওড়ার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি এখনও পেঁড়ো গ্রাম বর্ধমান বা হুগলীর মধ্যে বলেন, তা হ'লে আজকে তা একেবারে অর্থহীন হবে। বর্তমানের

উল্লেখ না করে শুধু পুরাতনের উল্লেখ করায় একটা মস্ত ভুলের সৃষ্টি হবে। পেঁড়ো গ্রামকে বর্তমানে হাওড়া জেলায় না বলে যদি শুধু হুগলী বা বর্ধমানের মধ্যে বলা হয়, তা হ'লে কবির জন্মস্থান খুঁজতে গিয়ে প্রাণান্ত করলেও উক্ত জেলায় কোথাও এই গ্রামের সন্ধান পাবে না।

তাছাড়া পূর্বে কি ছিল বর্তমানে তার প্রয়োজনই বা কি? এখনকার প্রায় সমস্ত জেলাই ত নানা সীমা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকেকার রূপগুলো লাভ করেছে। আজ যদি শুধু আগের কথা ধরে বলা যায় তাহলে ত বাঙ্গলার অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিরই জন্মস্থান নিয়ে একটা জটিলতার সৃষ্টি হবে। এখানে একটা উদাহরণ দিলেই আশা করি ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ম'শায়ের জন্মের সময় তাঁর জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম ছিল হুগলী জেলার মধ্যে। তখন ঘাটাল মহকুমাটাই ছিল হুগলীর অন্তর্গত। আমরা আজও লিখব কি, হুগলী জেলায় ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর ম'শায় জন্মেছিলেন? এরূপ লেখার অর্থ ত ভুলের সৃষ্টি করা। কেননা হুগলী জেলায় আজ আর বীরসিংহ গ্রাম নেই। তাই বিদ্যা-সাগরের ক্ষেত্রে আমরা সকলেই যেমন লিখি মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন, তেমনি ভারতচন্দ্রের বেলায়ও লেখা উচিত—হাওড়া জেলার পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন।'

২. ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস' ১ম খণ্ড গ্রন্থে লিখেছেন—'দক্ষিণ রাঢ়ের মুসলমান কবিদের মধ্যে সৈয়দ হামজাই শ্রেষ্ঠ।...

কবির পৈতৃক নিবাস ছিল ভুরশুট অদুনা (বা উদনা) গ্রামে। ১১৯৮ সালে দামোদরের বান আসে তিন বার। তাহাতে ইঁহাদের বাড়িঘর ক্ষেত খামার নষ্ট হইয়াছিল। তখন কবিরা বায়ড়া পরগনার রানাঘাট গ্রামে উঠিয়া আসেন। সৈয়দ হামজা লিখিয়াছেন—

সন নিরানব্বই সালে   আমার কপাল ফলে
বাড়িতে পড়িল তিন হানা।'

সুকুমারবাবু এই উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন, হামজার জৈগুণ হানিফা বা জৈগুণের পুথি থেকে। এই উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে, কবি বন্যার কথায় নিজে লিখেছেন—(১১শ) ৯৯ সালে, সুকুমারবাবু বলেছেন ১১৯৮ সালে।

সুকুমারবাবু কবির জৈগুণ হানিফা বা জৈগুণের পুথি থেকে কবির পরিচয় দিলেও কবির মনোহর মধুমালতী বা মধুমালতী কাব্য থেকে কবির আত্মপরিচয় তাঁর বইয়ে দেননি। মধুমালতী কাব্যে কবি বিস্তৃত আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তার কিছুটা এই—

সৈয়দ হামজা বলে মুরশিদ ভাবনা
উদানা বসতি যার ভুরশুট পরগনা।

মেহেদি মোল্লার হউক দুকুল উজালা
কভু যেন কুলে তার নাহি পড়ে মলা।
সাকিন বসন্তপুরে যাহার বসতি
যার বাড়ি আঠার বৎসর মোর স্থিতি।

সুকুমারবাবু তাঁর বইয়ে এই বসন্তপুর গ্রামে কবির থাকার কথা বলেন নি। ১১৯৯ এর বন্যায় কবিরা রানাঘাট গ্রামে গেলেও সম্ভবতঃ পরে আবার তাঁরা উদানায় ফিরে আসেন এবং কবি এই উদানা থেকে আবার বসন্তপুর গ্রামে এসে ১৮ বৎসর ছিলেন।

ডঃ অশোক কুন্ডু সৈয়দ হামজার সাহিত্যগুরু শাহ্ গরীবুল্লাহর 'ইউসুফ জোলায়খা' কাব্য সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গত সৈয়দ হামজার উদানা গ্রামকে হাওড়া জেলার উদং গ্রাম বলেছেন।

ভুরশুটের পাশের পরগনার রসপুর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে উদং। তাই কবি-বর্ণিত ভুরশুটের উদানা উদং নয় বলেই মনে করি।

ভুরশুট পরগনায় উদানা গ্রাম চোখে পড়ে না। তবে ভুরশুটে দামোদর তীরে উদয়নারায়ণপুর আছে।

সেখ আবদুর রহমান তাঁর 'বঙ্গের আদি কবি সৈয়দ হামজা ও সাহিত্য পরিষদ' প্রবন্ধে লিখেছেন—কবি ছিলেন বসন্তপুরে মেহেদী (মইনুদ্দীন) মোল্লার বাড়িতে।

১৩৫৭ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' আমি যখন 'কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জন্মস্থান' প্রবন্ধটি লিখি, তখন তথ্য সংগ্রহের জন্য পেঁড়োয় ভারতচন্দ্রের বংশের প্রায় ৮০ বৎসর বয়স্ক জ্ঞানী ও গুণী বিধুভূষণ রায়ের কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন—আমাদের পেঁড়ো হয়েছে 'পার রাধানগর' থেকে।

বিধুবাবুর কথায় আমি আমার প্রবন্ধে লিখেছিলাম 'পেঁড়ো বা পার রাধানগর'।

পার রাধানগর যদি পেঁড়ো হয়, মইনুদ্দীন যদি মেহেদী হয়, তাহলে উদয়নারায়ণপুর উদনা বা উদানা হয় নি তো ?

৩. সুকুমারবাবু তাঁর বইয়ে গরীবুল্লাহর আমীর হামজা ১ম খণ্ড, ইউসুফ জেলেখা, হানিফার জঙ্গনামা এই তিনটি গ্রন্থের নাম করলেও গরীবুল্লাহর সোনাভান এবং সত্যপীরের পুথি গ্রন্থের নাম করেন নি।

সুকুমারবাবু গরীবুল্লাহকে দক্ষিণরাঢ়ে ভুরশুট অঞ্চলের মুসলমান কবিদের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো কবি বলেছেন।

গরীবুল্লাহ জন্মেছিলেন ভুরশুটের পাশের পরগনার হাফেজপুর গ্রামে।

রবীন্দ্রনাথ

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে হেডিং ও সাব হেডিং দিয়ে এবং বেশ বড় করেই বিজ্ঞাপিত হয়েছিল—

'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ
অদ্য টাউন হলে বিরাট সভা
সভাপতি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে গঠিত নতুন শাসনতন্ত্রের আমলে আইন সভায় হিন্দু প্রতিনিধিগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলে পরিণত হইবে। বর্তমানে হিন্দুদের যে ক্ষমতা আছে তাহা ক্ষুন্ন হইবে ·····

বুধবার ১৫ই জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সময় কলিকাতা টাউন হলে হিন্দুগণের এক বিরাট সভা হইবে। বাঙ্গলার জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। হিন্দু সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।'

স্যার বিজয় চাঁদ মহাতাব (বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ)
প্রফুল্লচন্দ্র রায়
যুগলকিশোর বিড়লা
শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়···

এইভাবে ৩৩ জনের নামের পর বিজ্ঞপ্তির শেষে আবার লেখা হয়েছিল —'ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে একটি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়া কবি রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি পদে বরণ করিবেন। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জে. সি. গুপ্ত, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী, ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত, রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করিবেন।'

ঐ সময় আমি কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে আই. এ. পড়তাম। সেদিন আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদটি পড়ে আমি এবং কলেজে আমার এক সহপাঠী—আমরা দু'জনে ঐ সভায় গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে দেখা।

সভা আরম্ভ হওয়ার কথা সাড়ে ছটায়। আমরা দুই বন্ধুতে সভা আরম্ভের ঘণ্টা দুই আগে টাউন হলের সামনে গিয়ে পৌঁছাই। গিয়ে দেখি সেখানে অসংখ্য লোক জমায়েত হয়ে আছেন। ভাবলাম রবীন্দ্রনাথ মোটরে এসে মোটর

থেকে নেমে যখন সভাস্থানে যাবেন, তখন তাঁকে কাছে থেকে দেখবার জন্যই এঁরা এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। আমরা আর সেখানে না দাঁড়িয়ে সেই ভিড়ের মধ্য দিয়ে কোন রকমে রাস্তা করে নিয়ে টাউন হলে এলাম। টাউন হলের উপরের হল তো বটেই, এমন কি নীচের হল সেখানেও বসার যে-সব চেয়ার ছিল, সে সবও ভর্তি। উপরের হলে অর্থাৎ আসল সভায় যেমন লাউড স্পীকার ছিল, তেমনি নীচের হলের শ্রোতাদের জন্যও সেখানে লাউড স্পীকার ছিল।

আমরা উপরে উঠে উপরের হলে ওঠার একটি সিঁড়ির ধারে দুই বন্ধুতে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদেরও উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথ যখন সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন, তখন কাছে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখবো।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি তো আছিই। সাড়ে ছটা বেজে গেল। তবুও রবীন্দ্রনাথ আসছেন না। ঐখানে দাঁড়িয়েই শুনলাম—রবীন্দ্রনাথ ঠিক সাড়ে ছটাতেই এসেছেন। তবে স্বেচ্ছাসেবকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা অপেক্ষমান জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে রবীন্দ্রনাথকে কিছুতেই উপরে আনতে পারছেন না। তাঁরা আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অবশেষে সাতটা বেজে যাবার পর স্বেচ্ছাসেবকরা রবীন্দ্রনাথকে কোন রকমে ঘিরে উপরে নিয়ে এলেন। আমরা কাছে থেকেই দেখলাম, ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ কবি অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে উপরে এলেন।

এরপর আমরা দুই বন্ধু স্বেচ্ছাসেবকদের পিছনে পিছনে গিয়ে সভা মঞ্চের অদূরে এক কোণে তাঁদেরই দলে ভিড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রবীন্দ্রনাথ এলে সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন। সভায় জনতা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করলে, তাঁর পাশে উপবিষ্ট ডাঃ নীলরতন সরকার রবীন্দ্রনাথের নাকের কাছে অক্সিজেনের পাত্রটা ধরলেন। সভায় আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের জন্য অক্সিজেনের ব্যবস্থা ছিল। রবীন্দ্রনাথের পাশে ডাঃ সরকার ছাড়া ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে প্রভৃতি আরও কয়েকজন নেতা বসেছিলেন।

শরৎচন্দ্র ঐ পংক্তিতে ছিলেন না। সভামঞ্চেই আলাদা একটা পৃথক জায়গায় বসেছিলেন।

এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ আসার সঙ্গে সঙ্গেই সভার কাজ শুরু হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ পড়তে আরম্ভ করলেন। তিনি তাঁর লিখিত ভাষণ পড়ছেন, এমন সময় লাউড স্পীকার বিগড়ে যায়। তখন একজন শরৎচন্দ্রের নির্দেশেই তাঁর লেখার বাকি অংশটা জোর গলায় পড়তে থাকেন। পরে জেনে ছিলাম ইনি ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল।

কিছুক্ষণ পরেই আবার লাউড স্পীকার ঠিক হয়ে যাওয়ায় শেষাংশটা শরৎচন্দ্র নিজেই পড়লেন।[১]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণ[২] লিখে এনেছিলেন ইংরাজিতে। তিনি প্রথমে মুখে কয়েকটা কথা বলেন। তারপর তাঁর লিখিত ভাষণ অন্য একজনকে পড়তে দেন। পরে শুনেছিলাম ইনি ছিলেন—সন্তোষ কুমার বসু।

সভায় রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে, তুলসী গোস্বামী প্রভৃতি বক্তৃতা করেছিলেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা পর্যন্ত সভা চলেছিল। সভার শেষ পর্যন্তই রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

সেদিনের সভার বিষয় নিয়ে আমার তখন তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। আমার আগ্রহ ছিল রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথকে দেখা। সেদিন ঐ সভায় দু ঘণ্টারও অধিক সময় ধরে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অদূরে দাঁড়িয়ে তাঁদের দেখে ছিলাম। তাঁদের মুখের কথাও শুনেছিলাম।

স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এ. পড়তে শুরু করে হঠাৎ একদিন আমার খেয়াল হ'ল—বি. এ. টা শান্তিনিকেতনে পড়লেই ভাল হ'ত। তাহলে সেখানে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে যাওয়া যেত।

শান্তিনিকেতনে পড়ার কথা বাবা মাকে বললে, তাঁরা বললেন—কলকাতার মত শহরের আবহাওয়া ও পরিবেশ ছেড়ে শান্তিনিকেতনের মত নির্জন নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে কি টিকতে পারবি? আচ্ছা, একদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখে আয়, তোর কেমন লাগে।

বাবা মা'র নির্দেশ মত যাই যাই করেও কিছু দিন কেটে গেল। শেষে ১৯৩৭ সালে পুজার ছুটিতে একদিন শান্তিনিকেতনে গেলাম। গিয়ে পৌঁছাই দুপুরের দিকে।

শান্তিনিকেতনে গেলে সেদিন প্রথমে সেখানে গোপাল বক্সী নামে এক ভদ্র লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি শান্তিনিকেতনে একটি বিভাগের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন-তাঁর বাড়ি বর্ধমান জেলায়। তিনি তখন শান্তিনিকেতনের নতুন কুটির নামক বাড়িতে বাস করতেন। এই নতুন কুটির যদিও অনেক আগেই পুরাতন হয়ে গিয়েছিল, তবুও এই বাড়ি নতুন হওয়ার সময় সেই যে নতুন কুটির নাম দেওয়া হয়, সেই নামই চলতে থাকে।

গোপালবাবুর এই নতুন কুটির বাসায় বসে সেদিন আমি তাঁর কাছ থেকে শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে নিয়ে ছিলাম। তিনিও আমার সমস্ত পরিচয় নিয়ে ছিলেন।

গোপালবাবুর বাসা থেকে উঠে আমি নিকটেই 'শান্তিনিকেতন' নামক বাড়িতে তখনকার গেষ্ট হাউসে যাই। সেখানে গেলে গেষ্ট হাউসের তত্ত্বাবধায়ক আমার থাকার জন্য একটা ঘর নির্দিষ্ট করে দেন। সেখানে আমার সঙ্গের ব্যাগ ইত্যাদি রেখে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রম দেখতে

বেরোই। বেরিয়ে কাঁচের উপাসনা ঘরের সামনে আমলকি বীথি দিয়ে যাবার সময় দেখি গাছের তলায় কত আমলকি ফল বিছিয়ে পড়ে আছে।

একটু যেতেই শান্তিনিকেতনের কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হ'লে তাঁরা বললেন—এখন আমাদের এখানে পুজোর ছুটি, এখন স্কুল কলেজ সব বন্ধ। ছাত্র ছাত্রীরাও প্রায় সকলেই ছুটিতে যে যার বাড়ি চলে গেছে। এখন কয়েক জন গুজরাটী প্রভৃতি অবাঙ্গালী ছাত্র আছে, আর এই ক'জন বাঙ্গালী ছাত্র আছি। অবাঙ্গালী ছাত্ররা হয়ত পুজোর ছুটিতে বাড়ি যাবে না, তবে আমরা দু'একদিনের মধ্যেই বাড়ি চলে যাব।

ঐ ছাত্ররা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে শান্তিনিকেতন দেখাতে লাগলেন। সন্ধ্যায় তাঁদের সঙ্গেই দল বেঁধে কিচেনে খেতে গেলাম। মনে পড়ে সেদিন আমার খাওয়ার জন্য দিতে হয়েছিল বার আনা—এখনকার প্রচলিত হারে ৭৫ পয়সা। আর এও মনে আছে—খাওয়ার সঙ্গে এক বাটি দুধও পেয়ে ছিলাম।

খাওয়ার পর আশ্রমের ঐ ছেলেদের সঙ্গে প্রার্থনা সভার কাঁচের ঘরের পাশে একটা ছোট্ট পুকুরের (সে পুকুর এখন আর নেই) পাড়ে বসে অনেকটা রাত পর্যন্ত নানা গল্প করেছিলাম। তখন আশপাশ থেকে শেফালী ফুলের বেশ মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল। ফুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত হয়ে উঠে ছিল।

একটি ছাত্র বললেন—এই যে বাতাসে এত ফুলের গন্ধ, এই ফুলের গন্ধের জন্যই আমাদের এখানে সাপের বড় উৎপাত। রাত্রে টর্চ ছাড়া অন্ধকারে পথ চলা দায়। এইজন্যই দেখুন না, এই টর্চ নিয়ে বেরিয়েছি। কিছুদিন আগেই এখানে একটি ছাত্রকে সাপে কামড়ে ছিল, বহু কষ্টে তাকে বাঁচান হয়।

সেদিন ঐ ছাত্রদের সঙ্গে যে সব গল্প হয়েছিল তারমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন নিয়েই বেশী। রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা তাঁর অসুখের কথাই সেদিন বিশেষ করে বলেছিলেন। বলেছিলেন—আপনি নিশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়েছেন—গুরুদেব এই মাত্র কিছুদিন আগেই ক'জনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েন, দুদিন ঐ অবস্থায় ছিলেন। তখন শান্তিনিকেতনে আমরা কী দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে দিন কাটিয়েছি! কলকাতা থেকে ডাঃ নীলরতন সরকার এসে গুরুদেবের চিকিৎসা করায় তিনি একটু সুস্থ হ'ন। শুনছি, তিনি আর একটু সুস্থ হ'লে তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে। গুরুদেবের এই অসুখের সময় এখানে একটা স্পেশাল পোষ্ট অফিসই বসে গিয়েছিল। তখন সারা পৃথিবী থেকে এত চিঠি ও এত টেলিগ্রাম এসেছিল যে কল্পনাতীত। আজও ডাক্তাররা বাইরের লোক কেন, আশ্রমেরও কয়েকজন ছাড়া অন্য কাউকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেন না। তা না হলে, কাল সকালে আমরাই আপনাকে গুরুদেবের কাছে নিয়ে যেতাম।

সেই ছোট্ট পুকুরের পাড়ে বসে অনেকটা রাত পর্যন্ত গল্প করার পর ঐ ছাত্রবন্ধুরাই আমাকে গেস্ট হাউসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। গেস্ট হাউসে তখন যে একজন মাত্র রাত্রের কর্মী ছিলেন, বাড়িতে তাঁর মেয়ের অসুখ বলে আমাকে জানালেন এবং বললেন, তিনি আজ রাত্রে এখানে থাকবেন না।[৩] অদূরে তাঁর বাড়িতে যাবেন। আমি বললাম—আমি ছাড়া যখন আর কোন লোক গেস্ট হাউসে নেই, তখন অচেনা জায়গায় এই নির্জনে এত বড় বাড়িতে একা থাকি কেন? এখানে থাকলে রাত্রে হয়ত ঘুমই হবে না। তার চেয়ে বরং আমাকে গোপাল বক্সী মশায়ের বাসায় নিয়ে চলুন। রাত্রে সেখানেই থাকবো।

আমার এই কথায় ঐ ভদ্রলোক হ্যারিকেন হাতে নিয়ে আমাকে গোপালবাবুর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

গোপালবাবু তখনও জেগে ছিলেন। তিনি সব শুনে বললেন—আপনি এই পাশের ঘরটায় থাকুন। মহাত্মা গান্ধী এক সময় এই ঘরেই ক'দিন ছিলেন।

এই বলে গোপালবাবু নতুন কুটিরের[৪] যে ঘরে এক সময় গান্ধীজী বাস করে ছিলেন, সেই ঘরে আমার জন্য বিছানা করে দিলেন। গ্রামের বাড়ি থেকে রওনা হয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ট্রেন জার্নি, তারপর শান্তিনিকেতনে এসে ঘোরাঘুরিতে বেশ ক্লান্তই ছিলাম। তাই বিছানায় শুয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠে কয়েক জনের সঙ্গে দেখা করে সেইদিনই সকালের দিকে শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসে ছিলাম।

পড়ার মাঝে এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে ট্রান্সফার নেওয়ার ঝামেলা ইত্যাদি নানা কারণে শেষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে পড়তে যাওয়া আর হ'ল না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ার সময় আমাদের ক্লাসের ছাত্রদের একবার বাইরে বেড়াতে যাবার অর্থাৎ এক্‌সকারশানে যাবার কথা হয়। তখন আমি সহপাঠীদের বলেছিলাম—চল, শান্তিনিকেতনে যাওয়া যাক্। রবীন্দ্রনাথ এখনও জীবিত আছেন। গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আসি চল।—আমার এ কথা টেকে নি। ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্রই বৃন্দাবন ও মথুরা যাওয়ার মত করায়, সেবার অনেকে বৃন্দাবন মথুরায় গিয়েছিল, আমি যাই নি।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ রবীন্দ্রনাথ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতার বড় বড় ডাক্তাররা শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁর শরীর পরীক্ষা করলেন এবং শেষে চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন ২৫শে

জুলাই তারিখে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। অবশেষে ক'দিন পরে ৭ই আগস্ট তিনি কলকাতায় তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে আমি তখন কলকাতায় আমাদের মেসেই থাকি। কয়েকজন শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজের ছাত্র মিলে ১৯৬এ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে (বর্তমান নাম বিধান সরণি) একটা দুতলা বাড়ির দুতলায় মেস করে থাকতাম। সেই বাড়ি আজ আর নেই। এখন সেখানে একটা পাঁচতলা বাড়ি হয়েছে।

৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮) দুপুরে সংবাদ পত্রের বিশেষ এক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হ'ল। এই সংবাদ পড়ে বেদনার্ত হৃদয়ে তখনই চললাম জোড়াসাঁকোয় কবির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। গিয়ে দেখি, ঠাকুরদের বাড়ি থেকে চিৎপুর রোড পর্যন্ত সমস্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনটাই লোকে লোকারণ্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের মুখে চিৎপুর রোডের দু পাশেও মোটর গাড়ী আর লোকের ভীড়। ভীড় ঠেলে কোন রকমে একটু একটু করে আগিয়ে রবীন্দ্রনাথদের বাড়ির দরজার কাছ পর্যন্ত গেলাম। গিয়ে দেখি লোকের ভীড়ের জন্য সামনের দরজার কোলাপ্সিবল্ গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এইখানে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই শুনলাম—কবির মরদেহের শেষ কৃত্য হিন্দু মতে নিমতলার মহাশ্মশানে সম্পন্ন হবে। এবং তাঁর মরদেহ নিয়ে শীঘ্রই শোকযাত্রা বার হবে।

ঐখানে দাঁড়িয়েই শুনলাম।—শোকযাত্রা যথাক্রমে বিবেকানন্দ রোড, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ও বিডন স্ট্রীট (যে অংশের বর্তমান নাম দানী ঘোষ সরণি) হয়ে নিমতলা মহাশ্মশানে গিয়ে পেঁীছাবে। শুনে বুঝলাম—শোকযাত্রা আমাদের কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ মেসের সামনে দিয়েও যাবে। এই শুনে মেসে ফিরে এলাম।

মেসে এসে আমি এবং আমাদের মেসের আরও উপস্থিত সকলে, ছাদে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটের দিকে দাঁড়িয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখলাম শোকযাত্রা আসছে।

আমাদের ছাদের ন্যায় আশপাশের বাড়ির ছাদগুলিতেও লোকে ভর্তি। আর রাস্তার দু ধারে তো কাতারে কাতারে মানুষ। শোকযাত্রার সামনে কয়েকজন মানুষ। তারপরেই শব বাহকদের কাঁধে খাটের উপর শুভ্র বিছানায় সাদা ফুলে ফুলে ঢাকা রবীন্দ্রনাথের মৃত দেহ। মুখটা কেবল ঢাকা নেই। শব-বাহকদের পিছনে বিরাট এক মানুষের শোক মিছিল।

দেখলাম—আমাদের সামনের বাড়ির দোতলা তিনতলায় বহুলোক ফুল

ছুঁড়ে দিচ্ছে। আমাদের বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো সকলের সঙ্গে আমিও কবির মরদেহের প্রতি আমার শেষ প্রণাম জানালাম।

প্রসঙ্গ কথা

১. শরৎচন্দ্রের সেদিনের উদ্বোধনী ভাষণ পরদিন দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকায় যা প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

'...বাঙলার এই সমগ্র হিন্দুজাতির পক্ষ থেকে, যাঁরা এই সভার উদ্যোক্তা তাঁদের পক্ষ থেকে আমি সবিনয়ে সসম্মানে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করি—এই বিপুলায়তন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে।...

কারও কারও ধারণা আমরা বিলেতে memorial পাঠিয়েছি সুবিচারের আশায়। সে বিশ্বাস আমাদের কারও নেই, আমরা পাঠিয়েছি অন্যায়ের প্রতিবাদ। নূতন শাসন ব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ। সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাঙলার হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল সবচেয়ে বেশী। আইনের পেরেক ঠুকে তাঁদের ছোট করা হ'ল চির দিনের মত। তথাপি এ কথা সত্য যে, দেশের মুসলমান ভাইয়েরা দশ পনেরটা স্থান বেশী পেয়েছেন বলে তাঁদের প্রতি আমাদের ক্রোধ নেই। কিন্তু এই অন্যায়ের জনক যাঁরা তাঁদের বলতে চাই—অন্যায়-অবিচার একজনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কাহারও মঙ্গল হয়।'

[শরৎচন্দ্রের এই লিখিত উদ্বোধনী ভাষণটি তখনকার ১লা শ্রাবণ ১৩৪৩ তারিখের সাপ্তাহিক 'বাতায়ন' পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাতায়ন' পত্রিকা থেকে শরৎচন্দ্রের এই অভিভাষণটি নিয়ে পরে তাঁর 'পুস্তকাকারে শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী' গ্রন্থে দেন। বাজারে যত 'শরৎ রচনাবলী' প্রচলিত সেগুলির সবেতেই ব্রজেনবাবুর ঐ বই থেকেই শরৎচন্দ্রের এই অভিভাষণটি নিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই অভিভষাণের শেষের দিকটা ব্রজেনবাবুর বইয়ে এবং আনন্দ বাজারের লেখায় একটু ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। ব্রজেনবাবুর বইয়ে আছে—'দেশের মুসলমান ভাইয়েরা দশ পনেরটা স্থান বেশী পেয়েছেন বলে তাঁদের বলতে চাই—অন্যায়, অবিচার একজনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের না হিন্দুর না জন্মভূমির—কাহারও মঙ্গল হয় না।'

১লা শ্রাবণ ১৩৪৩ এর সাপ্তাহিক 'বাতায়ন' কোথাও পেলাম না। তবে আমার অনুমান দু কলম করে ছাপা বাতায়নের পৃষ্ঠায় এক কলমে হয়ত লেখাটা এই ভাবে ছিল—

তাঁদের প্রতি আমাদের ক্রোধ নেই। কিন্তু এই অন্যায়ের জনক যাঁরা তাঁদের বলতে চাই ...

ব্রজেনবাবু অথবা তাঁর নিযুক্ত নকলকারী বাতায়নের লেখাটা নকল করতে গিয়ে অমনোযোগিতার জন্য হয়ত এখানে 'তাঁদের' দিয়ে শুরুর প্রথম পংক্তিটা বাদ দিয়ে 'তাঁদের' দিয়ে শুরুর দ্বিতীয় পংক্তিটা নিয়ে নকল করেছিলেন। ফলে 'তাঁদের প্রতি আমাদের ক্রোধ নেই। কিন্তু এই অন্যায়ের জনক যাঁরা'—কথাগুলো বাদ গেছে।

কিন্তু অভিভাষণের শেষ বাক্যটা 'তাতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কাহারও মঙ্গল হয় না।' এতে বাতায়নের লেখায় শেষ শব্দ 'না' আছে, আনন্দ বাজারের লেখায় 'না' নেই।

মনে হয়, শরৎচন্দ্রের মূল লেখায় 'না' ছিল।]

২. রবীন্দ্রনাথের সেদিনের সেই লিখিত ভাষণের যে মর্মার্থ পরের দিনের আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, এখানে তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

'বন্ধুগণ! আজ আমরা ঘোর সংকটে পতিত, সুতরাং অদ্য আমি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিব। বিশেষতঃ এই জরাজীর্ণ দেহে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও আমার নাই।...

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশের রাজনৈতিক জীবনকে ছিন্ন বিছিন্ন করিবার জন্য একটি অভিশাপ। যে সকল দল ও সম্প্রদায় বাঁটোয়ারা চাহে নাই, তাহাদের উপরও এই অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে। ভারতবাসীদিগকে রাজনীতিক হিসাবে আঠারটি পৃথক ভাগে বিভক্ত করিবার আয়োজন হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ইহাকে ভারতবর্ষের জীবন্ত-ব্যবচ্ছেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ব্যবচ্ছেদের ফলে ভারতবর্ষ প্রাণহীন শবমাত্রে পর্যবসিত হইবে।

কোন কোন সম্প্রদায়কে তাহাদের প্রাপ্যাতিরিক্ত অধিকার দানের ব্যবস্থায় এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অনর্থ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন তুলাদণ্ডে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে পরিমাপ করিয়াছেন। আসন্ন শাসনতন্ত্রে নিগূঢ় কারণে হিন্দুদের উপরই সর্বাধিক অবিচার করা হইয়াছে, সেই কারণ এস্থলে বর্ণনা করা নিরর্থক। বাংলার হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়; সুতরাং তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা করা আবশ্যক, কিন্তু তৎপরিবর্তে তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য অপেক্ষাও কম সদস্যপদ দিয়া অপর সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।...

আমরা যে মুসলমান ভ্রাতৃবর্গকে তাঁহাদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতার সুযোগ-

সুবিধা দিতে চাই না এমন নহে, তাঁহাদের কোনও দুরভিসন্ধি আছে বলিয়াও আমরা সন্দেহ করি না। যে ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সমস্ত সম্ভাবনা নির্মূল হইয়া পড়িয়াছে, আমরা শুধু সেই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে চাহি না। যে ব্যবস্থায় জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন করিয়া সাম্প্রদায়িকতাকে পুরস্কৃত করা হইয়াছে, সাম্প্রদায়িকতাবোধে উন্মত্তদিগকে সাম্প্রদায়িকতা প্রচারপূর্বক রাজনৈতিক সুবিধা হস্তগত করিবার সুযোগ দানে উভয় সম্প্রদায়ে দুর্নীতি প্রচারের পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে এবং যে ব্যবস্থায় পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবর্তে সন্দেহ সৃষ্টি করিবে, আমরা তাহা মানিয়া লইতে অক্ষম।...

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব যেদিন উত্থাপিত হয়, সেইদিন হইতেই আমাদের প্রদেশ বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে—ঔদার্য এবং সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই আমাদের সাহিত্যেও ধ্বংসোম্মত্ততা আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাদের ভাষাকে আক্রমণে উদ্যত হইয়াছে।...

যদি সাম্প্রদায়িক একগুঁয়েমির ফলে জাতীয় ঐক্যবোধ বিদূরিত হয়, তবে শুধু আমাদের রাজনৈতিক শক্তি নহে, আমাদের আর্থিক সম্পদও ধ্বংস হইবে।...

নানা কারণে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবর্গের বহুকাল যাবৎ নানা বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, কিন্তু তজ্জন্য হিন্দুরা দায়ী নহে। ইহার প্রতিকার হউক, তাঁহারাও হিন্দুদের অবস্থায় উপনীত হউন—ইহা আমার আন্তরিক কামনা। কিন্তু স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রতিকার ব্যবস্থার পশ্চাতে এমন একটি মনোবৃত্তি রহিয়াছে, সমস্যা মীমাংসার সহিত প্রকৃতপক্ষে যাহার কোনও সম্পর্ক নাই; এই অবস্থায় আমাদের সকলের কল্যাণ ক্রমাগত বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে।...

মুসলমানদের চরিত্রে যে স্বাভাবিক সবলতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহাদের গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি যে তাঁহাদিগকে জীবনযুদ্ধে বিজয়লাভের ক্ষমতা দিয়াছে, তাহাও নিঃসন্দেহ। যে সকল মুসলমানের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ আমার হইয়াছে, তাঁহাদের সকলকেই আমি ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি; তাঁহাদের সংখ্যা কম নহে। আমার চিরদিনের বিশ্বাস এই যে, প্রধানতঃ মূর্খতা ও প্রাচীন যুগীয় যুক্তিহীনতাবশতঃই আমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি এবং ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব দ্বারা সেই ভেদ-বিভেদ দূর করা সম্ভব।...

আমরা, যাহারা এক জন্মভূমির সন্তান, সভ্য জাতিস্বরূপ অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য, এমন কি আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের উচিত পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা, উভয় সম্প্রদায়েরই ক্ষোভের কারণ ও প্রলোভন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা।'

[রবীন্দ্রনাথের সেদিনের লিখিত ইংরাজি ভাষণের যে মর্মানুবাদ আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করেছি। এই উদ্ধৃতির ৪র্থ অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য—'আমরা যে মুসলমান ভ্রাতৃবর্গকে তাঁহাদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতার সুযোগ-সুবিধা দিতে চাই না এমন নহে।'

উদ্ধৃতির ৩য় অনুচ্ছেদে আছে—'হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়'।

অনুমান ৪র্থ অনুচ্ছেদের 'সংখ্যা লঘিষ্ঠ' হবে 'সংখ্যাগরিষ্ঠ'। কারণ, বাস্তবে বাঙ্গলায় মুসলমানরা তখন সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিলেন।

মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মূল ইংরাজি ভাষণ থেকে অনুবাদ করতে গিয়ে আনন্দবাজারের অনুবাদক অনবধানতাবশতঃ এই ভুলটা করেছেন।

উদ্ধৃতির ৫ম অনুচ্ছেদ আমাদের ভাষাকে আক্রমণের কথা আছে, কারণ—এই সময় কিছু সংখ্যক মুসলমান দাবী তুলেছিলেন, বাঙ্গলা দেশের শতকরা ৫৫ জন মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে বাঙ্গলা ভাষায় ৫৫ টি আরবী, ফারসি ও উর্দু শব্দ চালু করতে হবে।]

৩. এই ঘটনার বহুকাল পরে ১৯৫৫ সালের ২রা আগস্ট তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের একটি চিঠি পড়ি। চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর কোন এক স্নেহের পাত্রীকে। চিঠিতে লিখেছিলেন—

'১৯১১ সালে গ্রীষ্মের ছুটির আগে দু মাস শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে ছিলুম। তখন কলেজে পড়ি, সতেরো আঠারো বছর বয়স। তখন সারাদিন প্রায় ওঁর (রবীন্দ্রনাথের) কাছে কাছেই থাকতুম। শান্তিনিকেতন পুরনো Guest House-এর দোতলার পূর্ব দিকের সেই ছোট ঘরখানায় উনি থাকতেন। এই ঘরে বসেই গীতাঞ্জলি, রাজা, ডাকঘর লিখেছেন। মাঝে একটা বসবার ঘর। আমি থাকি পশ্চিমের ঘরে, সন্ধ্যে বেলায় আশ্রমের লোকজন দেখা করে যাওয়ার পরে দক্ষিণে গাড়ি বারান্দার ছাদটায় উনি বসে থাকতেন একটা লম্বা চেয়ারে।'

আগে যদি প্রশান্তবাবুর ঐ চিঠির কথাগুলো জানতে পারতাম, তাহলে সে রাত্রে ঐ নির্জন প্রকাণ্ড বাড়িতে একা থাকতে যত ভয়ই পাক্ থাকতাম। রবীন্দ্রনাথ এই বাড়িতে থেকে গীতাঞ্জলি ইত্যাদি রচনা করেছেন, এই স্মৃতি-স্মরণ করেই শুধু থাকতাম।

৪. শান্তিনিকেতনের সেই 'নতুন কুটির' আজ আর আগেকার অবস্থায় নেই। এক সময় এই কুটিরে আগুন লাগায় খড়ের ছাওয়া নতুন কুটিরের অনেকটা অংশ পুড়ে যায়। পরে সেই অংশ সারানো হয়। শান্তিনিকেতনের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথও কিছু দিন এই নতুন কুটিরে বাস করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র

আমতা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে থার্ড ক্লাসে যখন পড়ি, তখন আমাদের বাংলা পাঠ্য বইয়ে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত—১ম পর্ব উপন্যাসে যেখানে 'ছিনাথ বহুরূপী'র কাহিনীটা আছে, সেই অংশটাও ছিল।

ক্লাসে মাষ্টার মশায় যিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন তিনি ঐ অংশটা পড়াবার সময় ক্লাসে পড়া বোঝানো বা পড়া ধরা কিছুই করতেন না, নিজেই মুগ্ধ হয়ে সমস্তটা গড় গড় করে ক্লাসে পড়ে যেতেন। আর বলতেন—কী অপূর্ব লেখা! পড়তে আরম্ভ করলে আর ছাড়া যায় না।

শুধু এই নয়, মাষ্টার মশায় তখন শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ১ম পর্ব বইটা এনেও ঐ বইয়ের প্রথম দিকের অনেকটা অংশই ক'দিন ধরে ক্লাসে পড়ে শুনিয়ে ছিলেন। ক্লাসে আমরা যারা শুনতাম, তখন আমাদেরও পাঠ্য বইয়ের ঐ মনোরম ছিনাথ বহুরূপীর কাহিনী ছাড়া শ্রীকান্তর আরও কাহিনী শোনার নেশায় পেয়ে বসেছিল।

শরৎচন্দ্র বা শরৎ-সাহিত্যের সঙ্গে এই হ'ল আমার প্রথম পরিচয়।

এরপর আরও শরৎ-সাহিত্য পড়লেও শরৎচন্দ্রকে প্রথম দেখি এবং তাঁর মুখের ভাষণ শুনি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে কলকাতায় টাউন হলের এক সভায়। আগেই 'রবীন্দ্রনাথ' অধ্যায়ে সেকথা বলেছি।

এরপর শরৎচন্দ্রকে আবার দেখি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের স্কটিশ চার্চ কলেজে। সেবার আমাদের কলেজের বাংলা সাহিত্য সমিতি তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার আয়োজন করলে, তিনি সেই সভায় এসেছিলেন।

সভায় শরৎচন্দ্রকে আনার সময় তিনি গাড়ী থামিয়ে, আমাদের কলেজের অদূরে অবস্থিত ভারতবর্ষ পত্রিকা অফিস থেকে ভারতবর্ষ-সম্পাদক বৃদ্ধ জলধর সেনকে সঙ্গে এনেছিলেন।

স্কটিশ চার্চ কলেজের আগে নাম ছিল, জেনারেল এসেমব্লিজ ইনিষ্টিটিউশান। জলধর সেন সেদিন আমাদের কলেজের ঐ শরৎ-সম্বর্ধনা সভায় কিছু বলতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ বলেছিলেন, তিনিও এক সময় যখন এই কলেজের নাম জেনারেল এসেমব্লিজ ইনিষ্টিটিউশান ছিল, তখন এখানকার ছাত্র ছিলেন।

বৃদ্ধ জলধর প্রসঙ্গতঃ আর একটা কথা বলেছিলেন—আমি শরতের চেয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বয়সে বড়। রবীন্দ্রনাথকে এবং শরৎচন্দ্রকে তুমি বলে সম্বোধন করার মানুষ বোধ করি এখন শুধু আমিই জীবিত আছি।

কলেজে সেদিনের সম্বর্ধনার উত্তরে শরৎচন্দ্র কিছু বলেছিলেন। তাঁর সেদিনের সেই মৌখিক ভাষণ পরে তখনকার কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। ঐ ম্যাগাজিন থেকে নিয়ে পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুস্তকাকারে শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী' গ্রন্থে ছেপেছেন। তবে কলেজ ম্যাগাজিনে বা ব্রজেন্দ্রনাথের সম্পাদিত বইয়ে শরৎচন্দ্রের সেদিনের একটা কথা ছাপা হয়নি। সেটা হ'ল—শরৎচন্দ্র সেদিন রবীন্দ্রনাথের তখনকার গুরুতর অসুখের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন—আমাদের ভাগ্য যদি মন্দই হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ যেদিন ইহলোক ত্যাগ করবেন, সেদিন যেন জাতীয় শোকদিবস হিসাবে পালিত হয়।

পরাধীন ভারতে শরৎচন্দ্রের সে কথা রক্ষিত বা পালিত হয় নি।

স্কটিশ চার্চ কলেজে শরৎচন্দ্রকে দেখার পর বছর আণ্টেক কেটে গেল। শরৎচন্দ্র তখন আর ইহলোকে নেই। (তিনি ১৯৩৮-এর ২রা জানুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেন।) ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে আমি তখন ভারতবর্ষ পত্রিকায় কাজে যোগ দিয়েছি।

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প, উপন্যাসই এবং কিছু কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—ভারতবর্ষ পত্রিকায়। আর ভারতবর্ষ পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁদের বইএর দোকান 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' থেকে শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত বইই প্রকাশ করে ছিলেন। এই সব সূত্রে শরৎচন্দ্র ভারতবর্ষ পত্রিকা অফিসে এবং হরিদাসবাবুর কাছে প্রায়ই আসতেন।

আমি যখন ভারতবর্ষ পত্রিকায় কাজে যোগ দিই, তখন ভারতবর্ষ পত্রিকা অফিসে শরৎচন্দ্রকে আসতে দেখেছেন, এমন কয়েকজন কর্মী ভারতবর্ষ অফিসে কাজ করতেন। এঁরা এঁদের অভিজ্ঞতা থেকে শরৎচন্দ্রের অনেক গল্প শোনাতেন। এই সময় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী কথা শুনি হরিদাস-বাবুর কাছ থেকেই।

এই সময় কানাইলাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তির লেখা 'শরৎচন্দ্র' বইটি আমার হাতে আসে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন এই বইএর একটা মুখবন্ধ লিখে দেওয়ায়, বইটার গুরুত্ব বেড়ে যায়। ফলে বইএর একাধিক সংস্করণও হয়।

বইটা পড়ে দেখি, এতে শরৎচন্দ্র, এমন কি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও বেশ অবাস্তব ও অসত্য কাহিনী লেখা হয়েছে।[১]

এই বই পড়ে তখনই স্থির করি, এই লেখার এখনই প্রতিবাদ হওয়া উচিত। কিন্তু সত্য উদ্ধারের জন্য পরিশ্রম করে এর প্রতিবাদ করবে কে?

একরূপ এই সময় থেকেই আমি শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত হই এবং শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতেও শুরু করি।

শরৎচন্দ্র ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এই তথ্য

সংগ্রহের ও লেখার কাজে ছেদ পড়লেও আমার শরৎচন্দ্র বিষয়ক ঐ সব কাজ আজও চলেছে।

প্রসঙ্গ কথা

১. এ সম্পর্কে আমার শরৎচন্দ্র—১ম খণ্ড (১ম সংস্করণ) গ্রন্থে গ্রন্থ-কারের নিবেদনে যা লিখেছি তা থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি। কানাইবাবু লিখেছেন—

'...সেবার ঠিক হ'ল শিবপুরে রবীন্দ্রনাথের একটা জয়ন্তী উৎসব করা হবে। উদ্যোগী হলেন অনুরূপবাবু, নীলরতনবাবু, আরও পাড়ার উৎসাহী যুবকবৃন্দ। তাদের পাণ্ডা হলেন শরৎচন্দ্র। তিনি নিজে চিঠি দিয়ে রবীন্দ্র-নাথকে আনানোর ব্যবস্থা করালেন।

লক্ষ্ণৌ থেকে আনা হ'ল বাইজী, তার সঙ্গে এলো পরিচিত আট দশ বছরের একটি বাঙ্গালী মেয়ে। ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ। কিন্তু বিঘ্ন ঘটালো তবলচী। কথা ছিল আসার, কোন কারণবশতঃ তা আর সম্ভব হয়ে উঠলো না। কলকাতার নামজাদা বাজিয়েদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হ'ল।

নাচ সুরু হ'ল। রবীন্দ্রনাথ সামনে বসে আছেন তাকিয়াটি হেলান দিয়ে। মেয়েটি নাচতে নাচতে মাঝে মাঝে থেমে যেতে লাগলো—মুখে ফুটে উঠতে লাগলো বিরক্তির ছায়া। সবাই বুঝলেন, তাল কেটে যাচ্ছে। অথচ সে আসরে তাঁর সামনে তবলা ধরতেও সাহসী হচ্ছে না কেউ।

দুবার মেয়েটি নাচতে নাচতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রবীন্দ্রনাথের অসম্মান করা হচ্ছে ভেবে শরৎচন্দ্র আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। একটি হাই তুলে ডাক দিলেন, অনুরূপ !

অনুরূপবাবু ছুটে এলেন। শরৎচন্দ্র বললেন—একটু আফিং নিয়ে এসো। নীলরতন গেল কোথায় ? তাকে মাঝে মাঝে বরং একটু চা যোগাতে বলো।

নাচ সুরু হ'ল। তাল আর কাটে না। সভা নিস্তব্ধ হয়ে পড়লো। শুধু শোনা যেতে লাগলো—তবলার বোল আর ঘুঙুরের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ।

এলো পেশাদার বাইজী। শরৎচন্দ্র অটল অচল। নাচ যখন থামল, তখন ভোর হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন তাঁর এই অসাধারণ শক্তির পরিচয় পেয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন—এমন সুন্দর বাজাতে কোথায় শিখলে শরৎ ?

শরৎচন্দ্র উত্তরে মৃদু হাসলেন। বললেন—আমার যা কিছু সঞ্চয় সবই বর্মামুলুকে, ভারতী।

বৈকালে রবীন্দ্রনাথ সকলকে এসরাজ বাজিয়ে শোনালেন। শেষে এসরাজটি পাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—বোধ করি এ রসে তুমি বঞ্চিত শরৎ ?

শরৎচন্দ্র মিষ্টি মধুর হেসে বললেন—এ অভাগার কোন কিছুতে বঞ্চনা নেই, ভারতী! একটু যদি অপেক্ষা করেন—আমি আপনাকে সেতার শোনাতে পারি। অনুরূপ এক নম্বর এক্‌স একটু এনে দাও তো।

অনুরূপবাবু কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনি সেটুকু গলাধঃকরণ করে সেতারখানা কোলে তুলে নিলেন। ঘরটা মূর্চ্ছনায় ভরে উঠলো। বহুক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র সেতারখানা নামিয়ে রাখলেন।

ভারতীর তন্ময়তা কাটলো বহুক্ষণ পরে। তিনি শরৎচন্দ্রের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন—তুমি যে এত গুণের অধিকারী, তা আমার জানা ছিল না শরৎ! সত্যই তুমি সরস্বতীর বরপুত্রই বটে!'

এই গল্পের খুঁটিনাটি কথাগুলো বাদ দিয়েও মূল কথা থাকে এই—রবীন্দ্রনাথ শিবপুরে তাঁর জন্মতিথি উৎসবে গিয়ে সারারাত্রি ধরে বাইজীর নাচ দেখলেন। পরদিন বিকালে আবার নিজে তো এসরাজ বাজালেনই, এমন কি শরৎচন্দ্রের সেতার বাজনাও শুনলেন। আর শরৎচন্দ্র সেতার ধরবার আগে রবীন্দ্রনাথের সামনে বসেই এক নম্বর এক্‌স অর্থাৎ মদ খেলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে যাঁরা সামান্য মাত্রও চিনেছেন বা দেখেছেন, তাঁরাই জানেন—নিজের জন্মতিথি উৎসবে দুদিন ধরে যোগ দেওয়া এবং সারারাত্রি ধরে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বাইজীর নাচ দেখার মানুষ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। আর যে-শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে শ্রদ্ধাভক্তি করতেন, তাঁর সামনে বসে তিনি কখনই মদ খেতে পারেন না।

গ্রন্থকার জানেন না যে, মদ তো দূরের কথা, শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এত বেশি শ্রদ্ধা করতেন যে, তাঁর সামনে ধূমপানও করতেন না।

যে-শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা সিগারেট পর্যন্ত খেতেন না, তিনিই তাঁর সামনে বসে মদ খাচ্ছেন, একি কখনো সম্ভব ?

তাছাড়া গ্রন্থকারের গল্পের অনুরূপবাবু ও নীলরতনবাবু এঁরা দুজনেই আজও এই প্রবন্ধ লেখার সময় বেঁচে আছেন। তাঁরা বলেন যে, এই কাহিনী সত্য নয়। শিবপুরে কখনো ঐ ধরণের কোন রবীন্দ্র-জন্মোৎসব হয়নি।

শিবপুরে শরৎচন্দ্রের আর যেসব বন্ধু জীবিত আছেন, তাঁরাও বলেন—শিবপুরে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনো আসেন নি। এমন কি তাঁর কোন জন্মোৎসবে তাঁকে নিয়ে আসারও কখনো চেষ্টা হয়নি।

অতএব পূর্বোক্ত 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের এই গল্পটি যে একেবারেই অসত্য, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

সুভাষচন্দ্র

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। সুভাষচন্দ্র সেবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাঁর সভাপতিত্বে হরিপুরায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ৫১ তম বার্ষিক অধিবেশন হয়।

কংগ্রেস সভাপতিকে তখন বলা হ'ত—রাষ্ট্রপতি। সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে যে হরিপুরা গ্রামে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়—সেই হরিপুরা হ'ল গুজরাটে বারদৌলি তালুকে তাপ্তি নদীর তীরে। হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশন চলেছিল—১৩ই ফেব্রুয়ারি থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

এই কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য তখন যে অস্থায়ী নগর স্থাপিত হয়েছিল, সেই নতুন নগরের নাম হয়—গুজরাটের প্রসিদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামী বিঠলভাই প্যাটেলের নামে—বিঠলনগর। স্থানটি ছিল মূল হরিপুরা গ্রাম থেকে ৪ কিলো মিটার দূরে। শান্তিনিকেতনের কলা ভবনের অধ্যক্ষ নন্দলাল বসু এই ৫১বর্ষীয় জাতীয় সম্মেলনের জন্য ৫১টি সুসজ্জিত তোরণ তৈরি করে দিয়ে ছিলেন।

অধিবেশনের প্রথম দিন ১৩ই ফেব্রুয়ারি রবিবার কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে বিরাট মিছিল করে রাজসমারোহে হরিপুরা থেকে বিঠলনগর এই দীর্ঘ পথ নিয়ে যাওয়া হয়। বাঁশদা রাজের একটি সুসজ্জিত লাল রথে সুভাষচন্দ্র উপবিষ্ট ছিলেন। নানা অলঙ্কারশোভিত ১৫টি বলদ ঐ রথ টেনে নিয়ে যায়। সুভাষচন্দ্রের রথের পিছনে অন্য ৬টি শকটে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ছিলেন। এই মিছিল দেখতে লক্ষাধিক লোক পথের দুধারে সমবেত হয়েছিল। বিঠলনগরে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত থেকে সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেছিলেন।

তখনকার জাতীয়তাবাদী সমস্ত দৈনিক পত্রিকায় কংগ্রেস অধিবেশনের এই ক'দিনের নানা অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের ছবি, তাঁর ভাষণাদি দেখে ও পড়ে বাঙালী মাত্রেই গর্ববোধ করেছিল। আর আমরা কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষ একটা গর্ব বোধ করেছিলাম। গর্বের হেতু সুভাষচন্দ্র এক সময় আমাদের কলেজের কৃতি ছাত্র ছিলেন। আমরা স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা এই সময় একদিন মিলিত হয়ে স্থির করলাম, শীঘ্রই রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে আমাদের কলেজে আনব, এনে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বলে তাঁকে অভিনন্দন জানাব।

পরে এ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে মোটামুটি একটা দিনও স্থির হয়।

রাষ্ট্রপতিকে কলেজে আনা একরূপ স্থির হ'লে, আমরা কলেজের অধ্যক্ষকে এই কথাটা জানাতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রচণ্ড বাধা পেলাম। কলেজের অধ্যক্ষ তখন স্কচ্ (স্কট্ল্যাণ্ডের মানুষ) ক্যামেরন সাহেব। তিনি জোরের সঙ্গেই বললেন—কলেজ চত্বরে কংগ্রেস সভাপতিকে কিছুতেই আনতে দোব না।

ক্যামেরন সাহেব ইংরেজ না হলেও ব্রিটিশ তো! সুভাষচন্দ্র আমাদের কলেজের ছাত্র ছিলেন, তাঁর সম্মানে আমরা গর্বিত ইত্যাদি বলে অধ্যক্ষকে কত বোঝাবার চেষ্টা হ'ল। তাঁকে এও বলা হ'ল--সুভাষচন্দ্র কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় সেখানকার অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে প্রহার করার ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রও জড়িত ছিলেন বলে কলেজ থেকে তাঁকে বিতাড়িত করেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সুভাষচন্দ্রকে রাস্টিকেট্ করে। পরে সুভাষচন্দ্রের আবেদন ক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রেসিডেন্সি কলেজ ভিন্ন অন্য কলেজে পড়ার অনুমতি দিলে, তখন আমাদের এই কলেজেরই আপনার পূর্ববর্তী অধ্যক্ষ ডঃ আর্কুহার্ট সুভাষচন্দ্রকে এখানে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।[১]

অধ্যক্ষ ক্যামরন সাহেব আমাদের কোন কথাই শুনতে চাইলেন না। তাঁর ঐ এক কথা—কংগ্রেস সভাপতিকে কিছুতেই এখানে আনতে দোব না।

আমরা তরুণের দল। বাধা পেয়ে আমাদের আরও জিদ্ বেড়ে গেল। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে কলেজে আনবই। এই নিয়ে আমরা প্রথমে কলেজ হলে সভা করতে লাগলাম। অধ্যক্ষ এখানে বাধা দেওয়ায় কলেজের গেটের সামনে আমরা আলোচনা সভা ও ধর্না দেওয়া ইত্যাদি শুরু করলাম। আমাদের সভায় ক্যামেরন সাহেবের ঔদ্ধত্য নিয়েও বক্তৃতা চলতে লাগল।

এই সব দেখে অধ্যক্ষ ক্যামেরন অনির্দিষ্ট কালের জন্য কলেজে ছুটি ঘোষণা করে কলেজ বন্ধ করে দিলেন। এতে আমাদের আন্দোলন আরও জোর হল। আমরা দাবি করলাম, কলেজ অহেতুক বন্ধ করা চলবে না। কলেজ খুলতে হবে, আমরা পড়ব। আর রাষ্ট্রপতিকে তো আনবই।

বন্ধ কলেজের সামনে পথের উপর আমরা আমাদের দাবি নিয়ে রোজই জোর সভা করতে থাকি।

আমাদের এই সভা বন্ধ করবার জন্য ব্রিটিশ অধ্যক্ষ ক্যামেরন সাহেব ফোর্ট থেকে গোরা সৈন্য এক ঝাঁক এনে কলেজের সামনে বসালেন।

আমরা তখন সামনের হেদোয় (বর্তমান নাম আজাদ হিন্দ বাগ) সভা করতে লাগলাম। এই সময় অধ্যক্ষ ক্যামেরন সাহেব আর একটা কাজ

করলেন। তিনি কলেজের প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের কাছে চিঠি দিলেন। চিঠিতে জানালেন—আমরা চিরকালের জন্য কলেজ বন্ধ করে দিলাম। আমাদের স্কটল্যান্ড মিশন থেকে নির্দেশ এসেছে—কলেজ বন্ধ করে দিয়ে ওখানে হাসপাতাল কর। আমরা এখানে হাসপাতাল খুলব। অতএব আপনাদের ছাত্র-ছাত্রীদের এখান থেকে সরিয়ে অন্য কলেজে নিয়ে যান। আমরা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দোব।

আমরা কেউই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে চাইলাম না। সৈন্য মোতায়েনের জন্য কলেজের সামনে না গিয়ে, আমরা হেদোয় এবং কলেজের আশে পাশে রোজই সভা করি। আমাদের দাবি কলেজ খুলতে হবে এবং রাষ্ট্রপতিকে কলেজে আনার অনুমতিও দিতে হবে।

এইভাবে দীর্ঘ প্রায় দু মাস আন্দোলন চালানোর পর শেষ পর্যন্ত আমাদের জয় হ'ল। কলেজ খুলল এবং রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে কলেজে আনার অনুমতিও পেলাম। ইতিপূর্বে অধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতিকে কলেজে আনার অনুমতি না দেওয়ায়, সে কথা আমরা যথাসময়েই রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছিলাম। আমাদের আন্দোলনের সময়ও দু-একবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। শেষে সফলকাম হ'লে তাঁর কথামত সভার দিন স্থির করা হয়।

আমাদের কলেজের প্রশস্ত হলে সেদিনের সেই সুভাষ-সংবর্ধনা বা রাষ্ট্রপতি সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ঐতিহাসিক ডঃ কালিদাস নাগ। সভার শেষদিকে সুভাষচন্দ্রের বন্ধু দিলীপকুমার রায় এসেছিলেন। এসে তিনি তাঁর পিতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত ক'টি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শুনিয়ে ছিলেন।

আমাদের অভিনন্দনের উত্তরে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সেদিন যা বলেছিলেন, পরদিন ৫ই বৈশাখ (১৩৪৫) তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকায় তার অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে আনন্দ বাজার থেকে সেদিনের সভার বিবরণ ইত্যাদি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

'ছাত্র-ছাত্রী ও বাহিরের লোকের জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, হলে তিল ধারণের স্থান ছিল না। স্থানাভাবে অনেককে বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, ডঃ কালিদাস নাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে কলেজের হলঘরে অভিনন্দনের আয়োজন করিয়া ছিল। অধ্যাপক মিঃ বি. বি. রায় ভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষের কাহাকেও মঞ্চের উপর দেখা যায় নাই। কিন্তু ছাত্রদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ঘন ঘন বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে হলটি মুখরিত হইয়াছিল। ভারতীয় রীতি অনুসারে মঞ্চের সম্মুখস্থ স্থান আলপনা দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছিল। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের পর সুভাষচন্দ্রকে

পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়। অতঃপর ছাত্র ও ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্য বিধাতা' সঙ্গীতটি গান করেন।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র, ডঃ কালিদাস নাগ ও সমাগত অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা জানান, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাশগুপ্ত। স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীদের পক্ষ হইতে শ্রীযুত নরেন পালিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। তাহার মর্ম এই—হে ত্যাগব্রতে দীক্ষিত বরেণ্য নেতা, তুমি বাঙলার তথা ভারতের যুবকগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। যে সকল সমস্যা যুবকগণের মনকে আন্দোলিত করিতেছে, তোমার জীবনে তাহার সমাধান তাহারা খুঁজিয়া পাইয়াছে। যে মহত্বের আবরণ আজ তোমাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, তাহা দূরীভূত হউক, আমরা তোমার সঙ্গে মিলিত হই। যে ধ্রুব নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া তুমি ছুটিয়াছ, তাহা আমাদিগকে দেখাও, যেন আমরাও সেই লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া জয়যাত্রা করিতে পারি।

অতঃপর স্কটিশ চার্চ কলেজের নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমূহ সুভাষচন্দ্রকে মানপত্র দান করেন। মুসলমান ছাত্র সংঘ, সাহিত্য সমিতি, অর্থনৈতিক সোসাইটি, ঐতিহাসিক সোসাইটি, হিন্দি-সাহিত্য পরিষদ, নাইট স্কুল, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ, চারুশিল্প সমিতি ও মনোবিজ্ঞান সোসাইটি।

স্কটিশ চার্চ কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক মিঃ বি. বি. রায়[২] রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া বলেন যে, তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরূপে অথবা অতিথি স্বরূপ এখানে আসেন নাই। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে মিলিত হইয়া রাষ্ট্রপতিকে সম্বর্ধনা করিতে আসিয়া ছিলেন। সুদীর্ঘ বার বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বলিতে পারেন, এইরূপ বিপুল ও উৎসাহপূর্ণ সভা ইতিপূর্বে তিনি কলেজ হলে দেখেন নাই। যে অভিনন্দন আজ সুভাষচন্দ্রকে দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি শব্দ ছাত্রদের অন্তর হইতে উৎসারিত হইয়াছে। সুভাষচন্দ্রের অতীত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, ছাত্র জীবনে তাঁহার আশ্চর্য সাফল্য এবং কর্মজীবনে আত্ম-বলিদান ও দুঃখকষ্ট বরণ বাঙ্গালীর মানসিক উৎকর্ষের ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে উদঘাটিত করিয়াছে।

অতঃপর বিশ্বনাথ মুখার্জী, মিঃ কে. এস. আমেদ সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

সম্বর্ধনার উত্তরে বিপুল বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বলেন—আপনারা যতই আমার প্রশংসা করুন না কেন, আমার দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সজাগ আছি। যে আন্তরিক প্রীতির বশে আপনারা আজিকার সম্বর্ধনার আয়োজন করিয়াছেন, তাহা আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। সংগ্রামের ভিতর দিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আপনাদের উৎসাহ বর্ধিত হইয়াছে। যে হলে আজ আপনারা আমাকে অভিনন্দন করিবার অনুমতি

পাইয়াছেন, সেখানে প্রবেশ করিবার সময় অতীত ছাত্র জীবনের কথা আমার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হইয়াছে, বর্তমান ছাত্রজীবন কি অতীতের সঙ্গে যোগসূত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে যে আপনারা এই অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে এত বেগ পাইয়াছেন। ১৯২৭ সালে প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে অতিথিরূপে যখন আমি এখানে আসিয়াছিলাম, তখন তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। কিন্তু আজ ১৯৩৮ সালে তাহা করা হইতেছে।

১৯৩১ সালে তখনকার কলেজ অধ্যক্ষের অনুরোধে প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে কলেজের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে আর একবার আমি এখানে উপস্থিত হইয়া ছিলাম। তখন কতকগুলি সর্তে কলেজ অধ্যক্ষকে রাজী করাইয়া ছিলাম। সে সর্তের কথা শুনিলে আপনারা আশ্চর্যান্বিত হইবেন, প্রথম সর্ত ছিল—বড়লাটকে শতবার্ষিক উৎসবে নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারিবে না। দ্বিতীয় সর্ত ছিল—উৎসব উপলক্ষে ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করা হইবে না। এই দুইটি সর্তই কলেজ কর্তৃপক্ষ মানিয়া লইয়া ছিলেন। প্রাক্তন ছাত্র স্বরূপ সেই সভায় উপস্থিত হইতে আমার বাধা হয় নাই। আজ এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করিতে আপনাদিগকে বেগ পাইতে হইয়াছে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। যাহা হউক, আপনাদের বিপদ কাটিয়া গিয়াছে ও আপনারা সফল মনোরথ হইয়াছেন দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি।

আমি যখন কলেজে পড়িতাম তখন প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম, কখনও গতানুগতিক পথে চলিব না। দুঃসাহসের সহিত নূতন পথে চলিবার এক আনন্দ আছে। হিমালয়ের উচ্চ চূড়াই হউক, সমুদ্রের অতল তলই হউক, কি অনন্ত আকাশই হউক, অজানা রাজ্যের সন্ধানে যাত্রা করিবার একটা প্রলোভন আছে। এই অজানার খোঁজে বাহির না হইলে ভারতের সমৃদ্ধি আসিবে না। এইভাবে ব্রিটিশ শক্তি ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। তাহারা সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছে। অজানা রাজ্যের সন্ধানে সন্ধানে ছুটিয়াছে, দুঃখ ও বিপদকে হাসিমুখে বরণ করিয়াছে। ইহাই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের সাইকোলজি। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা তিব্বত, সিংহল, মালয়, চীন প্রভৃতি দেশে যে সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছিল, তাহার মূলেও সেই একই সাইকোলজি রহিয়াছে। এই নূতনের সন্ধান বিজ্ঞান রাজ্যে হইতে পারে, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হইতে পারে। দুর্জয় সাহস ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা যদি জাতি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহা হইলে অতি শীঘ্র আমাদের দাস-সুলভ মনোবৃত্তি দূরীভূত হইবে।

দেশের যুবকেরা যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করিতে শিখে এবং নিত্য নূতন আবিষ্কারের জন্য বিপদের মধ্যেও দুঃসাহসের সহিত ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে, তবে যে কোন সমস্যার সমাধান তাহাদের পক্ষে সহজ সাধ্য

হইবে। শত বৎসরের পরাধীনতা সত্ত্বেও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে আমরা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছি, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহারা সমষ্টিগত জাতীয় উন্নতির প্রতীক নহে। সমষ্টিগত আত্মচেতনা উদ্বোধনের ভার সমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই এ জাতি আবার জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে—এই মর্মে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু গত শনিবার সন্ধ্যায় স্কটিশ চার্চ কলেজ হলে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্তৃক প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করেন।'

প্রসঙ্গ কথা

১. প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেন সহ ইংরাজ অধ্যাপকরা ক্লাসে প্রায়ই ভারত তথা ভারতীয়দের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করতেন। তাঁরা ছাত্রদের বাঁদর, কুলী ইত্যাদিও বলতেন।

এরই ফলে ১৯১৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অধ্যাপক ওটেন ঐ কলেজের কয়েক জন ছাত্রের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে ছিলেন। সেই দলে সুভাষচন্দ্রও ছিলেন।

এই ঘটনার পরই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জেম্‌স সাহেব সুভাষচন্দ্রকে তখনই কলেজ থেকে বিতাড়িত করেন। অল্পদিন পরেই কলেজে জেম্‌স সাহেবের জায়গায় অধ্যক্ষ হয়ে আসেন ওয়ার্ডসোয়ার্থ সাহেব।

এদিকে সুভাষচন্দ্র অন্য কলেজে যাতে তাঁর পড়া চালিয়ে যেতে পারেন, সেজন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বার বার আবেদন করতে থাকেন। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি পেয়ে সুভাষচন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ার সুযোগ পেয়ে ছিলেন।

এ সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি কলেজের তখনকার ছাত্র-সেক্রেটারি (স্টুডেন্টস কন্‌সালটেটিভ কমিটি-প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৯১৫-১৬) ভোলানাথ রায় পরবর্তী কালে তাঁর 'OATEN INCIDENT 1916' গ্রন্থে যা লিখেছেন, তা থেকে কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি—

We have seen that Mr. James had ordered the expulsion of Subhas Bose on 16th February 1916, the very day after the Assault. This was confirmed by the Governing Body on the 19th February next. The Committee of Enquiry was announced on the 20th February 1916. Some wiseacre

politicians (even THE BENGALEE) advised that the Principal's orders were ultra vires since the Committee of Enquiry had taken away all his powers. An application was made to the Syndicate of the University to institute an enquiry regarding his case. In April next another application was made to the Syndicate for permission to continue his studies in some other college. He was informed in July 1916 that no such permission could be granted. He was thus virtually rusticated from the University. The attitude of the Universty however, later softened. It was given out that if any college affiliated to the University agreed to admit him, inspite of the order of expulsion passed by the Presidency College the University might be pleased to consider his case afresh.

After this, Dr. W. S. Urquhart, the then Principal of the Scottish Churches College was approached. He agreed to admit Subhas if the Principal of the Presidency College, from which he had been expelled had no objection. Mr. Wordsworth did not make any objection, saying that he would not block the future career of a promising young man. Thus Subhas resumed his studies as a third year student of the Scottish Churches college from July 1917. He had to waste two years'.

[স্কটিশ চার্চেস কলেজের নাম পরে হয় স্কটিশ চার্চ কলেজ।]

ভোলানাথবাবু তাঁর ঐ বইয়ে সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের বন্ধু ওটেন সাহেবের একটি কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। ভোলানাথবাবুর বই থেকে সেই কাহিনীটিও এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

'A recent biographer of Netaji interviewed Mr. Oaten at his home in England in 1971. At this interview Mr. Oaten was full of praise for Subhas Bose and entertained his Indian visitor by playing a tape-recorder of Subhas Bose. This is welcome news. In 1971 Mr. Oaten was aged 87. At the time of the incident in 1916, he was 32. Fifty-five long years had passed in the meantime. The young man of 32 had become an octogenarian. Subhas Bose had be-

come Netaji, and risen to the pinnacle of his fame. India had attained independence. It is quite believable that Mr. Oaten had also changed.'

[ভোলানাথ রায়ের লেখা OATEN INCIDENT—1916 বইটি আমি পেয়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামী সুহৃদ গোপাল দত্তর কাছ থেকে।]

২. স্কটিশ চার্চ কলেজের তখনকার সর্বজন প্রিয় ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক বি. বি. রায়ের পুরো নাম বীরেন্দ্র বিনোদ রায়। ইনি চট্টগ্রামের অর্থাৎ মাষ্টারদা সূর্য সেনের দেশের মানুষ। চিরকুমার, সুপণ্ডিত ও লেখক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র।

অধ্যাপক জীবনে ইনি ক্লাসে আসতেন সম্পূর্ণ ইউরোপীয় পোশাকে এবং ক্লাসে কোনদিন একটিও বাংলা কথা বলতেন না। কিন্তু কলেজে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সম্বর্ধনার দিন সভায় এসেছিলেন খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরে এবং বক্তৃতা করেছিলেন বিশুদ্ধ বাংলায়।

আমাদের কলেজে তখন হিন্দু বাঙালী ও খ্রীষ্টান বাঙালী অধ্যাপক যত ছিলেন, প্রায় ততই ইউরোপীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা ছিলেন। সাহেব, মেম এবং খ্রীষ্টান বাঙালীদের কথা বাদ দিলেও এক এই নির্ভীক বি. বি. রায় ছাড়া কোন হিন্দু বাঙালী অধ্যাপকই অধ্যক্ষের ভয়ে বা চাকরি যাওয়ার ভয়ে সেদিনের সুভাষ-সম্বর্ধনা সভায় যোগ দেন নি।

বি. বি. রায় যেমন অপূর্ব পড়াতেন, তেমনি কলেজে সব ব্যাপারে নির্ভীকও ছিলেন। আমরা ক্লাসে বসেও তাঁর অন্য ধরণের সাহসের কাজ দেখেছি। একটা বলি—

তিনি আমাদের ক্লাসে পড়াচ্ছেন। আমরা নিঃশব্দে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর কথা শুনছি। ঐ সময় পাশের ঘরের এক অধ্যাপকের ক্লাস থেকে গোলমালের শব্দ আমাদের ঘরে আসছিল।

দেখলাম, অধ্যাপক রায় পড়াতে পড়াতে হঠাৎ ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন, একটু পরেই আবার ফিরে এলেন। দেখা গেল, আর কোন গোলমালের শব্দই আমাদের ক্লাসে আসছে না।

আমরা বুঝলাম, পরে জেনেও ছিলাম, তিনি অধ্যক্ষের কাছে যান নি, পাশের ঐ ঘরে গিয়ে অধ্যাপককে কিছু না বলে, ছাত্রদের গোলমাল করতে নিষেধ করে এসেছিলেন। ছাত্ররা যেমন তাঁকে ভয় করতো, তেমনি ভালও বাসতো।

কিন্তু ক্লাসে পাঠদান-রত এক অধ্যাপকের ঘরে অপর এক অধ্যাপকের ঐ ভাবে যাওয়াটা তো কম সাহসের কাজ ছিল না!

১৯৩৯—'৪৫ এই ক' বছরের নানা ঘটনার সাক্ষী

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল এই ক' বছরে দেশে এবং বিদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। এই সময়কার দেশের কোন কোন ঘটনার সঙ্গে আমার সামান্য একটু আধটু যোগ থাকলেও, তখনকার অন্য সমস্ত ঘটনা ঘটতে দেখেছি এবং শুনেছি, সংবাদপত্রেও পড়েছি। সে সবের কিছু কিছু কাহিনী এখানে বলছি—

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করে। পোলাণ্ড ছিল ব্রিটিশের মিত্র রাষ্ট্র। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জার্মানীকে পোলাণ্ড আক্রমণ করতে নিশেষ করল। কিন্তু জার্মানী সে কথায় কান দিল না।

ফলে দুদিন পরে ৩রা সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ব্রিটেনের সঙ্গে ফ্রান্সও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

এই যুদ্ধে দেখা গেল, জার্মানীর সর্বাধিনায়ক হিটলার তাঁর প্রচণ্ড সেনা-বাহিনী ও রণকৌশল নিয়ে একে একে পোলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, এমন কি ফ্রান্সও জয় করে নিল। আর দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস বোমা ফেলে ফেলে ইংলণ্ডকেও বিধ্বস্ত করে দিল।

হিটলারের সেনাবাহিনীর হাতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরীর পতন হয় ১৯৪০-এর ১৪ই জুন। হিটলারের সেনাবাহিনী ফ্রান্সের দ্বারে এলে তখনই ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ছিলেন। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে নৈতিক সমর্থন জানালেও, অন্য কোনরূপে সাহায্য করে নি।

ফ্রান্সের পতন হ'লে তখন আমাদের রবীন্দ্রনাথও ফ্যাসিস্টদের দমন করবার জন্য রুজভেল্টের কাছে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন।

ফ্রান্স জয় করার বছর খানেক পরে ১৯৪১-এর ২২য়ে জুন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে। ঐদিনই হিটলারের আক্রমণের ঘণ্টা খানেক পরে ইতালিও রাশিয়া আক্রমণ করল।

১৯৪১ এর ৭ই ডিসেম্বর জার্মানীর মিত্র রাষ্ট্র জাপান কোন রকম যুদ্ধ ঘোষণা না করেই প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপে মার্কিন নৌঘাঁটি পার্ল

হারবার ধ্বংস করে দেয়। এর পরদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৪২ এর প্রথম দিকে জাপান দেখতে দেখতে হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর থেকে ইংরাজদের তাড়িয়ে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করল এবং ৬ই মার্চ রেঙ্গুন শহর দখল করে নিল।

রেঙ্গুনের পতনের পর তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ১২ই মার্চ ভারতের সাহায্য চেয়ে ক্রিপ্‌স মিশনের সংবাদ ঘোষণা করেন। স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স চার্চিল গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব নিয়ে মার্চের শেষ দিকে ভারতে এলেন। তিনি এই প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস. মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সকল দলের সঙ্গেই পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করলেন। কিন্তু কোন দলই তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করতে সম্মত হ'ল না।

ক্রিপস প্রস্তাবে বলা হয়েছিল—যুদ্ধ থেমে যাবার অব্যবহিত পরেই ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে। তখন ব্রিটিশ-ভারতের কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে, যে ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হবে তার মধ্যে থাকতেও পারে বা স্বতন্ত্র হয়েও থাকতে পারে। দেশীয় রাজ্যগুলোর ক্ষেত্রেও ঐরূপ ব্যবস্থা হবে। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে শাসনতন্ত্র রচনা পরিষদ গঠিত হবে।

ক্রিপ্‌স সাহেবের এই প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেউই মেনে নিল না। ক্রিপ্‌স প্রস্তাবে ভারত বিভাগের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা থাকায় কংগ্রেস এই প্রস্তাব ত্যাগ করল, অপর পক্ষে প্রস্তাবের মধ্যে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকায় মুসলিম লীগও গ্রহণ করল না।

এই সময়েই ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ও ৮ই আগষ্ট বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে কংগ্রেস বিখ্যাত 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

এই আন্দোলন প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী তখন তাঁর এক ভাষণে দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন—জাতির একজন সেবক রূপে আমি আপনাদের একটা ছোট্ট মন্ত্র দেব। মন্ত্রটা হচ্ছে—'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে',—হয় ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবো, না হয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রাণ দেব।

কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের প্রস্তাবে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল এবং আন্দোলনকে অংকুরেই বিনাশ করবার জন্য ৯ই আগষ্ট অতি প্রত্যুষেই মহাত্মা গান্ধী সমেত বোম্বাইয়ে অবস্থিত সকল কংগ্রেস নেতাকেই গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করল। এছাড়া ভারতের অন্যান্য স্থানেও প্রভাবশালী কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করল এবং কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণাও করল।

এই ভারত ছাড় আন্দোলন বা আগষ্ট আন্দোলনকে দমন করবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে নৃশংস নির্যাতনের পথ অবলম্বন করেছিল, তার তুলনা নেই। পুলিশ ও সৈন্যরা সর্বত্রই বেপরোয়া গুলি চালিয়ে বহু লোককে হতাহত করেছিল। বিমান থেকে নিরস্ত্র জনতার উপর বোমা বর্ষণও করা হয়েছিল। বহু গৃহ ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং নির্বিচারে পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়েছিল। তবে সর্বত্রই মুসলমানদের পাইকারী জরিমানা ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল! উত্তর ভারতের বালিয়া, গোরক্ষপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এবং বাঙ্গলায় মেদিনীপুর জেলায় সরকারী নির্যাতন বিশেষরূপে দেখা দিয়েছিল।

কলকাতা শহরেও এই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের আগুন জ্বলে উঠেছিল। এই আগষ্ট বিপ্লবে কলকাতার বিপ্লবীরা কলকাতার বহু জায়গায় টেলিফোনের তার কেটে দেয়, বহু পোষ্ট অফিস পুড়িয়ে দেয় এবং অনেক ট্রাম গাড়ীতে আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে। কলকাতার বহু জায়গায় পুলিশ ও মিলিটারীর সঙ্গে এই বিপ্লবীদের খণ্ডযুদ্ধও হয়। এতে অনেক বিপ্লবী নিহত হন এবং বহু আহত হন। তখন এই খণ্ডযুদ্ধের এলাকাগুলিতে রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র পুলিশ এবং সেনাবাহিনীও পাহারা দিত।

ঐ সময় একদিন দুপুরে আমার মেসে ফেরার সময় ঠনঠনে কালীতলার কাছে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে (বর্তমান নাম বিধান সরণি) সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে টহলদারী এক মিলিটারী দলের সামনে পড়ে কোন রকমে প্রাণে বাঁচি। ঐখানে একটু আগেই যে ট্রাম পোড়ানো নিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে এবং তারই জের হিসাবে সৈন্য দল এসেছে, এ খবরটা তখন জানতাম না।

কলকাতায় জাপানী বোমা

মহাত্মা গান্ধী 'ভারত ছাড়' নামক তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—ইংরেজদের যেমন করে সিঙ্গাপুর ছেড়ে দিতে হয়েছে, তারা যদি তেমনি করে ভারতবর্ষও ছেড়ে যায়, তাহলে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতের কোন ক্ষতি হবে না। হয়ত সে রকম অবস্থায় জাপানীরাও ভারতবর্ষ স্পর্শ করবে না।

দেশে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন যখন খুব জোর চলছে সেই সময়ে কলকাতার হাতিবাগান বাজারে প্রথম জাপানী বোমা পড়ল ১৯৪২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর রাত্রে। পরদিন রাত্রে আবার জাপানী বোমা পড়ল ডালহৌসী এলাকায়। দুদিনেই বোমায় একজনও মানুষ মরে নি। আর ক্ষয় ক্ষতিও হয়েছিল খুব সামান্যই।

কিন্তু তাহলে কি হবে। কলকাতার মানুষ খবরের কাগজ পড়ে আগেই জেনেছে, জাপান বোমার আঘাত হেনে হেনে অল্প সময়ের মধ্যেই কিভাবে পূর্ব এশিয়ায় একের পর এক ব্রিটিশের রাজ্য জয় করেছে। তাই কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দারা পর্যন্তও তখন প্রাণভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাতে লাগল। যে যা পারল সঙ্গে নিল, বাকি সব ফেলে রেখে চলে গেল।

হাওড়া স্টেশনে ও শিয়ালদহ স্টেশনে এবং হাওড়া শহর থেকে তখন মার্টিন কোম্পানীর যে হাওড়া-আমতা, হাওড়া-শিয়াখালা ও হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা আর কলকাতার বেলগাছিয়া এলাকা থেকে বেলগাছিয়া-বসিরহাট লাইট রেল বা ছোট রেল গাড়ী চলতো এই সব-স্টেশনেই লোকের কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার সে কী ভীড়! লোকে ঠাসাঠাসি করে গাদাগাদি হয়ে ট্রেনের ভিতরে এমনকি গাড়ীর ছাদে উঠে এবং ঝুলে ঝুলেও গেছে। ট্রেন ছাড়া লোকে ট্যাক্সি, লরি প্রভৃতিতেও কলকাতা ছেড়ে পালায়। গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ীতে করে মালপত্র নিয়ে গেছে।

কলকাতার অদূরেই ২৫ কিলোমিটারের মত দূরে আমার বাড়ি। কলকাতার মেসে থেকে পড়া শেষ করলেও, ঐ মেসে বরাবরই আমার একটা আস্তানা ছিল। কখন গ্রামের বাড়িতে, কখন বা কলকাতায় এসে থাকতাম।

কলকাতায় যখন জাপানী বোমা পড়ল, তখন আমি কলকাতায় আছি। বোমার ভয়ে ঐ পলাতক নর-নারীর মত আমিও সেদিন অনেক কষ্টে আমাদের হাওড়া-আমতা লাইট রেলের ভীড়ের মধ্যে বাড়ি গিয়েছিলাম।

কলকাতা থেকে এইভাবে চলে যাওয়া মানুষের স্রোত বেশ কয়েক দিন চলেছিল। তারপর কলকাতায় আর জাপানী বোমা পড়ল না দেখে, ঐ চলে যাওয়া মানুষরা সাহসে ভর করে আবার কলকাতায় ফিরে আসতে লাগলো।

ভারতের ব্রিটিশ সরকার ইতিপূর্বে এশিয়ায় জাপানের কাছে তাদের পরাজয়ের জন্য কলকাতা থেকে আগেই তাদের গুরুত্বপূর্ণ কোন কোন অফিস আংশিকভাবে পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

জাপানী আক্রমণের ভয়ে ভারত সরকার তখন আমাদের এই বাংলা দেশে আর একটা সতর্কতামূলক কাজ করেছিল। জাপান ইংরাজদের হাত থেকে ব্রহ্মদেশ কেড়ে নিলে ভারত সরকারের ভয় হ'ল এবার হয়ত জাপানীরা চট্ট-গ্রামের ভিতর দিয়ে পূর্ব বাংলায় এসে যাবে। এই ভেবে ভারত সরকার পূর্ব বঙ্গের বহু নৌকা, ডিঙ্গি বাজেয়াপ্ত ক'রে জলে ডুবিয়ে রাখল। আর কোথাও কোথাও এ সবের চলাচলও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করলো। ভয় এই সব নৌকা ডিঙ্গিতে করে জাপানী সৈন্যরা পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে না ছড়িয়ে পড়ে!

পশ্চিম বঙ্গেও এই ব্যবস্থা হ'ল। এখানে আবার সরকার অনেকের সাইকেল, মোটর প্রভৃতিও আটক করে রাখল। এখানেও ঐ ভয়, জাপানী সৈন্যরা এই সবের সাহায্যে গ্রামে গঞ্জে না চলে যায়।

সরকারের তখনকার ঐ জলযান আটক করার প্রসঙ্গেই রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের 'পদ্মা' বোট প্রসঙ্গে যা লিখেছেন, পরে তা পড়েছি। তিনি লিখেছিলেন—

'মহাযুদ্ধের প্রকোপ ঘরের কাছে এসে পড়ল। জাপানীদের ভয়ে বাংলার নদীগুলোতে যত রকমের জলবাহন ছিল গভর্ণমেণ্ট সেগুলো সব ডুবিয়ে দিতে লাগল। পদ্মা বোটে আমি তখন উত্তরপাড়ায় থাকতুম। ভয় হ'ল কোনদিন বোটটা কেড়ে নিয়ে যায়। বোটটি বাঁচাবার জন্য গঙ্গা ধরে আগাগোড়া নদীপথে পতিসরে যাবার জন্য রওনা হলুম। সেখানে পেঁৗছে নিশ্চিন্ত বোধ হ'ল। তখনকার মত পদ্মা বোট রক্ষা হ'ল। কিন্তু বাবা ও মহর্ষি'র বিশেষ প্রিয় এই বজরা বোটটিকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারলুম না। যুদ্ধের সময় কাঠ ও লোহার অভাবে সময় মত মেরামত করা গেল না। একটু একটু করে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নিঃশেষ হয়ে গেল।' পিতৃস্মৃতি—পৃঃ ২৪৯

দেখেছি জাপানী আক্রমণের ভয়ে ভারত সরকার তখন কলকাতায় এ. আর. পি অর্থাৎ এয়ার রেড প্রিকশান ও হোমগার্ড নামে দুটি দপ্তর খুলেছিল। জাপানের বোমার আক্রমণ থেকে কলকাতাকে রক্ষা করবার জন্য তখন কলকাতায় যে নিষ্প্রদীপ বা ব্ল্যাক আউটের মহড়া চলতো, তাতে এই এ. আর. পি ও হোম গার্ডের কর্মীদের খাটতে হোত। তখন কলকাতায় নিষ্প্রদীপ বা ব্ল্যাক আউটের মহড়া চলতো এইভাবে—হঠাৎ রাত্রে এক সময় খুব জোর আওয়াজে সাইরেন বেজে উঠল। এই সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গেই নিভে যেত রাস্তার সমস্ত আলো। লোকের বাড়ি ঘরের বা দোকানপাটের আলো না নিভলেও, আলোকে এমন ভাবে ঢেকে বা আড়াল করে দিতে হোত, যাতে সেই আলোর একটুও আভা রাস্তায় বা ঘরের বাইরে গিয়ে না পড়ে।

বাড়ির ও দোকানের আলোর এই ব্যবস্থা দেখবার জন্য এ. আর. পি. কর্মীরা ও হোম গার্ড কর্মীরা টর্চ হাতে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ও পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াত। সাধারণ মানুষের রাস্তায় বেরোন নিষিদ্ধ হোত। এর পর সাইরেনের অল্ ক্লিয়ার বা বিপদমুক্তির আওয়াজ বেজে উঠলে, লোকে আলোর ঢাকানা খুলতো এবং রাস্তায় বেরতো। রাস্তার আলো জ্বলে উঠতো।

দিনে সাইরেন বাজলে পথচারীকে এমন কি ট্রাম বাসের যাত্রীদেরও সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে সরে যেতে হ'ত। সরে গিয়ে পার্কে বা খালি জায়গায় তখন যে সব পরিখা বা ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছিল তার ভিতর গিয়ে আশ্রয় নিতে হ'ত, নয়ত কারও বাড়ির এক তলায় অথবা রাস্তায় কোন কোন বাড়ির পাশে হাত তিনেক করে ফাঁক দিয়ে যে সব ইটের ব্যাফল ওয়াল তৈরি করা হয়েছিল, সেই ব্যাফল ওয়ালের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়তে হ'ত। এই দেওয়ালগুলো সাধারণতঃ লম্বায় ১০/১২ হাত এবং উচ্চতায় ৭/৮ হাতের মত ছিল। অল ক্লীয়ার সাইরেন না বাজা পর্যন্ত ঐখানে থাকতে হ'ত।

এই সব ওয়ালের পাশে বালির বস্তা থাকত। বাড়িতেও সম্ভব হলে বালির বস্তা রাখতে হ'ত। বোমার টুকরোকে বালি চাপা দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল। বোমার আওয়াজ থেকে কানের পর্দা রক্ষা করবার জন্য সঙ্গে তুলো রাখতে হ'ত। বোমা পড়লে এবং কেউ সামান্য আঘাত পেলে তার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বাড়িতে First Aid Box ও রাখতে হ'ত। জানালা, আলমারী প্রভৃতির কাঁচে কাগজ মেরে দেওয়া হ'ত, যাতে না বোমার কাঁপনে কাঁচ ভেঙ্গে সেই ভাঙ্গা কাঁচে বাড়ির লোকের ক্ষতি হয়। কলকাতায় থেকে তখন আমাদের এসব ব্যাপারে রীতিমত ভুক্তভোগী হতে হয়েছে।

মালয়, সিঙ্গাপুর, বার্মা হারাবার পর ইংরাজ সরকার জাপানের হাত থেকে ভারতকে বিশেষ করে বার্মার লাগোয়া আমাদের এই বাংলা দেশকে রক্ষা করবার জন্য এই যে সব ব্যবস্থা নিয়েছিল এবং তখন বাংলায় যে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছিল, এসব হয়ত বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছিল। যদিও এই সৈন্য সমাবেশ করতে গিয়ে অসামরিক জনগণকে অনেক উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং সৈন্যদের জন্য আগে খাদ্য মজুত করতে গিয়ে বাংলায় মহা দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছিল। সে কথা পরে আলোচনা করছি। এখন যে কথাটা বলতে যাচ্ছি, কলকাতায় যে জাপানী বোমা পড়েছিল, সে বোমা কি সত্যই জাপানীরা ফেলেছিল? না এরমধ্যেও ইংরাজের কূটবুদ্ধি কাজ করেছিল?

এতকাল শুনে আসছিলাম কলকাতায় জাপানীরাই বোমা ফেলেছিল। কিন্তু সম্প্রতি আমার পুত্র দীপংকরের মুখে অন্য কথা শুনলাম। সে বলে জাপান নয়, ইংরাজরাই ঐ বোমা ফেলেছিল।

দীপংকর পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও নানা বিষয়ে সে প্রচুর পড়াশুনা করে এবং লেখেও। আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরেট করার সময় ১৯৮৭ সালে বড় দিনের ছুটিতে দীপংকর বাড়ি এসেছিল। একদিন বাড়িতে আমি ও আমার স্ত্রী মীনাক্ষী কি একটা প্রসঙ্গে কলকাতায় জাপানী বোমার কথা আলোচনা করছিলাম। দীপংকরও তখন সেখানে বসে।

দীপংকর আমাদের কথা শুনে, আমেরিকায় কার যেন একটা লেখায় পড়েছিল,—বললো কলকাতায় জাপান বোমা ফেলে নি। ভারতীয়দের মনে জাপানী-বিদ্বেষ আনবার জন্য ইংরাজ নিজেই ঐ বোমা ফেলেছিল। তখনকার অমন শক্তিধর জাপান কলকাতায় বোমা ফেলল, একটাও মানুষ মরল না, একটাও বাড়ি ঘর ভাঙল না? এ কখন সম্ভব?

দীপংকরের এই কথা শুনে আমাদেরও তখন মনে হ'ল—তাও তো বটে! যে জাপান তার অব্যর্থ বোমার আঘাতে পূর্ব এশিয়ায় ইংরাজ ও আমেরিকান-দের কত ক্ষতি করল, সেই জাপানের বোমায় আমাদের একটুও ক্ষতি হ'ল না!

জাপানী বোমায় আমাদের কোন ক্ষতি না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে ভাবতাম, হয়ত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নির্দেশেই এইরূপ হয়েছিল, কিন্তু তাই কি?

এখন ভাবছি সুভাষচন্দ্র তো বার্লিন থেকে ডুবো জাহাজে করে টোকিও গিয়েছিলেন ১৯৪৩ এর ২০ শে জুন। অর্থাৎ কলকাতায় বোমা পড়ার ছ'মাস পরে।

তবে কি সুভাষচন্দ্র বার্লিনে বসে বা রাসবিহারী বসু জাপানে বসে জাপানী সেনাবাহিনীকে ঐরূপ কোন ক্ষতি না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন? এ ব্যাপারে এঁদের নির্দেশ থাকলে, এঁরা তো বোমা ফেলতেই নিষেধ করতেন। তাই দীপঙ্করের কথাটা বা যাঁর লেখা দীপঙ্কর পড়েছিল, তাঁর কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতেও পারি না।

এই প্রসঙ্গেই আমার আর একটা কথা—ঐ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে দেখেছি, যুদ্ধে আমরা জিতবই—মানুষের মনে সর্বক্ষণের জন্য এই মনোবল আনতে তখন ইংরাজ সরকার Victory শব্দের V অক্ষরটা নিয়ে বড় করে লিখে দেশের সর্বত্র প্রচার করেছিল। তখন মোটর, ট্যাক্সি, লরি, ট্রাম, বাস, ট্রেন প্রভৃতি যান বাহনে, অফিস আদালতে, প্রকাশ্য স্থানে, এমন কি লোকের বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালেও ঐ বড় অক্ষরের V দেখা যেত।

এখন ভাবছি, যে ইংরাজ দেশর লোকের মনে 'জিতবই' এই মনোবল আনবার জন্য অমন করে অত V ব্যবহার করেছিল, সেই ইংরাজ বাঙালীদের তথা ভারতীয়দের মনে জাপানী বিদ্বেষ এবং 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের বিপ্লবীদের মনে জাপানী ভয় আনবার জন্য নিজেই যে ঐ ক্ষতিহীন বোমা ফেলে নি, সে কথা হয়ত জোর করে বলা যাবে না।

১৩৫০-এর মন্বন্তর

১৯৪২ সালে 'আগস্ট বিপ্লব' বা 'ভারত ছাড়' আন্দলনের সময় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল তাঁর নিজের দেশবাসীকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন—ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে এখন সর্বাপেক্ষা বেশী সৈন্যই ভারতে মোতায়েন রাখা হয়েছে।

এক দিকে পূর্বভারতে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য, অপর দিকে ১৯৪২ এর আগস্ট বিপ্লবের বিপ্লবীদেরও দমনের জন্য—এই উভয় কারণে ভারতের ইংরাজ সরকার ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করেছিল। মিত্র রাষ্ট্র আমেরিকা থেকেও অসংখ্য আমেরিকান সৈন্য এনেছিল।

মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই বাংলায় খাদ্য নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হয়েছিল, এবার ঐ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো কঠোর হ'ল। দেশের উৎপন্ন খাদ্য আগে জমা হবে সৈন্যদের জন্য। অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে অসামরিক জন-সাধারণ।

ঐ সময় বাংলায় যা খাদ্য উৎপন্ন হ'ত, তাতে বাংলা দেশের অধিবাসীদেরই অভাব মিট্‌ত না। তখন প্রচুর পরিমাণ খাদ্য বিশেষ করে চাল আমদানী করতে হ'ত ব্রহ্মদেশ থেকে। জাপান ব্রহ্মদেশ জয় করায় সে আমদানী একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

দেশের উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশই আগে চলে যেতে লাগল বাংলায় জমায়েত করা সেনাবাহিনীর জন্য। ফলে বাংলায় খাদ্যাভাব দেখা দিল। ক্রমে এই অভাব এত তীব্র আকার ধারণ করল যে ১৩৫০ সালে বাংলায় মহা দুর্ভিক্ষ হ'ল।

সারা বাংলা জুড়েই দুর্ভিক্ষ। কলকাতার দূরদূরান্তের গ্রামের সাধারণ মুটে মজুর ভূমিহীন চাষীর দল ও অভাবী মানুষ এক মুঠো ভিক্ষের আশায় তখন গ্রামের বাড়ি ঘর ছেড়ে সপরিবারে কলকাতায় এসেছে। দেখেছি তারা এসে পথে পড়ে থেকেছে। তারা দেখেছে, দোকানে, বাজারে, বড় লোকের ঘরে ঘরে নানান্ খাবার সাজানো রয়েছে। খেতে না পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় সবাই মরেছে, তবুও কোথাও জোর করে কেড়ে খায় নি। তারা মাটির সরা বা কোন পাত্র হাতে নিয়ে কলকাতায় লোকের বাড়িতে বাড়িতে ভাতের 'ফেন' ভিক্ষা করে খেয়েছে,। তখন কলকাতার অলিতে গলিতে ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা নারী পুরুষকে এবং উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ শিশুকে দিনে এবং অনেক রাত পর্যন্তও ঐ ফেন চাইতে কত দেখেছি। কেউ কেউ হয়ত ফেনের সঙ্গে দয়া করে এক মুঠো ভাত ও একটু তরকারিও দিয়েছে; কিন্তু সে অভাবের মহা-সমুদ্রে এক কণা জলবিন্দুর মতই। এই দুর্ভিক্ষে গ্রামে ও শহরে মানুষ কাতারে কাতারে মরেছে।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের খাবার দেবার জন্য তখন গ্রামে কোথাও কোথাও লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল। গ্রামে যাদের বাড়িতে ধানচাল ছিল, তাদের বাড়ি থেকে চাল চেয়ে এনে চালে-ডালে খিচুড়ি করে লঙ্গরখানা থেকে ক্ষুধার্ত মানুষদের দেওয়া হ'ত। আধ পেটা, সিকি পেটা করেই, তাও কি সকলকে দেওয়া সম্ভব হ'ত! বসিয়ে খাওয়ান অসম্ভব ছিল, ক্ষুধার্তরা সামান্য পরিমাণ মতই খাদ্য এখান থেকে নিয়ে যেত।

সরকার থেকেও এইরূপ কিছু কিছু লঙ্গরখানা হয়েছিল।

এই দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে প্রায়ই বাড়িতে থাকতাম। সেই সময় আমাদের পাশাপাশি তিনখানা গ্রামের সহৃদয় দরদী মানুষরা মিলে হাটতলায় আমরাও একটা লঙ্গরখানা খুলেছিলাম। সেখান থেকে প্রতিদিন দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের কিছু কিছু খিচুড়ি দিতাম।

১৩৫০ এর এই দুর্ভিক্ষে সারা বাংলায় প্রায় ৫০ লক্ষ বাঙালী (হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই) অনাহারে মরেছিল। এরা মরেছিল বৈশাখ থেকে কার্তিকের মধ্যেই। কারণ, এ বছর অগ্রহায়ণ মাসে হৈমন্তী ধান প্রচুর

হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের পর দেশে ধানচাল হ'ল, লোকে ভাত খেতে পেল। কিন্তু অনাহারী উপোষী মানুষ অধিক খেয়ে আরও কত মরল।

এই দুর্ভিক্ষ মহামারীর সময় সরকারের খাদ্য-নীতিতে একটা মারাত্মক ত্রুটি হয়েছিল। লোকের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়ে তখন সৈন্যদের জন্য এত বেশী খাদ্য জমা করা হয়েছিল যে, সেই উদ্বৃত্ত খাদ্য পরে নষ্ট হয়ে গেলে তা ফেলে দিতে হয়েছিল। গরু মহিষেরও খাদ্যের অযোগ্য হয়ে ছিল। অথচ তখন ঐ লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরল।

যা কিছু চাল কোনরকম খাদ্যযোগ্য ছিল, সেগুলো রেশনে বিক্রি হ'ল। আর কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যারা মুনাফার আশায় চাল লুকিয়ে রেখেছিল, মাঠে ধান হওয়ায় এখন তারা লুকোনো চাল বেচতে শুরু করল।

দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তখন বেদনার্ত হৃদয়ে 'তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে একটা কবিতার বই লিখেছিলাম। এইটাই আমার সাহিত্য জীবনের প্রথম বই। এই বইয়ের একটা কবিতার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি—

জগৎ সুদ্ধ চলেছে যুদ্ধ
জাপান করেছে বার্মা জয়
রেঙ্গুন চালের বাজার বন্ধ
তাইত বাঙ্গালী হতেছে ক্ষয়।

* * *

কাহার লাগিয়া কে করিছে যুদ্ধ
আমরা হেথায় মরি,
পরাধীন কিনা, চুপটি করিয়া
মৃত্যুরে বরণ করি।

* * *

এখন শুধু ভাবি—মরিয়াছে যারা
বাঁচিয়াছে মরে',
আমরা যারা বাঁচিয়া আছি
মরিব কেমন করে'।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী

হরিপুরা কংগ্রেসে যে-সুভাষচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন, পর বৎসর ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে তাঁকেই কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়লাভ করেও নেতাদের সঙ্গে মত পার্থক্যের জন্য তাঁকে কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছিল।

হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে এবং অন্যত্রও সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশী রাষ্ট্রের সশস্ত্র সাহায্য নিতে ইতস্ততঃ করা উচিত হবে না। অহিংসার উপাসক মহাত্মা গান্ধী সুভাষচন্দ্রের এই মত সমর্থন করতেন না।

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ত্যাগ করে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করেন। ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্র যখন তাঁর 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় তিনি কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসের নিকটে অবস্থিত 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' বা 'অন্ধকূপ হত্যা' নামক এক অলীক কাহিনীর স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণের জন্যও আন্দোলন করবেন বলেন। এই হলওয়েল মনুমেণ্টের ইতিহাস হ'ল—

হলওয়েল নামে এক সাহেব লেখেন—ইংরাজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সুদৃঢ় করতে থাকলে, তখন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ ক'রে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করেন এবং ১৪৬ জন ইংরাজকে বন্দী করেন। পরে নবাব এই বন্দীদের তত্ত্বাবধানের জন্য মানিকচাঁদ নামে এক ব্যক্তির উপর ভার দিয়েছিলেন। মানিকচাঁদ একটা খুব ছোট্ট ঘরে এদের আবদ্ধ করে রাখেন। এতে দারুণ গ্রীষ্মে পিপাসায় ১২৩ জন বন্দীর মৃত্যু হয়, বাকি ২৩ জনকে অর্ধমৃত অবস্থায় পরের দিন ঘর থেকে বাইরে আনা হয়। এইটাই অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত।

হলওয়েলের বিবরণ ছাড়া আর কারও লেখায় কিন্তু এই ঘটনার কোথাও কোন উল্লেখ নেই। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—আগামী ৩রা জুলাই (১৯৪০) সিরাজদ্দৌলা দিবসে 'হলওয়েল মনুমেণ্ট' অপসারণে তিনি নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু ৩রা জুলাইয়ের আগের দিন বেলা আড়াইটা নাগাদ পুলিশ সুভাষচন্দ্রের এলগিন রোডের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ভারতের ইংরাজ সরকার 'ভারত রক্ষা আইনে' সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাঁকে কারাগারে অন্তরীণ করে রাখল।

সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেও তাঁর সহকর্মী ও অনুরাগীরা যথারীতি ৩রা জুলাই হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলন চালান। তখন কলকাতায় অবস্থানকালে এই আন্দোলন দেখেছি। এঁদের আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত পরে ঐ হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারিত হয়েছিল তাও দেখেছি।

এদিকে কারাগারে অবস্থানকালে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখার প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র অমরণ অনশন করবেন স্থির করলেন। তিনি তাঁর অনশন আরম্ভের দিন জানিয়ে বাংলা সরকারকে একটা চিঠিও দিলেন। ১৯৪০ সালের ১০ই নভেম্বর থেকে তিনি অনশন আরম্ভ করলেন।

সুভাষচন্দ্র অনশন আরম্ভ করলে গবর্ণমেণ্ট ৫ই ডিসেম্বর তাঁকে মুক্তি দিয়ে স্বগৃহে অন্তরীণ করে রাখল। এই সময় ১৯৪১ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবসে এক সংবাদ প্রকাশিত হ'ল যে, সুভাষচন্দ্র

রহস্যজনক ভাবে বাড়ি থেকে অন্তর্হিত হয়েছেন। গভর্ণমেন্ট থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুল, কিন্তু এক বছর পর্যন্ত কেউ কিছুই জানতে পারল না সুভাষচন্দ্র কোথায় গেছেন। তবে বিলাতের কর্তৃপক্ষ তখন অনুমান করেছিল, সুভাষচন্দ্র হয় রোম, নয়ত বার্লিন চলে গেছেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অনুমান মিথ্যা হয়নি। কারণ সুভাষচন্দ্র বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আনবার জন্য ব্রিটিশের শত্রু জার্মানীর রাজধানী বার্লিনেই গিয়ে ছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বার্লিনে গিয়ে পেঁছলে হিটলার তাঁকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দেন। পরে সুভাষচন্দ্র আবার বার্লিন থেকে ডুবো জাহাজে ক'রে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে টোকিওতে এসে পেঁছন।

সুভাষচন্দ্র ২০শে জুন টোকিওয় পেঁছে ২রা জুলাই সিঙ্গাপুরে যান। সিঙ্গাপুরে পেঁছলে রাসবিহারী বসু ৪ঠা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্রকে তাঁদের পূর্ব-গঠিত আজাদ হিন্দ সংঘের সভাপতি করেন। সুভাষচন্দ্র এই দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সংঘের আন্দোলন প্রবল বেগে আগিয়ে চলে। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় নরনারী দলে দলে আজাদ হিন্দ সংঘের সভ্য হতে থাকে এবং আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দিতে আরম্ভ করে। এখানে ইংরাজের ফেলে আসা ভারতীয় সৈন্যরাও দলে এল। পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত ভারতীয়রা এই সময় মুক্ত হস্তে আজাদ হিন্দ সংঘে অর্থ দানও করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র এবার এখানে একটা অস্থায়ী আজাদ হিন্দু গবর্ণমেন্ট গঠন করলেন। তিনিই হলেন এই গবর্ণমেন্টের সর্বাধিনায়ক বা নেতাজী। জাপান, জার্মাণী, ইটালী প্রভৃতি ইংরেজের বিরুদ্ধের কয়েকটা রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ গবর্ণমেন্টকে স্বাধীন গবর্ণমেন্ট ব'লে স্বীকার করে ছিল।

এই আজাদ হিন্দ গবর্ণমেন্ট ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর যথাযথ-ভাবে গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

এই সময় আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারের সংখ্যা ছিল ১৫ শত। ঝান্সীর রাণী বাহিনী নামে একটা নারী বাহিনীও ছিল।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখে আজাদ হিন্দ বাহিনী প্রথম ভারত-ভূমিতে প্রবেশ করে। এই বাহিনী অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে মোরাই ও কোহিমার উপত্যকায় ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত ক'রে মণিপুরে উপস্থিত হয় এবং পুনরায় ইম্ফল আক্রমণ করে।

এই সময় ভীষণ বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহ করা এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হতে হয়। তবে এই সময় আজাদ হিন্দ বাহিনী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ

চালিয়ে যেতে থাকে। খাদ্য সরবরাহ একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কোন কোন স্থানে সৈন্যদের ঘাস খেয়েও জীবন রক্ষা করতে হয়েছিল।

জাপানীরা ব্রিটিশের কাছ থেকে ব্রহ্মদেশ কেড়ে নিয়ে ছিল। ব্রিটিশ সৈন্য পুনরায় ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করলে, এই আক্রমণে জাপানের বাধা দেবার ক্ষমতা নেই দেখে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র রেঙ্গুন ত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে রেঙ্গুন থেকে আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের দপ্তরখানাও সিঙ্গাপুরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

অবশেষে আগষ্ট মাসে জাপান ব্রিটিশের নিকট আত্মসমর্পণ করলে, আজাদ হিন্দ ফৌজও ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

যতদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে, ততদিন সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতার জন্য এত সব বীরত্বের বিস্তৃত কাহিনী অপ্রকাশিতই ছিল। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'লে ক্রমে ক্রমে এই সব কাহিনী প্রকাশিত হয়। আমরা তখন সংবাদপত্রে নেতাজীর ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর এইসব বীরত্বপূর্ণ অপূর্ব কাহিনী পড়ে আনন্দে ও গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠতাম।

পরে এক সময় আজাদ হিন্দ বাহিনীর এক বাঙালী সৈনিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর মুখেও ভারতের মুক্তির জন্য তাঁদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুদ্ধের বর্ণনা শুনেছি। তিনি বলেছিলেন—আমাদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর যুদ্ধের শেষ দিকে একবার বর্ষার সময় যখন আমাদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা নিরুপায় হয়ে আমাদের যুদ্ধের যানবহন হিসাবে যে সব অশ্ব আমাদের সঙ্গে ছিল, সেগুলোকে একটা একটা করে মেরে সেই ঘোড়ার মাংস আগুনে সেঁকে খেয়ে আমরা প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলাম।

যুদ্ধাবসানে যখন নেতাজীর ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বকাহিনী পড়ে গর্বিত হ'তাম, তখন নেতাজী ও তাঁর এই আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে কয়েকটা কবিতা লিখেছিলাম। নেতাজী যেদিন তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্বোধন করে 'দিল্লী চলো' বলেছিলেন, সেদিনের সেই 'দিল্লী চলো' নিয়ে যেমন কলকাতার গড়ের মাঠে নেতাজীর একটি মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, তেমনি আমি এ নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম। সেই কবিতার প্রথম ক'লাইন এই—

ঐ দূরে, বহু দূরে
পর্বত বনানী জুড়ে
দেখা যায় ভারতের শ্যাম সীমা।
আকাশের নীলিমা
পদপ্রান্তে যার হইয়াছে নত,
ঐ জন্মভূমি মোদের স্নেহশীলা জননীর মত।

চাকরি

ছেলেবেলায় বইয়ে পড়তাম, আমাদের এই বাংলায় আগে এমন দিন ছিল, যখন লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু এবং পুকুরভরা মাছ থাকতো।

আমাদের গ্রামের বাড়িতে আজও এই তিনটার কোনটারই তেমন অভাব নেই। বর্তমানে কৃষি সেচ এবং অধিক ফলনশীল ধানের দৌলতে গোলায় ধানের বরং বাড়বাড়ন্তই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালেই এম. এ. পাস করি। তখন যুদ্ধের কারণেই কোন একটা চাকরি জোগাড় করতে তেমন অসুবিধা ছিল না। তবুও চাকরির জন্য কোন চেষ্টা করি নি। ভাবতাম, যা জমি জায়গা আছে, তাতেই চলে যাবে। শুধু শুধু চাকরি করতে যাব কেন! তাই চাকরির চেষ্টা না করে ঘরে বসে আপন মনে গল্প কবিতা লিখতাম, কিছুটা চাষের কাজ দেখতাম এবং প্রয়োজন বোধে কিছু কিছু গ্রাম সেবার কাজও করতাম।

চাকরির জন্য বাব-মাও অবশ্য তেমন কিছু বলতেন না। তখন ভাবতাম, যদি চাকরি করতেই হয় তো এমন চাকরি করবো, যার সঙ্গে অন্তত যেন কিছুটা সাহিত্য চর্চার সুযোগ থাকে। কিন্তু এমন চাকরি পাব কোথায়? কে দেবে? এইভাবেই দিন কাটে।

এই সময় ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি একদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম—

ভারতী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেকটর বৌবাজারের গোপীমোহন বসু লেন থেকে 'প্রত্যহ' নামে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা বার করবেন। এই সংবাদ পড়ে ঐ কাগজে চাকরির জন্য একটা দরখাস্ত করি।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে 'প্রত্যহ' প্রকাশ শুরু হ'ল। সম্পাদক হলেন বাংলা কংগ্রেসের এক সময়ের সেক্রেটারি জনাব আশরাফউদ্দিন চৌধুরী। 'প্রত্যহ' বেরোবার প্রথম থেকেই অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকেই সাব এডিটরের চাকরি পেয়ে এখানে কাজে যোগ দিলাম। এই পত্রিকায় কাজ করি এক বছরেরও কিছু বেশি সময়। শেষ দিকে এই পত্রিকার রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগ অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি দুজনে চালাতাম, এবং ১৯৪৬ সালের 'প্রত্যহ' পূজা সংখ্যাও আমরা দুজনেই সম্পাদনা করেছিলাম।

এই পূজা সংখ্যায় আমরা বাংলার তখনকার বিখ্যাত লেখক লেখিকাদের কাছ থেকে রচনা এনে প্রকাশ করে ছিলাম। এই পূজা সংখ্যা 'প্রত্যহ'য়

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একটি পুরনো লেখাও প্রকাশ করে ছিলাম। এই সংখ্যায় কনকবাবুর একটা লেখা এবং আমার একটা কবিতা ছেপে ছিলাম।

'প্রত্যহ' পত্রিকায় কাজ করার সময়েই তখনকার বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় একটা কাজ পেয়ে যাই।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় কি করে চাকরিটা পেয়ে ছিলাম, এখন সেই কথা বলি—

১৯৪৬ সালের মে মাস। 'প্রত্যহ' পত্রিকায় তখন কাজ করছি। সেই সময় আমার এম. এ. ক্লাসের সহপাঠী গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য একদিন আমার 'মেসে' এসে আমাকে বললো—সাহিত্য বোঝেন এমন কোন লোক তোর চেনা আছে? চেনা থাকলে, তাঁকে দে। আমাদের ভারতবর্ষ পত্রিকায় একজন লোকের দরকার। নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-বর্ষের কাজ ছেড়ে দিয়ে 'পরাগ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হয়ে চলে গেছেন।

গোকুল শুধু আমার এম. এ. ক্লাসের সহপাঠীই নয়, সে ও আমি একই জেলার (হাওড়া) এবং একই থানার (আমতার) অধিবাসী, গোকুল নিজেও কিছু কিছু লেখে। সে কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পুত্র। গোকুল তখন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা যাঁদের, তাঁদেরই পুস্তক প্রতিষ্ঠান 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স'-এর ম্যানেজার।

'প্রত্যহ'য় আমার প্রধানতঃ কাজ ছিল বিকালে অথবা রাত্রে। আমি গোকুলের কথা শুনে তাকে বললাম—সাহিত্য বোঝেন এমন লোক তো কই এখন মনে আসছে না। তা আমি যদি মণিবাবুর জায়গায় তোদের কাগজে যাই চলবে?

—তুই গেলে তো খুবই ভাল হয়। কাল সকালে ১০টার সময়েই তুই আমাদের দোকানে চলে আয়।

পরদিন ছিল ২৫শে বৈশাখ, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। তখন ইংরাজ আমলে ২৫শে বৈশাখ ছুটির দিন ছিল না।

ঐ ২৫শে বৈশাখে সকাল ১০টায় আমি ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে গেলাম। আমি গেলে গোকুল আমাকে সঙ্গে নিয়ে এই দোকানের এবং ভারতবর্ষ পত্রিকারও মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে নিয়ে গেল। হরিদাসবাবু আমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলেই বললেন—আজ থেকেই কাজে লেগে যাও।—এই ব'লে গোকুলকে বললেন—গোকুল, এঁকে উপরে ভারতবর্ষ অফিসে নিয়ে গিয়ে ফণিবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও।

ফণিবাবু অর্থাৎ ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখন ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক।

২০৩/১/১ এই বিরাট বাড়ির এক তলায় এঁদের বইয়ের দোকান ও প্রেস। দু তলায় ভারতবর্ষ অফিস।

গোকুলের সঙ্গে ভারতবর্ষ পত্রিকা অফিসে এসে ফণিবাবুর সঙ্গে এবং ঐ পত্রিকা অফিসের আরও ছ সাত জন কর্মীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। ১৩৫৩ সালের ২৫শে বৈশাখ থেকে ভারতবর্ষ পত্রিকায় কাজে লেগে গেলাম।

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ভারতবর্ষের পাবলিসিটি অফিসার বা প্রচার সচিব। আমি তাঁর ঐ পদে গিয়ে যোগ দিলেও আমাকে সহকারী সম্পাদকের কাজও করতে হ'ত। মাঝে মাঝে ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদকীয়, যা সাময়িকী নামে লেখা হ'ত, তাও লিখতে হ'ত। এমন কি ভারতবর্ষ এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্সের 'ল' অফিসার হয়ে, আইন সংক্রান্ত সমস্ত কাজও দেখাশোনা করতে হ'ত। এই এত সব কাজ করতাম বলে হরিদাসবাবু আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে আমার একজন সহকর্মী ছিলেন বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় সবে দিন পনের কাজ করেছি, এই সময় সম্পাদক ফণিদা (বয়োজ্যেষ্ঠ বলে ভারতবর্ষ অফিসের সকলেই আমরা তাঁকে ফণিদা বলতাম) একদিন আমাকে বললেন—ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন ভারতে এসেছে, এদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে দাও। ভারতবর্ষে ছাপাবো।

ভারতকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশন তখন কিছুদিন হ'ল ভারতবর্ষে এসে গেছে। ফণিদার কথায় পুরাতন সংবাদপত্র ঘেঁটে এ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে ভারতবর্ষে দিই। প্রবন্ধ লিখে শেষে তারিখ দিয়ে ছিলাম ৪.৬.৪৬। লেখাটা সেই সময় ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল।

আমতা রামসদয় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত দাতা পঞ্চানন চোংদার আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর কলেজে অধ্যাপনা করবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে বলেছিলেন। বাড়ির কাছেই একরূপ লোভনীয় চাকরি হলেও 'ভারতবর্ষ' ছেড়ে যাই নি।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় আমি ১০বছর ৮মাস চাকরি করেছি। এর মধ্যে বোধ করি কখনও একটানা কখন বা ছেদ দিয়ে নানা বিষয়ে প্রায় ৮বছরের মত ভারতবর্ষ পত্রিকায় লিখেছি। শেষ দিকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচুর লিখি।

ভারতবর্ষ পত্রিকায় দীর্ঘ ১০/১১ বছর কাজ করার সময় মাঝে বছর খানেক করে দুটো পত্রিকায় বিকালে ও সন্ধ্যার দিকে সহ-সম্পাদক হিসাবে পার্ট টাইম কাজ করেছি। এই দুটো পত্রিকা হ'ল সাপ্তাহিক 'সৈনিক' ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী'। 'প্রত্যহ' তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে আমার কাজের সময় ছিল দিনে ১০টা থেকে ৫টা।

পশ্চিম বঙ্গের তখনকার সেচমন্ত্রী ভূপতি মজুমদার তাঁর ছোটভাই শৈলেশ মজুমদারকে 'সৈনিক' কাগজটা করে দিয়েছিলেন। গৌতম সেন ছিলেন এই কাগজের সম্পাদক।

ভূপতিবাবু প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে 'সৈনিক' অফিসে আসতেন। এসে তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের গল্প শোনাতেন এবং দেশের রাজনীতি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন।

'বঙ্গবাসী' পত্রিকা ছিল, সেকালের একটি বিখ্যাত পত্রিকা। এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু একজন খ্যাতনামা লেখক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন।

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমের অন্যতম ট্রাস্টি বিশিষ্ট গান্ধীবাদী জিতেন্দ্রমোহন দত্তর সঙ্গে নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় গান্ধীজীর শান্তি অভিযানে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। নোয়াখালি-ত্রিপুরা থেকে গান্ধীজীর চলে আসার দিন বিকালে চাঁদপুরে মেঘনার সুবিশাল চরে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা। সভা আরম্ভ হতে তখনও দেরি আছে। জিতেনবাবু ও আমি মেঘনার ঐ বিস্তৃত চরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছি। এমন সময় জিতেনবাবু আমাকে বললেন—আপনি ভারতবর্ষ অফিস থেকে ফেরার পথে আমার 'বঙ্গবাসী' কাগজটা কিছুক্ষণ করে দেখুন না। অবশ্য সেজন্য আপনাকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিকও দেব। বর্তমানে ঐ কাগজটা আমি কিনে নিয়েছি।

গান্ধীজীর অভিযান থেকে ফিরে কিছুদিন পরেই এই কাগজে সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগ দিই। তখন সম্পাদক ছিলেন, শান্তিপুর-নিবাসী বৃদ্ধ পণ্ডিত হরিনাথ ভট্টাচার্য। শান্ত প্রকৃতির অতিশয় ভদ্র মানুষ। বঙ্গবাসীর শেষ দিন পর্যন্ত এখানে কাজ করেছি।

এরপর বসিরহাটের জমিদার, ২৪ পরগনা জেলা স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও আমি দুজনে 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করেছিলাম। এই পত্রিকাটি কিছুদিন চালিয়ে ছিলাম। তখনও কিন্তু ভারতবর্ষ পত্রিকার মূল চাকরিটা আমি ঠিকই করে চলেছি।

ভারতবর্ষ অফিসে ফণিদা একদিন আমাকে বললেন—গোপাল, নৈহাটীর কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের যে 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা' হয়েছে তুমি ঐটার ভার নাও, কিউরেটর হয়ে ওখানে চল। এখানে তুমি যেমন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখছ, ওখানে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখবে। তুমি তো জান, আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি, তুমি যদি ওখানে যাও তো আমি সেক্রেটারি থাকবো, না হ'লে ছেড়ে দোব।

আমি বললাম—এখানকার চাকরি ছেড়ে অতদূরে যাব ?

—দূর আবার কোথায়? কলকাতা থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করবে। যেতে বড় জোর ঘণ্টা খানেক লাগবে। নৈহাটী থেকে আরও কতদূরে রানাঘাট, কৃষ্ণনগর থেকেও লোকে প্রতিদিন কলকাতায় চাকরি করতে আসে।

—সংগ্রহশালায় কি আছে?

—বঙ্কিমচন্দ্রের শ'খানেকেরও বেশী অপ্রকাশিত চিঠি আছে। আরও কিছু কিছু জিনিস আছে, যা তোমার লেখার বিষয় হতে পারবে।

এই শুনেই বললাম—তাহলে যাব।

ফণিদা বললেন—লাইব্রেরি ও সংগ্রহশালা দেখাশুনার জন্য একটা পরিচালক সমিতি আছে। আমি সেক্রেটারি হলেও, আমাদের কমিটির প্রেসিডেণ্ট বারাকপুরের এস. ডি. ও.। বারাকপুরে এস. ডি. ও-র কোয়ার্টারে দিন কয়েক পরেই সংগ্রহশালার পরিচালক সমিতির একটা মিটিং আছে। সেই মিটিংয়ে তোমার নাম প্রস্তাব করে তোমার চাকরির ব্যবস্থা করে দোব।

বারাকপুরে এস. ডি. ও. অর্থাৎ মহকুমা শাসকের কোয়ার্টারে ২৩.৪.৫৬ তারিখে ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার পরিচালক সমিতির যে মিটিং হয়, তাতে ১লা মে ১৯৫৬ থেকে এস. ডি. ও. রাঘবন্ আমাকে ঐ প্রতিষ্ঠানের কিউরেটর হিসাবে নিয়োগ করেন। এই চাকরির জন্য আমাকে কোথাও যেতেও হয়নি।

১৯৫৬র ১লা মে থেকে ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ হিসাবে কাজে যোগ দিই। (তখন পশ্চিম বঙ্গে ১লা মে ছুটির দিন বলে ধার্য হয়নি।) এখানে কাজে যোগ দিলাম বটে, কিন্তু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স তথা ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষ আমাকে ছাড়তে চাইলেন না। এঁরা বললেন—দিনের প্রথম দিকটায় অন্তত কিছুক্ষণ করে এখানে কাজ করে তারপর দুপুর নাগাদ কাঁটালপাড়ায় যাবেন।

ফণিদা ভারতবর্ষের সম্পাদক, 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার'ও সম্পাদক, তাঁরও ইচ্ছা অন্তত কিছুদিন আমি এইভাবে দুটো জায়গায় কাজ করি।

কিন্তু এতে আমার শরীরের উপর চাপ পড়তে লাগল। তবুও এই ভাবে ৮ মাস চালিয়ে ছিলাম। শেষে ১৯৫৬র ডিসেম্বর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের কাজে ইস্তফা দিই।

নৈহাটী ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় সেই যে ১৯৫৬র ১লা মে কাজে লেগেছি, সেই থেকে দীর্ঘ ৩৭ বছর হ'ল আজও এখানে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করে চলেছি। এখন আমি বৃদ্ধ, তবুও এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতি আমাকে ছাড়ছেন না। বলছেন—আপনি যতদিন আসতে পারবেন ততদিন কাজ করুন। সরকারেরও এতে আপত্তি নেই।

রানী রাসমণি

রানী রাসমণির পুত্রসন্তান না থাকায় তাঁর অন্যতম জামাতা মথুরা মোহন বিশ্বাস নিজ অংশেই শাশুড়ীর প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছিলেন। পরে এই মথুর বাবুর ঐ সম্পত্তির একটা বড় অংশের মালিক হয়েছিলেন বিজয় কৃষ্ণ হাজরা। বিজয়বাবুর বাড়ি ছিল হাওড়া জেলার আমতা থানায়। তিনি রাজনীতি করতেন এবং একজন বিশিষ্ট সমাজসেবীও ছিলেন।

আমিও হাওড়া জেলার আমতা থানার মানুষ। এই সূত্রে এবং সমাজসেবা প্রভৃতি অন্যান্য সূত্রেও বিজয়বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তিনি কলকাতায় জানবাজারে রানী রাসমণির বিরাট বাসভবনের একাংশে—তাঁর নিজের অংশে সপরিবারে বাস করতেন। বিজয়বাবুর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে মাঝে মাঝে জানবাজারে তাঁর বাড়িতে যেতাম, তিনিও কলকাতায় আমার বৌবাজারের বাড়িতে আসতেন।

বিজয়বাবুর মারফৎই রানীর অপর জামাতাদের বংশধরদের সঙ্গে, বিশেষ করে এঁদের মধ্যেকার গোপীনাথ দাসের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তখন গোপীবাবু দক্ষিণেশ্বর মন্দির পরিচালনার বা মন্দিরের কাজকর্ম ব্যাপারে সেবায়েতদের পক্ষ থেকে ছিলেন নির্বাচিত কর্মকর্তা।

এই সময় আমি রানী রাসমণির একটি জীবনী লিখলে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ সেই বইএর সমস্ত ব্যয় বহন করে বইটি প্রকাশ করে ছিলেন। পরে এই রানীর জীবনীর সঙ্গে আরও কিছু তথ্য যোগ করে রানীর জীবনী নিয়ে একটা সিনেমা করার কথাও আমি এঁদের বলি এবং এ নিয়ে হাওড়া জেলারই এক চিত্র পরিবেশক নারায়ণ পিকচার্সের সঙ্গে কথাও বলতে থাকি।

এই সময় রানীর দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ এসে যায়। তখন আমি গোপীবাবু, বিজয়বাবু এবং রানীর অন্যান্য বংশধরদের বলি—বেশ জাঁক করে রানীর মন্দির প্রতিষ্ঠার শত বার্ষিকী উৎসব পালন করা হোক্।

আমার এই প্রস্তাবে এঁরা সকলেই সম্মত হলেন, গোপীবাবু বললেন—এজন্য যত টাকা লাগে, আমি সমস্তই মন্দিরের ফান্ড থেকে দোব।

স্থির হ'ল—যেহেতু স্নানযাত্রার দিনে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেজন্য আগামী ১লা আষাঢ় বুধবার (১৩৬১ বঙ্গাব্দ) স্নানযাত্রায় দিন থেকে শুরু করে ৫ই আষাঢ় রবিবার পর্যন্ত ৫দিন ধরে মহা আড়ম্বরে এই মন্দির প্রাঙ্গনেই উৎসব হবে। প্রথম দিনের এবং শেষ দিনের সভায় বিখ্যাত ব্যক্তিরা এসে বক্তৃতা দেবেন, অপর তিন দিনের সভায় ধর্ম আলোচনা এবং ধর্মীয় সংগীত

পরিবেশিত হবে। এও স্থির হ'ল—মন্দির চত্বরের বাইরে একটা ছোট মন্দিরের মত করে তাতে রানী রাসমণির একটা মর্মর মূর্তিও স্থাপন করা হবে।

আর এই উপলক্ষে দেশের খ্যাতনামা লেখক লেখিকাদের রচনা নিয়ে একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশ করা হবে।

উৎসবের প্রথম দিনের এবং শেষ দিনের বক্তা ঠিক করা, স্মারক গ্রন্থের জন্য রচনা সংগ্রহ করে বই ছেপে প্রকাশ করা সমস্ত ভার পড়ল আমার উপর।

১লা আষাঢ় আসতে আর বেশি দেরি ছিল না। তাই আমার ঘোরাঘুরির জন্য এঁরা একটা মোটর আমাকে দিয়ে রাখলেন। হাতে অল্প সময় পেলেও যথা সময়ে সমস্তই ঠিক ঠিক সম্পন্ন করে দিয়ে ছিলাম।

উৎসবের প্রথম দিনের অর্থাৎ উদ্বোধন দিনের সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রী যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী প্রভৃতিও সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ঐ দিন মন্দিরে রানী রাসমণির যে মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয় তার আবরণ উম্মোচন করেছিলেন ডক্টর রমা চৌধুরী।

২রা আষাঢ়ের আনন্দ বাজার পত্রিকায় এঁদের সকলের বক্তৃতা ছাড়াও রানীর দক্ষিণেশ্বর মন্দির সম্বন্ধেও কয়েকটা কথা লেখা হয়েছিল। যেমন—

"১৮৪৭ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের জন্য ২০ একর জমি দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকায় ক্রয় করেন। ১২৬২ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার স্নান যাত্রার দিন ঐ মন্দির স্থাপিত হয়। দেবালয় নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। দেশ দেশান্তর হইতে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। প্রত্যেক পণ্ডিতকে গরদের ধুতি, একটি করিয়া মোহর এবং যাতায়াত খরচ দেওয়া হয়। বিপুল সংখ্যক দরিদ্র নারায়ণের মধ্যে ঐ দিবস অন্নবস্ত্র বিতরণ করা হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে ৫ লক্ষ টাকার সম্পত্তি কিনিয়া রাসমণি তাহা দেবোত্তর করিয়া দেন। উহা হইতেই মায়ের নিত্য সেবা চলে।'

'যুগান্তর' পত্রিকাও সকল বক্তার বক্তৃতা এবং সভার আরও খুঁটিনাটি কথাও প্রকাশ করেন। যুগান্তর সব শেষে লেখেন—'মন্দিরের সেবায়েতদের পক্ষ হইতে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় অতিথি অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জানান।'

১৩৬১ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় সাময়িকীতেও এই 'দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী' সংবাদ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ৫ই তারিখের সভা সম্বন্ধে সভার ছবি সহ লেখা হয়েছিল—

'৫ই তারিখের সভায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান

অতিথির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বাঙ্গলার বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের রচনা লইয়া দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর ট্রাষ্টের পক্ষ হইতে 'দক্ষিণেশ্বর মন্দির' (শত বার্ষিকী) নামে একটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকখানি সম্পাদনা করেন সাহিত্যিক শ্রী গোপালচন্দ্র রায়।'

এই বিরাট উৎসবাদির কাজ মিটে গেলে, এবার রানীর জীবনীচিত্র বা সিনেমার কাজের দিকে মন দিই। আমার লেখা রানী রাসমণির জীবনীর সঙ্গে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিলে যথাসময়ে ছবি হয়ে ১৯৫৫ সালের ১২ই জানুয়ারি ছবিটি মুক্তি লাভ করে। ছবিতে কাহিনীকার হিসাবে আমারই নাম থাকে। এই সিনেমা পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘকাল চলেছিল। এবং রাষ্ট্রপতির পুরস্কারও লাভ করেছিল।

এই সিনেমা থেকে প্রচুর অর্থ লাভ করায় প্রযোজক এই ছবি চলা কালেই, এক সিনেমা হলে সভার আয়োজন করে পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, কাহিনীকার প্রভৃতিকে একটি করে সোনার মেডেল উপহার দিয়েছিলেন। সেদিনের সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। সভায় রাজ্যপালের পত্নী বঙ্গবালা দেবী রঙীন সিল্কের ফিতায় বাঁধা মেডেলগুলি প্রাপকদের গলায় পরিয়ে দিয়ে ছিলেন। পরে এক সভায় বেঙ্গল মোশান পিকচার এওয়ার্ড কমিটিরও একটি মানপত্র পাই। তাতে সহি আছে—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অতুল্য ঘোষ ও সুধাংশু বক্সীর।

এই ছবির পরিচালক ছিলেন—কালীপ্রসাদ ঘোষ। রানী রাসমণির ছোট বেলার চরিত্রে অভিনয় করে বালিকা শিখারাণী বাগ, রানীর পিতা হরেকৃষ্ণ দাসের ভূমিকায় অভিনয় করেন—পাহাড়ী সান্যাল। রানী রাসমণির প্রথম জীবনে তাঁর স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অনুপকুমার। রানীর প্রথম জীবনের পর অর্থাৎ বেশী বয়সের ভূমিকায় অভিনয় করেন মলিনা দেবী, তখন তাঁর স্বামীর ভূমিকায় ছিলেন—ছবি বিশ্বাস। জামাতা মথুরের ভূমিকায় ছিলেন অসিতবরণ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

'রানী রাসমণি' ছবি তোলার সময় স্টুডিওতে এবং দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরেও উপস্থিত থেকেছি। মন্দিরে ছবির স্যুটিং-এর সময় আমাকে এখানে উপস্থিত থাকতেই হ'ত। এক দিনের কথা মনে আছে—দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে রানীর ভূমিকায় মলিনা দেবীকে নিয়ে ছবি তোলা হচ্ছে। ছবি তোলা শেষ হলে, মলিনা দেবী আমাকে অনুরোধ করলেন—দাদা, মা কালীর একেবারে সামনে বসে মা-কে একবার আমি প্রণাম জানাব। আপনি পুরোহিতকে বলে এর ব্যবস্থা করে দিন।

মলিনা দেবীর এই কথায় আমি কালী মন্দিরের পুরোহিতকে বলে কালীর

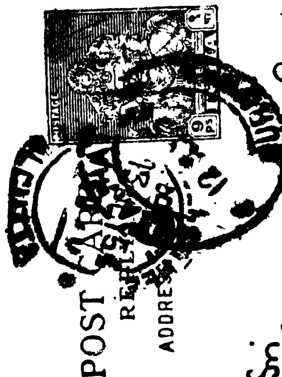
শ্রীহরি কোগ্রাম
সর্ব্ব: ২৬।৩।৬১

প্রিয়বরেষু ।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির শত বার্ষিকী পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। সম্পাদনা সুন্দর হইয়াছে। বইখানি সুন্দর, সুপাঠ্য ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। রানী রাসমণির মত পুণ্যবতী তেজস্বিনী মহিলার আবির্ভাবই নতুন [illegible] করিতেছে।

আশা করি আপনার সব কুশল। ইতি

স্নেহের
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক



Sri Gopal Chandra Roy, M.A.
Bharatbarsha Office
203/1/1 Cornwallis Street
Calcutta 6

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থের অন্যতম লেখক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের চিঠি

সম্মুখে মলিনা দেবীর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিই। তখন তিনি কালীর সামনে বসে তাঁর প্রার্থনা জানিয়ে কালীকে প্রণাম করে আসেন।

রানী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের নিকটেই রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের একটি আন্তর্জাতিক অতিথি ভবন আছে। এই অতিথি ভবনের সঙ্গে বা রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের সঙ্গে রানীর বংশধরদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের অতিথি ভবনে যাঁরাই আসেন, তাঁরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-পীঠ রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির দেখতে আসেনই।

১৯৫৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের এক সভায় মহা-মণ্ডলের উদ্যোক্তারা রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে নিয়ে আসবেন বলে স্থির করলেন। এই সংবাদ পেয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সেবায়েতদের পক্ষের সেক্রেটারি গোপীনাথ দাস আমার বাড়িতে এসে আমাকে বলেন—কাল বিকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসুন। কাল বিকালে পাশেই মহামণ্ডলের সভায় রাষ্ট্রপতি আসছেন। সেখান থেকে তিনি আমাদের মন্দিরে আসবেনই।

পরদিন বিকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে গেলাম। রাষ্ট্রপতি মহামণ্ডলে তাঁর সভা শেষ করে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এলেন। গোপীবাবু এবং আমি রাষ্ট্রপতিকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে কালী মন্দির, বিষ্ণু মন্দির, শিবমন্দির ইত্যাদি দেখালাম। শেষে আমি রাষ্ট্রপতিকে শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘরে নিয়ে এলাম। ঘরে ঢোকার আগে রাষ্ট্রপতিকে জুতো খুলে ঢুকতে বলায় তিনি তাই করলেন।

ঘরে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের ফটো বা প্রতিমূর্তিতে যাতে রাষ্ট্রপতি মালা দেন সেজন্য আগেই পাশের একটা ফুলের দোকান থেকে একটা বড় ফুলের মালা কিনিয়ে এনে রেখে ছিলাম। রাষ্ট্রপতির হাতে ফুলের মালাটা দিলে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ফটোয় মালা দিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন।

মন্দিরের পুরোহিত, রানীর একজন বংশধর এবং আমি পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মালা দেওয়া হলে আমরা সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাসকক্ষের বাইরে এলাম। এই সময় আমি আমার লেখা—ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান, মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান, মহামানব (গান্ধীজীর জীবনী), শহীদ (বাঙালী শহীদদের কাহিনী) প্রভৃতি কয়েকটা বই রাষ্ট্রপতিকে উপহার দিই।

জানতাম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ভালই বাংলা জানেন। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। কলকাতায় হিন্দু হোস্টেল বাঙ্গালী ছাত্রদের সঙ্গে থাকতেন। একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের এক বিরাট সভায় এই রাষ্ট্র-পতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে বাংলায় বক্তৃতা দিতেও দেখেছিলাম।

মহাত্মা গান্ধী

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিল বোম্বাই অধিবেশনে ব্রিটিশ মন্ত্রী মিশনের গণপরিষদ ও অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, এই উভয় প্রকার প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে প্রতিবাদ জানাবার জন্য ১৬ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস ঘোষণা করে। শান্তিপূর্ণভাবে এই বিক্ষোভ দিবস পালিত হবে, লীগ নেতাদের এরূপ আশ্বাস দান সত্ত্বেও 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবসে বহু লীগ সমর্থক ভারতের প্রায় সর্বত্রই একটা ভীষণ হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। ফলে দেশ জুড়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঘোরতর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। ১৬ই আগস্ট থেকে ২০শে আগস্ট মাত্র এই ক'দিনেই শুধু কলকাতার দাঙ্গায় পাঁচ হাজার লোক নিহত ও দশ হাজার লোক আহত হয় এবং লোকের প্রায় দশ কোটী টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। এই সময় কলকাতায় ছিলাম। তাই ঐ ভয়াবহ দৃশ্য কিছু দেখতে হয়েছে। ১৬ই আগস্টের পর অনেক দিন পর্যন্তও এই দাঙ্গার জের মিটল না। দেশের সর্বত্রই এই সংগ্রাম ছোট বড় আকারে এক প্রকার লেগেই রইল। ১০ই অক্টোবর থেকে সপ্তাহাধিক কাল ধরে লীগ শাসিত বাঙ্গলার নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় এই সংগ্রাম যে নৃশংস আকার ধারণ করল, তার কাছে কলকাতা ও অন্যান্য স্থানের হত্যাকাণ্ডও যেন ম্লান হয়ে গেল।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার এই নিদারুণ সংবাদে মহাত্মা গান্ধী তীব্র বেদনা অনুভব করলেন। তিনি তখন ছিলেন দিল্লীতে। তিনি বাঙ্গলার এই দুর্গত অঞ্চলে আসবার জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

২৮শে অক্টোবর প্রাতে মহাত্মা গান্ধী নয়াদিল্লী থেকে বাংলার উদ্দেশে রওনা হলেন। পরদিন অপরাহ্নে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে এসে পৌছলেন। এখানে কয়েকদিন থেকে তিনি বাংলার গবর্ণর ও প্রধান মন্ত্রী (তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধান মন্ত্রী বলা হ'ত) মিঃ সুরাবর্দির সঙ্গে কলকাতার ও পূর্ব বঙ্গের হাঙ্গামা নিয়ে আলোচনা করলেন। তারপর ৬ই নভেম্বর প্রাতে একটা স্পেশাল ট্রেনে সদলে নোয়াখালি অভিমুখে যাত্রা করলেন।

গান্ধীজী এই সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠানে থাকার সময় একদিন তাঁকে দেখবার জন্যই সোদপুরে তাঁর বিকালের প্রার্থনা সভায় গিয়েছিলাম। সেদিন সভায় বোধ করি হাজার পঁচিশ-এর মত মানুষের সমাবেশ হয়েছিল। দূরে থেকে গান্ধীজীকে সেই প্রথম দেখলাম।

গান্ধীজী নোয়াখালি গিয়ে দিনের পর দিন দুর্গতদের মধ্যে মিশে তাঁদের অভয় দিতে লাগলেন এবং এই উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে যেতে আরম্ভ করলেন। মুসলমানদের সঙ্গেও দেখা করে স্থানীয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

আমি এই সময় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ভারতের সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে প্রবন্ধ লিখছিলাম। ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণিদা একদিন আমাকে বললেন—নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান নিয়ে তুমি 'ভারতবর্ষে' আর একটা করে পৃথক প্রবন্ধ লিখতে থাক।

প্রতি মাসে একই নামে একজনের দুটো করে প্রবন্ধ ছাপা হলে, ভাল দেখাবে না বলে, আমি আমার গোপাল রায় এই নামের দুটো শব্দের আদ্যক্ষর নিয়ে 'গোরা' ছদ্মনামে ঐ প্রবন্ধ লিখতে লাগলাম।

তখন পৃথিবীর বহু দেশেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল ঐ নোয়াখালিতে। ইউরোপের অনেক দেশের সাংবাদিকও নোয়াখালি গিয়েছিলেন গান্ধীজীর শান্তি অভিযান দেখতে।

গান্ধীজীর এই শান্তি অভিযান লিখতে লিখতে আমারও বড় আগ্রহ হ'ল, ঐ শান্তি অভিযান প্রত্যক্ষ করার। কিন্তু যাই কি করে?

এমন সময় একদিন শুনলাম, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য নোয়াখালি ঘুরে এসেছেন। গেলাম তাঁর কাছে, কিভাবে যাওয়া যায় জানতে। তিনি বললেন—যাওয়া অসম্ভব। আমি শরৎ বসুর সঙ্গে গিয়েছিলাম বলেই যেতে পেরেছিলাম। শরৎ বসু নোয়াখালি যাব বলায় সুরাবর্দি সাহেব তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা অর্থাৎ জীপ ও সশস্ত্র প্রহরার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেখানে চারিদিকে কেবল মুসলমান আর মুসলমান, হিন্দুর নাম গন্ধ নেই, যা আছে সব আশ্রয় শিবিরে। গান্ধীজীর এবং তাঁর কর্মীদের চেষ্টায় কিছু কিছু হিন্দু অবশ্য এখন নিজ নিজ বাস্তু ভিটায় ফিরে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু সে প্রায় কিছুই নয়।

চপলাবাবুর এই কথা শুনে আমার আগ্রহ অনেকটা দমে গেল। কিন্তু তবুও ভাবতে থাকি, কি করে যাব!

ঠিক এই সময়টায় হঠাৎ একদিন খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রম থেকে আমার ডাক পড়ল। ভারতবর্ষ পত্রিকা খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে নিয়মিত যায়, আশ্রমবাসীরা এই কাগজ পড়েনও। এই প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বিশ্বনাথ নাথ 'ভারতবর্ষে' নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান পড়ে খোঁজ করে আমার সমস্ত পরিচয় জেনে নিয়েছিলেন।

আমি সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করলে, তিনি আমাকে বললেন—গোপালবাবু আপনার লেখা পড়ছি, আপনি দয়া করে একবার নোয়াখালি যান, গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখে আসুন।

বললাম—আমি তো যাবার জন্য পাগল।

বিশ্বনাথবাবু বললেন—তাহলে এক কাজ করুন—কালই আমাদের খাদি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ট্রাস্টি জিতেন্দ্র মোহন দত্ত রেডিও ইত্যাদি নিয়ে নোয়াখালি যাচ্ছেন। আপনি আজই আমাদের কলকাতার অফিসে সন্ধ্যার সময় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। তিনি প্রতিদিন ঐ সময় ওখানে আসেন।

সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে ফিরে ঐ দিন সন্ধ্যার সময় ওঁদের কলকাতার অফিসে গিয়ে জিতেনবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি সব শুনে বললেন—কাল সকালে চিটাগং মেলে আমি নোয়াখালি রওনা হচ্ছি। আপনিও চলুন। ভালই হবে।

পরদিন সকালে জিতেনবাবু ও আমি শিয়ালদহ থেকে চিটাগং মেলে নোয়াখালি অভিমুখে যাত্রা করলাম। দুপুরে গোয়ালন্দে গিয়ে পেঁছিলাম। তারপর সেখান থেকে স্টীমারে চাঁদপুর। রাত্রি ৮টা নাগাদ চাঁদপুরে গিয়ে পেঁছিলাম। সেখান থেকে ট্রেনে লাকসাম জংশন স্টেশন। আবার সেখান থেকে লাকসাম-নোয়াখালি লাইনে সোনাইমুড়ি-তে গিয়ে ভোরে নামলাম। ওখান থেকে ট্যাক্সিতে করে কাজিরখিল। গান্ধীজীর নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় শান্তি অভিযানে এই কাজিরখিল ছিল হেড্ কোয়ার্টার। কাজিরখিলের যে বাড়িতে গান্ধীজীর ক্যাম্প ছিল, দাঙ্গার সময় সেই বাড়ির অনেককেই মুসলমানরা হত্যা করেছিল।

আমরা যখন যাই তখন ঐ ক্যাম্পে খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, গান্ধীবাদী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জিতেনবাবু আমার সঙ্গে সতীশবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি বললেন—আপনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মানুষ এসেছেন, খুবই ভাল হয়েছে। আপনি আমাদের দলে এখানে কিছুদিন থাকুন। থেকে সব দেখুন এবং লিখুন।

এরপর তিনি আমাদের একটু বিশ্রাম করে স্নান আহার করতে বললেন।

আমরা স্নান করে, আহারে বসলাম। সতীশবাবুও আমাদের সঙ্গে খেতে বসলেন। খাবার সময় আমি সতীশবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম-এই যে নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় এত ক্যাম্প ও এত লোক, এদের খাওয়া ইত্যাদির টাকা আসছে কোথা থেকে? সতীশবাবু বললেন—খাদি প্রতিষ্ঠানই প্রথম কদিন এখানে গান্ধীজী ও তাঁর দলবলের ব্যয় বহন করেছিল। ঐ সময় গান্ধীজী একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই সব খরচ হচ্ছে কোথা থেকে? আমি বললাম, খাদি প্রতিষ্ঠানই চালাচ্ছে।

শুনে তিনি বললেন—তাহলে তো খাদি প্রতিষ্ঠান ফেল হয়ে যাবে, তা হতে দোব না। আমিই টাকা দোব। এই বলে তিনিই এখন এই খাওয়া ইত্যাদির সব খরচই দিচ্ছেন। বিড়লা প্রভৃতি এঁরাই গান্ধীজীকে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

খাওয়া দাওয়ার পর সতীশবাবু আমাকে বললেন—চলুন এবার জীপে করে গান্ধীজীর কাছে যাই। তিনি এখন ত্রিপুরার হাইমচরে। আপনি সেখানেই থাকবেন।

সতীশবাবু, জিতেনবাবু এবং আমি তিনজনে হাইমচরে এলাম বিকালের দিকে। বিকালে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা। আমরা এই সভায় যোগ দিতে পারলাম। দেখলাম প্রার্থনা সভায় হিন্দুরা ছাড়া মুসলমানরাও এসেছেন।

হাইমচরে ছিল একটা হিন্দু প্রধান মস্ত বড় বাজার। হাঙ্গামার সময় মুসলমানরা এই বাজারটা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। এই পোড়া বাজারের পাশেই একটা ছোট্ট কুটিরে গান্ধীজী তখন ছিলেন। হাইমচরে গৃহহীন ও দুর্গতদের সেবা কাজের ভার ছিল গান্ধীবাদী ঠক্কর বাপার উপর। তিনি কয়েকজন কর্মীসহ এখানেই পৃথক একটি ক্যাম্পে থাকতেন। আমি এখানে এসে রইলাম সাংবাদিকদের ক্যাম্পে। সতীশবাবু ও জিতেনবাবুর সঙ্গে কাজিরখিলে আর ফিরে গেলাম না।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় গান্ধীজীর শান্তি অভিযানে থাকার সময় একদিন মাত্র সকালে গান্ধীজীর সঙ্গে আমার দু একটা কথা হয়েছিল।

সেদিন ভোরে গান্ধীজীর অন্তরঙ্গ বা নিকট বাসীদের নিয়ে তাঁর ভোরের প্রার্থনা সভা সেই সবে শেষ হয়েছে। নিকটেই সাংবাদিক শিবিরে শুয়ে শুয়ে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার প্রার্থনা শুনছিলাম। প্রার্থনা শেষ হলে, আমি শয্যা ছেড়ে গান্ধীজীর কুটিরের কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি, সেখানে উঠানের মাঝখানে যে একটা বিরাট গাছ ছিল সেই গাছের তলায় গান্ধীজী একা দাঁড়িয়ে আছেন। সকাল হতে দেরি, শীত শেষের কুয়াশায় চারিদিক ঝাপসা হয়ে আছে! কুয়াশা গাছের পাতা বেয়ে শিশিরের মত ঝরছে। গান্ধীজীর আশে পাশে তখন কেউ নেই। তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরোবেন বলে সঙ্গীসাথীদের জন্য অপেক্ষা করছেন বলে মনে হ'ল।

আমি সামনে গিয়ে হাত জোড় করে গান্ধীজীকে নমস্কার করলাম। তিনিও আমার মতই হাত জোড় করে আমাকে প্রতি-নমস্কার করলেন।

আমি সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি-ই বা তাঁকে জিজ্ঞাসা করার থাকতে পারে! তাঁর কথা তো তাঁর বিকালের প্রার্থনা সভাতেই শুনছি।

এমনি ভাবে দু এক মিনিট বোধহয় কেটে গেলে গান্ধীজী আমাকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন—বিষেণ কোথায়?

বিষেণ (সম্ভবত আমাদের বাংলায় বিষ্ণু) ছিলেন গান্ধীজীর ওয়ার্ধা আশ্রমের একজন কর্মী।

আমি উত্তরে গান্ধীজীকে বললাম—তাতো জানি না। আচ্ছা খুঁজে দেখছি, কোথায় আছেন।—আমি এই কথাগুলো গান্ধীজীকে বলেছিলাম ইংরাজিতে। হিন্দিতে বলতে গিয়ে ভুল হবে ভেবে।

গান্ধীজীর থাকার ঘরটা ছিল একটা মাটির এক কুটরি ঘর। এর সামনে তাঁবুর কয়েকটা কুটরিতে তাঁর সঙ্গীসাথীরা থাকতেন। এরই একটাতে থাকতেন গান্ধীজীর সেক্রেটারি নির্মল বসু। মাঝখানে ছিল গাছে ঢাকা এই মাঝারি ধরণের উঠানটা। আমি কুটরিগুলোর একটায় গিয়ে বিষেণবাবুর খোঁজ করলাম। গিয়ে শুনলাম, তিনি স্নান করতে গেছেন।

উঠানে ফিরে গান্ধীজীকে এই খবরটা দিতে এসে দেখি, ইতিমধ্যেই তাঁর দলের ঠক্কর বাপা, মনু গান্ধী, সুশীলা পাই প্রভৃতি এসে গেছেন এবং তিনি প্রাতঃভ্রমণে বেরোবার উদ্যোগ করছেন। আমি এসে আবার ঐ ইংরাজিতেই বললাম—বিষেণবাবু স্নান করতে গেছেন।

গান্ধীজী বললেন—ঠিক আছে।

এঁদের সঙ্গে সেদিন আমিও অমনি চললাম। দেখতে দেখতে আরও কয়েকজন এসে আমাদের সঙ্গী হলেন। পথে যাবার সময় দেখলাম, সেই প্রায় ভোরেই তাঁর এই যাত্রা পথের দুপাশে অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা কেউ তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করল, কেউ বা তাঁর চলার পথের পাশে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম জানাল।

গান্ধীজী হাত তুলে এদের প্রতি-নমস্কার করতে করতে চললেন। খানিকটা পথ গিয়ে গান্ধীজী কুটিরের দিকে ফিরলেন। ফেরার সময়ও তেমনি পথের দুপাশে নারীপুরুষের ভীড়। আর তেমনি নীরবে নমস্কার ও প্রণাম জ্ঞাপন। গান্ধীজী আগের মতই হাত জোড় করে প্রতি-নমস্কার জানাতে জানাতে কুটিরে এলেন। আমি গেলাম, নিকটেই আমার আস্তানা সাংবাদিক শিবিরে।

এই যে ভোরে বা অত সকালে গান্ধীজীর পথের দুপাশে যাদের দেখতাম, তারা প্রায় সকলেই হিন্দু। ওখানকার সেদিনের দুর্গত হিন্দুরা গান্ধীজীকে তাঁদের ত্রাণকর্তা হিসাবেই ভেবেছিলেন। গান্ধীজীর উপদেশে তাঁদের মধ্যে অনেকে তখন আশ্রয় প্রার্থী শিবির ত্যাগ করে নিজ নিজ ঘরে ফিরে এসে-ছিলেন। ঘর অবশ্য অনেকেরই আর ছিল না, কেন না, হাঙ্গামার সময় সে সব হয় অগ্নি দগ্ধ হয়েছিল, না হয় জানালা, দরজা, কাঠকুটো লুঠ হওয়ায় কিছুই ছিল না। অবশ্য গান্ধীজীর নির্দেশে বাঙ্গলার সুরাবর্দি সরকার এঁদের ঘর তৈরির জন্য আর্থিক সাহায্যও দিচ্ছিলেন।

গান্ধীজী এই হাইমচরে থাকার সময়েই একদিন কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি কুমারী মৃদুলা সরাভাই, জওহর লাল নেহরুর এক চিঠি নিয়ে হাইমচরে এলেন। নেহরু তখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট এবং অন্তবর্তী কালীন গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রীও। কুমারী সরাভাই দিল্লী থেকে বিমানে নোয়াখালির কোন একটা জায়গায় নেমে সেখান থেকে ট্যাক্সিতে করে এসেছিলেন। এইখানে যেমন মৃদুলা সরাভাইএর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তেমনি আলাপ

হয়েছিল শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর সঙ্গেও। ঠক্কর বাপার মত তিনিও ত্রিপুরার এক জায়গায় হিন্দুদের পুনর্বাসনের ভার নিয়ে কাজ করছিলেন।

গান্ধীজী যখন নোয়াখালিতে তখন বিহারের হিন্দুরা নোয়াখালির প্রতিশোধ নেবার জন্য বিহারের মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করলে, বিহারের উন্নয়ন সচিব ডাঃ মামুদ তাঁর সেক্রেটারির হাতে এক পত্র দিয়ে গান্ধীজীকে একবার বিহারে আসার জন্য আমন্ত্রণ করে পাঠালেন।

১লা মার্চ তারিখে গান্ধীজী তাঁর বৈকালিক প্রার্থনা সভায় বললেন—আগামী কাল আমি এখান থেকে বিহারে যাচ্ছি। আমি বিহার গেলেও শীঘ্রই বিহার থেকে ফিরে আসব। তখন এসে আবার এখানে নতুন করে গ্রাম পরিক্রমায় বেরোব। আমি যে সব গ্রামে যাবার কথা দিয়েছি, এসে সেই সব গ্রামে যাবার চেষ্টা করবো।

পরদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর গান্ধীজী সদলবলে হাইমচর ত্যাগ করে বিহারের উদ্দেশে চললেন। বাংলা সরকার তাঁর এই সদলে আসার জন্য চারখানা জীপ দিয়েছিলেন। দুখানা জীপে সশস্ত্র বাহিনী ছিল। আর দুটোর মধ্যে একটাতে ছিলেন গান্ধীজী ও তাঁর নাতনী মনু গান্ধী। অপরটাতে ছিলাম—নির্মল বসু, জিতেন্দ্র মোহন দত্ত, আমি এবং আরও দু একজন। সশস্ত্র পুলিশের জীপ দুটো আমাদের জীপ দুটোর একটা আগে এবং একটা পরে ছিল। এইখানে একটা কথা বলা দরকার যে, গান্ধীজী পূর্ববঙ্গে শান্তি অভিযানের সময় বার বার বাংলা সরকারকে বলেছিলেন, তাঁর রক্ষার জন্য কোন পুলিশ পাহারা দিতে হবে না। কিন্তু তবুও বাংলায় তখনকার সুরাবর্দি সরকার গান্ধীজীর নিরাপত্তার জন্য জন আষ্টেক সশস্ত্র পুলিশ দিয়েছিলেন। এঁরা সব সময়েই গান্ধীজীর প্রায় কাছে কাছেই থাকতেন। গান্ধীজীর ক্যাম্পের অদূরেই এঁদের ক্যাম্প হ'ত।

পথে আসবার সময় দেখলাম—গান্ধীজী চলে যাচ্ছেন দেখে হিন্দুদের চোখে মুখে কী হতাশার ভাব। তারা তবুও গান্ধীজীর জয়ধ্বনি দিতে লাগল এবং হাত তুলে তাঁর উদ্দেশে নমস্কার জানাতে লাগল। আমাদের জীপ এদের ফেলে হু হু বেগে ছুটে চলেছে। এই ভাবে কিছুক্ষণ আসার পর চারটা জীপই এসে থামল ডাকাতিয়া নদীর তীরে। নদীর অপর পারে আমাদের পেঁছে দেবার জন্য একটি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও খুব সাজানো নৌকা রাখা হয়েছিল। শুনলাম এই নৌকাটা বিড়লাদের। এখানে নিকটেই কোথায় বিড়লাদের ব্যবসায়ের কারখানা, সেখান থেকেই নৌকাটা এসেছে!

পুলিশদের রেখে গান্ধীজীসহ আমরা সকলে নৌকায় উঠে অপর পারে এলাম। পুলিশরা এল পরের বারে। এরপর অন্য একটা নৌকায় করে জীপগুলো পার করানো হ'ল।

এরপর আবার আগে পুলিশের গাড়ী, তারপর গান্ধীজীর গাড়ী, তারপর আমাদের গাড়ী এবং শেষে পুলিশের গাড়ী এইভাবে রওনা হলাম। চাঁদপুরে এসে সেখানকার বিখ্যাত দেশকর্মী স্বর্গীয় হরদয়াল নাগের বাড়িতে গান্ধীজী সহ আমরা সকলেই উঠলাম।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় গান্ধীজীর সঙ্গে ভ্রমণরত সাংবাদিকরা আমাদের আসার পরে ঐ জীপে করেই এখানে আসেন।

হরদয়াল নাগের বাড়ির সামনে তখন হাজার হাজার লোকের ভীড় এবং তাঁদের কণ্ঠে 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' বলে গান্ধীজীর জয়ধ্বনি। স্বেচ্ছা-সেবকদের সহায়তায় আমরা কোন রকমে পথ করে সকলে বাড়ির ভিতরে এলাম। বাইরে হাজার হাজার লোক একবার গান্ধীজীর দর্শন প্রার্থনা করছিল। কিছুপরে গান্ধীজী দুতলার বারান্দায় এসে সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের দর্শন দিলেন।

গান্ধীজী দর্শন দিয়ে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা বাড়ির একটা কামরায় চলে গেলেন। পরে নির্মল বসু এবং মনু গান্ধীও সেখানে গেলেন।

জিতেনবাবু পূর্ববঙ্গের লোক এবং গৃহস্বামীর পরিচিত। তাই গৃহস্বামী এক সময় জিতেনবাবুকে ও আমাকে আলাদা জলযোগ করালেন।

এরপর জিতেনবাবু ও আমি চাঁদপুরে মেঘনার সুবিস্তৃত চরে যেখানে গান্ধীজীর বৈকালিক প্রার্থনা সভার আয়োজন হয়েছিল, সেখানে গেলাম। চরে প্রার্থনা সভায় ২৫/৩০ জন লোক বসার মত একটা সুন্দর মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। সভাস্থলে তখনই হাজার হাজার লোক তো এসেই ছিল, দেখা গেল মেঘনায় নৌকা বেয়ে আরও কত মানুষ আসছে।

গান্ধীজী সভায় আসার একটু আগে আমরা দুজনে মঞ্চের উপর উঠে এক পাশে গিয়ে বসলাম। সেখানে তখন স্থানীয় আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে বসেছিলেন। এই মঞ্চেই আলাদাভাবে পৃথক করে গান্ধীজীর বসার জন্য স্থান করা হয়েছিল। গান্ধীজী সভায় এসে গেলেন। সভায় রামধুনের পর তিনি বক্তৃতা দিলেন।—প্রার্থনা সভায় তিনি প্রথমেই স্বর্গীয় হরদয়াল নাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। তারপর বললেন—বাংলার মুসলমান নেতারা আমাকে এতদিন ধরে বিহারে যাবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল, আমি পূর্ববাঙ্গলায় বসেই বিহারের উপর আমার প্রভাব বিস্তার করতে পারব। তাই তাঁদের আবেদনে এতদিন কান দিই নি। সম্প্রতি বিহারের উন্নয়ন সচিব ডাঃ মামুদের নিকট থেকে এক পত্র পেয়ে জানতে পারলাম যে, আমি যেমনটি চেয়েছিলাম, ঠিক সেরূপ হয় নি। তাই সেখানে একবার যাওয়া মনস্থ করেছি। আমি শীঘ্রই ফিরে আসব। এখানকার হিন্দু-মুসলমান ভাইরা সম্প্রীতিতে বাস করবেন, এই কামনা করছি।

সভা যখন শেষ হ'ল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সভাশেষে গান্ধীজী সদলে

হরদয়াল নাগের বাড়িতে গেলেন। সেখানে তিনি রাত্রির আহার সমাধা করলেন। একটা হলে মনু গান্ধী সমেত আমরা প্রায় পনের জন খেতে বসলাম। রুটি, বেগুনভাজা এবং অন্য কি একটা তরকারি।

খাওয়া শেষ হওয়ার পরেই দেখলাম, গান্ধীজী ও তাঁর সঙ্গীরা যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন, পরে স্টীমার ঘাটের দিকে তাঁরা রওনা হলেন।

একটা স্পেশাল স্টীমার গান্ধীজী ও তাঁর সঙ্গীদের চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দ নিয়ে যাবে ঠিক হয়েছিল। এঁরা রাত্রে স্টীমারে গিয়ে রইলেন।

জিতেনবাবু ও আমি রাত্রে হরদয়াল নাগের বাড়িতে রইলাম। সকালে জিতেনবাবু কাজিরখিলে সতীশ দাসগুপ্তর কাছে ফিরে গেলেন, আমাকেও যেতে বললেন। কিন্তু আমি আর না গিয়ে কলকাতায় ফিরলাম।

গোয়ালন্দ থেকে যে ট্রেনে বাড়ি আসি, সেই ট্রেনে সদলে গান্ধীজীও ছিলেন। ট্রেনে ফেরার সময়ও দেখেছি গান্ধীজীকে দেখবার জন্য স্টেশনে স্টেশনে লোকের কী ভীড়। এরা কিভাবে জেনেছিল, গান্ধীজী ঐ ট্রেনে আসছেন। গান্ধীজী ট্রেনের কোন্ কামরায় আছেন তা কেউ জানে না। তাছাড়া গাড়ী তো চিটাগং মেল! অনেক স্টেশনে থামছেও না। ঝড়ের বেগে গাড়ী স্টেশনে আসছে আর সেই বেগেই স্টেশন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তবুও তাদের সান্ত্বনা এই ছিল যে, গান্ধীজীকে নাই দেখি, যে গাড়ীতে তিনি গেলেন, সেই গাড়ীটা তো দেখলাম।

এরপর গান্ধীজী কলকাতায় এসে একদিন থেকে সোজা বিহারে চলে গেলেন। তারপর তিনি বিহার থেকে আবার দিল্লীতে গিয়ে সেখানকার হিন্দু-মুসলমানের হাঙ্গামা থামাতে শান্তি অভিযানে বেরোলেন।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে বড়লাট ও কংগ্রেস নেতাদের উপদেশ দেবার জন্যও তাঁকে তখন দিল্লীতে থাকতে হয়েছিল।

গান্ধীজী যখন দিল্লীতে তখন কলকাতায় আবার এপ্রিল (১৯৪৭) মাসে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দেয়। এই সময় বাংলার একটি প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লীতে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে কলকাতার হাঙ্গামার কথা তাঁকে জানালে, তিনি নয়াদিল্লীর কাজ শেষ করে ৯ই মে একেবারে সিধা কলকাতায় চলে এলেন। খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত গান্ধীজীর নির্দেশ অনুযায়ী তখন পূর্ব বাংলার উপদ্রুত অঞ্চলে সেবাকাজ চালিয়ে যেতে থাকায়, গান্ধীজী খাদি প্রতিষ্ঠানে এসে সতীশবাবুর ভাই ক্ষিতীশবাবুর আতিথ্য গ্রহণ করলেন।

মহাত্মা গান্ধী এবার কলকাতায় এসে ছ দিন ছিলেন। ঐ সময় আমি আমাদের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অফিসের কাজ সেরে বিকালে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে যেতাম। সেখানে রাত্রে থাকতাম। তখন সোদপুরে সারা বাংলা দেশের বিশিষ্ট বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী ও সমাজসেবীরা নিজ নিজ

বিছানাপত্র সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। খাদি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বিশ্বনাথবাবু আমার খাট, বিছানা ও মশারির ব্যবস্থা করে দিতেন। খাদি প্রতিষ্ঠানের বিরাট মাঠে ছোট ছোট তাঁবুর মত অসংখ্য বিছানা পড়ত। (সে খাদি প্রতিষ্ঠান আজ আর নেই।)

এখানে এসে বিকালে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যোগ দিতাম। রাত্রে খাদি প্রতিষ্ঠানের লঙ্গরখানায় খেতাম, ভোরে উঠে গান্ধীজীর সঙ্গীজনদের নিয়ে যে প্রার্থনা সভা হ'ত, তাতে যেতাম এবং পরে সকালে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পুত্র আমার পরিচিত বিমলানন্দ শাসমলের মোটরে করে কলকাতায় চলে আসতাম। বিমলানন্দবাবু নিজেই আমাকে ডাকতেন এবং নিজেই তাঁর গাড়ি চালিয়ে আসতেন।

এই সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দি কলকাতায় না থাকায় বাংলা সরকারের অর্থসচিব জনাব মহম্মদ আলিকে সঙ্গে নিয়ে গান্ধীজী কলকাতার দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করলেন। এখানে তাঁর এই উপস্থিতিতে হাঙ্গামার অবস্থা শান্ত হয়ে এলে, তিনি মাত্র ৬ দিন থেকেই বিহারে তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করবার জন্য বিহারে গেলেন।

কলকাতায় হাঙ্গামার জন্য গান্ধীজী খুবই বিচলিত ছিলেন। তাই স্বাধীনতা লাভের কয়েকদিন আগে তিনি আবার কলকাতায় এলেন। এসে উপদ্রুত অঞ্চলগুলি দেখলেন। গান্ধীজী এসে সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমেই ছিলেন।

১৩ই আগষ্ট রাত্রিতে তিনি সোদপুর ত্যাগ করে কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলের এক মুসলমানের খালি বাড়িতে এসে বাস করতে আরম্ভ করলেন। গান্ধীজীর আহ্বানে বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেবও এসে গান্ধীজীর সঙ্গে একই কামরায় বাস করতে লাগলেন। দুজনে একসঙ্গে দুর্গত হিন্দু-মুসলমানের দুঃখের কাহিনী শুনলেন।

এই সময়ও কলকাতার বিভিন্ন স্থানে, এমনকি কলকাতার আশে পাশেও গান্ধীজীর বৈকালিক প্রার্থনা সভা হতে লাগল। প্রতিদিনই প্রার্থনা সভায় অগণিত মানুষ জমায়েত হ'ত।

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে গান্ধীজী কলকাতায় রইলেন। এই সময় পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিলে তিনি সেখানে শান্তি আনার জন্য ৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতা ত্যাগ করে ৯ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে গিয়ে পৌঁছলেন। পরে সেখানেই তিনি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রতিবাদ

ইংরাজ আমলে ভারতের অনেকগুলি প্রদেশ ঠিক ভাষা-ভিত্তিক হিসাবে গঠিত ছিল না। তাই স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পরেই ঐ সব প্রদেশে সংলগ্ন অঞ্চলের একই ভাষাভাষীর লোকদের নিয়ে প্রদেশ বা রাজ্য পুনর্গঠনের দাবী ওঠে। পশ্চিম বঙ্গ থেকে দাবী উঠল—পশ্চিম বঙ্গের লাগোয়া বিহারের যে অঞ্চলগুলি বাঙালী প্রধান সেগুলি পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পশ্চিম বঙ্গের দাবী ছিল—১. সমগ্র মানভূম জেলা ২. সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমা, ৩. সাঁওতাল পরগনার সমস্ত বঙ্গ-ভাষী অঞ্চল, ৪. পূর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ মহকুমার সমগ্র অংশ—বিহার থেকে পাওয়া প্রয়োজন।

বিহার পশ্চিম বঙ্গের এই দাবী মানতে রাজী হ'ল না, তবে সামান্য কিছু দিতে চাইল। এই সময় বহু বিহারী বিহারের বাঙালী প্রধান অঞ্চলে জোর করে হিন্দি প্রচার শুরু করল।

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী সভার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অতুল্য ঘোষ পশ্চিম বঙ্গের এই দাবী নিয়ে দিল্লীতে সীমানা নির্ধারণ কমিটির কাছে পেশ করলেন।

তখন রাজ্য সীমানা নির্ধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহরু, কেন্দ্রীয় সরকারের অপর দুই মন্ত্রী মোলানা আবুল কালাম আজাদ ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ইউ. এন. ডেবর—এই চারজনকে নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটি পশ্চিম বঙ্গের দাবীর এবং বিহারের ফেরৎ দেওয়ার মনোভাবের মধ্যে কোনও রূপ আপস করতে পারলেন না। কমিটি বঙ্গ-বিহার সীমানা নির্ধারণে শোচনীয়ভাবে অক্ষম হয়ে শেষে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহকে ডেকে তাঁদের উভয়ের কাছে এই দুই প্রদেশকে সংযুক্ত করে একটি প্রদেশ করার প্রস্তাব দেন। কমিটি ডাঃ রায়ের উপর চাপ দিয়েই হোক্ বা অন্য যে কোন উপায়েই হোক ডাঃ রায়কে এই প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করান। তখন ১৯৫৬ সালের ২৪ শে জানুয়ারি তারিখে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বঙ্গ-বিহার মিলন প্রস্তাব প্রথম ঘোষিত হ'ল। এই প্রস্তাবে বিহারের হিন্দি-ভাষী অধিবাসীরা খুব খুশী হলেন, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের জনগণ ব্যথিত হলেন। ঐ সঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের সংলগ্ন বিহারের বাংলাভাষী মানুষরাও ক্ষুণ্ণ হলেন। তখন পশ্চিম বঙ্গের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ ছাড়া এখানকার

আপামর জনগণ এই বঙ্গ-বিহার মার্জার বা মিলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কারাবরণও করতে লাগলেন।

এই সব দেখে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হুমকী দিলেন, এইভাবে আন্দোলন হ'লে তিনি মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করবেন।

পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে ডাঃ রায়ের মুখ্যমন্ত্রী থাকা তখন খুবই প্রয়োজন। তবুও লোকে ডাঃ রায়ের হুমকীকে আদৌ গ্রাহ্য করলেন না। আন্দোলন চালিয়েই যেতে লাগলেন।

এই সময়েই মেদিনীপুর জেলার খেজুরি বিধানসভা কেন্দ্রের এবং উত্তর পশ্চিম কলকাতার লোক সভা কেন্দ্রের দুটি উপনির্বাচন হয়। এই দুটি আসনেই কংগ্রেস প্রার্থীরা বিরোধী দলের প্রার্থীদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন।

খেজুরি বিধান সভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয় ২৬শে এপ্রিল তারিখে। আর উত্তর পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয় ২রা মে তারিখে। এই লোকসভা কেন্দ্রে পশ্চিম বঙ্গ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিটির সম্পাদক মোহিত কুমার মৈত্র কংগ্রেসপ্রার্থী অশোক কুমার সেনকে পরাজিত করেছিলেন। ডঃ মেঘনাথ সাহার মৃত্যুতে এই আসনটি খালি হয়ে ছিল।

বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে বাংলার আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ছিল—

বিহারের আয়তন ৭০৩৩০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ৪ কোটী ২ লক্ষ। পশ্চিম বঙ্গের আয়তন ৩০৭৭৫ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ২ কোটী ৪৮ লক্ষ। বিহারের বাংলা ভাষাভাষী প্রায় ১২ হাজার বর্গমাইল (প্রায় ছ ভাগের এক ভাগ) অঞ্চল বাংলার সীমানাভূক্ত কারবার দাবী জানান হয়েছে—এই ভূখণ্ডের জনসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ হবে। এই অঞ্চলগুলি পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত হলে জনসংখ্যা হবে প্রায় ২ কোটী ৯০ লক্ষ। বিহারের জনসংখ্যা হবে ৩ কোটী ৬২ লক্ষ। তবুও বিহারে লোক সংখ্যার আধিক্য থাকবে ৭২ লক্ষর মত। বর্তমানে লোক সংখ্যার ভিত্তিতে যে নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত আছে, সেই নির্বাচন আইন অনুসারে বিহারের অন্তত ৫০ জন সদস্য বিধান সভায় বেশী থাকবে এবং সংখ্যা লঘু বাঙ্গালীদের উপর বরাবর অবিচার করবার সুযোগ পাবে।

এই সময় মানভূম লোক সেবক সংঘের এক হাজার সত্যাগ্রহী ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবী নিয়ে এবং বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মানভূম থেকে কলকাতার অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন। তাঁরা বঙ্গ-বিহার সীমান্ত হতে তিন মাইল দূরে মানভূমের পাকবীরা গ্রাম থেকে

২০শে এপ্রিল তারিখে পদ পরিক্রমা আরম্ভ করলেন। এই সত্যাগ্রহী দলে নারী-পুরুষ উভয়ই ছিলেন। দলের নেতৃত্বে ছিলেন—লোক সেবক সংঘের সভাপতি ৭৬ বৎসর বয়স্ক অতুলচন্দ্র ঘোষ। অতুলবাবুর স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ মহিলা দলের অগ্রে ছিলেন। দলে নেতৃস্থানীয় পুরুষদের মধ্যে ছিলেন—ভজহরি মাহাতো এম. পি. চৈতন্য মাঝি এম. পি. শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জী এম. এল. এ. সত্যকিঙ্কর মাহাতো এম. এল. এ. ভীমচন্দ্র মাহাতো এম. এল. এ. দীননাথ চর্মকার এম. এল. এ. প্রভৃতি।

এঁরা মাদল বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' ও 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে' গান এবং টুসু গান, 'বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে, ও ভাই মারবি তোরা কি তারে' গাইতে গাইতে আসতে থাকেন। এঁদের পদযাত্রা দেখে তখন অনেকেই ২৬ বছর আগে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত লবণ আইন ভঙ্গের জন্য মহাত্মা গান্ধীর ডান্ডী অভিযানের কথা স্মরণে এনেছিলেন।

এই বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে আমরাও তখন আমাদের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লিখে আমাদের মত প্রকাশ করেছিলাম। এই সময়েই জেনেছিলাম—মানভূম সত্যাগ্রহী দল ২১শে এপ্রিল দুপুরে বাঁকুড়া শহরে এসে প্রবেশ করবেন। এই জেনে আমি এবং 'সংহতি' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক সুরেন্দ্র নাথ নিয়োগী মানভূম সত্যাগ্রহীদের পদযাত্রা দেখবার জন্য এবং বাঁকুড়া শহরে এঁদের পদযাত্রার সঙ্গী হওয়ার জন্য আগের দিন বাঁকুড়ায় গিয়ে পৌঁছে ছিলাম। আমাদের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ব্লক তৈরি বিভাগের প্রধান কর্মীর বাড়ি ছিল বাঁকুড়া শহরে। আমরা গিয়ে তাঁরই বাড়িতে উঠে ছিলাম।

সুরেনবাবু ছিলেন মানভূম জেলার পুরুলিয়ার মানুষ। তখন মানভূম জেলা ছিল ধানবাদ ও পুরুলিয়া এই দুই মহকুমা নিয়ে গঠিত। পুরুলিয়া শহর ছিল জেলার হেড কোয়ার্টার। অতুলবাবু এবং সত্যাগ্রহীদের অনেকেই সুরেনবাবুর পরিচিত ছিলেন।

মানভূম সত্যাগ্রহী দলের পদযাত্রা দেখা ও বাঁকুড়ায় তাঁদের পদযাত্রার সঙ্গী হওয়া ছাড়াও, বাঁকুড়া যাওয়ার আমার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল—বাঁকুড়ায় জ্ঞানতাপস ৯৭ বৎসর বয়স্ক আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্গে দেখা করা। ২১শে এপ্রিল সকালে আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসি। তিনি থাকতেন বাঁকুড়া শহরের নতুন চটি পল্লীতে খ্রীষ্টান কলেজের পাশে একটি সুন্দর বাড়িতে! বাড়ির নাম স্বস্তিক। পরে যোগেশবাবু সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ১৯৫৬ সালের ৫ই আগস্ট (২০শে শ্রাবণ ১৩৬৩) তারিখের 'যুগান্তর সাময়িকীতে' 'আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়' নামে একটা প্রবন্ধ লিখে ছিলাম।

২১শে এপ্রিল ঠিক দুপুরে নারী-পুরুষের ঐ হাজার পদযাত্রী সত্যাগ্রহী বাঁকুড়া শহরে এসে প্রবেশ করলেন। একশ, একশ করে দশটা দলে সমগ্র দল বিভক্ত ছিল। মহিলা দল পৃথক ছিল।

সর্বাগ্রের প্রথম পুরুষ দলে একটা গরুর গাড়ী দেখলাম। শুনলাম—সত্যাগ্রহী দলের নেতা বৃদ্ধ অতুলবাবু রৌদ্রে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লে এই গরুর গাড়িতে উঠে আসেন। না হলে পদযাত্রীদের সঙ্গেই হেঁটে চলেন।

বাঁকুড়া শহরে বৈশাখের ঐ তীব্র খরা রোদে অতুলবাবু হেঁটে হেঁটেই আসছিলেন। রৌদ্রাতপ বাঁচাবার জন্য মাথায় একটা ভাঁজ করা গামছা ছিল মাত্র। তাঁর এবং দলের কারুরই মাথায় ছাতা ছিল না।

দেখলাম, শহরে পথের দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ দুপুরের ঐ চড়া রোদে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে সানন্দে সত্যাগ্রহীদের পদযাত্রা দেখছেন। পথের দু পাশের বাড়িগুলোর বারান্দায় এবং ছাদেও মানুষ দাঁড়িয়ে দেখছেন। কোথাও কোথাও মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করে, পুষ্প ও লাজ বর্ষণ করে সত্যাগ্রহী-দের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আর সারা পথ রঙিন কাগজের ফেস্টুন ইত্যাদিতে তো ভরে দেওয়া হয়েইছে।

পথে সত্যাগ্রহী পদযাত্রীদের পদযাত্রায় যাতে বিঘ্ন না হয়, সেজন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অনেকে সত্যাগ্রহী দলের আগে আগে চললেন। কেউ কেউ সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে সঙ্গেও চললেন। এঁদের মধ্যে সাংবাদিকরাও ছিলেন। সুরেনবাবু এবং আমি মূলতঃ সাংবাদিক হিসাবেই এঁদের দলে রইলাম। তাছাড়া সুরেনবাবু তো সত্যাগ্রহীদের অনেকের পরিচিতই ছিলেন।

সত্যাগ্রহীরা বাঁকুড়া শহরের বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে এলে, যেখানে তাঁদের এবং সাংবাদিকদের স্নানাহারের ব্যবস্থা হয়েছিল, সকলে সেখানে গেলেন। ব্যবস্থা হয়েছিল স্থানীয় একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে।

সুরেনবাবু এবং আমি শহরে যাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম সেখানে গিয়ে স্নানাহার করলাম। পরে বিকালে আবার সত্যাগ্রহীদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্য একটা বড় মাঠে যে সভা হয় সেই সভায় গেলাম।

ঐ দিন বাঁকুড়া শহরে যে বিরাট জনসভা হয়, তাতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং সত্যাগ্রহী দলের নেতারা বক্তৃতা করলেন। সভায় সভাপতিত্ব করে-ছিলেন বাঁকুড়া উকিল সভার সভাপতি সমরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভায় বক্তৃতা শুনছি, এমন সময় একটি যুবক পদযাত্রী দলের একটা ফটো আমার হাতে দিয়ে বললে—দুপুরে ফটো তুলে এইমাত্র 'ওয়াশ' করে আনছি। এই দেখুন—দলনেতা অতুলবাবুর ডান পাশে একজন, তার পাশেই আপনি চলেছেন।—বলেই ফটোটা আমার হাতে দিয়ে সে চলে গেল।

সত্যাগ্রহীরা রাত্রে বাঁকুড়া শহরে থেকে পরদিন সকালে আবার তাঁদের পদযাত্রা শুরু করেন। পথে সর্বত্রই তাঁরা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হ'ন।

এইভাবে ১৭৫ মাইল পথ পরিক্রমা করে তাঁরা ৬ই মে তারিখে সকালে কলকাতায় এসে পেঁছান। হাওড়া পুল অতিক্রম করে কলকাতায় প্রবেশ করলে সেখানে অপেক্ষমান এক বিরাট জনতা তাঁদের অভ্যর্থনা জানায়। বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের পক্ষ থেকে মাল্য চন্দন দিয়ে তাঁদের সম্বর্ধনাও জানান হয়।

ঐদিন সন্ধ্যায় মনুমেন্টের (শহীদ মিনারের) পাদদেশে সত্যাগ্রহীদের সম্বর্ধনা জানাবার জন্য এক বিরাট সভা হ'ল। তাতে সভাপতিত্ব করলেন প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সত্যাগ্রহী দল তাঁদের পদযাত্রার মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করলে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সত্যাগ্রহীরা কলকাতায় আসার ৩ দিন আগেই ৩রা মে তারিখে সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

এই সময় ১৩৬৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'সাময়িকী'তে আমরা এ সম্পর্কে লিখেছিলাম—

'গত ৩রা মে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় দিল্লী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ভারত সরকারকেও তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়া দেন। ডাক্তার রায় বলেন—উত্তর-পশ্চিম কলিকাতা কেন্দ্র হইতে সংসদ সদস্য উপনির্বাচনে জনগণের যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইয়াই তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তৎপূর্বে তিনি রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিলেন। গত ২৪শে জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বঙ্গ-বিহার মিলন প্রস্তাব প্রথম ঘোষিত হয়, তাহার পর তিন মাসেরও অধিক কাল ঐ প্রস্তাব লইয়া নানাবিধ আলোচনা হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত ডাঃ রায় খেজুরি ও উত্তর-পশ্চিম কলিকাতায় নির্বাচনের ফল দেখিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সম্মত হইয়াছেন।'

এই তো গেল বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের পরিণতির কথা। এবার ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবী করে পশ্চিম বঙ্গ কি পেয়েছিল, এখানে মোটামুটি তার একটু হিসাব দিই—

মানভূম জেলার ধানবাদ মহকুমা বাঙালী প্রধান হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম বঙ্গ পেল না, পেল শুধু পুরুলিয়া মহকুমা। পরে এই পুরুলিয়া মহকুমা নিয়েই হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলা। ঐ পুরুলিয়া ছাড়া আর পেয়েছিল মাত্র পূর্ণিয়া জেলার কিষাণগঞ্জ মহকুমার মুসলমান প্রধান ইসলামপুর থানা। এই ইসলামপুর বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে হয়েছে ইসলামপুর মহকুমা।

রাজশেখর বসু

সাহিত্যিক, শিল্পী প্রভৃতিদের সংস্থা 'সাহিত্য বাসর'[১]-এর আমি তখন সম্পাদক। সেই সময় একবার স্থির হয়—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পরশুরাম বা রাজশেখর বসুকে সাহিত্য বাসরের পক্ষ থেকে বেশ জাঁক করে একটা সম্বর্ধনা জানানো হবে।

এজন্য তাঁর মত এবং তাঁর সুবিধা মত একটা দিন ঠিক করে আসবো বলে সাহিত্য বাসরের অন্যতম সদস্য আমার অগ্রজ-প্রতিম সাহিত্যিক রামপদ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে একদিন বিকালে রাজশেখরবাবুর কলকাতার বাড়িতে গিয়েছিলাম। সে দিনটা ছিল ১৯৫৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি, রবিবার।

পথে আমরা প্রধানতঃ রাজশেখরবাবুর কথাই আলোচনা করতে লাগলাম। আমি বললাম—কজ্জলি, গড্ডলিকা, হনুমানের স্বপ্ন প্রভৃতির তুলনা নেই। এমন লেখা আর কেউ লিখতে পারলেন না। তাঁর 'চলন্তিকা' অভিধান, সেও এক অপূর্ব সৃষ্টি, তাঁর রামায়ণ, মহাভারতও এক নতুন জিনিস।

রামপদদা বললেন—রামায়ণ লেখার সময় রাজশেখরবাবু আমাকে প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন। আমাকে বসিয়ে, এক থালা নানা রকমের খাবার দিয়ে, পড়ে শোনাতেন। বলতেন—আপনি খেতে খেতে শুনুন, আমি পড়তে থাকি। শুনে বলুন, লেখাটা চলবে কি না? রামায়ণ আজ পর্যন্ত যা সকলে লিখেছেন, সবই সাধু ভাষায়। আমি অনুবাদ করছি, একেবারে চলিত ভাষায়। আর একেবারে নিছক গল্পের আকারে। অবশ্য, আমিই বানিয়ে গল্প বলে যাচ্ছি বলে লোকে না ভুল করে, তাই মাঝে মাঝে শ্লোক উদ্ধৃত করেছি। তাহলে লোকে ভাববে, না ঠিক রামায়ণই আছে।

আমি এক সময় বললাম—আচ্ছা রামপদদা, শুনেছি ওঁর নাকি এক দিকে বড় দুঃখের জীবন।

—হ্যাঁ, সেদিক থেকে তাই। স্ত্রী তো অনেক আগেই মারা যান। একমাত্র কন্যা সেও মারা গেছে বছর পনেরো হ'ল। ওঁর মেয়ের মৃত্যুটা ভারি চমৎকার।

—চমৎকার মৃত্যু কি রকম?

—রাজশেখর বসুর জামাই মারা গেছেন শুনেই, ওঁর মেয়েও তখনই হার্টফেল করে মারা যান। দুজনকেই একই চিতায় দাহ করা হয়েছিল। সেই সময় এ সংবাদটা খবরের কাগজেও বেরিয়ে ছিল। এ রকম বড় একটা দেখা

যায় না। মেয়ে মারা যায় একটি ছেলে রেখে। ছেলেটি বাইশ তেইশ বছরের হয়ে, সেও কিছুদিন হ'ল মারা গেছে। ভদ্রলোককে দেখলে, বড় দুঃখ হয়। উনি যদি বকুল বাগান রোডে উঠে না এসে ওঁদের পার্শী বাগানের বাড়িতেই থাকতেন, তাহলে ভাইদের মধ্যে থাকলে, শোক অনেকটা ভুলে থাকতে পারতেন। স্বর্গীয় গিরীন্দ্রশেখর বসু ওঁর দাদা, উনি মেজ, ওঁর পর আরও দু'একজন ভাই আছেন। সেখানে সকলের মধ্যে থাকলে আজকের এই শোকটা অনেকটা ভুলতে পারতেন। নির্জনে একা থেকে শুধু শোকের বোঝাই বয়ে চলেছেন।

কথায় কথায় রাজশেখরবাবুর বকুল বাগান রোডের বাড়িতে এসে গেলাম। বাড়িতে কোথাও কারও সাড়া নেই। এমন সময় দেখা গেল, দোতলার বারান্দায় এক বৃদ্ধ গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে পায়চারি করছেন। খুব সম্ভব তিনি রাজশেখরবাবুর কোন আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধব হবেন। তাঁকে ডেকে তাঁর মারফৎই আমাদের খবর পাঠান হ'ল।

এরপর আমরা নীচের বৈঠকখানার একটা ঘরে এসে বসলাম। এ ঘরটা খোলাই ছিল। একটা তক্তপোষের উপর ঢালা ফরাস পাতা, তার উপর গোটা কয়েক তাকিয়া সাজানো।

রামপদদা বললেন—এ ঘরটা দেশি প্রথায় সাজানো। আর পাশে ঐ ঘরটা ইউরোপীয় প্রথায় সাজানো। অর্থাৎ সোফা, কোউচ ইত্যাদিতে। কোণে ঐ কাগজের স্লিপ, আর তাব সঙ্গে বাঁধা পেন্‌সিল। তবে আমাদের আর স্লিপ পাঠাতে হবে না। আগে এই ঘরের সামনে লেখা ছিল—সাক্ষাতের সময় সকালে দশটা থেকে সাড়ে দশটা। আর বিকালে তিনটা থেকে সাড়ে তিনটা। পাঁচ মিনিটের বেশী সময় নেবেন না।—ওটা আমিই বলে তুলিয়ে দিয়েছি।

আমি দেখা করতে এলে পাঁচ মিনিটের জায়গায় ঘণ্টা খানেক কেটে যায়। তাই একদিন বলেছিলাম—আপনার নোটীশ কিন্তু আমার বেলায় কার্যকর হচ্ছে না।

উত্তরে বলেছিলেন—ও নোটীশ আপনাদের জন্যে নয়।

আমি বলেছিলাম—তাহলে, ওটা যদি তুলে দেওয়া সম্ভব হয় ত তুলে দেবেন। লোকে ভাববে, আপনি বড় দাম্ভিক।

বললেন—দাম্ভিকের কথা নয়। কি জানেন, আমি একা থাকতে বড় ভালবাসি, তাই।

আমরা কথা বলছি, এমন সময় রাজশেখরবাবু নেমে এলেন। রামপদদা আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে আমার আসার উদ্দেশ্য জানালাম।

আমার কথা শুনে তিনি বললেন—আমি কোথাও যাই না। মাঝ মাঝে মাঝে বেঙ্গল কেমিকেলের সভায় আর কখন কখন ভাইদের দেখতে যাই। আমাকে সামনে বসিয়ে আমার প্রশংসা করবেন, একি সহ্য করা যায় ?

আমি বললাম—আচ্ছা প্রশংসার কিছু থাকবে না। আপনি সভায় যাবেন, তাতেই আমাদের হবে।

—আমাকে উদ্দেশ্য করে লোক জমা হয়েছে, এটা ভাবতেও যেন আমার ভয় হয়। জানেন তো সব লোক সমান নয়। আমি একটু অদ্ভুত রকমের। আমি কোথাও যাই না, কিছু বলতেও পারি না। চোখে দেখতেও পাই না। বয়স তো অনেক হ'ল।

জিজ্ঞাসা করলাম—কত ?

—কয়েক মাস কম তিয়াত্তর।

আমি আমার আগের কথায় আবার ফিরে গিয়ে বললাম-আমাদের 'সাহিত্য বাসরে'র সাহিত্যিক বন্ধুরা সকলেই আপনাকে দেখতে চেয়ে ছিলেন।

—আমার লেখাই তো আমার পরিচয়, আমাকে আর কি দেখবেন !

—তবুও তাঁরা চাক্ষুষ আপনাকে দেখতে চান।

—কিন্তু আমি যে একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। সভায় যেতে পারি না। —বলেই হাসতে লাগলেন। এরপর বললেন—কি আর লিখেছি। এমন আর কি সাহিত্যিক !

—যা লিখেছেন, তাই যে যথেষ্ট।

—লিখতে তো পারিনি। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে অসাহিত্য করে। যাই হোক্, আপনি এসে যে বলেছেন—এই আমার সম্বর্ধনার বাবা হয়েছে।—বলে আবার হাসতে লাগলেন।

আর কোন কথা না বলে, অগত্যা রামপদদাকে নিয়ে উঠে পড়লাম। তিনি বাইরের পথ পর্যন্ত এসে আমাদের আগিয়ে দিয়ে গেলেন।

বাইরে এসে রামপদদা আমাকে বললেন—তুমি যখন ওঁর লেখার কথা বলছিলে, তখন দেখলে তো উনি বলতে লাগলেন—কি আর লিখেছি। আমি এমন কি আর সাহিত্যিক !—ওঁর এই কথা শুনে আমার মনে হ'ল—বিদ্যা যে মানুষকে বিনয় দেয়, এ তার একটা উদাহরণ।

এই ঘটনার পর বছর খানেক কেটে গেল। সেই সময় আর একবার রাজশেখরবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। সেবার আর সম্বর্ধনা জানাবার কথা নিয়ে নয়। সেবার একজনের আমন্ত্রণে রাজশেখরবাবুর সঙ্গে আমরা কয়েকজন দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেদিনের সেই ঘটনা বলি—

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারির শেষ দিক। আমি 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকাতেই কাজ করছি। বেঙ্গল কেমিকেলের পানিহাটী শাখার জেনারেল

ম্যানেজার রবীন্দ্রনাথ রায় আমাদের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার লেখক ছিলেন। তিনি একদিন আমাদের পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে এবং আমাকে বললেন—রাজশেখরবাবু বেঙ্গল কেমিকেলের ডিরেক্টর বোর্ডের অন্যতম প্রধান। তিনি প্রায় প্রতি বছরই শীতকালটায় মাস খানেক করে এই বেঙ্গল কেমিকেলের পানিহাটী শাখায় এসে বাস করে যান। এখানে কারখানার ভিতরেই সুন্দর এক বাড়িতে এসে থাকেন। এবার কয়েক দিন হ'ল এসেছেন। আমার আমন্ত্রণেই সামনের রবিবার সকালে আপনারা কয়েকজন চলুন। রাজশেখর-বাবুর সঙ্গে বসে গল্প হবে। আমি তাঁকে বলে রেখেছি!

রবিবাবুর আমন্ত্রণে সেদিন ফণিদা ও আমি ছাড়া সিটি কলেজের দুই অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী এবং সিটি কলেজের লাইব্রেরিয়ান—আমরা মোট পাঁচজন গিয়েছিলাম। সময় অল্প ছিল বলে অনেককেই খবর দিতে পারিনি। কেউ কেউ খবর পেয়েও যেতে পারেন নি।

রবিবাবু কারখানার গেটেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটা সময় ঠিক করা ছিল, তাই দু পাঁচ মিনিট আগে পরের মধ্যেই আমরা সকলেই কারখানার গেটের কাছে গিয়ে পেঁছে ছিলাম।

সকলে গিয়ে পেঁছিলে রবিবাবু আমাদের সকলকে রাজশেখরবাবুর কোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন। গেটের নিকটেই কোয়ার্টার। রাজশেখরবাবুও তাঁর কোয়ার্টারের বৈঠকখানার বারান্দায় আমাদের জন্য বসে অপেক্ষা করছিলেন।

আমরা গেলে রাজশেখরবাবু আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে সামনে পাতা চেয়ারে আমাদের বসতে বললেন।

আমাদের পক্ষ থেকে ফণিদাই রাজশেখরবাবুর শারীরিক কুশলাদির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে আমাদের সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এই সময় আমি বললাম—গত বছর রামপদদার সঙ্গে আমি একদিন আপনার বকুল বাগানের বাড়িতে গিয়েছিলাম।

বললেন—হ্যাঁ, মনে আছে।

এবার ফণিদা বললেন—গোপাল, তুমিই আমাদের মুখপাত্র হয়ে রাজশেখর-বাবুর সঙ্গে কথা শুরু কর।

তখন আমি বললাম—আপনার গড্ডলিকা প্রভৃতি বই যখনই পড়ি, তখনই আনন্দ পাই। আপনি বৈজ্ঞানিক হয়েও, কি করে যে এত বড় সাহিত্যিক হলেন, তার কথা একটু বলুন, আপনার মুখেই শুনি।

—এত বড় আর কি? যাই হোক, আমার সাহিত্য জীবনের কথা বলতে গেলে বলতে হয়—

১৯২২ সালে ৪২ বছর বয়সে আমি প্রথম গল্প লিখি। সেই গল্পের

নাম 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'। আপনাদের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাতেই সে গল্পটা ছাপা হয়েছিল। ভারতবর্ষের সম্পাদক তখন জলধর সেন। কয়েকজন ধুরন্ধর ব্যবসায়ীকে ব্যঙ্গ করার জন্যই এটা লিখি। এই লেখার সঙ্গে লেখক হিসাবে আমার আসল নাম ছিল না। নাম ছিল পরশুরাম। এই নাম দেওয়ারও একটু ইতিহাস আছে—আমি তখন পার্শি বাগানে আমাদের পৈতৃক বাড়িতে থাকি। সেখানে আমাদের একটা আড্ডা ছিল। নাম—আরবিট্রারি ক্লাব। বাংলা নাম করা হয়—উৎকেন্দ্র সংঘ। অনেক শিল্পী সাহিত্যিক এর সদস্য ছিলেন। সদস্য না হয়েও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কয়েক-বার এই আড্ডায় এসে ছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড লিখে প্রথমে আমাদের উৎকেন্দ্র সংঘে পড়ি। সেখানে সংঘের সদস্য জলধর সেনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি গল্প শুনে ভারতবর্ষে ছাপবেন বলে গল্পটা চাইলেন। তাঁকে গল্প দিলাম, কিন্তু লেখক হিসাবে আমার নাম দিতে নিষেধ করলাম। কি ছদ্মনাম দেওয়া যায় ভাবছি, এমন সময় পরশুরাম নামে এক স্যাকরা সেখানে এসে উপস্থিত হয়। হাতের কাছে তাকে পেয়ে ছদ্মনাম হিসাবে তারই নামটা দিয়েছিলাম। পরে আরও লিখবো জানলে ও-নামটা দিতাম না। সিদ্ধেশ্বরী লিলিটেড ভারতবর্ষে ছাপা হওয়ার পর জলধরবাবু আরও লিখবার জন্য আমাকে চাপ দিতে লাগলেন। ফলে আরও অনেকগুলো গল্প লিখলাম। সেই গল্পগুলো নিয়ে আমার প্রথম বই বেরোয় 'গড্ডলিকা'।

এই সময় আমি ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখছিলাম। তাই জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ ছিল?

—তা ছিল। এবং ভালই ছিল।

—তবে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কথা বলুন শুনি।

—তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তার সব আজ আর মনে নেই। তবে একটা বেশ মনে আছে। তাঁর 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাস তখন সবে বেরিয়েছে। সেই সময় তাঁর সঙ্গে একবার আমার দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনি ঐ রকম একটা চরিত্র আঁকলেন কেন? তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—ওযে আমার দেখা চরিত্র। এই বলে তিনি একটা গল্প বলেছিলেন। সে গল্পটা এই—

ছেলেবেলায় একবার আমি ঘুরতে ঘুরতে ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে এক বৃদ্ধা বিধবার বাড়িতে আমি একদিন ছিলাম। বৃদ্ধাটি ব্রাহ্মণের মেয়ে। তাঁর কেউ ছিল না। আমি যে ব্রাহ্মণ, বিধবাটি আমার এই পরিচয় পেয়ে, তাঁর রান্না অন্ন-ব্যঞ্জন আমায় আর দিলেন না। হাঁড়ি কড়া ধুয়ে আমার আলাদা স্ব-পাকের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা হয়েও কেন আমার আলাদা রান্নার ব্যবস্থা করলেন, এ কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা

করায়, তিনি বড় দুঃখে তাঁর অতীত জীবনের কথা বলেছিলেন। তাঁকেই অবলম্বন করে আমি আমার 'বামুনের মেয়ে' লিখি।

সেদিন শরৎচন্দ্র ডাক্তার কুমুদশংকর রায়কে সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়িতে এসেছিলেন। তখন যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল হচ্ছে। ঐ হাসপাতাল আমাদের বেঙ্গল কেমিকেলের ডাক্তারি যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজন হলে ওষুধও যাতে বিনামূল্যে কিছু পায় তারই জন্য কুমুদবাবুই শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। শরৎবাবু কুমুদবাবুর অভিপ্রায়ের কথা আমাকে বললে, আমি তাঁকে বলেছিলাম—এজন্য কুমুদবাবু শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিয়ে এনেছেন, উনি নিজে এলেও আমি এ সব দেবার জন্য বেঙ্গল কেমিকেলকে বলে দিতাম। এতে শরৎবাবু এবং কুমুদবাবু দুজনেই খুব খুশী হয়েছিলেন। পরে বেঙ্গল কেমিকেলের যা দেবার ছিল, সে সবই বিনামূল্যে যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে তখন দিয়েছিল।

এরপর আমি বললাম—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয়ের কথা কিছু বলুন শুনি।

—শান্তিনিকেতনে আমি গেছি দু একবার। কবির আমন্ত্রণেই গিয়েছিলাম। একবার গিয়ে দু এক দিন থেকে চলে আসবো বলে কবির কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি বললেন—এরই মধ্যে চলে যাবে কি? আরও কয়েক দিন থাক। এই ত এবার শান্তিনিকেতনের শাল-বীথিকায় গাছে গাছে শালের ফুল আসছে। তার কি শোভা হয় তুমি দেখবে।

আমি কবির এই কথায়, চলে আসবো বলেও আর কিছু বলতে পারলাম না। রয়েই গেলাম। পরে বিকালে শাল গাছে ফুল দেখবার জন্য শাল-বীথিকায় গেলাম, গিয়ে ঘুরে ঘুরে গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। কোন গাছেই ফুল দেখতে পেলাম না। সন্ধ্যার সময় কবির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বললাম—কই ফুল ফলের গন্ধ তো দেখতে পেলাম না। তবে ধুনোর গন্ধ না পেলেও গাছে গাছে ধুনো রয়েছে দেখলাম।

কবি শুনে বললেন—তার মানে?

—আপনার শাল-বীথিকার অনেক গাছেই খুব আটা জমে আছে দেখলাম। এই শালের আটা থেকেও ধুনো হয় কিনা!

কবি বললেন—তাই নাকি? শালের আটা থেকেও ধুনো হয়?

—বললাম, হ্যা, তবে ওর সঙ্গে আরও কিছু কিছু মেশাতে হয়।

রাজশেখরবাবুর এই কথা শুনে উপস্থিত আমরাও বললাম—এটা আমরাও জানতাম না।

আমন্ত্রণকারী রবিবাবু আমাদের কথাবার্তার প্রথম দিকে কিছুক্ষণ ছিলেন।

তারপর তিনি উঠে যান। ঠিক এই সময়টায় দেখি—তিনি তিনজন লোক সহ প্লেটে প্লেটে খাবার ভর্তি করে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর চা ইত্যাদি এনে জলযোগের বিরাট ব্যবস্থা করলেন।

আমাদের যে যা পারলেন খেলেন। রাজশেখরবাবুও সামান্য কিছু খেলেন।

এরপর আমরা বিদায় নিয়ে উঠলে রাজশেখরবাবু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা এলেন।

প্রসঙ্গ কথা

১. 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার লেখক, লেখিকা, শিল্পী ও ফটোগ্রাফার এবং অপর বেশ কিছু সাহিত্য-রসিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল, আমাদের 'সাহিত্য বাসর'। আমি ভারতবর্ষ পত্রিকায় কাজে যোগদানের পর থেকেই সাহিত্য বাসরের সম্পাদক হই। যতদিন ভারতবর্ষে কাজ করেছিলাম—দশ বছর আট মাস—ততদিনই সাহিত্য বাসরের সম্পাদক ছিলাম।

করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি বহু কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের নিয়ে সাহিত্য-আলোচনা, আবৃত্তি, নৃত্য, গীত প্রভৃতি সহ সাহিত্য বাসরের অনেক জাঁক জমকপূর্ণ অধিবেশন করেছি।

যাদু সম্রাট পি. সি. সরকার বা প্রতুলচন্দ্র সরকার ভারতবর্ষের লেখক হিসাবে সাহিত্য বাসরের সদস্য ছিলেন। তিনি সাহিত্য বাসরের সভায় আসতেন, এসে নানা রকমের ছোট খাট যাদুও দেখাতেন।

আমাদের ঐ সাহিত্য বাসরের সভায় অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। যেমন, একজনের কথা বলি—

আপার সার্কুলার রোডে (বর্তমান নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড) রাজা রামমোহন রায়ের বিখ্যাত বাসভবনে, এখন যেখানে উত্তর কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের অফিস, সেখানে আমাদের সদস্য ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ডঃ পঞ্চানন ঘোষালের আহ্বানে সাহিত্য বাসরের এক অধিবেশন হয়েছিল। তাতে আমন্ত্রিত হয়ে আমাদের সদস্য নাট্যকার কানাই বসুর সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত গণিতজ্ঞ সোমেশ বসু এসেছিলেন।

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার অজয় ও কুনুর নদীর

সংযোগ স্থল কোগ্রাম। আমরা সাহিত্য বাসরের অনেক সদস্য একবার কোগ্রাম গিয়ে কবি কুমুদরঞ্জনকে সম্বর্ধনা জানিয়ে এসেছিলাম। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি লোচন দাসেরও জন্মস্থান এই কোগ্রাম। সেবার কোগ্রাম গিয়ে লোচন দাসের পাটও দেখে এসেছিলাম।

আমরা সাহিত্য বাসর থেকে বোম্বাই-প্রবাসী সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুরবাসী সাহিত্যিক বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতিকে কলকাতায় সম্বর্ধনা জানিয়েছি। সে সব কথা বইয়ে পরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনফুল অধ্যায়ে বলেছি।

সাহিত্য বাসর থেকে রাজশেখর বসুকেও সম্বর্ধনা জানাবো, এই প্রস্তাব নিয়েই সেদিন রাজশেখরবাবুর কাছে গিয়ে ছিলাম।

সাহিত্য বাসরের অধিবেশনের আমন্ত্রণ পত্র বা চিঠি কয়েকটা আজও আমার কাছে পড়ে আছে। এখানে মাত্র দুটো চিঠি উদ্ধৃত করছি। এ থেকেই বোঝা যাবে আমাদের 'সাহিত্য বাসর' কি রকম ছিল।

সাহিত্য বাসর

২০৩/২ বি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলকাতা

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ২২শে মে মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬টায় হাওড়ার সিভিল সার্জন ডাঃ মুনীন্দ্রপ্রিয় তালুকদারের আমন্ত্রণে তাঁহার ১১ নং ফরেষ্ট রোডস্থ বাসভবনে* সাহিত্য বাসরের এক বিশেষ সভায় ভগবান বুদ্ধের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়। সভায় প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ এবং নৃত্য গীতাদির ব্যবস্থা রহিয়াছে। আপনার উপস্থিতি কামনা করি।

বিনীত—
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

১৯. ৫. ১৯৫১

* হাওড়ায় ময়দানের নিকট জি. টি. রোড ও নেতাজী সুভাষ রোডের সংযোগস্থল (মল্লিক ফটক) হইতে পূর্বদিকে ২ মিনিটের পথ। হাওড়া স্টেশন হইতে ৫২, ৫৮, ৫৫, ৫৯ নং বাসে অথবা শিবপুরের ট্রামে যাওয়া যায়।

সিভিল সার্জন মুনীন্দ্রপ্রিয়বাবু চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ ছিলেন। তিনি বৌদ্ধদের সাহিত্য পত্রিকা জগজ্জ্যোতির সম্পাদক ছিলেন। ভাল কবিতা লিখতেন।

সাহিত্য সূত্রেই মুনীন্দ্রপ্রিয়বাবু আমাদের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। হাওড়ায় তাঁর কোয়ার্টারে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন মহা আড়ম্বরে আমরা সাহিত্য বাসরের বুদ্ধ উৎসব করতাম। সভায় আমাদের সাহিত্য বাসরের সদস্য সদস্যারা ছাড়া মুনীন্দ্রপ্রিয়বাবুর পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে হাওড়ার জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট, হাওড়ার জজ সাহেবরা, হাওড়ার এস. ডি. ও প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকতেন।

এখানে একবার সভায় আমার বিশেষ পরিচিত বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মণি বর্ধণকে বলায় তিনি সদলে তাঁর প্রসিদ্ধ 'চণ্ডাশোকের রূপান্তর' নৃত্যনাট্যটি দেখিয়ে ছিলেন। দীর্ঘ এই নৃত্যনাট্যের বিষয় বস্তু ছিল—সম্রাট অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের পর থেকে নানা মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুতে পরিণত হয়ে ছিলেন।

সেদিনের এই সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন বৃদ্ধ কবি করুণা নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপরে উদ্ধৃত চিঠিতে পথনির্দেশে শিবপুর ট্রামের কথা আছে। তখন হাওড়া স্টেশনের কাছ থেকে শিবপুর পর্যন্ত ট্রাম চলতো। বহুদিন হ'ল সে ট্রাম চলা বন্ধ হয়ে গেছে।

সিভিল সার্জন মুনীন্দ্রপ্রিয়বাবুর বাড়িতে ২২. ৫. ৫১ তারিখের অধিবেশনে উপস্থিত হতে না পেরে প্রবীণ ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন আমাকে যে চিঠি দিয়ে ছিলেন, সেই চিঠিটা এখানে উদ্ধৃত করছি। আমাদের সাহিত্য বাসর কি রকম ছিল উপেনবাবুর এই চিঠি থেকেও তার কিছুটা জানা যাবে। উপেনবাবু লিখেছিলেন—

৪৬/৫বি বালিগঞ্জ প্লেস

সবিনয় নিবেদন, ২১. ৫. ৫১

সাহিত্য বাসরের পক্ষ থেকে আপনার আমন্ত্রণ লিপি পেয়ে বিশেষ সুখী হলাম। আপনাদের সাহিত্য বাসর খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের ভারি সুন্দর সমিতি। আমার ভারি ভাল লাগে। আপনাদের কালকের অধিবেশন হাওড়ায় কিন্তু আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। শারীরিক অবস্থা প্রতিবন্ধক। অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করবেন।

আপনাদের অধিবেশনের সাফল্য কামনা করি। ইতি,

নমস্কারান্তে

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথমে সাহিত্য বাসরের কার্যালয় ছিল ২০৩।২ বি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। এটা ছিল আমাদের সদস্য সুরেন্দ্র নাথ নিয়োগীর 'সংহতি' পত্রিকার অফিস। পরে সাহিত্য বাসরের কার্যালয় হয় আমার ২৬ নং মদন বড়াল লেনের বাড়িতে।

৪৬/৫বি, [illegible] রোড,
২১.৫.'৫১

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সাহিত্য বাসরের পত্র পেলাম। আমন্ত্রণ লিপি পেয়ে বিশেষ খুশী হলাম। আপনাদের সাহিত্যবাসর উদীয়মান সাহিত্যিকদের ভারি সুন্দর সমিতি। আমার ভারি ভাল লাগে। আপনাদের কালকের অধিবেশনে ইচ্ছাও কিন্তু আমার যাওয়া সম্ভব হবেনা। শারীরিক অসুস্থতা প্রতিবন্ধক। অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।

আপনাদের অধিবেশনের সাফল্য কামনা করি। ইতি,

নমস্কারান্তে
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

POST CARD
ADDRESS ONLY

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
সম্পাদক, সাহিত্য বাসর
203/2B, Cornwallis Street,
Calcutta

সাহিত্য বাসর

২৬ মদন বড়াল লেন
বৌবাজার, কলকাতা

প্রিয় বন্ধু,

আগামী ২রা নভেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৩॥ টায় শ্রীঅমিয়গোপাল হাজরার আমন্ত্রণে ১৩ রানী রাসমণি রোডে (প্রাতঃস্মরণীয়া রানী রাসমণি ভবনে) সাহিত্য বাসরের এক প্রীতি সম্মেলন হবে। এই অনুষ্ঠানে বিখ্যাত সাহিত্যিক-দম্পতি শ্রীপ্রতিভা বসু ও শ্রীবুদ্ধদেব বসু যথাক্রমে সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন। সভায় 'গম্ভীরা পরিষদে'র লোকসংগীত এবং কুমারী রত্না ও স্বপ্না মিত্রের নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে। আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিনীত—
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

২৮.১০.১৯৫২

গম্ভীরা পরিষদের প্রধান তারাপদ লাহিড়ী সদলে সভায় সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। পরিষদের সদস্যরা গম্ভীরা নৃত্যও প্রদর্শন করেছিলেন।

আগে 'রানী রাসমণি' অধ্যায়ে যে বিজয়কৃষ্ণ হাজরার কথা বলেছি, অমিয়গোপাল সেই বিজয়বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

এই রানী রাসমণি ভবনেই সাহিত্য বাসরের আর একবার বেশ বড় রকমের অধিবেশন হয়েছিল। সেদিন সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের লেখক সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে শ্রীরামকৃষ্ণ, রানী রাসমণি ও মথুরবাবু সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

এখানে একটা কথা বলা বাহুল্য যে, আমাদের সাহিত্য বাসরের প্রতিটি অধিবেশনের শেষে ভূরিভোজের ব্যবস্থা থাকতো।

২. সেদিন রাজশেখরবাবু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁর লেখার প্রশংসা প্রভৃতির কথা আদৌ বলেন নি। তিনি না বললেও পরে আমরা জানি— রবীন্দ্রনাথ রাজশেখরবাবুর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'গড্ডলিকা' পড়ে স্বেচ্ছায় প্রবাসী পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) প্রশংসাসূচক একটি লেখা দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ রাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা' অভিধান ১ম সংস্করণ এবং ২য় সংস্করণ পেয়ে দুবারই ঐ অভিধান সম্বন্ধে প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থটি 'রাজশেখর বসু বন্ধুবরেষু' সম্বোধনে এবং 'দুইবোন' উপন্যাসটি 'রাজশেখর বসু করকমলেষু' লিখে উৎসর্গ করেছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আমি প্রথম দেখি ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলের এক সভায়।

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির প্রস্তাব নিয়ে তখন সারা পশ্চিম বঙ্গে তুমুল আন্দোলন। দেশের শুধু রাজনৈতিক দলগুলিই নয়, নানা প্রতিষ্ঠান এবং জন সাধারণও এ নিয়ে আলোচনা সভা করছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্যরাও এই সময় ঐ 'বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি' প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত, না উচিত নয় এই নিয়ে দ্বারভাঙ্গা হলে সভা করেছিলেন। ঐ সভা যদিও কেবল সিনেটের সদস্যদেরই আলোচনা সভা ছিল, তবুও সিনেটের সদস্য নই, এমন কয়েকজনও আমরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমরা ছিলাম রবাহূত।

সেদিন ঐ সভায় অন্যতম সদস্য সত্যেন বসু ভাল বক্তৃতা দিতে না পারলেও বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধেই বলেছিলেন।

এরপর সত্যেনবাবুর বাড়িতে আমি প্রথম যাই ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন রবিবার সকালে। সত্যেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর একতলার বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখি, পাকাচুল মাথায় সেই পূর্ব পরিচিত সত্যেন বসু। একটা ছোট খাটে বসে, সামনে চেয়ারে বসা একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। খালি গা, পরণে একটা পেঁশুটে রংয়ের সিল্কের লুঙ্গী।

সত্যেন বসুর বাড়িতে যাওয়ার সময় আমার শরৎচন্দ্র-(২য় খণ্ড) বই একখানা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ছিলাম, তাঁকে দেব বলে। বইখানা দিলে হাতে নিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন—বোস।—তারপর বললেন—এযে বিরাট বই।

আমি বললাম—ঐ রকম আরও একটা আছে। সেটা শরৎচন্দ্র—১ম খণ্ড, শরৎচন্দ্রের জীবনী। সে বই বাড়িতে না থাকায় আনতে পারলাম না। এই ২য় খণ্ডে আছে—শরৎচন্দ্রের মৌখিক আলাপ-আলোচনা, মৌখিক পরিহাস-রসিকতা, বৈঠকী গল্প ও মৌখিক অভিভাষণ— অর্থাৎ এক কথায় শরৎচন্দ্রের মুখের কথা ও কাহিনী। আর একটা এই রকমই বড় বই শরৎচন্দ্র ৩য় খণ্ড অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী ছাপা হচ্ছে।

আমার এই কথা শুনে সত্যেনবাবু বললেন—আমার সঙ্গেও শরৎবাবুর খুব আলাপ ছিল।

আমি বললাম—তা ত জানতাম না। তাহলে আপনার সঙ্গে আলাপ-

আলোচনার কথা এই বইয়ে দিয়ে দিতাম। তা তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের বা কোন মজার গল্প যদি মনে থাকে তো বলুন না, পরে এই বইয়ে দিয়ে দোব।

—সে সব কথা আর ভাই মনে নেই। তবে এইগুলো মনে আছে—আমি তখন কলকাতায় ছিলাম, সেই সময় ১৯১৭ কি ১৮ সালে আমি একবার হাওড়ায় বাজে শিবপুরে শরৎচন্দ্রকে দেখতে গিয়ে ছিলাম।

—কেন দেখতে গিয়ে ছিলেন ?

—এর আগে 'যমুনা' পত্রিকায় তাঁর লেখা পড়ে এবং তাঁর বড়দিদি প্রভৃতি ক'টা বই পড়ে তাঁর উপর আমার একটা শ্রদ্ধা আসে এবং ভাবি কে এই শক্তিশালী লেখক ? তাই তাঁকে দেখতে গিয়ে ছিলাম। এরপর জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা'র আসরে যখন যেতাম, সেখানেও তাঁকে দু একবার দেখেছি।[১]

আমি বিকালে হেদোয় বেড়াতে গেলে কখন কখন শরৎচন্দ্রকে সেখানে দেখতাম। তিনি তাঁর বইএর প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্সের দোকানে এসে এখানে আসতেন।

তিনি যখন কলকাতায় বাড়ি করে ছিলেন, তখন আমি কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তিনি ঢাকায় ডি. লিট্ উপাধি নিতে গিয়ে আমার বাড়িতেও একবার গিয়ে ছিলেন। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতাম। তিনি ঢাকায় গিয়ে উঠেছিলেন চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। চারুবাবুর বাড়ি আমার বাড়ির খুব কাছেই ছিল।

আমি বললাম—এই যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আপনার এত বার দেখা হয়েছিল, তা কি কি আলোচনা হয়েছিল, তার কিছুই কি আপনার মনে নেই ?

—না, কিছুই মনে নেই। অবশ্য মনে রাখার মত তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও হয়নি। অমনি সাধারণ মামুলি কথাবার্তা হয়েছিল। যাক্, তুমি কি প্রয়োজনে এসেছ বল।

আমি বললাম—আমি 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামে একটা বই লিখছি। ঐ বইয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে কিছু আলোচনা আছে, ঐ প্রসঙ্গেই আপনার কাছে একটা কথা জানতে এসেছি—শ্রীম তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের ৪র্থ ভাগে এক জায়গায় লিখেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের বেলতলায় কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হতে দেখেছিলেন। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি বলে ?

শুনে তিনি বললেন—বিজ্ঞান ও কথা বিশ্বাস করে না। তাই ও কথা স্বীকারও করে না। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান চক্ষে, কি কি চক্ষে ও সব দেখেছিলেন তা ভাই বলতে পারি না। এই সেদিন এক জায়গায় পড়লাম—একজন এক মন্দিরে রাধাকৃষ্ণকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখলেন—রাধাকৃষ্ণের চরণে যত

ফুল উৎসর্গ করা হয়েছে, তার সবেতেই রাধাকৃষ্ণ লেখা। তিনি কি চোখে যে ঐ সব দেখেছিলেন তা বলতে পারি না। অথচ আমাদের চোখে ঐ ফুল শুধুই ফুল। এঁদের ঐ দেখা যে মিথ্যে তাও জোর করে বলতে পারি না। কেননা, এঁরা যে মন ও চোখ নিয়ে দেখেছিলেন, তাতে ঐ রকমই হয়ত দেখেছিলেন।

তবে আমাদের কাছে ও সব অবৈজ্ঞানিক কথা। কারণ, বিজ্ঞান ও সব কথা বিশ্বাস করে না।

আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাড়ির ভিতর থেকে কার ডাকে সত্যেনবাবু একবার বাড়ির ভিতরে গেলেন।

এই ফাঁকে আমিও একবার উঠে তাঁর ঐ বৈঠকখানা ঘরের এদিক ওদিক একবার দেখে নিলাম। দেখলাম, দেওয়ালের দিকে একটা টেবিলে কিছু বই অগোছান অবস্থায় পড়ে আছে। উপরেই দেখলাম—সেক্সপীয়ারের ওথেলোর বাঙ্গলা অনুবাদ একটা বই। একটা আলমারিতে বই ঠাসা। সেগুলো অবশ্য ভালভাবে সাজানো ও গোছান। ঘরে সোফা কৌচের বালাই নেই। সাধারণ কাঠের চেয়ার অতিথিদের জন্য। ঘরের দেওয়ালের একদিকে রবীন্দ্রনাথের একটা বড় ছবি, আর একদিকে আইনস্টাইনের একটা ছবি। খাটের পাশে একটা ছোট চৌকির উপর টেলিফোন। ঘরে ক'টা পোষা বিড়াল ঘুরছে।

এই সময় সত্যেনবাবু আবার তাঁর বসবার ঘরে ফিরে এলেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এবং প্রসঙ্গত বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল।

এরপর সত্যেনবাবুর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আর একবার দেখা করতে যাই ১৯৭২ সালে, তখন আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বইটা লিখছি।

আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে আমি লিখি—রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার জনগণের আমন্ত্রণে ঢাকায় গিয়ে প্রথমে বুড়ীগঙ্গার উপর ঢাকার নবাবদের তুরাগ নামক হাউস বোটে কয়েকদিন ছিলেন।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আমার এই লেখার তীব্র প্রতিবাদ করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বক্তৃতায়, এমনকি আমাকে চিঠি লিখেও জানান—আমার ঐ লেখা ভুল। রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে প্রথমে তাঁর বাড়িতে উঠে ছিলেন।

নানা পাথুরে প্রমাণে আমি জানি যে, আমি আমার বইয়ে যা লিখেছি, তাই ঠিক, তবুও এ সম্বন্ধে আরও জানবার জন্য আমি সেদিন সত্যেনবাবুর বাড়িতে গিয়ে ছিলাম। গিয়ে তাঁকে বলে ছিলাম—১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ঢাকায় যান, তখন তো আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। বিষয়টা যদিও অতি তুচ্ছ, তবুও জিজ্ঞাসা করছি—আপনার কি মনে আছে—রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে প্রথমে কোথায় উঠেছিলেন? নবাবদের 'তুরাগ' হাউস বোটে না রমেশবাবুর বাড়িতে?

সত্যেনবাবু বললেন—রবীন্দ্রনাথ যখন ঢাকায় যান, তখন ঠিক ঐ সময়টায় আমি ঢাকায় ছিলাম না, বিলাতে ছিলাম। তুমি এ সম্বন্ধে নাট্যকার মন্মথ রায়কে জিজ্ঞাসা করতে পার। তিনি ঐ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

এরপর সত্যেনবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কিছু লিখছো?

—এখন লিখছি 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' নামে একটা বই। এর আগে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আরও কয়েকটা বই লিখেছি। প্রথম লিখি 'রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস' নামে একটা বই।

—কি রকম পরিহাস নিয়ে লিখেছ শুনি।

—এতে মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের মৌখিক পরিহাস-রসিকতার কথাই আছে। তবে কেবল একটা ছোট্ট চিঠির ঠিকানা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা পরিহাসের কথা ঐ বইয়ে দিয়েছি।

—কি রকম?

—আমার ঐ বইয়ে 'ঠিকানা' শিরোনামেই গল্পটা দিয়েছি। এ কাহিনীটা আমি ঐতিহাসিক কালিদাস নাগের কাছে শুনেছি।

কালিদাস নাগ ছাত্রজীবনেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন। এম. এ. পাস করে কালিদাসবাবু একবার শান্তিনিকেতনে যান। শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেবার তিনি ক'দিন থাকেন।

শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসবার সময় কালিদাসবাবু কবিকে প্রণাম করতে গেলে, কবি বললেন—তোমার ঠিকানাটা কি? দিয়ে যাও তো। জেনে রাখা ভাল।

কালিদাসবাবু ঐ সময় তাঁর মামার কাছে থাকতেন। তাঁর মামা বিজয়কৃষ্ণ বসু তখন কলকাতায় জু-গার্ডেনের সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন। তিনি জু-গার্ডেনে কোয়ার্টার পেয়ে সেখানেই সপরিবারে থাকতেন।

কবি কালিদাসবাবুর ঠিকানা চাইলে কালিদাসবাবু মামার ঠিকানা ব'লে, প্রয়োজন হলে সেখানেই তাঁকে চিঠি দেবার কথা বললেন।

কয়েকদিন পরে কবির কাছ থেকে কালিদাসবাবুর নামে একটা চিঠি এল। ঠিকানার ঘরে কবি লিখেছেন—

Sri Kalidas Nag
C/o Bijoy Krishna Bose
Zoo-garden
(Human Section)

এখানে Human Section লেখাটা খুবই মজার।

—তা ঠিক।

এই কাহিনীটা বলার পর আমি সত্যেনবাবুকে বললাম—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' বইটা আপনাকে উৎসর্গ করেছেন। আপনার সঙ্গে তো রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল, সেই পরিচয়ের কিছু কথা বলুন না শুনি। আপনাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কোন চিঠি আছে? বিশ্বপরিচয় উৎসর্গ করার আগে, কবি আপনাকে চিঠি লিখে আপনার মত নিয়ে ছিলেন কি?

—না, আমি আগে এর কিছুই জানতাম না। রবীন্দ্রনাথ বই উৎসর্গ করতেই জানতে পারলাম। আগে চিঠি দিয়ে কিছুই জানান নি।

তবে ১৯৩৬ সালে যখন তিনি ঐ বইটা লিখছিলেন, তখন আমি শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। সেই আমি প্রথম শান্তিনিকেতনে যাই। গিয়ে কয়েকদিন ছিলাম। গিয়ে উঠেছিলাম আমার এক ছাত্র, ওখানকার অধ্যাপকের বাড়িতে। ঐ সময় কবির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কবি তখন তাঁর শ্যামলী বাড়িতে থাকতেন।

কবির সঙ্গে আমার আর একবার আলাপ-পরিচয় হয়। সেটা তাঁর মৃত্যুর বৎসরে গ্রীষ্মের ছুটিতে। সেবারও গিয়ে শান্তিনিকেতনে দিন কতক ছিলাম। সেই কবির সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

প্রথম বারে আমি যখন গিয়েছিলাম, তখন কবির পক্ষ থেকে আমার ঐ ছাত্রই আমাকে ডেকেছিল। কারণ, ওখানে বিজ্ঞানের ক্লাস খোলা যাবে কিনা, এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য।

সত্যেনবাবুর সঙ্গে আমার সেদিন এই রকম আরও কিছু কথাবার্তা হয়েছিল।

প্রসঙ্গ কথা

১. জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর বাড়িতে শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের মিলন কেন্দ্র ছিল 'বিচিত্রার আসর'। এই আসরে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতেন। শরৎচন্দ্রও মাঝে মাঝে যেতেন।

এই বিচিত্রার আসরেই ১৩২৪ সালের ১৪ই চৈত্র তারিখে শরৎচন্দ্র তাঁর 'বিলাসী' গল্পটি পাঠ করেছিলেন। সেদিন ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন।

কালিদাস রায়

১৩৫৭ সালের ২৫শে চৈত্র তারিখে কৃষ্ণনগর রাজবাটীর সভাগৃহ বিষ্ণুমহলে 'কৃষ্ণনগর সাহিত্য ও সঙ্গীতি'র উদ্যোগে এক সভা হয়। সভাটি ছিল কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'অন্নদামঙ্গল' রচনার দুইশত বৎসর পূর্ণ হওয়ার উপক্রম উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠান। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক মদনমোহন গোস্বামী (উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক) প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় এই সভার বিবরণ সহ সভাপতির বক্তৃতারও অনেকটা প্রকাশিত হয়েছিল।

কালিদাস রায় আমাদের ভারতবর্ষ পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি তাঁর কবিতা নিয়ে প্রায়ই ভারতবর্ষ অফিসে আসতেন, এসে আমাদের সঙ্গে নানা রকমের গল্প করে যেতেন। তিনি আমাদের পত্রিকা অফিসের সকলকেই ছোট ভাইয়ের মত ভাবতেন এবং সম্পাদকসহ সকলকেই 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন। আমরা তাঁকে বলতাম—কালিদা।

আনন্দবাজার পত্রিকায় অন্নদামঙ্গল রচনা উৎসবের ঐ সংবাদ পড়ে সেইদিনই কালিদার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বলি—কালিদা, কৃষ্ণনগরে ভারতচন্দ্রের উপর আপনার বক্তৃতাটা কাগজে পড়লাম, বেশ ভাল লেগেছে।

শুনেই বললেন—তুই তো বলবিই। ঐ দুর্মুখ সজনীও ভাল বলেছে।

এই বলেই কালিদা যেন কতকটা অহং ভাব নিয়েই বেশ মোলায়েম সুরে বললেন—আচ্ছা তুই বল ভাই গোপাল, ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে এখন আমিই অথরিটি, নাকি ?

কালিদার মনোভাব বুঝে বললাম—তা ঠিক। আপনি তো প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে বইও লিখেছেন।

এর পরেই বললাম—কালিদা, আপনি তো ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে অথরিটি। আমি ভারতচন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতির সেক্রেটারি। তা একদিন আমাদের ওখানে ভারতচন্দ্রের জন্মস্থানে স্মৃতি সভায় চলুন না !

আমার এই কথা শুনে কালিদা বললেন—সেটা কোথায় রে গোপাল ?

বললাম—দাদা, এই আপনার অথরিটি !

—তামাসা রাখ্। সেটা কোথায় বল্।

—হাওড়া জেলায় আমতা থানায় পেঁড়ো গ্রামে। মার্টিন কোম্পানীর রেলে যেতে হবে।

—রেল থেকে নামিয়ে আবার হাঁটাবি তো? কতটা হাঁটতে হবে?

—একদম হাঁটতে হবে না। হাওড়ার কদমতলা থেকে মার্টিনের গাড়িতে চেপে মুন্সিরহাট স্টেশনে গিয়ে নামবো। সেখান থেকে গ্রামের ট্যাক্সিতে করে একেবারে পেঁড়ো। অবশ্য ঐ রাস্তাটা পাকা নয়, মাটির রাস্তা। মাঝে মাঝে একটু আধটু উঁচু-নীচু আছে।

—আচ্ছা, তোদের সভায় যাব। তবে পরে এক সময়।

কালিদার সঙ্গে এই কথাবার্তার প্রায় বছর দুই পরে আমাদের ভারতচন্দ্র স্মৃতি উৎসবে তাঁকে নিয়ে যাই। তিনি সভাপতি, কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথি।

এই ভারতচন্দ্র উৎসব হয়ে যাওয়ার পর আমরা তখন ১৩৫৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার 'সাময়িকী'তে লিখেছিলাম—

ভারতচন্দ্র স্মৃতি উৎসব

গত ৯ই মার্চ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতি ও ভারতচন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে হাওড়া জেলার হরিশপুরে কবির স্মৃতি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে।

পার্শ্ববর্তী পেঁড়ো গ্রামে কবির জন্মস্থান অবস্থিত। খ্যাতনামা কবি-শেখর শ্রীকালিদাস রায় সভায় পৌরোহিত্য করেন ও সুকবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এম. এল. এ. প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। স্থানীয় অধিবাসী স্মৃতিরক্ষা সমিতির অন্যতম সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সংহতি সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন। কবির জন্মস্থানে একটি স্মৃতি-মন্দির নির্মাণের প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছিল।

সংবাদপত্রেও এই ধরণের সংবাদ তখন প্রকাশিত হয়েছিল।

আমাদের ভারতচন্দ্র স্মৃতি উৎসব হয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পরে একবার কালিদার বাড়িতে যাই। গেলে তিনি বললেন—কাল মদন গোস্বামী নামে কোন্ এক কলেজের অধ্যাপক আমার কাছে এসেছিল। এসে বললে—মশায়, আমরা তো পড়ে আসছি হুগলী জেলার পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে, আবার কেউ বলেছেন বর্ধমান জেলার পেঁড়ো গ্রামে ভারতচন্দ্র জন্মেছিলেন। সেদিন কাগজে দেখলাম, আপনারা হাওড়া জেলার পেঁড়ো গ্রাম ভারতচন্দ্রের

জন্মস্থান বলে সেখানে সভা করে এসেছেন। হাওড়ায় কি করে ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান হ'ল ?

ঐ অধ্যাপকের কথা শুনে আমি তাঁকে বললাম—হাওড়ায় যে পেঁড়ো তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি সভা করতে গিয়ে তো দেখে এলাম। আপনি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অফিসে গিয়ে গোপাল রায়ের সঙ্গে দেখা করুন। সে আপনাকে সব বুঝিয়ে বলবে। তার বাড়ি ঐ অঞ্চলেই।—ঐ অধ্যাপক বোধ হয় দু এক দিনের মধ্যেই তোর কাছে যাবে।

কদিন পরে দেখি, ঐ মদন গোস্বামী ভারতবর্ষ পত্রিকা অফিসে আমার খোঁজে এলেন, এসে আমাকে বললেন—আমি কবি কালিদাস রায়ের কাছ থেকে আস্‌ছি। তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

—আপনি আসবেন কালিদা আমাকে বলেছেন।

—আমি ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে আমার পি. এইচ্‌-ডি. ডিগ্রির জন্য কবি ভারতচন্দ্র রায়ের উপর গবেষণা করছি। কাগজে আপনাদের ভারতচন্দ্র উৎসবের সংবাদ পড়ে কবির জন্মস্থান নিয়ে আমরা মুস্কিলে পড়েছি। শুনলাম, আপনার বাড়ি তো ঐ অঞ্চলে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে একবার ঐ পেঁড়োয় নিয়ে যেতে পারবেন ?

—তা পারবো না কেন ? সামনের রবিবারেই চলুন। ১৩৩৭ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জন্মস্থান' নামে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ছিলাম, আপনি সেটা পড়েন নি ? এই বলে তখনই 'ভারতবর্ষ' অফিস থেকে পুরনো ঐ সংখ্যাটা নিয়ে মদনবাবুকে দেখালাম।

পরের রবিবার সকালে তাঁকে পেঁড়োয় নিয়ে গেলাম। মদনবাবু সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের ভারতচন্দ্র স্মৃতি রক্ষা সমিতির অপর সম্পাদক ভারতচন্দ্রের বংশধর, ভারতচন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বিজলী ভূষণ রায় মদনবাবুকে দেখালেন—কোথায় রাজবাড়ি ছিল, আর ঠিক কোন্‌ জায়গায় কবি জন্মেছিলেন বলে, কাহিনী চলে আসছে। মদনবাবু কবির জন্ম-স্থান বলে প্রচলিত জায়গাটায় বিজলীবাবুকে এবং আমাকে পাশাপাশি বসিয়ে একটা ফটো তুললেন। তারপর পেঁড়োর গড় ইত্যাদি দেখলেন।

বিজলীবাবুর বাড়িতে জলযোগের পর আমি মদনবাবুকে এবার নিয়ে গেলাম, ৪ কিলোমিটার দূরে দামোদর পার হয়ে গড় ভবানীপুরে। পেঁড়োর রাজাদের এক অংশের রাজধানী ছিল এই ভবানীপুর। এখানে রাজাদের গড় ছিল বলে—আজ নাম হয়েছে গড় ভবানীপুর। গড় ভবানীপুরে সেকালের রাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ইত্যাদি মদনবাবুকে দেখালাম। পরে স্থানীয়

জমিদার আমার বন্ধুস্থানীয় প্রাণধন রায়ের বাড়িতে স্নানাহার সেরে সন্ধ্যার পর কলকাতায় ফিরে এলাম।

পরে দেখেছি, মদনবাবু তাঁর ভারতচন্দ্রের উপর পি. এইচ্ ডি. পাওয়া বইয়ে ভারতচন্দ্রের জন্মস্থানে তাঁর তোলা বিজলীবাবুর ও আমার ফটো এবং ভারতবর্ষে প্রকাশিত আমার 'কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জন্মস্থান' প্রবন্ধেরও কিছুটা দিয়েছেন।

একদিন কালিদার বাড়িতে গিয়ে কালিদাকে বলি দাদা, বিভূতিদা অর্থাৎ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দ্বারভাঙ্গার তাঁর বাসস্থান থেকে হাওড়ায় তাঁর বোনের বাড়িতে এসেছেন। কাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অফিসে এসেছিলেন, এখন তিনি কয়েকদিন থাকবেন। আমাদের সাহিত্য বাসরের পক্ষ থেকে বিভূতিদাকে নিয়ে একটা সভা করতে চাই। বিভূতিদা আর আপনি। একজন সভাপতি আর একজন প্রধান অতিথি। সভা হবে হাওড়া শহরে হাওড়ার সিভিল সার্জন ডাঃ মুনীন্দ্র প্রিয় তালুকদারের কোয়ার্টারে। তিনি আমার বন্ধু স্থানীয়, মুনীন্দ্রপ্রিয়বাবু বৌদ্ধ। তাই সামনের বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন বুদ্ধ-উৎসব হিসাবে সভাটা করবো। আপনাকে যেতেই হবে।

—তুই বলছিস্ যখন, যাব। নিয়ে যাওয়ার এবং ফিরে পৌঁছে দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবি তো?

—নিশ্চয়ই, সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

যথা সময়েই বেশ জাঁকালো সভা হয়েছিল।

একদিন সকালে কালিদার টালিগঞ্জের বাড়ি 'সন্ধ্যার কুলায়' গেছি। গিয়ে দেখি তাঁর নীচের বৈঠকখানা ঘরে (সকালে বৈঠকখানাটা খোলাই থাকতো) এক পাশে সোফা, কৌচ, গড্রেজের আলমারি ইত্যাদি।

আমি গিয়ে কলিং বেল টিপলে কালিদা দোতলার জানালা দিয়ে আমায় দেখে বললেন—বোস্, আমি এখনি যাচ্ছি।

কালিদা নেমে এলে আমি তাঁকে বললাম—কি কালিদা, আজকাল আধুনিক হতে চলেছেন নাকি? আপনার সদরের এই নড়বড়ে তক্তপোষ এবং পুরনো ঐ চেয়ার টেবিল বদলে সোফা কৌচ পাতবেন?

—না-রে ভাই না। মেয়ের বিয়ে, যৌতুক হিসাবে এই সব দিতে হবে।

—দাদা, আপনিও মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিচ্ছেন? আপনি আমার বিয়েতে হাওড়া শহরে বরযাত্রী গিয়ে ছিলেন। আপনি তো তখন সবই শুনেছিলেন যে, আমি আমার বিয়েতে আদৌ পণ নিই নি।[১]

—তুই একটা পাগল। তোর মত পাগল ক'টা আছে বল্?

আমি বললাম—কালিদা সোফা কৌচের চেয়ে তক্তপোষ অনেক ভাল।

তক্তপোষে হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়, দরকার হলে গড়িয়ে নেওয়াও যায়।

—তবে তোকে একদিনের একটা ঘটনা বলি শোন্ গোপাল—একবার দিলীপ রায়ের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু আমার এই বৈঠকখানায় এসে হাজির। দিলীপই সত্যেনবাবুকে সঙ্গে করে আনে। দিলীপের সঙ্গে ওঁর খুব বন্ধুত্ব। সত্যেন বোস এই ঘরে ঢুকে আমার এই তক্তপোষের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। দিলীপ তাঁকে চেয়ারে বসবার কথা বললেন। তিনি বললেন—না দিলীপ এই ভাল, একটু আরাম করে শুয়ে নিই।

তক্তপোষের উপর মাত্র একটা সুজনি পাতা ছিল। আমিও তাঁকে চেয়ারে বসবার জন্য বললাম। তিনি শুয়ে শুয়েই বলতে লাগলেন—কিছু ভাববেন না, আমি বেশ আছি।

আচ্ছা গোপাল, তুই-ই বল্ আমরা কখন কোন অপরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে, এই সরল আচরণ করতে পারবো ? এইরূপ বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তির সরলতা ও অনাড়ম্বর জীবন যাত্রার কথা সাধারণের জানার জন্য লেখা দরকার। যদি পারিস্ তো কোনদিন এই কথাটা লিখিস্।

প্রসঙ্গ এলে নিশ্চয়ই লিখবো দাদা। লেখা দরকার।

দক্ষিণ কলকাতায় কালিদাদের 'রসচক্র' নামে একটা সাহিত্যের আড্ডা ছিল। কালিদারা তাঁদের এই রসচক্রের সভাপতি করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে। কালিদা ছিলেন রসচক্রের সম্পাদক। শরৎচন্দ্র ঐ সময় কলকাতায় থাকলে রসচক্রের আড্ডায় যেতেন, গিয়ে নানা গল্প করতেন।

শরৎচন্দ্র কালিদাকে খুব স্নেহ করতেন। কালিদা দুখণ্ডে 'শরৎচন্দ্র' নামে শরৎ-সাহিত্য আলোচনার বইও লিখেছেন। তিনি তাঁর এই বইএর তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেক সময় শরৎচন্দ্রের নিজের মুখের কথা জেনে নিতেন।

আমি কালিদার বাড়িতে গেলে তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করতাম এবং শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কি সব কথাবার্তা হ'ত তাও জেনে নিতাম। আমার শরৎচন্দ্র ২য় খণ্ড গ্রন্থের 'মৌখিক আলাপ আলোচনা' অধ্যায়ে 'কালিদাস রায়ের সহিত (শরৎচন্দ্রের) আলোচনা' প্রবন্ধে সে সব কথা বলেছি।

প্রসঙ্গ কথা

১. এই প্রসঙ্গে আমার বিবাহের ইতিহাসটা একটু বলে নিই—

কলকাতাবাসী আমাদের গ্রামের এক বিরাট ধনী ব্যক্তির অনুরোধে একবার তাঁর সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করতে যেতে হয়েছিল। গিয়েছিলাম হাওড়া শহরে এক বিখ্যাত উকিলবাবুর বাড়িতে। পাত্র ছিলেন ঐ উকিলবাবুর

শ্যালক। পাত্র ইঞ্জিনীয়ার কিন্তু পিতৃহীন। তাই উকিলবাবুই ছিলেন পাত্রের অভিভাবক।

আমরা গেলে আদর আপ্যায়নের পর আমাদের পাত্রীর পিতা যখন উকিলবাবুর কাছে তাঁর কন্যার বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, তখন উকিলবাবু বললেন—আমার এক এম. এ. পাস অবিবাহিতা শ্যালিকা আছেন। একটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। তাঁর বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত আমার শ্যালকের বিবাহের কথা উঠতেই পারে না।

উকিলবাবুর বাড়িতে প্রচুর জলযোগের পর আমি যখন পাশের বারান্দায় হাত ধুতে যাই, সেই সময় এক ফাঁকে আমাদের গ্রামের ঐ ধনী ভদ্রলোক আমার অগোচরে উকিলবাবুকে বলেন—আপনার এম. এ. পাস শ্যালিকার জন্য পাত্র খুঁজছেন, পাত্র এই তো আমাদের গোপালবাবুই আছেন।

জলযোগের পর আমরা উকিলবাবুর বাড়ি থেকে চলে আসি। পরের রবিবার সকালে দেখি উকিলবাবু স্বয়ং আমার কলকাতার বাড়িতে এসে হাজির। এসে তিনি দু একটা সৌজন্যমূলক কথার পর তাঁর শ্যালিকার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা উত্থাপন করলেন। বললেন—আমার শ্যালিকা ভাল গান জানে। গল্প কবিতা লেখে। দেখতেও ভালই। আশা করি আপনার সুযোগ্যা সহধর্মিণী হতে পারবে।

শুনে বললাম—বিবাহ করতে পারি, যদি বিবাহে একটা পয়সাও যৌতুক হিসাবে বা অন্য কোনওরূপে না দেন।

—আচ্ছা, তাই হবে।

—শুনলাম তো আপনার শ্বশুর মশায় জীবিত নেই। এরূপ ক্ষেত্রে বেশী বরযাত্রী নিয়ে যাওয়াও আমি পছন্দ করি না। বরযাত্রী যাবেন বড় জোর আট দশ জন সাহিত্যিক।

—এতেও রাজি আছি।

উকিলবাবুর সঙ্গে সেদিন এই কথাবার্তার পর গ্রামের বাড়িতে বাবা-মাকে সমস্ত জানালাম। বাবা একদিন কলকাতার বাড়িতে এসে, হাওড়ায় গিয়ে তাঁর ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে এলেন।

এরপর ১৩৬১ সালের ২৮শে মাঘ আমার বিবাহ হয়। সেইদিনই আমার দেওয়া কাহিনী অবলম্বনে 'রানী রাসমণি' ছায়া চিত্রের উদ্বোধন হয় কলকাতার রাধা প্রভৃতি কয়েকটি প্রেক্ষা গৃহে।

আমার বিবাহে কলকাতা থেকে হাওড়া শহরে বিবাহ সভায় বরযাত্রী গিয়েছিলেন—পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন, ঔপন্যাসিক রামপদ মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল, কবি কালিদাস রায় ও দিনেশ দাস। খুব আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতি যেতে পারেন নি।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে মহেশ ভট্টাচার্যের ওষুধের দোকানের রাস্তার দিকের প্রশস্ত উঁচু রকের এক পাশে 'কাত্যায়নী বুক স্টল' নামে একটা বইএর দোকান ছিল। দোকানটা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর বইএর দোকানের নিকটে। ঐ দোকানের মালিক এক সময় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক'টা উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন। তখন তারাশংকরবাবু কখন কখন বিকালের দিকে ঐ দোকানে যেতেন।

সেই সময়েই আমার এক কলেজের সহপাঠী তারাশংকরবাবুকে দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন—উনিই প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারাশংকরবাবুর তখনও মোটর হয় নি। তিনি তখন ট্রামে বাসেই যাতায়াত করতেন।

তখনকার এক দিনের ঘটনা। আমি সেই সবে ভারতবর্ষ পত্রিকায় কাজে যোগ দিয়েছি। থাকি মেসে।

সেদিন কি একটা কাজে শ্যামবাজারে গিয়ে বাসে করে মেসে ফিরছি। পথে যাত্রী ওঠানো-নামানোর জন্য এক জায়গায় আমাদের বাসটা থামলে, এক ভদ্রলোক বাসে উঠে আমার পাশে এসে বসলেন। বাসে আমি যে বেঞ্চটায় বসেছিলাম, সেটা ছিল মাত্র দুজন যাত্রীরই বসার বেঞ্চ অর্থাৎ টু সিটার বেঞ্চ। পাশে চেয়ে দেখি, ইনি আর কেউ নন, স্বয়ং ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন তারাশংকরবাবুকে এইভাবে একেবারে আমার পাশে বসতে দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কোন কথা বলতে সাহস হয়নি।

মেসে ফিরে এসে অহংকার করে মেসের বন্ধুদের বলেছিলাম—বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমি এই মাত্র বাসে পাশাপাশি বসে এলাম।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আমার 'মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান' বইটি প্রকাশিত হয়। তখন আমার খেয়াল হয়—বইটা সম্বন্ধে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির অভিমত নেব। এই ভেবে এই বই একটা হাতে নিয়ে একদিন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যাই। তখন তিনি অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকার অফিসের পাশে আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে থাকতেন। তাঁর বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে ছিলাম আমাদের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার অফিস থেকে।

সেদিন তারাশংকরবাবুর হাতে আমার বইটা দিয়ে একটা অভিমত চাইলে,

বইটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন—বইটা পড়ে দেখি, পড়া হয়ে গেলে আমার অভিমত আমি লিখে ডাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দোব। এই বইয়েতেই তো দেখছি আপনার একটা ঠিকানা রয়েছে।

কয়েকদিন পরেই তিনি আমার নামে একটি চিঠি এবং সঙ্গে আমার ঐ বই সম্বন্ধে তাঁর অভিমত লিখে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁর সেই অভিমতটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

'আপনার 'মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান' পড়লাম। ভারতবর্ষের মানুষ যখন উন্মত্ত আত্মঘাতি, জীবনের পাপ, ক্রোধ, হিংসা যখন প্রলয় তাণ্ডবে দেশকে শ্মশান করে তুলেছিল, তখন সমগ্র ভারতবর্ষের যুগযুগান্তরের কল্প-কল্পান্তরের সাধনাপুণ্য ওই একটি মহামানবের জীবনকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশিত করেছে। তাঁর স্বকীয় আত্মিক শক্তিতে প্রাণময় হয়ে জয়যুক্ত হয়েছে। এই উন্মত্ত হিংস্র অন্ধ পাপ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ভারতের আত্মিক-সাধনার মহনীয় দ্বন্দ্ব বাস্তবের এই ধর্মযুদ্ধকে স্বচক্ষে আপনি দেখেছেন, একক মহারথীর পদচিহ্ন অনুসরণ করেছেন, তাঁর সঙ্গে থাকার পুণ্য অর্জন করেছেন, এ আপনার মহৎ সৌভাগ্য। সেই পুণ্য কথা ভারতের এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়। সেই অধ্যায় রচনার পুণ্য মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করে রাখলেন আপনি আপনার বইখানিতে 'মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানে।'

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার লেখক ছিলেন। এই লেখার ব্যাপারেই তিনি ভারতবর্ষ পত্রিকা অফিসে আসতেন। তখনই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এবং তিনি আগে আমাকে যে 'আপনি' বলতেন, সেটা ত্যাগ করে 'তুমি' বলা শুরু করেন। আর আমিও এখন থেকে তাঁকে তারাশংকরদা বলতে লাগলাম।

এই বইয়ে 'রানী রাসমণি' প্রবন্ধে রানীর বংশধরদের বলে দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসব করা এবং ঐ উপলক্ষে একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশ করারও কথা বলেছি। শতবার্ষিকী উৎসবের শেষ দিনের সভায় তারাশংকরদা প্রধান অতিথি হয়েছিলেন, সেকথাও বলেছি। স্মারক গ্রন্থে বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের লেখা ছিল, একথা বললেও, তাঁর লেখা ছিল বলিনি। স্মারক-গ্রন্থের জন্য তাঁর কাছে পাইকপাড়ায় তাঁর নিজের বাড়িতে লেখা চাইতে গেলে, তিনি আমাকে সামনে বসিয়ে তখনই রানী রাসমণিকে প্রণাম জানিয়ে যে লেখাটি দিয়েছিলেন, স্মারক-গ্রন্থে তারাশংকরদার এই লেখাটাই সর্ব প্রথমে দিয়েছিলাম।

এই প্রণাম প্রসঙ্গেই তখনকার একটা কথা মনে পড়ছে।

শতবার্ষিকী সভার শেষ দিনে যেদিন তারাশংকরদা সভায় প্রধান অতিথি, সেদিনও আমরা সভায় আমন্ত্রিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির হাতে একটি করে শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলাম।

এঁদের একজন, তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বইটা হাতে নিয়ে পাতা উল্টে প্রথমেই তারাশংকরদার সেই প্রবন্ধের কয়েক লাইন পড়েই মহাবিস্মিত হয়ে তাঁর পাশের এক ব্যক্তিকে বলেছিলেন—একজন অব্রাহ্মণ মাহিষ্য জাতির মহিলাকে, তিনি যতই খ্যাতিসম্পন্না হউন, ব্রাহ্মণ তারাশংকর প্রণাম জানালেন!

ঐ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বক্তব্যের শ্রোতা বলেছিলেন—অব্রাহ্মণ হলেও প্রণাম যোগ্যাকে প্রণাম জানানোয় দোষ কোথায়? এতে তো বরং তারাশংকরবাবুর মহত্ত্ব এবং মনের উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার শত বার্ষিকী উৎসবের মাস চারেক পরে তারাশংকরদার সঙ্গে একদিন দেখা হয়। দেখা হ'লে তিনি বললেন—ভাই গোপাল, তুমি তো জান আমি শাক্ত। তা ভাই তুমি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সেবায়েতদের বলে, আমাকে একদিন মা কালীর অন্নভোগের প্রসাদ খাওয়াও।

শুনে আমি বলেছিলাম—দাদা, এই কথা! তা এতদিন বলেন নি কেন? সামনের রবিবারেই আমি ব্যবস্থা করছি। আর শুধু আপনি একা নন, আপনার বাড়ির সকলের জন্যই ঐ দিন মন্দিরে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করবো।

এরপর আমি মন্দিরের সেবায়েতদের পক্ষের সেক্রেটারি গোপীনাথ দাসকে বলে সমস্ত ব্যবস্থা করি।

রবিবার দুপুরের দিকে গোপীনাথবাবু আমার কাছে তাঁর মোটর পাঠিয়ে দিলে, সেই মোটরে এবং তারাশংকরদার নিজেরও মোটরে তিনি এবং তাঁর বাড়ির অনেকেই দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে যান। আমি সঙ্গে থেকে তাঁদের নিয়ে যাই।

এঁদের আহারের সময় মন্দিরে গোপীনাথবাবুও উপস্থিত ছিলেন।

আহারের পর বিশ্রাম নিয়ে এঁদের মন্দিরাদি দেখা হ'লে বিকালে আবার আমি এঁদের বাড়িতে পেঁছে দিয়ে যাই।

এই খাওয়ার প্রসঙ্গে তারাশংকরদার অন্য আর এক জায়গায় এক দিনের খাওয়ার কথা মনে আসছে। সেই কথাটা বলি—

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় প্রতি বৎসর ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম দিনে আমরা বঙ্কিম জন্মোৎসব পালন করি। সেবার ঐ সভায় তারাশংকরদাকে সভাপতি করবো মনস্থ করে তাঁর বাড়িতে যাই। গিয়ে বললে,

তিনি শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন—১৩ই সকালে তোমার ওখানেই ত যাচ্ছি। নৈহাটী থেকে একজন এসেছিলেন—বললেন সকালে সভা।

আমি বললাম—না দাদা সকালের ওটা আমাদের সভা নয়। ওটা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নৈহাটী শাখার সভা। আমাদের সভা বিকালে।

—আমি ভেবেছিলাম, ওটা তোমারই সভা। তাই যাব বলে মত দিয়েছি। এখন কি করি তুমিই বল।

—দাদা, তাহলে এক কাজ করুন। সকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নৈহাটী শাখার বঙ্কিম উৎসবে যোগ দিন, আর বিকালে আমাদের সভায় আসুন। সকালে ওদের সভা শেষ হ'লে আপনাকে আমাদের সংগ্রহশালায় নিয়ে আসবো। সংগ্রহশালার হলে বিছানা করে দোব, সেখানে দুপুরে বিশ্রাম করবেন। আর পাশেই বঙ্কিমচন্দ্রের এক জ্ঞাতির বাড়িতে আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করবো। সংগ্রহশালার সামনেই মাঠে প্যাণ্ডেল করে আমাদের বিরাট সভা। আপনি ছাড়া বনফুল এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও যাবেন।

—সেই ভাল। তাই কর।

বঙ্কিমচন্দ্রের এক জ্ঞাতির বাড়িতে তারাশংকরদার মধ্যাহ্ন ভোজনের কথা বললে, তাঁরা সানন্দে রাজী হলেন। তাঁরা ঐ সঙ্গে আমাকেও সেদিন মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণ করলেন।

দুপুরে যথাসময়ে তারাশংকরদা ও আমি পাশাপাশি বসে খাচ্ছি। গৃহ-স্বামী বাড়িতে নেই, অফিসে গেছেন। সেকালের প্রথা মত গৃহস্বামীর এক প্রৌঢ়া দিদি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাত পাখা নিয়ে আমাদের হাওয়া করছেন বা মাছি তাড়াচ্ছেন! ঐ দিদি কলকাতার এক ধনী ঘরের গৃহিণী। প্রচুর তরি-তরকারীর ব্যবস্থা, সঙ্গে এক খণ্ড বড় ইলিশ মাছ ভাজাও দেওয়া হয়েছে।

আমি তখন নিরামিশ ভোজী ছিলাম। তাই আমার পাতে মাছ নেই। তারাশংকরদা অন্য মাছ খাওয়ার পর যখন ভাজা ইলিশ মাছটি বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছেন—তখন ঐ দেখে প্রৌঢ়া দিদি তারাশংকরদাকে বললেন—আর একটা ইলিশ মাছ ভাজা এনে দিই ?

শুনে তারাশংকরদা বললেন—হ্যাঁ, আর একটা ইলিশ মাছ ভাজা এনে দিন।

ভদ্র মহিলা পাখা রেখে ভ্রাতৃবধূর রান্না ঘর থেকে একটা ইলিশ মাছ ভাজা আনতে গেলেন। কিন্তু আর ফিরলেন না।

তারাশংকরদা এবং আমি উভয়েই বুঝলাম—ইলিশমাছ ভাজা ঐ একখণ্ডই হয়েছিল। আমি যে নিরামিশ ভোজী এ কথা ওঁদের আগেই জানিয়ে দিয়ে ছিলাম।

ভদ্রমহিলা মাছ আনতে গিয়ে, মাছ না পেয়ে আমাদের সামনে আর আসতেই পারলেন না।

ঐ এক খণ্ডের বেশী ইলিশ মাছ ভাজা আর না থাক, তবে অন্য আয়োজন প্রচুর ছিল। আমরা দুজনে চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়লাম।

এবার সেদিনের বঙ্কিম-স্মরণ সভার কথা বলি—আমাদের ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা আছে। এখানে প্রতি বছর বঙ্কিমচন্দ্রদের রথের মেলা বসে। এখানে বেশ বড় একটা প্যাণ্ডেল করে সেদিনের সভা হয়েছিল। সভায় তারাশংকরদা সভাপতি। বনফুল ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি।

সভায় প্রচুর লোক হয়েছিল। তারাশংকরদার বক্তৃতা খুবই ভাল হয়েছিল।

এরপর নানা সূত্রে নানা স্থানে তারাশংকরদার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হয়েছে। এখানে দু-একটার উল্লেখ করছি—

১. ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে ভূদান নেতা আচার্য বিনোবা ভাবে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরের অদূরে বলরামপুর আশ্রমে আসেন। সেখানে তিনি একদিন বাংলার সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের আহ্বান করে কিছু ভাষণ দেন। সেই সম্মেলনে তারাশংকরদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আচার্য ভাবের ভাষণের পর, তিনি আমাদের পক্ষ থেকে সভায় কিছু বলেছিলেন।

২. হাওড়া শহরের এক বিখ্যাত রোভার ক্লাব-এর সদস্যরা তাঁদের হাতে লেখা এক বিশেষ সংখ্যা পত্রিকার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাকে সভাপতি করে নিয়ে যান। সভা শেষে তাঁরা আমাকে অনুরোধ করেন—আমাদের এই পত্রিকা সম্বন্ধে কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের মতামত যদি সংগ্রহ করে দেন তো বড় উপকার হয়।

তাঁরা একদিন ঐ পত্রিকা নিয়ে আমার কলকাতার বাড়িতে এলে, আমি তাঁদের নিয়ে প্রথমেই তারাশংকরদার কাছে যাই এবং তাঁকে দিয়ে ঐ পত্রিকা সম্বন্ধে পত্রিকাতেই একটা অভিমত লিখিয়ে নিই।

৩. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকের কক্ষে একদিন তারাশংকরদার সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন—ভাই গোপাল, কদিন তোমার কথাই ভাবছিলাম।

বললাম—কেন দাদা ?

—তুমি তো জানই আমি শাক্ত। দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর প্রসাদও খাইয়েছিলে একদিন, তা আর একটা কাজ কর না। কালী মন্দিরের পুরোহিত এবং মন্দিরের সেবায়েতদের বলে—মা ভবতারিণীর সামনে বসে যাতে কিছুক্ষণ করে সাধনা করতে পারি, তার একটা ব্যবস্থা করে দাও না।

রানী রাসমণির বংশধর আমার বিশেষ পরিচিত গোপীনাথ দাস তখন আর সেবায়েতদের পক্ষ থেকে মন্দিরের কর্মকর্তা ছিলেন না। অন্য যিনি কর্মকর্তা হন, তাঁর সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাই তারাশংকরদার এ কথাটা আর রাখতে পারি-নি।

গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে জাপান হয়ে আমেরিকা যাবার পথে রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন। এর পরদিন ৮ই তারিখে রেঙ্গুনের প্রবাসী বাঙ্গালীরা স্থানীয় জুবিলী হলে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানান। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গলায় লেখা যে মানপত্রটি দেওয়া হয়েছিল, সেটি শরৎচন্দ্রের রচনা। সেদিনের সভায় উদ্বোধন সংগীত গাইবার কথা ছিল শরৎচন্দ্রের, কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ দৌর্বল্যবশতঃ শেষ পর্যন্ত গান গাইতে রাজী হন নি এবং এই কথা ঠিক রাখতে না পারার জন্য লজ্জায় তিনি সভাতেও যান নি। তবে কয়েক মাস পরে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পথে আবার রেঙ্গুনে এলে সেদিন বেঙ্গল সোসাল ক্লাবে শরৎচন্দ্র-সহ তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর আমেরিকা ও হনলুলু ভ্রমণের গল্প শুনেছিলেন।

গিরিনবাবু তাঁর এই 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থেই লিখেছেন—শরৎচন্দ্র ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে চিরকালের জন্য ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করে দেশে চলে এসেছিলেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' পড়ে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ হনলুলুতে গিয়েছিলেন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারির শেষ দিকে।

গিরিনবাবুর কথা অনুযায়ীই শরৎচন্দ্র যদি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে চিরকালের জন্য দেশেই চলে আসেন, তাহলে তিনি রেঙ্গুনে বেঙ্গল সোসাল ক্লাবে বসে রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর আমেরিকা ও হনলুলু ভ্রমণের কাহিনী শুনতে পারেন না।

শরৎচন্দ্রের তখনকার গ্রন্থ সমূহের দুই প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও সুধীরচন্দ্র সরকারকে লেখা শরৎচন্দ্রের ঐ সময়কার চিঠি এবং শরৎচন্দ্রের আর এক বন্ধু সতীশচন্দ্র দাসের 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শরৎচন্দ্র ১৯১৬ সালের ৭ই মের আগে এপ্রিল মাসেই রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসেন।

যাই হোক্, গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে যেমন লিখেছেন, রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের দেখা হয়েছিল, তেমনি তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া মানপত্রটি শরৎচন্দ্রের রচনা বলে তাঁর বইয়ে ছেপেও দিয়েছেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত

রচনাবলী' নামে একটি বই আছে। ব্রজেনবাবু তাঁর ঐ বইয়ে গিরীন্দ্রনাথ সরকারের বই থেকে রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত বাংলায় লেখা মানপত্রটি শরৎচন্দ্রের রচনা বলে হুবহু উদ্ধৃত করেছেন।

গিরিনবাবু লিখেছেন—রবীন্দ্র সম্বর্ধনা সভায় উদ্বোধন সংগীত গাইবার কথা ছিল শরৎচন্দ্রের, কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত গাইতে রাজী হন নি। লজ্জায় ঐ সভায় যেতে পারেন নি।

ব্রজেনবাবু গিরিনবাবুর লেখাই উদ্ধৃত করতে গিয়ে কিন্তু ভুল করে লিখেছেন, শরৎচন্দ্র ঐ রবীন্দ্র সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

১৩৬০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার মানপত্রটি কি শরৎচন্দ্রের রচিত?' নামে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। ঐ প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম—রবীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে যাওয়ার অনেক আগেই শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ছেড়ে চলে আসেন। তিনি রেঙ্গুন ছেড়ে আসার আগেও যদি মানপত্র লিখে দিয়ে আসেন, তাহলেও গিরিনবাবুর তথা ব্রজেনবাবুর বইয়ের ঐ মানপত্র শরৎচন্দ্রের অবিকল রচনা নয় বলেই মনে হয়। আমি এ জন্য মানপত্রের ভাষা ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করি।

চৈত্র সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, এর পরের মাসে অর্থাৎ ১৩৬১ সালের বৈশাখ মাসে 'শনিবারের চিঠি'তে ঐ পত্রিকার সম্পাদক সজনীকান্ত দাস আমাকে আক্রমণ করে লেখেন—

'মৃত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এখন বিভিন্ন পালোয়ান খাঁড়ার ঘা মারিতেছেন। সেদিন ভারতবর্ষে দেখিলাম, তরুণ শ্রী গোপাল রায় প্রমাণই করিয়া ফেলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে রেঙ্গুনে যে মানপত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহা শরৎচন্দ্রের রচনা—ব্রজেন্দ্রনাথের এই উক্তি ভ্রান্ত। কারণ, ওই মানপত্রের ভাষা নাকি শরৎচন্দ্রের হইতে পারে না। ভাষা লইয়া দীর্ঘকাল কারবার করিতেছি। বহু ভাষাভাষী শরৎচন্দ্রকে অধ্যয়নও কম করি নাই। কিন্তু মানপত্রটির মধ্যে এমন কিছুই অশরৎচন্দ্রীয় ভাষা নাই, যাহাতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, উহা শরৎচন্দ্রের রচনা নহে। ব্যক্তিগত সাহিত্য বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া প্রবীণ ব্রজেন্দ্রনাথকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা 'বর্ণপরিচয়ে'র গোপালোচিত হয় নাই।'—(সংবাদ সাহিত্য, পৃঃ ১০৭)

বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ বইয়ে গোপাল সম্বন্ধে লিখেছেন—গোপাল অতি সুবোধ বালক।

সজনীবাবু তাঁর শনিবারের চিঠিতে আমার বিরুদ্ধে যখন ঐ কথা লেখেন, তখনও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তাই গোপাল নামক এই আমি সুবোধ কি অবোধ তা তাঁর জানার কথা ছিল না। তবে আমি যে তখন বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় নই, তরুণ, এটা হয়ত তিনি কারও কাছে জেনে-

ছিলেন। সজনীবাবু তখন আমাকে 'বর্ণপরিচয়ে'র গোপাল ব'লে সম্ভবত সাহিত্যে আমার 'বর্ণপরিচয়' বা সাহিত্যে হাতেখড়ি—এই কথাই বলতে চেয়ে ছিলেন।

'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ সাহিত্যে আমার বিরুদ্ধে সজনীবাবুর ঐ লেখা পড়ে আমি তখন ১৩৬১ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরৎ-পরিচয়' নামে একটা প্রবন্ধ লিখি। ব্রজেনবাবুর 'শরৎ পরিচয়' গ্রন্থের প্রকাশক সজনীবাবু নিজে। আমার এই প্রবন্ধে ব্রজেনবাবুর ঐ বইয়ে যত রকমের ভুল আছে, তা দেখিয়ে দিই।

আমার প্রবন্ধ পড়ে সজনীবাবু তাঁর শনিবারের চিঠিতে আমার বিরুদ্ধে কিন্তু কিছু লিখলেন না। না লিখে তিনি নিজে একদিন আমার সন্ধানে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে আসেন এবং আমার খোঁজ করেন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স দোকান যাঁদের, তাঁরাই 'ভারতবর্ষ' পত্রিকারও মালিক। একতলায় দোকান।

সজনীবাবুর সঙ্গে সেদিন আমায় পরিচয় হ'ল। তিনি সস্নেহে আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন—ভাই, ব্রজেনদার ঐ ভুলগুলো সম্বন্ধে লিখো, ব্রজেনদার চোখ এড়িয়ে গেছে।

সজনীবাবুর সঙ্গে সেদিন আরও কয়েকটা কথা হ ল। তাঁর ব্যবহারে খুবই খুশী হলাম।

এই সময় আমাদের সামনেই বসা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানের ম্যানেজার আমার এম. এ. ক্লাসের সহপাঠী গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য সজনীবাবুকে বললেন—কেন গোপালের সঙ্গে লেগেছেন? ওর সঙ্গে পারবেন না।

সজনীবাবু দোকান থেকে বেরিয়ে সামনেই রাস্তার উপর দাঁড়ান তাঁর নিজের মোটরে গিয়ে উঠলেন। আমি তাঁর সঙ্গে মোটরের গা পর্যন্ত গিয়ে, ফিরে ভারতবর্ষ কার্যালয়ে চলে এলাম।

এর এক বছর পরের কথা। সজনীবাবুর সঙ্গে আমার আর দেখাও হয়নি। ইতিমধ্যে ১৩৬১ সালের শেষ দিকে তখনকার কলকাতার বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন সংস্থা 'সিগনেট প্রেস' থেকে আমার 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' বইটি প্রকাশিত হয়েছে।

১৩৬১ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীবাবু আমাকে বলেছিলেন—বর্ণপরিচয়ের গোপাল, ১৩৬২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে পুস্তক পরিচয় বিভাগে আমার 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' বই সম্বন্ধে লিখলেন—

'গল্প-উপন্যাসের যাদুকর শরৎচন্দ্র বৈঠকী গল্পেও ওস্তাদ ছিলেন।

আমাদের কালের অনেকের তাঁহার বৈঠকী গল্প শোনার দুর্লভ সৌভাগ্য হইয়াছে। কিন্তু ভাবী কালের শরৎ-ভক্তদের জন্য সেগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করার কষ্ট কেহই স্বীকার করেন নাই। সাময়িক পত্রে বা দুই একটি পুস্তকে বিচ্ছিন্নভাবে কেহ কেহ দুই একটি গল্প ধরিয়া রাখিয়া আরও গল্প শুনিবার আগ্রহ-ই বাড়াইয়া দিয়াছেন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে একনিষ্ঠ গবেষক শ্রীমান গোপালচন্দ্র প্রভৃত যত্ন ও পরিশ্রমে এতদিনে অনেক-গুলি বৈঠকী গল্প সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলেন। সহৃদয় শরৎচন্দ্র, তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে অনেকখানি বিধৃত হইয়া আছেন। কিন্তু হাস্য-রসিক ও বৈঠকী-গাল্পিক শরৎচন্দ্রকে তাঁহার রচনার মধ্যে খুব কমই পাই। অথচ তাঁহার এই দিকটা ভাল জানা না থাকিলে মানুষ শরৎচন্দ্রকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নয়। গোপালচন্দ্র এই অভাব পূরণ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য রসিকদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। এখনো অনেক হয়তো বাকি রহিল। কিন্তু এই পুস্তকে যতটুকু পাইলাম, তাহাতেই শরৎচন্দ্রকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিবার ও জানিবার সুযোগ হইল। সংগ্রহকারের মত আমরাও মনে করি 'এই বৈঠকী গল্পগুলি থেকে শুধু মানুষ শরৎচন্দ্রকেই নয়, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রেরও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।'

গল্পগুলি যে ভাষা ও ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে গোপালচন্দ্রের সাহিত্যিক মুন্সীয়ানার পরিচয় পাইলাম। ছাপাই, বাঁধাই চমৎকার, কিন্তু মলাটের ছবিখানি সঙ্গত হয় নাই।'

আমার এই বইএর মলাটের ছবিটি ছিল বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিক, আজকের বিশ্ববিখ্যাত চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের আঁকা।

বইএর মলাটের এই ছবিটি সম্বন্ধে সজনীবাবুর মত অন্য একজনকেও বলতে শুনেছি—বৈঠকী গল্প বলার ভঙ্গীর ছবিটি না হয়েছে শরৎচন্দ্রের, না হয়েছে গোপালচন্দ্রের। এঁরা যাই বলুন—এই ছবি প্রকাশক দিলীপ কুমার গুপ্তর তো বটেই, আমারও খুবই ভাল লেগেছিল। যাই হোক্, সত্যজিৎবাবুর আঁকা সেই বিতর্কিত ছবিটি পাঠক-পাঠিকাদের দেখার জন্য আমার এই বইয়ে দিয়েছি।

শনিবারের চিঠির গ্রন্থ বিভাগে আমার বই সম্বন্ধে সজনীবাবু এই যে লেখেন, এ তিনি স্বেচ্ছায় লিখেছিলেন। বই সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন কিছুই লেখার প্রয়োজনই ছিল না। কারণ, আমি জানি, এই বইয়ের প্রকাশক সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত তখন প্রত্যেক পত্রিকা অফিসেই এই বই পাঠিয়ে ছিলেন; কিন্তু বইয়ের প্রথমেই পুস্তানির পাতায় পরিষ্কার লিখে দিয়ে-ছিলেন—'সমালোচনার জন্য নহে'।

তবুও সজনীবাবু আমার বই সম্বন্ধে ঐ কথা লিখেছিলেন। এরপর

থেকেই সজনীবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং আমিও তখন থেকে তাঁকে সজনীদা বা দাদা বলে ডাকতাম।

সাহিত্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সজনীদার পাইকপাড়ার বাড়িতে অনেকবার গেছি। প্রতিবারই তিনি সমাদর করে আপ্যায়িত করেছেন।

১৩৬২ সালের আশ্বিন মাসে বহরমপুর থেকে প্রকাশিত 'পরিক্রমা' সাপ্তাহিক পত্রিকার এক সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের একটি দীর্ঘ চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিটি শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ২২. ২. ১৯০৮ তারিখে বাল্যবন্ধু বিভূতি-ভূষণ ভট্টকে লিখেছিলেন। ঐ চিঠিতে এক রজক-কন্যার সঙ্গে ১৮ মাস ব্যাপী শরৎচন্দ্রের দাম্পত্য-প্রেমচর্চার কাহিনী রয়েছে।

'পরিক্রমা' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের ঐ চিঠিটি পড়ে সজনীদা তাঁর ১৩৬২ সালের আশ্বিন সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে সংবাদ সাহিত্য বিভাগে তাঁর কল্পিত গোপালদার বক্তব্য দেখিয়ে লিখেছিলেন—

'তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) জীবিত কালেই মাতুল সুরেন্দ্রনাথ বারম্বার তাঁহাকে 'আজন্ম ব্রহ্মচারী শরৎচন্দ্র' বলিয়া উল্লেখ করিয়া ছিলেন। তিনি তারিয়া তারিয়া বিশেষণটি পরিপাক করিয়া ছিলেন। প্রতিবাদে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীনরেন্দ্র দেব, গিরীন্দ্রনাথ সরকার, কানাই লাল ঘোষ প্রভৃতি মারফৎ জানা গেল, 'আজন্ম-ব্রহ্মচারী'র এক নয়, একাধিক বিবাহ হইয়াছিল। নানা বিভ্রান্তিকর গুজবের একটা মীমাংসা করিয়া দিয়া-ছিলেন শেষ শরৎ-গবেষক অত্যুৎসাহী শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র রায়। ভারতবর্ষ ১৩৬১ অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র পর্যন্ত পাঁচ মাস গভীর গবেষণার দ্বারা তিনি নিঃশংসয়ে প্রমাণ করিয়া দেন, শরৎচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল ১৯০৫-৬ সনে মেদিনীপুরের কৃষ্ণ অধিকারীর (চক্রবর্তী) কন্যা মোক্ষদা দেবীর সহিত। ইনিই বর্তমানে হিরণ্ময়ী দেবী নামে পরিচিত। বিবাহ হয় রেঙ্গুনে। এই প্রমাণের পর আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিলাম। হঠাৎ শরৎচন্দ্রের আবাল্য ভক্ত অনুজোপম পুঁটু অর্থাৎ শ্রীবিভূতি-ভূষণ ভট্ট মহাশয় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের একখানি পত্ররূপী কাল সাপ তাঁহার পুরাতন ঝাঁপি হইতে বাহির করিয়া এ কী কাণ্ড বাধাইলেন।...চিঠিখানির তারিখ ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯০৮। চিঠি জাল না হইলে, ওই দিন পর্যন্ত কোনও ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত শরৎচন্দ্রের বিবাহ হয় নাই, তাহা নিশ্চয় এবং পরবর্তী আঠারো বৎসরের মধ্যে যে বিবাহ হইবে না সে প্রতিজ্ঞাও করা হইয়াছে। ইহা নেশাখোরের উক্তিও নয়। কারণ, এই চিঠিতেই শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন—'মাস ছয়েক মদ খাই নাই।' তবে ?

গোপালদার এই 'তবে ?' র জবাব দিতে পারেন শ্রীমান গোপাল রায়। আমরা তাঁহারই শরণাপন্ন হইতেছি।'

'শনিবারের চিঠি'তে সজনীদার এই লেখা পড়ে তখন পুণা (বর্তমান নাম পুণে) থেকে সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে জানতে চেয়ে আমাকে এক চিঠিতে লিখে ছিলেন—ব্যাপার কি ?

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বারম্বার শরৎচন্দ্রকে 'আজন্ম ব্রহ্মচারী শরৎচন্দ্র' বলেছেন, এ কথা ঠিক নয়। শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে সুরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়িতে গেছেন, শরৎচন্দ্রের কলকাতার বাড়িতেও এসেছেন। দু জায়গাতেই তিনি দেখেছেন, শরৎচন্দ্র স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে নিয়ে সুখে বসবাস করছেন। সুরেনবাবু হিরণ্ময়ী দেবীকে 'বড় মা' বলে সম্বোধন করতেন।

সজনীদা যে লিখেছেন—আমি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছি, শরৎচন্দ্রের বিবাহ হয়েছিল ১৯০৫-৬ সনে— একথাও ঠিক নয়। ভারতবর্ষ পত্রিকায় পাঁচ মাস ধরে আমি যে 'শরৎচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গ' নামে প্রবন্ধ লিখি, তাতে কোথাও এ কথা বলিনি। আমার শেষ কিস্তির লেখায় অর্থাৎ চৈত্র মাসের লেখায় আমি শুধু বলেছিলাম —

'শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীকে আমি যা দেখেছি এবং তাঁর সম্বন্ধে আমি যা শুনেছি, তাতে জানি যে, তিনি একজন অত্যন্ত সরল স্বভাবা, নিষ্ঠাবতী ও ধর্মশীলা মহিলা। তিনি তাঁর জীবনভোর পুজো-পার্বণ ও জপতপ নিয়েই আছেন। হিরণ্ময়ী দেবীর বয়স যখন অল্প ছিল, তখন থেকেই তাঁর জীবনে এই ধর্মভাব দেখা দেয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে, বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীর এই জপতপ ও পুজো পার্বণের কথা উল্লেখ করে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে রেঙ্গুন থেকে তখন এক পত্রে লিখেছিলেন—'ইনি তো দিনরাত পুজো আচ্চা নিয়েই আছেন।'

সজনীদা যে লিখেছেন—'২২. ২. ১৯০৮ তারিখ পর্যন্ত কোনও ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত শরৎচন্দ্রের বিবাহ হয় নাই তাহা নিশ্চয়'—এ কথাটাকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নেশাখোরের উক্তি নয় বলে সজনীদা যে লিখেছেন—'পরবর্তী আঠার বৎসরের মধ্যে যে বিবাহ হইবে না, সে প্রতিজ্ঞাও করা হইয়াছে'—এ 'প্রতিজ্ঞা' বা উক্তি একটা কথার কথা মাত্র।

শরৎচন্দ্র চিঠিতে লিখেছিলেন—

'আমার ইতিহাস একটু শুনিবে ? মধ্যে এই রেঙ্গুনে দাম্পত্য-প্রেমচর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম, পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ (!) বাধিয়া গেল এবং মান ভঞ্জনের পূর্বেই দেখিলাম, গৃহিণী আমার অভিমানভরে আর একজন সুপাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। কাজেই আমি আমার পোঁট্‌লা-

পুঁটুলি ঘাড়ে করিয়া এই ৩৬ নম্বর গলির চারতলার একটা ঘর ভাড়া লইয়া বিছানা পাতিয়া চিৎ হইয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

এটা যে কি হইয়া গেল, আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধূ আমার ব্রহ্মদেশিনী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী। যখন শুনিলাম, তিনি রজক-কন্যা, তখন কান মলিয়া, এক হাত নাকখত্ দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিনই মেডিকেল সার্টিফিকেট দিয়া প্যাসেজ বুক করিয়া বিরহ জ্বালা শান্ত করিতে হংকং চলিয়া গেলাম। ফিরতি পথে কলিকাতায় গিয়াছিলাম মাত্র। শুনিয়াছি, চণ্ডীদাস নাকি ঐ রকম কি একটা করিয়া মাথুর লিখিয়া ছিলেন, আমিও স্থির করিয়াছি, বহুপূর্বে 'চরিত্রহীন' বলিয়া যেটা সুরু করিয়া ছিলাম, এইবার সেটা শেষ করিব।

দেশে গিয়াও সুখ পাই নাই। একবার ওলাউঠা হইল, কতদিন হাসপাতালে অপারেশন হইয়া পড়িয়া রহিলাম। আর সবচেয়ে জ্বালাতন করিয়াছিল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দল। গায়ের চামড়া খাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। আমার দুঃখের দিনে তাঁহারা যে কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু আজ নিশ্চিন্ত হইয়া বাকি দিন ক'টা কাটাইয়া দিবার যেই সময় আসিয়াছে, অমনি দয়া করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহারা কোন্ অজ্ঞাত স্থান হইতে যে বাহির হইতেছেন, নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার ত নাই!

আমি গৃহ, গৃহিণী, প্রণয় ও বিরহ এই আঠার মাসের মধ্যে এমনি পুরাদমে ভোগ করিয়া লইয়াছি যে, তাহা হজম করিতে অন্ততঃ আঠার বৎসর লাগিবে। ইহার পরেও যদি বাঁচিয়া থাকি, ওদিকে চাহিব—এখন নয়।

মাস ছয়েক মদ খাই নাই—শরীরটা যেন একটু সুস্থবোধ করি—আর যদি না খাই ত বোধ হয় বেশ সারিয়া যাইব।'

শরৎচন্দ্রের লেখা এই চিঠিটি নিয়ে সজনীদা আমার শরণাপন্ন হলে, আমি তখন এ সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য লিখে তাঁকে দিয়েছিলাম। সেই লেখার মধ্যে—আমি কোথাও নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিই নি শরৎচন্দ্র ১৯০৫/৬ সনে হিরণ্ময়ী দেবীকে বিবাহ করেছিলেন ইত্যাদি কথাও ছিল।

আমার লেখাটা পড়ে সজনীদা যখন দেখলেন, তাঁর লেখায় দু একটা ভুল হয়েছে, তখন তিনি আমাকে বললেন—ভাই, এ নিয়ে আর কিছু আলোচনা না করাই ভাল, কি বল!

আমি বললাম—সেই ভাল। থাক, এ লেখা আর ছেপে কাজ নেই।

পরে আমার শরৎচন্দ্র ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) গ্রন্থে 'উচ্ছৃঙ্খল জীবন' অধ্যায়ে এবং আমার শরৎচন্দ্র—৩য় খণ্ড বা শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী গ্রন্থে এই চিঠি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

এরপর সাহিত্য সংক্রান্ত ব্যাপার ইত্যাদি নিয়ে সজনীদার বাড়িতে অনেকবার গেছি। সমাদর করে বসিয়েছেন এবং সাহিত্য প্রভৃতি নিয়ে আলোচনাও করেছেন। সভা সমিতি প্রভৃতি নানা জায়গায়ও তাঁর সঙ্গে কতবার দেখা হয়েছে, সর্বত্রই তিনি আমাকে ছোট ভাই-এর মত স্নেহের চোখে দেখেছেন।

প্রসঙ্গ কথা

১. রবীন্দ্রনাথকে প্রদত্ত মানপত্রটি এবং ঐ মানপত্র সম্পর্কে আমার বক্তব্য এখানে দিলাম—

রেঙ্গুনে রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা

জগৎবরেণ্য—

শ্রীযুক্ত স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট্‌ ডি-লিট,

মহোদয় শ্রীকরকমলেষু—

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব কবি-প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং নব সুরে, নব রাগিণীতে বঙ্গ-হৃদয়কে এক নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্যকলার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্যবীণায় সহস্র অনির্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অনাদিগাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব-হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অণুপরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে এবং এক অপরিচ্ছিন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগবিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি।

আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সংগীতে যে মহান আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এক অমৃত সত্তার আনন্দরসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ-উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দ-গীতি নিখিল মানব হৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমোহন কাব্যবীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা।

ইতি—

রেঙ্গুন
২৫শে বৈশাখ
১৩২৩ বঙ্গাব্দ

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
রেঙ্গুন প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানগণ

এখানে মানপত্রটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্রের ভাষায় যে সহজবোধ্যতা, সরলতা ও মিষ্টতা রয়েছে, মানপত্রটির মধ্যে যেন তা নাই। তাছাড়া মানপত্রটির ঐ অল্পমাত্র লেখার মধ্যেই বহুবার 'নব নব', ৭ বার 'আনন্দ', ৬ বার 'হৃদয়' এবং একাধিকবার 'নিখিল', 'কাব্যবীণা', 'আলোক' প্রভৃতি ব্যবহৃত হওয়াতেও বেশ বোঝা যায় যে এ হয়ত শরৎচন্দ্রের রচনা নয়। কেন না একটুমাত্র পরিসরের মধ্যে একই শব্দের এত বেশি ব্যবহার শরৎচন্দ্র কোথাও কখন করেন নি। আর অসমাপিকা ক্রিয়া প্রভৃতি দিয়ে টেনে টেনে অত বড় বড় বাক্যও তিনি লেখেন নি। এমন কি তাঁর বাল্য রচনার মধ্যেও এই সব চোখে পড়ে না। আর এই মানপত্রের মধ্যেকার 'পরিস্পন্দিত' শব্দটি দেখেও মনে হয় যে, এটি শরৎচন্দ্রের রচনা নয়। কেননা সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে কোথাও 'পরিস্পন্দিত' শব্দ দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। অবশ্য রেঙ্গুনের মানপত্রটির লেখা ভাল কি মন্দ সে আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, এটি অবিকল শরৎচন্দ্রের রচনা কিনা?

গিরিনবাবুর বইএর এই মানপত্রটি সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের আরও কারণ—গিরিনবাবুর লেখায় রেঙ্গুনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই কিছু ভুল উক্তি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালে তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থেরই প্রকাশক ছিলেন 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স'। তাঁর বহু লেখাও বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে এঁদের 'ভারতবর্ষ'' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শরদিন্দুবাবু থাকতেন বোম্বাই-এর পুণা শহরে। তিনি কলকাতায় এলেই 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' এবং ভারতবর্ষের'রও মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দে া করবার জন্য এঁদের দোকানে আসতেন। এলে ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে যেতেন।

ভারতবর্ষ অফিসে এসে আমাদের সঙ্গেও কথাবার্তা বলতেন। আমরা তাঁকে শরদিন্দুদা বলতাম।

১৩৫৮ সালের শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তিনি একবার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে এসে ভারতবর্ষ অফিসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তখন ভারতবর্ষ পত্রিকায় তাঁর 'কানামাছি' ধারাবাহিক রচনাটি প্রকাশিত হচ্ছিল।

সেদিন আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি শরদিন্দুদাকে জিজ্ঞাসা করি—দাদা, এবার কলকাতায় কতদিন থাকবেন?

—বেশী দিন থাকবো না। আর ৪/৫ দিন আছি।

এই শুনে আমি ফণিদাকে বললাম—ফণিদা তাহলে আমাদের সাহিত্য বাসর থেকে শরদিন্দুদাকে একটা সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করি।

শরদিন্দুদা বললেন—ওসব আবার কেন?

বললাম—আমাদের দরকার আছে।

ফণিদা বললেন—এই অল্প সময়ের মধ্যে সভা করতে পারবে?

বললাম—খুব পারবো।

ঐ সময় পাটনা-প্রবাসী প্রবীণ ঔপন্যাসিক মানিক ভট্টাচার্যও কলকাতায় এসেছেন জেনে—শরদিন্দুদাকে এবং তাঁকে এক সঙ্গে সম্বর্ধনা জানিয়ে ছিলাম। বেশ জাঁক-জমকেই সভা হয়েছিল—হাতিবাগান বাজারের উপর কালীশ মুখোপাধ্যায়ের রূপমঞ্চ অফিসে।

সেদিনের এই সভা সম্বন্ধে ১৩৫৮ সালের আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষ পত্রিকায় সাময়িকীতে আমরা লিখেছিলাম।—

'শরদিন্দু ও মানিক সম্বর্ধনা

গত ১লা আগস্ট তারিখে কলিকাতায় 'রূপমঞ্চ' কার্যালয়ে বোম্বাই-প্রবাসী

বিখ্যাত কথা-সাহিত্যিক ও চিত্রনাট্যকার শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাটনা-নিবাসী প্রবীণ ঔপন্যাসিক শ্রীমানিক ভট্টাচার্যকে সাহিত্য বাসরের এক সভায় সম্বর্ধিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্র-নাট্যকার ও চিত্র পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্য বাসরের পক্ষ হইতে শ্রী গোপালচন্দ্র রায় শরদিন্দুবাবু ও মানিকবাবুকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এবং শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুমথনাথ ঘোষ, অখিল নিয়োগী, দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল ও ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় তাঁহাদের কণ্ঠ সংগীতে সভায় সকলকে তৃপ্তি দান করেন।'

সেদিনের সভা সম্বন্ধে এই কথা লেখা হলেও, সভার একেবারে শেষ অংশের একটা কথা ঐ 'সাময়িকী'তে সেদিন লেখা হয়নি। সে কথাটা হ'ল—সভা যখন শেষ হয়ে গেছে, সকলেই উঠবো উঠবো করছেন, এমন সময় হঠাৎ যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার এসে হাজির। তিনি বললেন—নানা কারণে আসতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। যাক্, তবুতো এসেছি।

আমরা বললাম—এসেছেন যখন, তখন সভার শেষটাকে আর একটু মধুরেণ সমাপয়েৎ করুন। কয়েকটা ম্যাজিক দেখান।

আমাদের কথায় যাদু সম্রাট তখনই তাঁর হাতের একটা ছুরি, পকেটের কিছুটা দড়ি, আরও সঙ্গের কি সব টুকি টাকি জিনিস নিয়ে যাদু দেখালেন।

সভা চলাকালে সভার একটা ছবি কালীশবাবু তুলেছিলেন। সভা শেষে জলযোগের পর প্রায় সকলেই চলে গেলে, কালীশবাবু শরদিন্দুদা, মানিক-বাবু ও ফণিদাকে বসিয়ে এবং এঁদের পিছনে দেবনারায়ণ গুপ্তকে, আমাকে এবং আরও কয়েকজনকে দাঁড় করিয়ে একটা গ্রুপ ফটো তুলে ছিলেন।

শরদিন্দুদা আমাকে ছোট ভাই-এর মত ভেবে অত্যন্ত স্নেহ করতেন বলে প্রতি বছর পুজোর সময় বিজয়ার পর বিজয়ার প্রণাম জানিয়ে চিঠি দিতাম। তিনিও বিজয়ার আশীর্বাদ জানাতেন।

তিনি কলকাতায় এলে এখানে বালিগঞ্জে কেয়াতলা লেনে তাঁর পুত্রের বাসায় থাকতেন। তাঁর পুত্র হাওড়া শহরে গেস্‌কিন উইলিয়মস কোম্পানীর একজন বড় অফিসার ছিলেন।

যে বছর আনন্দবাজার পত্রিকার পূজা সংখ্যায় শরদিন্দুদার 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়, সে বছর তিনি পুজোর সময় কলকাতায় তাঁর পুত্রের বাসায় ছিলেন। সেবার ঐ কেয়াতলায় গিয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে এসেছিলাম এবং তুঙ্গভদ্রার তীরে' যে অপূর্ব হয়েছে, সে কথাও তাঁকে জানিয়ে এসেছিলাম।

তিনি বলেছিলেন—এই প্রথম তুমিই আমার ঐ লেখার প্রশংসা করে গেলে।

ঐ সময় আরও কয়েকদিন কেয়াতলা লেনে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবার জন্য তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

আমার লেখা নতুন কোন বই প্রকাশিত হলে, আমি সে বই পড়ার জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতাম। তিনি বই পড়ে তাঁর মতামত জানাতেন, এই ধরণের তাঁর কয়েকটা চিঠি আজও আমার কাছে রয়েছে। কয়েকটা হারিয়ে গেছে। তাঁর ক'টা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

পরম স্নেহাস্পদেষু,

গোপাল, এই মাত্র তোমার পাঠানো বই পেলাম। খুব সুন্দর হয়েছে। এরি মধ্যে পড়তে সুরু করে দিয়েছি। ইচ্ছে ছিল চেখে চেখে অনেক দিন ধরে পড়ব। কিন্তু তা বোধ হয় আর হয়ে উঠবে না, এক নিশ্বাসেই পড়তে হবে।[১]

আমার বিশ্বাস তোমার এই বই আবার অতি শীঘ্র সংস্করণ শেষ হবে। তোমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। আশীর্বাদ করি, তোমার নির্বাচিত ক্ষেত্রে তুমি দিনে দিনে শীর্ষস্থানে আরোহণ কর।

এবারকার ভারতবর্ষে তোমার শরৎচন্দ্রের বিবাহ সংক্রান্ত প্রবন্ধটি খুব কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে। আগামী সংখ্যার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছি।[২]

আশা করি তোমরা ভাল আছ। আমি এক রকম। তোমরা আমার ভালবাসা নিও। ফণীবাবুকে নমস্কার জানিও।

তোমাদের

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৮।১২।৫৪

পরম কল্যাণীয় গোপাল,

বৈঠকী গল্প পেয়েছি এবং এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলেছি। 'শরৎচন্দ্রের চিঠি-পত্র'র চেয়ে এ বইখানিতে তোমার কৃতিত্ব বেশী। এতে তুমি শরৎচন্দ্রের নানা রকমের গল্পগুলি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেছ। গল্পগুলি পড়তে পড়তে শরৎচন্দ্রের গলার স্বর শোনা যায়।

শরৎচন্দ্রের আরও অনেক গালগল্প আছে সেগুলিকে এবার দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ কর। একটি গল্প মনে পড়ছে—দাঁড়কাক মারলে ফাঁসি হয় না—হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন কোনও একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায় (বোধ হয় পত্রিকা সম্পাদন করেছিল প্রাণতোষ ঘটক।) ভারি মজার গল্প।[৩]

তোমার উদ্যমের ভূয়সী প্রশংসা করছি এবং এই ধরণের নব নব পুস্তকের পথ চেয়ে আছি। আমার স্নেহপূর্ণ শুভেচ্ছা নিও।

ইতি

পুণা
২১/৩/৫৫

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম কল্যাণীয়,

গোপাল, তুমি ও বিশ্বনাথ আমার ৺বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ নিও, আর সকলকে যথাযোগ্য দিও।

দাঁড় কাক মারলে ফাঁসি হয় না—গল্পটা হেমন্তবাবু ভুলে গেছেন এ হতেই পারে না। কোনও কারণে হয়তো চেপে যেতে যান, লেখাটা বেরিয়েছিল অধুনালুপ্ত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ৮/১০ বছর আগে। পত্রিকার প্রধান পাণ্ডা ছিল প্রাণতোষ ঘটক। কারণ, সে-ই ও পত্রিকার জন্যে আমার কাছে লেখা চেয়েছিল। তুমি প্রাণতোষের কাছে খোঁজ নিলে নিশ্চয় জানতে পারবে।

ফাইলও পাবে। গল্পটা ভারি মজার। তাৎকালিক রাজনৈতিক চিত্রও তাতে পাবে।

তোমার নতুন বই পাঠিয়েছ এখনও পাইনি, পেলে খবর দেব।[৫] কলকাতায় যাবার কোনও পরিকল্পনা এখন নেই। বয়স বাড়ছে। বেশী নড়তে চড়তে ভাল লাগে না।

ভালবাসা নিও

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৪/১১

পুঃ এবার শনিবারের চিঠিতে শরৎচন্দ্রের বিবাহ সম্বন্ধে এক নতুন ফ্যাচাং উঠেছে দেখছি। ব্যাপার কি? তুমি অনুসন্ধান করেছ নাকি?

প্রসঙ্গ কথা

১. গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স থেকে সেই সদ্য প্রকাশিত আমার 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' বইটি পাঠালে, তখন শরদিন্দুদা বই পড়তে আরম্ভ করে এই কথা লিখেছিলেন।

গুরুদাস থেকে প্রকাশিত এই বই শেষ হয়ে গেলে, এর সঙ্গে আরও অনেক চিঠি যোগ করে 'সাহিত্য সদন' থেকে প্রকাশ করি শরৎচন্দ্র ৩য় খণ্ড বা শরৎ-চন্দ্রের পত্রাবলী।

এই বইও শেষ হয়ে গেলে এর সঙ্গেই আরও বহু নতুন চিঠি যোগ হয়ে ভারতী বুক স্টল থেকে প্রকাশিত হয় 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী।'

পরিবর্ধিত ২য় ও ৩য় সংস্কারণে শরৎচন্দ্রের লেখা অনেক মজার মজার চিঠিও দিয়েছি।

শরদিন্দুদা এই বই দুটা পড়লে আরও খুশী হতেন এবং বোধ করি আমার আরও প্রশংসা করতেন।

২. এই সময় আমি ১৩৬১ সালের অগ্রহায়ণ থেকে চৈত্র-এই পাঁচ মাস ধরে ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'শরৎচন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গ' নামে একটি দীর্ঘ ধারা-বাহিক প্রবন্ধ লিখে ছিলাম। তাতে শরৎচন্দ্রের বিবাহ নিয়ে নানা জনের নানা গালগল্প-গুলো নিয়েও আলোচনা করেছিলাম। এবং এ সম্পর্কে একটা সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিলাম। আমার শরৎচন্দ্র ১ম খণ্ড (জীবনী) গ্রন্থেও এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

৩. এই চিঠি লেখার কিছুদিন পরে শরদিন্দুদা কলকাতায় এলে তাঁকে বলে ছিলাম—দাদা, দাঁড়কাক মারলে ফাঁসি হয় না, গল্পটা হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় লেখেন নি। মনে হয় রাজনীতিবিদ হেমন্ত সরকার লিখেছিলেন!

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় কবিতা লিখতেন, আপনিও এক সময় কবিতা লিখতেন। অনেক দিনের পুরনো কথা, তাই হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের নামটাই আপনার মনে এসেছে। রাজনীতির লোক হেমন্ত সরকারের নামটা আপনার মনে আসে নি।

এই বলে তাঁকে ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসের শরৎ-স্মৃতি সংখ্যা 'বাতায়ন' পত্রিকায় হেমন্তকুমার সরকারের 'রহস্য-প্রিয় শরৎচন্দ্র' লেখাটা দেখালাম। হেমন্তকুমার লিখেছেন—

'বরিশালে বি, পি, সি, সি-র মিটিংএ শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। ভীষণ হট্টগোল হওয়ায় সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়কে সভাস্থলে (শরৎচন্দ্র) প্রশ্ন করেন—এটা সভা না বাজার ?

ইহাতে শ্যামবাবু ভীষণ চটিয়া শরৎচন্দ্রকে সভা হইতে বাহির করিয়া দেন। বাসস্থানে ফিরিয়া শরৎদার সে কি রাগ! পায়চারি করিতেছেন, আমাদের সাধ্য-সাধনা সব বিফল। শ্যামবাবুকে মারিয়া না ফেলিলে, তিনি আর মিটিংএ যাইবেন না। সেখানে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, সুভাষচন্দ্র বোস প্রভৃতি অনেকে ছিলেন।

শরৎদা বলেছিলেন—উপেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ভোগ করেছে, কিরণ জমিদার মানুষ, সুভাষ পারবে না। হেমন্ত যাক্, গিয়ে শ্যামবাবুকে মেরে ফেলে আসুক।

তারপর আবার বললেন—ওহে দাঁড়াও, শ্যামবাবুকে 'নন্-ভায়োলেণ্ট' ভাবে কি করে মারবে ভেবে দেখি, আর তাতে যদি মারা যান তো তোমার ফাঁসি যাতে না হয়, সে সম্বন্ধে দেশবন্ধুর আইনের পরামর্শ একটু নেওয়া যাক্।'

শরদিন্দুদা বললেন—হেমন্ত সরকারই যদি হন, তাহলেও মনে হয়, তিনি এ প্রসঙ্গ নিয়ে 'বাতায়ন' ছাড়া অন্য কোন কাগজেও লিখেছিলেন। কারণ, ঐ গল্পের শেষটা আমার পরিষ্কার মনে আছে—হেমন্ত যাক্, গিয়ে শ্যামবাবুকে মেরে যেখানে সভা হচ্ছে, তার পাশে ঐ খালটার জলে লাশ ফেলে দিয়ে আসুক। যদি পুলিশ আসে, লাশ খোঁজ করতে গিয়ে দেখবে, খালের জলে একটা দাঁড়কাক মরে পড়ে আছে, এতে ওর কিছুই হবে না। কেননা, দাঁড়কাক মারলে তো আর ফাঁসি হয় না।

এখন হেমন্তবাবুর এই লেখাটা সম্বন্ধে আমার একটা সন্দেহ বা প্রশ্ন—সত্যই কি শ্যামসুন্দরবাবু শরৎচন্দ্রকে সভা থেকে বার করে দিয়েছিলেন ?

দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর প্রভৃতির সঙ্গে শরৎচন্দ্র বরিশালে সভায় গিয়েছিলেন এবং অনুমান করা যেতে পারে, শরৎচন্দ্র তাঁদের সঙ্গেই সভায় একত্রে বসেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের সভা না বাজার বলার কথাটা যদি সত্যও হয়, তাহলেও এই সামান্য কথা বলার জন্যই শ্যামসুন্দরবাবু শরৎচন্দ্রের মত ব্যক্তিকে সভা থেকে বার করে দিলেন? অথচ তাঁর পাশেই বসে ছিলেন দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি, পাশে না থাকলেও তাঁরা এতে প্রতিবাদ করলেন না বা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁরাও বেরিয়ে এলেন না?

আসলে ব্যাপারটা ছিল এই—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে কাউন্সিল প্রবেশের বিষয় নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সভাপতি দেশবন্ধুর মতভেদ হয়। এবং বিরোধী দল সংখ্যা-গরিষ্ঠ হওয়ায় দেশবন্ধু কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ করেন। দেশবন্ধু সভাপতি পদ ত্যাগ করে কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই নিজের মতাবলম্বীদের নিয়ে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে টিকারীর মহারাজার বাড়িতে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করেন। এই স্বরাজ্য দল গঠিত হওয়ার ক'মাস পরেই বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। বাঙ্গলার কংগ্রেস নেতারা সকলেই যাতে কাউন্সিল প্রবেশ নীতি মেনে নেন, সেজন্য দেশবন্ধু তাঁর সমর্থকদের নিয়ে সদলে বরিশালে গিয়েছিলেন। বরিশাল সম্মেলনে দেশবন্ধু প্রস্তাব করেছিলেন—সভায় কাউন্সিল প্রবেশ নীতি নিয়ে আলোচনা হোক, এবং এ সম্পর্কে সভায় গৃহীত প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

বরিশাল সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তিনি ছিলেন দেশবন্ধুর কাউন্সিল প্রবেশ নীতির ঘোর বিরোধী। তাই তিনি সভায় ঐ প্রস্তাব উত্থাপনই করতে দেন নি।

তখন দেশবন্ধু তাঁর দলবল (শরৎচন্দ্র সহ) নিয়ে সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে আসেন।

দেশবন্ধুর সঙ্গে সভা থেকে বেরিয়ে এসে শরৎচন্দ্র রাগে শ্যামসুন্দরবাবুর সম্বন্ধে কিছু বললেও বলতে পারেন। কিন্তু শুধু সভা না বাজার বলার জন্য শ্যামসুন্দরবাবু শরৎচন্দ্রকে সভা থেকে বার করে দিয়েছিলেন, এ কথাটা বিশ্বাস হয় না।

এ সম্বন্ধে বরিশালে বি, পি, সি, সি,র ঐ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন, এমন একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও আমি জিজ্ঞাসা করেছি। তাঁরা সকলেই বলেছেন—শ্যামসুন্দরবাবু শরৎচন্দ্রকে সভা থেকে বার করে দিয়েছিলেন, এ কথা সত্য নয়।

৪. এ বইটা আমার 'রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস'—অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৌখিক পরিহাস-রসিকতার সংকলন। এ বই পেয়ে, পড়ে শরদিন্দুদা তখনও আমার প্রশংসা করেছিলেন। দুর্ভাগ্য বশত এই চিঠিটি কিভাবে হারিয়ে গেছে।

এই ভাবে আমাকে লেখা সতীনাথ ভাদুড়ি, কালিদাস রায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, দিনেশ দাস প্রভৃতি অনেকের অনেক চিঠিই হারিয়ে ফেলেছি। ঐ সব চিঠির বিষয় বস্তু বা লেখার কারণগুলো মনে থাকলেও ঐ সব চিঠির ভাষা আজ আর কিছুই মনে নেই। কেবল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর একটা চিঠির একটা লাইনের কিছুটা আজও পরিষ্কার মনে আছে।

আমি তখন শরৎচন্দ্রের পরিচিত জনদের কাছে শরৎচন্দ্রের লেখা চিঠি খুঁজে বেড়াচ্ছি। অচিন্ত্যবাবু শরৎচন্দ্রের পরিচিত ছিলেন জেনে, তাঁর কাছে তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি আছে কিনা জানতে চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম। তিনি তখন তমলুকের সাবজজ।

অচিন্ত্যবাবু আমাকে লেখা তাঁর চিঠিতে, তাঁর কাছে শরৎচন্দ্রের চিঠি নেই জানিয়ে সব শেষে লিখেছিলেন—'থাকলে গর্বের অন্ত থাকতো না।'

বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)

'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় বনফুলের (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের) 'পিতামহ' উপন্যাসটি তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই সময় ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে তিনি একবার তাঁর ভাগলপুরের বাড়ি থেকে কলকাতায় এলে একদিন আমাদের 'ভারতবর্ষ' অফিসে আসেন। এর আগেও তিনি অনেকবার আমাদের পত্রিকা অফিসে এসেছেন। আমরা সকলে তাঁকে বলাইদা বলতাম।

সেদিন বলাইদাকে পেয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—বলাইদা এবার কতদিন কলকাতায় থাকবেন?

—তা দিন পনের থাকবো। অনেকগুলো কাজ আছে।

—কোথায় এসে উঠেছেন?

—বাগবাজারে আমার এক আত্মীয়র বাড়িতে।

—বলাইদা, এতদিন যখন কলকাতায় থাকবেন, তখন আমাদের দুটা সভায় আপনাকে যেতেই হবে।

—কোথায় কোথায় তোমার সভা?

—একটা সভা হবে আমাদের 'সাহিত্য বাসরে'র। তাতে আমরা আপনাকে সম্বর্ধনা জানাবো। ঐ সভাটা হবে সম্ভবতঃ কালীশ মুখোপাধ্যায়ের 'রূপমঞ্চ' পত্রিকা অফিস হাতিবাগান বাজারের উপর। কাল আমাদের এখানে লক্ষ্ণৌএর বিখ্যাত গায়ক দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল এসেছিলেন। তিনি কলকাতায় এসে কোথায় উঠেছেন বলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। আপনার সঙ্গে তাঁকেও সাহিত্য বাসরের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানাব।

—আর একটা সভা কোথায় এবং কিসের?

—হাওড়া শহরে আমাদের একটা হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ আছে। আমি তার অন্যতম কর্মকর্তা। আমাদের ঐ পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে সামনের ৪ঠা জানুয়ারি থেকে ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রন্থাগারিকদের গ্রন্থাগার বিষয়ে শিক্ষাদান সপ্তাহ হবে। তাতে একদিন আপনাকে যেতে হবে।

—তুমি যখন বলছ, তখন তোমার দুটা সভাতেই যাব। কিন্তু ভাই আমি বক্তৃতা দিতে পারি নি।

—যা পারেন, তাই বলবেন।

এরপর বলাইদা এসে কোথায় উঠেছেন ঠিকানাটা জেনে নিলাম।

পরদিন সকালে দ্বিজেন সান্যালের কাছে গেলাম। বলাইদার সঙ্গে তাঁকেও

সাহিত্য বাসরের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানানো হবে—এই প্রস্তাব নিয়ে। তিনি প্রস্তাবে রাজী হলেন। হয়েই বললেন—ভাই, একটা কাজ করতে হবে। আপনাদের ঐ সভায় প্রবোধ সান্যালকে আনতেই হবে। আমি আপনার হাতে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছে, চিঠিটা পেলে তিনি অবশ্যই আসবেন।

এই বলে তিনি একটা ছোট কাগজে এক লাইন লিখে আমার হাতে দিলেন। খোলা চিঠি, পড়ে দেখি, লিখেছেন—মেসোদা এঁদের সভায় তোমার আসা চাই-ই।

আমি পড়ে বললাম—মেসোদা, এটা আবার কি ?

—উনি আগে সম্পর্কে আমার মেসো ছিলেন, হালে একটা বিবাহের সূত্রে উনি আমার সম্পর্কে হয়েছেন দাদা, তাই দুটো সম্পর্কই এক করে লিখেছি—মেসোদা।

শুনে একটু হাসলাম।

যাই হোক্, আমাদের সভার চিঠির সঙ্গে দ্বিজেনবাবুর ঐ চিঠিও প্রবোধ-বাবুকে দিয়ে এলে, তিনি সভার দিন সভারম্ভের আগেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

দ্বিজেনবাবুকে সভার চিঠি দিয়ে এলে তিনি নিজেই সভায় এসেছিলেন। সভার একদিন আগে আমি বলাইদাকে চিঠি দিয়ে আসি এবং সভার দিন আমি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি।

আমাদের সেদিনের ঐ সভার কথা আমরা ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন মাসের 'সাময়িকী'তে এইভাবে লিখেছিলাম—

বনফুল ও দ্বিজেন্দ্র সান্যাল সম্বর্ধনা

গত ৩রা জানুয়ারি তারিখে ৮১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটস্থ 'রূপমঞ্চ' কার্যালয়ে সাহিত্য বাসরের এক বিশেষ সভায় বিখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) ও লক্ষ্ণৌ নিবাসী খ্যাতনামা সঙ্গীতাচার্য দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যালকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। কবিশেখর কালিদাস রায়, প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক প্রবোধকুমার সান্যাল, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু, ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কবি প্রভাতকিরণ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, রায় বাহাদুর শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র রায়···প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।—পৃঃ ২৩৭

হাওড়ায় আমাদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষা সম্মেলনের সভায় আমি বলাইদাকে বাগবাজারে সেদিন তাঁর আত্মীয়র বাড়ি থেকে নিয়ে যাই। বিকালে সভা, কিন্তু দুপুরের একটু পরেই আমি বলাইদার কাছে যাই। তিনি সেদিন কথায় কথায় তাঁর প্রথম দিকের সাহিত্য জীবনের অনেক গল্প বললেন।

আমরা বাড়ির উপর তলায় বসে গল্প করছি। এমন সময় ঐ বাড়ির রাস্তার দিকে নীচে থেকে একজনের বলাই, বলাই ডাক শোনা গেল। জানালা দিয়ে নীচে চেয়ে দেখি—সজনীকান্ত দাস।

সজনীকান্ত উপরে উঠে এলেন। এসে আমাকে দেখে বললেন—তুমি এখানে! বলাইকে পাকড়াও করে কোন সভায় নিয়ে যাবে বুঝি?

বলাইদা বললেন—গোপালের সঙ্গে হাওড়ায় ওদের পাঠাগারের একটা সভায় যাব। গোপাল বলছে, মনোজ বসুও যাবে। তাকে তার দোকান থেকে সঙ্গে নেবে।

সজনীদা বলাইদার সঙ্গে দু একটা কথা বলেই বললেন—তাহলে আমি আসি, তোমরা রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হও।

পথে বেরিয়ে বললাম—বলাইদা, বাগবাজার স্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সংযোগ স্থলের কাছে না গেলে ট্যাক্সি পাব না। চলুন এই বাগবাজার স্ট্রীটটা হেঁটে গল্প করতে করতে যাই।

ঐ সময় আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে শরৎচন্দ্রের চিঠি সংগ্রহ করছিলাম। পথে হাঁটতে হাঁটতে বলাইদাকে জিজ্ঞাসা করলাম—বলাইদা, আপনার কাছে শরৎচন্দ্রের কোন চিঠি আছে?

শুনে বললেন—না ভাই, চিঠি নেই। তবে তিনি একবার ভাগলপুরে তাঁর মামার বাড়িতে গেলে, তখন আমি সস্ত্রীক একদিন তাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা করেছিলাম। সেদিন তিনি তখন আমাদের একটা মজার গল্প বলেছিলেন। সেই গল্পটা তোমাকে শোনাই।—এই বলে বলাইদা বাগবাজার স্ট্রীটে হাঁটতে হাঁটতে শরৎচন্দ্রের বলা সেই মজার গল্পটা আমাকে শোনালেন—

আমি শরৎচন্দ্রকে বলেছিলাম—শুনেছি আপনি ভাল গল্প বলতে পারেন। আজ আমাদের একটা গল্প শোনান।

আমার এই কথা শুনে তিনি বললেন—আচ্ছা, তাহলে তোমাকে আমাদের ছেলেবেলার এই ভাগলপুরেরই একটা সত্য গল্প বলি। বলেই তিনি এই গল্পটা শুনিয়ে ছিলেন—

একবার এক সাধু বহু ভক্ত পরিবৃত হয়ে ভাগলপুরের গঙ্গাতীরে একেবারে জলের গায়েই গঙ্গা-পুজোর আয়োজন করে। তখন প্রায় দুপুর। ঐ সময় একটা যাত্রীবাহী জাহাজ প্রতিদিনের মত সেদিনও ঐখান দিয়ে যাবার সময় ঢেউ তুলে সাধুর পুজোর যাবতীয় সামগ্রী সব ভাসিয়ে দিয়ে যায়।

এতে সাধু ক্ষেপে গিয়ে জাহাজকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল—ব্যাটা জাহাজ, তোর এতবড় স্পর্ধা যে আমার গঙ্গা-মায়ের পুজোর নৈবেদ্য ভাসিয়ে দিয়ে যাস্। তুই ব্যাটা কাল আয়, তোকে আমি আস্ত গিলে খাব।

সাধুর কথা শুনে ভক্তরা তো থ। একজন বললে—গুরুদেব ও তো জাহাজ!

—তাতে কি হয়েছে ? ওকে সব শুদ্ধ আমি গিলে খাব কাল।

সাধু জাহাজ গিলে খাবে, এই কথা ভক্তদের মুখ থেকে প্রচারিত হলে, পরদিন সকাল থেকেই ঐ দৃশ্য দেখবার জন্য গঙ্গাতীরে ঐখানে লোক জড় হতে লাগল। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। তারপর দুপুর নাগাদ একটু দূরে জাহাজ আসছে দেখেই সাধু গঙ্গায় জলে গিয়ে নামল। কোমর খানেক জলে গিয়ে জাহাজের দিকে হাত বাড়িয়ে হুংকার দিতে লাগল—অ্যায় ব্যাটা, তোকে আজ গিলে খাবই।

দেখতে দেখতে জাহাজ কাছে এসে গেলে, সাধু বিরাট এক হাঁ করে জাহাজকে গিলে খেতে যাবে কি, ঠিক সেই মুহূর্তে তীর থেকে দশ পনের জন লোক হঠাৎ হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠে হুড় মুড় করে নেবে জলের মধ্যেই সাধুর পা জড়িয়ে ধরে বলল—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন গুরুদেব, নির্জীব অচেতন ঐ জাহাজ! ওর উপর রাগ করা কি আপনার সাজে গুরুদেব! তাছাড়া জাহাজের মধ্যে নর-নারী-বালক-বৃদ্ধ অগুনতি কত যাত্রী রয়েছে, ওরা তো কোন অপরাধ করেনি গুরুদেব! কোন্ অপরাধে ওদের আপনি খাবেন!

শুনে সাধু গম্ভীর হয়ে কি ভাবল। তারপর দীর্ঘ এক নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল—তা বটে! আচ্ছা ছোড় দেও।—তারপর জাহাজের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বল্‌ল—যা ব্যাটা খুব বেঁচে গেলি আজ। তোর পুনর্জন্ম হয়ে গেল।

গল্পটা শুনিয়ে বলাইদা বললেন—তীরের ঐ লোকগুলো যে সাধুর শেখানো লোক ছিল, তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ।

—নিশ্চয়ই। বড় সুন্দর গল্প।

গল্প শেষ হ'ল। আমরাও বাগবাজারের মোড়ে এসে গেলাম। ঐখান থেকে ট্যাক্সি ধরে এলাম কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে তখনকার বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর বইএর দোকানে। সেখান থেকে মনোজ বসুকে সঙ্গে নিয়ে তিনজনে হাওড়ার সভায় গেলাম।

সভা ভালই হ'ল। সভার পর আবার ট্যাক্সিতে করে এঁদের যেখান থেকে যেখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম, সেই সেই খানে পৌঁছে দিয়ে এলাম। ট্যাক্সিতে যাওয়া আসার সময় বলাইদা টুকিটাকি নানান্ গল্পও বলেছিলেন।

বলাইদা আর একবার ভাগলপুর থেকে কলকাতায় এলে তাঁকে আমি নৈহাটী-কাঁটালপাড়ায় আমাদের ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার ১৩ই আষাঢ় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম দিনের সভায় নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিন ঐ সভায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও গিয়ে ছিলেন! খুব সুন্দর সভা হয়েছিল।

বলাইদা শেষ বয়সে তাঁর ভাগলপুরের বাড়ি বিক্রি করে কলকাতার লেক

টাউনে বাড়ি করে সপরিবারে বাস করতেন। ঐ সময়ও আমি তাঁকে একাধিক সভায় নিয়ে গিয়েছি। নয়ত তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যেমন—শরৎ জন্ম শত বার্ষিকীর সময় কলকাতায় শরৎ সমিতি পাঁচ খণ্ডে যে শরৎ-রচনাবলী প্রকাশ করেন, তার প্রথম খণ্ড প্রকাশের সভায় বলাইদাকে আনা হয়েছিল। আমি ছিলাম ঐ শরৎ রচনাবলীর তিন সম্পাদকের মধ্যে অন্যতম।

শরৎ-জন্ম শতবার্ষিকীতে পশ্চিম বঙ্গ সরকার মহা আড়ম্বরে মহাজাতি সদনে যে শরৎ-বন্দনা সভা করেন, তাতে বলাইদাকে সভাপতি করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঐ শরৎ-বন্দনা সভার সঙ্গে আমি বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলাম। সেদিনের সভায় আমিও অন্যতম বক্তা ছিলাম।

একবার আমি আমার লেখা দুটো—'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' এবং 'রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস' বই বলাইদাকে উপহার দিয়েছিলাম। আমার সেই বই দুটো পড়ে বলাইদা তখন আমাকে যে চিঠিটা লিখেছিলেন, তাঁর হস্তাক্ষরেই সেই চিঠিটা এখানে মুদ্রিত করলাম—

ভাগলপুর
৭।১১।৭৬

কল্যাণবরেষু,
এই দেওয়ালী, তোমার লিখা এই বই দুটি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। তুমি আমাকে ও লিখিয়ে সুধীজন সভা। বই দুটি বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে।

ইতি
শুভার্থী
বলাইদা

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'উত্তরায়ণ' উপন্যাসটি তখন ধারাবাহিক ভাবে মাসে মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। বিভূতিবাবু বিহারে তাঁর দ্বারভাঙ্গার বাড়ি থেকে উপন্যাসের কপি পাঠিয়ে দেন, আমরাই প্রুফ দেখে দিয়ে ছাপি।

সেই সময় ১৩৫৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের একেবারে প্রথম দিকে তিনি আমাদের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অফিসে আসেন। এখানেই তাঁকে প্রথম দেখি এবং এখানেই তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

এই আলাপের সময় কথায় কথায় জানতে পারি, তিনি হাওড়া শহরে তাঁর এক বোনের বাড়িতে এসে উঠেছেন এবং কয়েকদিন থাকবেন।

তখন আমি বিভূতিবাবুকে বললাম—দাদা, সাহিত্য বাসর নামে আমাদের একটা শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতিষ্ঠান আছে। আমরা মাঝে মাঝে এক একজন সাহিত্যিক বা সাহিত্য-রসিক বন্ধুর বাড়িতে এই সাহিত্য বাসরের আসর বসাই। তা আপনি যখন হাওড়া শহরে আছেন, তখন সামনের বুদ্ধ-পূর্ণিমার দিন হাওড়ার সিভিল সার্জনের বাড়িতে একটা সভা করি, তাতে সভাপতি হয়ে আসুন না!

—তা আসতে পারি।

এরপর বিভূতিবাবুর হাওড়ার ঠিকানাটা জেনে নিয়ে বললাম—সভার আগেই আপনাকে ছাপানো চিঠি দিয়ে আসবো। এবং সভার দিন আমিই সঙ্গে করে আপনাকে সভায় নিয়ে আসবো। দেখি, ঐ দিনের সভায় কালিদাকে অর্থাৎ কবিশেখর কালিদাস রায়কে প্রধান অতিথি করতে পারি কিনা।

সেদিনের সেই সভার একটা ছাপানো চিঠি আজও দেখছি, আমার পুরনো কাগজ পত্রের মধ্যে রয়েছে। সেই চিঠিটা আগে 'রাজশেখর বসু' প্রবন্ধের প্রসঙ্গ কথায় উদ্ধৃত করেছি।

সেদিন যথা সময়ে সুন্দর সভা হয়েছিল।

এর বছর চারেক পরে বিভূতিদা একবার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা অফিসে আসেন। এর বোধ হয় মাস খানেক আগে আমার বিবাহ উৎসবে যোগদানের জন্য কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের সঙ্গে এই বিভূতিবাবুকেও একটা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে ছিলাম। যদিও জানতাম, দ্বারভাঙ্গা থেকে তিনি আসতে পারবেন না, তবুও নিমন্ত্রণ করেছিলাম এবং আশীর্বাদ চেয়েছিলাম।

বিভূতিদা ভারতবর্ষ পত্রিকা অফিসে এসেই আমাকে বললেন—গোপাল, তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলাম, কিন্তু ভাই আসতে পারিনি। আজ সন্ধ্যার সময় তুমি বাড়িতে থেকো, তোমার বাড়িতে যাব। গিয়ে বৌমাকে আশীর্বাদ করে আসবো।

বিভূতিদা সন্ধ্যার একটু আগেই আমার বৌবাজারের বাড়িতে এলেন। এসে কয়েকটা রূপার টাকা আমার স্ত্রীর হাতে দিয়ে তাঁকে আশীর্বাদ জানালেন। আমরা দুজনে তাঁকে প্রণাম করলাম।

সেদিন তিনি আমার বাড়িতে অনেকক্ষণ ছিলেন। অনেক গল্প হ'ল, বেশীর ভাগ সাহিত্য নিয়েই। তারপর আমার গৃহিণীর রান্নায় ও পরিবেশনে তিনি নৈশ আহার করেন। পরে তাঁর সঙ্গে পথে গল্প করতে করতে গিয়ে তাঁকে বাসে তুলে দিয়ে আসি।

হাওড়ায় অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু, গল্প-লেখক হরিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এক সময় 'সংস্কৃতি পরিষদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। তাতে নিমাইবাবুদের বাড়িতে 'নৃসিংহ ভবনে' বিভূতিদা এবং আমি একবার এক সঙ্গে নিমাইবাবুদের ঐ সংস্থার এক সাহিত্য সভায় বক্তৃতা দিয়ে ছিলাম। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল—শরৎচন্দ্র।

নিমাইবাবুদের বাড়িতে বক্তৃতা দেওয়ার কয়েকদিন পরে, নিমাইবাবু ও হরিশংকরবাবু দ্বারভাঙ্গায় বিভূতিদার বাড়িতে গিয়েছিলেন। এঁরা যেদিন দ্বারভাঙ্গায় যান, তখন হরিশংকরবাবুর হাত দিয়ে আমার লেখা দুখানা বই 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' ও 'রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস' বিভূতিদাকে দেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে ছিলাম। ঐ বই পেয়ে তখন বিভূতিদা আমাকে এই চিঠিটা লিখেছিলেন—

দ্বারভাঙ্গা
৪.১১.৫৫

কল্যাণীয়েষু,

গোপাল, তোমরা উভয়ে আমার ৺বিজয়ার আশীর্বাদ নেবে।

তোমার চিঠি পেয়েছি এবং তৎপূর্বে হরিশংকর মারফৎ তোমার বই দুখানি। শরৎচন্দ্রেরটা অনেকখানি পড়েছি। বেশ হয়েছে। তুমি বেশ কাজ করছ, একটা লাইন ধরে। এগিয়ে যাও।

ওদিকে কবে যাব ঠিক করিনি। গেলেই দেখা হবে।

শুভার্থী
শ্রীবিভূতি ভূষণ

হরিশংকর আর নিমাই বোধহয় সোমবার ফিরবে। কাল তোমার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হোল। ব. ভ.

বিভূতিদার এই চিঠি পাওয়ার পর হরিশংকরবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা হলে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—দ্বারভাঙ্গায় বিভূতিদার বাড়িতে বসে আমার সম্বন্ধে কি সব আলোচনা করেছিলেন ?

হরিশংকরবাবু বললেন—আপনার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা এবং ভাল বক্তৃতা দেবার কথাই সেদিন আলোচনা হয়েছিল ।

বিভূতিদার ৪·১১·৫৫ তারিখের চিঠি পাওয়ার পরে তাঁর ১২·১২.৫৫· তারিখে লেখা আর একটি চিঠি পাই । তাতে তিনি লেখেন—

ওঁ

কল্যাণবরেষু,

গোপাল, তোমার বই দুখানি শেষ করতে মোটেই দেরি হয় নি । তবে আরম্ভ করতে দেরি হয়ে যায় । সেই জন্য চিঠি দিতে পারিনি তোমায় ।

চমৎকার হয়েছে বই দুখানিই ।

বাংলা সাহিত্যে তোমার এ পর্যন্ত যতটুকু দান, তার চমৎকার একটি বৈশিষ্ট্য আছে—যেদিকে কারুরই দৃষ্টি যায় নি তেমন করে, সেই দিকেই তুমি যেন বেশি অবহিত হচ্ছ । রানী রাসমণি সম্বন্ধে তোমার অবদানও ঠিক এই ধরণের ।

এদিকে খুব শীত পড়েছে । আশাকরি কুশলে আছ । উভয়ে আশীর্বাদ জানবে ।

'ভারতবর্ষ'-এর উপর দিয়ে তো একটা বিপর্যয় ঘটে গেল । দৈব, উপায়ই বা কি বলো ।

বই দুখানির জন্য আলাদা করে আশীর্বাদ জানাচ্ছি ।

শুভার্থী

শ্রীবিভূতি ভূষণ

বিভূতিদা চিঠিতে যে লেখেন—'ভারতবর্ষ'-এর ওপর দিয়ে তো একটা বিপর্যয় ঘটে গেল—এটা হয় তখন ভারতবর্ষ পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় ।

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবর্ষের সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার মহা আড়ম্বরে যে শরৎ-উৎসব করে ছিলেন, তার অনেকটাই ভার সরকার আমার উপর দিয়ে ছিলেন ।

ঐ সময় ৩১শে ভাদ্র মহাজাতি সদনে শরৎচন্দ্রের যে জন্মদিনের উৎসব হয়, তার সভাপতি বনফুল এবং প্রধান অতিথি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আমিই ঠিক করেছিলাম । এই স্থির করে তখন আমি বিভূতিদাকে যে চিঠি দিয়ে ছিলাম, তারই উত্তরে তিনি আমাকে এই চিঠিটা লিখেছিলেন—

ওঁ

C/o Dr. Achintya Kumar Mukherji
Dt. Anti Malaria Officer
L4-60 New Gandak Road
P.O. Sakchi
(Jamsedpur-1) Bihar

প্রীতিভাজনেষু,

আজ সকালে একই খামে তোমার এবং সুব্রতবাবুর[১] আমন্ত্রণ সূচক চিঠি পেলাম। আমি গত ২৪শে জুলাই থেকে এখানে আমার এক ভাইপোর কাছে রয়েছি। তোমার ২৬ এবং ওঁর ২৫ আগস্ট তারিখের চিঠি রিডাইরেক্ট হয়ে পেঁছাতে কিছু বিলম্ব হয়ে গেল। এই সঙ্গে ওঁকেও Under C.P. চিঠি দিলাম সম্মতি জানিয়ে। শরীর বেশ ভাল যাচ্ছে না। তবু চেষ্টার ত্রুটি হবে না জেনো। এখানকার গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেন, তিনিও পরশু আমার কথাটা জানিয়ে দিয়েছেন।

আমি ১৪/১৫ তারিখ নাগাদ কলকাতায় যাওয়ার চেষ্টা করছি। বোধ হয় একটু ঘুর পথে যেতে হবে। সমস্ত জানাব। কলকাতায় উঠব শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তীর বাড়িতে।—23 N-1 Diamond Harbour Road (নলিনীরঞ্জন এ্যাভিনিউ জংসন) নিউ আলিপুর। ফোন 45-0197. ঐ সময় খোঁজ নিও।

সুব্রতবাবুকেও বলে দিও সম্মতি জানিয়ে চিঠি দিয়েছি। কি জানি কারটা আগে পেঁছয়।

গেলে বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা হাতের পাঁচ থাকবে।

আশীর্বাদ জানাই।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

এই চিঠির সুব্রতবাবু হলেন পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তখনকার তথ্য ও জনসংযোগ (বর্তমানের তথ্য ও সংস্কৃতি) বিভাগের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। আমি বিভূতিদাকে চিঠি দিলেও খোদ সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো দরকার ভেবে সুব্রতবাবুকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে আমার চিঠির সঙ্গে একই খামে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

এই চিঠিতে বিভূতিদা যে গোপালহরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলেছেন—তিনি জামশেদপুরের রবীন্দ্র সংসদের সম্পাদক। শরৎজন্ম-শতবার্ষিকীর সময় জামশেদপুরে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে এই গোপালহরিবাবুর বাড়িতেই দুদিন ছিলাম।

আমাকে লেখা বিভূতিদার আরও কয়েকটা চিঠি ছিল! সেগুলো কিভাবে হারিয়ে গেছে। একটা চিঠির কথা বেশ মনে আছে।—হাওড়ায় সিভিল সার্জেনের বাড়িতে আমাদের 'সাহিত্য বাসরে'র বুদ্ধ উৎসবে পৌরোহিত্য করার পর তিনি তাঁর দ্বারভাঙ্গার বাড়িতে গিয়ে, ঐ বুদ্ধ উৎসব যে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল, সেকথা সেখান থেকে লিখে আমাকে জানিয়ে ছিলেন।

বিভূতিদা যখন মহাজাতি সদনে শরৎ-বন্দনা সভায় প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন, সেই সময় আমি ভারতবর্ষ পত্রিকায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লিখছিলাম। সে সব যে খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়েন, সেকথা বিভূতিদা আমাকে বললেন।

আর বললেন—আমি একদিন একা শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান দেবানন্দপুরে বেড়াতে গিয়ে ছিলাম। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই বোধ করি ভাল হ'ত। তুমি তো ওখানকার অনেক কথাই জান।

এর পর কথায় কথায় আমার মুখে আমার গ্রাম সেবার কথা বা কাজের কথা শুনে বললেন—তোমার গ্রামেও একদিন গিয়ে তোমার কাজ দেখে আসতে পারলে হ'ত। যদি সময় হয় তো কোনদিন যাব।

আমার গ্রামে বিভূতিদার আর যাওয়া হয় নি। তবে বিভূতিদার সঙ্গে আরও অনেকবার নানা জায়গায় নানা প্রসঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়েছে।

কলকাতার 'শরৎ সমিতি' বিভূতিদার আত্মজীবনী 'জীবনতীর্থ' প্রকাশ করেন। তাঁর এই আত্মজীবনী প্রকাশের ব্যাপারে তিনি একবার শরৎ সমিতির সহকারী-সম্পাদক দেবব্রত দাশগুপ্তর আমন্ত্রণে তাঁর বালীগঞ্জের বাড়িতে এসেছিলেন। দেবব্রতবাবু সেদিন তাঁর বাড়িতে আমাকেও আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন।

অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায়, দাদার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে ঐটাই আমার শেষ দেখা।

চলে আসার সময় দেবব্রতবাবুর পুত্র ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত বিভূতিদাকে ও আমাকে বসিয়ে একটা ফটো তুলে ছিলেন।

জীবনানন্দ দাশ

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে—ডায়মণ্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজে একজন ইংরাজির অধ্যাপক নেওয়া হবে।

ঐ কলেজ পরিচালক সমিতির কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্যর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। এঁদেরই একজনের আগ্রহে কলকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এক বাড়িতে ঐ অধ্যাপক নির্বাচক মণ্ডলীর বৈঠকে আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। সেদিন নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্যদের বলে অন্যতম প্রার্থী কবি জীবনানন্দ দাশের চাকরিটা করে দিয়েছিলাম।

ঐ দিনই জীবনানন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। ঐ নির্বাচন স্থান থেকে তাঁর বাড়ি অদূরেই জেনে, সেদিন তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাঁর বাসস্থানও দেখে এসেছিলাম।

চাকরি হ'ল, কিন্তু জীবনানন্দ কলকাতায় তাঁর টিউশনি ও সাংসারিক কারণে ডায়মণ্ড হারবারের চাকরিটা করতে পারলেন না। তখন তিনি একদিন আমায় বলেন, অন্য আর কোন একটা কলেজে তাঁর একটা চাকরি করে দেবার জন্য।

হাওড়া গার্লস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য আমার খুবই পরিচিত থাকায় তাঁকে বলে তখন ঐ কলেজে জীবনানন্দের অধ্যাপনার চাকরিটা করে দিই।

আমার 'জীবনানন্দ' গ্রন্থে 'জীবনানন্দের সঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয়' অধ্যায়ে জীবনানন্দের ঐ দুটা চাকরি প্রাপ্তিরই প্রসঙ্গে বিস্তৃত বলেছি।

হাওড়া গার্লস কলেজ থেকে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় যে 'জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা' প্রকাশিত হয়, তাতে অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যও লেখেন—'জীবনানন্দবাবুর পরিচয় পাই ভারতবর্ষের সহকারী সম্পাদক গোপাল রায়ের নিকট।'

বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বাড়ি হাওড়া শহরের শিবপুরে। তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন।

শরৎচন্দ্র দীর্ঘকাল হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। থাকতেন হাওড়ায় শিবপুরের পাশেই বাজে শিবপুরে। শিবপুরেও কিছুদিন ছিলেন।

হাওড়া জেলার দেড় শতাধিক গ্রন্থাগার নিয়ে আমরা এক সময় 'হাওড়া

জেলা পাঠাগার সংঘ' করে ছিলাম। বিজয়বাবু ছিলেন ঐ পাঠাগার সংঘের অন্যতম সহ-সভাপতি, আর আমি ছিলাম—একজন সহ-সম্পাদক।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ, হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ প্রভৃতি সূত্রে বিজয়বাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। আমি তখন তাঁকে বিজয়দা বলতাম, তিনি আমাকে ছোটভাই-এর মত দেখতেন।

জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে (পরে বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের নামে হয়েছে—হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ) চাকরি করছেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হওয়ায়, আমি তাঁর বাড়িতে যাই, তিনিও আমার বাড়িতে আসেন।

এবার আমার 'জীবনানন্দ' বই-এ 'জীবনানন্দের সঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয়' অধ্যায় থেকে কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

আমি তাঁর বাড়ির সামনে দরজার কাছে গিয়ে ডাক দিতাম—দাদা আছেন?

তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে, আসুন ব'লে তাঁর বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাতেন।

জীবনানন্দের সংসারে দেখতাম—তাঁর স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র। মনে হচ্ছে, একদিন যেন তিনি কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন—আমার মেয়েটি বি, এ, পড়ে এবং ছেলে পড়ে ক্লাস টেনে।

আমরা যখন কথাবার্তা বলতাম, তখন তাঁর ছেলে মাঝে মাঝে ঐ ঘরে হয় বই নিতে, না হয় অন্য কোন প্রয়োজনে এক এক বার আসত।

আমি জীবনানন্দ ছাড়া তাঁর বাড়ির কারও সঙ্গেই কথা বলতাম না। বলার প্রয়োজনও হ'ত না।

তিন খানা ঘর নিয়ে তাঁর যে ফ্ল্যাট, ঐ ফ্ল্যাটের একেবারে পূর্ব দিকের ঘরটায় একজন মহিলাকে দেখতাম। তাঁকে দেখেও আমার কোন কৌতূহল হ'ত না যে উনি কে? আমি ভাবতাম, উনি হয়ত কবির সংসারেরই কেউ হবেন।

আমি যাই আসি। কিছুদিন পরে একদিন তিনি আমাকে বললেন—গোপালবাবু, আমি একটা বড় বিপদের মধ্যে আছি। কিছু উপকার করতে পারবেন? কলকাতার কত লোকের সঙ্গেই ত আপনার পরিচয়, দেখুন না যদি একটু উপকার করতে পারেন!

—কি বিপদ দাদা?

—তবে খুলে সবই বলি শুনুন। আমার চাকরি-বাকরি নেই, অথচ এই রকম জায়গায় তিনখানা ঘরের একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছি, এই দেখে আমার

এক ছাত্র একদিন আমায় বললে—'স্যার, এখন তো আপনার তেমন আয় নেই, আর তিনখানা ঘর না হলেও আপনার চলে। তাই আপনি একখানা ঘর এক ভদ্রমহিলাকে ভাড়া দেবেন? তাঁর সঙ্গে আর কেউ থাকবে না, তিনি শুধু একা থাকবেন।' আমি ভাবলাম—একা একটি মেয়ে যদি থাকে, তাহলে ত কোন ঝামেলাই থাকবে না। অথচ কিছু আর্থিক সাশ্রয়ও হবে, এই ভেবে ঐ পূবের দিকের ঘরটা তাঁকে ভাড়া দিলাম। উনি একাই থাকেন বটে, কিন্তু ওঁর কাছে সব সময়েই এত লোক আসে যায় যে সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আর সব চেয়ে আপত্তিকর, রাত্রে ঐ ঘরে লোকজন নিয়ে গান বাজনা, হাসি-হল্লা ইত্যাদির কাণ্ড একেবারে অসহ্য। আমি মেয়েটিকে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে বলছি, তা উনি কিছুতেই যাচ্ছেন না। ওঁকে কি করে তোলা যায় বলতে পারেন?

—মহিলাটি কিছু কাজকর্ম করেন কি?

—শুনেছি, হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজন এজেন্ট।

—আইনের সাহায্যে কোন প্রকারে ওঁকে তোলা যায় কিনা আগে দেখা দরকার। আগামী রবিবার দিন সকালে আমি আপনার এখানে আসব। এসে আপনাকে নিয়ে আমার পরিচিত চাঁদমোহন চক্রবর্তী নামে এক প্রবীণ ও ভাল উকিলের কাছে নিয়ে যাব। চাঁদমোহনবাবু নিজেও একজন সাহিত্যিক মানুষ। তাঁর গল্পের বইটইও আছে। আশা করি একজন কবির বিপদের কথা শুনে তিনি তাঁর যথাসাধ্য করবেন।

রবিবার সকালে জীবনানন্দকে সঙ্গে নিয়ে রসা রোড (পরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড) ও প্রতাপাদিত্য রোডের সংযোগ স্থলের কাছে চাঁদমোহনবাবুর বাড়িতে গেলাম। তিনি সব কথা শুনে জীবনানন্দকে বললেন—আপনি সাবলেট করেছেন, আর ও যখন আপনাকে ভাড়া দেয়, তখন ওকে তোলা মুস্কিল। আপনি ওর কাছ থেকে ভাড়া না নিলে ও মণি অর্ডার করবে। আপনি মণি অর্ডারের টাকা না নিলে ও কোর্টে জমা দেবে। তাই ও নিজে থেকে না ছেড়ে চলে গেলে ওকে তোলা দায়। তবে পাড়ার লোকজন দিয়ে ভয় দেখিয়ে যদি তুলতে পারেন। তা না হ'লে তোলা মুস্কিল।

ফিরে আসবার সময় ট্রামে উঠে জীবনানন্দ আমাকে বললেন—পাড়ায় ত কারও সঙ্গেই আমার তেমন আলাপ নেই, আর থাকলেও তারা আমার হয়ে বলতেই বা যাবে কেন? আপনার ত বহু লোকের সঙ্গে আলাপ, এভাবে কি কিছু করতে পারবেন?

আমি বললাম—দাদা, আমি থাকি বৌবাজারে। আপনার পাড়ার দু এক জনের সঙ্গে ছাড়া আমার ত আলাপই নেই। আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন। যেদিন কলেজে আপনার দেরিতে ক্লাস থাকবে, সেদিন কলেজ যাওয়ার পথে আমাদের ভারতবর্ষ পত্রিকা অফিসে একবার আসুন। আমাদের কাগজের

সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একজন কংগ্রেসের এম, এল, এ,। কংগ্রেসেরই ত রাজত্ব! তাঁকে একবার বলে দেখি। পুলিশের সাহায্যে বা অন্য কোন ভাবে যদি কিছু করতে পারেন।

—আমি কালই এগারটা নাগাদ যাব।

রসারোড ও রাসবিহারী এভিনিউএর মোড়ে ট্রাম এসে গেলে তিনি নেমে গেলেন। আমি আমার বাড়ির দিকে ফিরে এলাম।

পরের দিন ঠিক সময়েই জীবনানন্দ ভারতবর্ষ অফিসে এলেন। আমি ফণিবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। ফণিবাবু সব শুনে বললেন—চাঁদমোহনবাবু ঠিকই বলেছেন। ওকে তোলা যাবে বলে ত মনে হয় না। আর পুলিশেও সহজে ও ব্যাপারে হাত দেবে না।

ফণিবাবুর মুখেও এই কথা শুনে তিনি বেশ দমে গেলেন। আমাকে বললেন—তাহলে কি করা যায় গোপালবাবু? আমি বললাম—আচ্ছা, সাবিত্রীদাকে একবার বলে দেখি। সাবিত্রীদা অর্থাৎ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর পাব্‌লিসিটি অফিসার। ঐ মেয়েটিও ত ঐ অফিসেরই একজন এজেণ্ট। সাবিত্রীদা যদি তাঁদের অফিসের উপরওয়ালাদের বলে আপোষে মেয়েটির চলে যাবার একটা ব্যবস্থা করতে পারেন।

—তাই বলুন, ব'লে তিনি চলে গেলেন।

চলে যাবার আগে তাঁর কাছ থেকে তাঁর ভাড়াটে মেয়েটির নামটা কেবল জেনে নিলাম।

এরপর একদিন সাবিত্রীদার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা বললাম।

শুনে তিনি বললেন—ও মেয়েটাকে আমি চিনি। কিন্তু আমাদের অফিসের প্রায় সকল উপরওয়ালার সঙ্গেই ওর খুব খাতির। তাই ওর বিরুদ্ধে কিছু বললে, তাঁরা শুনবেনই না।

সাবিত্রীদার কাছ থেকেও কোন সাহায্য পেলাম না।

একদিন গিয়ে জীবনানন্দকে সাবিত্রীদার কথাটা জানিয়ে এলাম। সেদিন তিনি আরও দমে গিয়ে বললেন—তাইত, কি করি! বড় বিপদেই পড়েছি!

আমি বললাম—ওকে তুলবার জন্য আর কা'কে ধরা যায় বা কি করা যায়, আবার একটু চিন্তা করে দেখি।

তিনি বললেন—আর কি করতে পারেন চেষ্টা করুন।

জীবনানন্দের জীবন সম্বন্ধে যাঁরা লিখছেন, শুনলাম তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি তাঁর ভাড়াটে ঐ মহিলাটির কাছ থেকেও তাঁর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছেন। জীবনানন্দ সম্বন্ধে এঁদের কাছে তিনি কি বলছেন জানি না। তবে আমি এইটুকু জানি যে, তাঁকে তুলে দেবার জন্য জীবনানন্দ একসময়

পাগলের মত ঘুরেছেন। কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় যদিও আজ আর জীবিত নেই, কিন্তু উকিল চাঁদমোহন চক্রবর্তী এবং একদা এম, এল, এ, ও ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আজও—এই প্রসঙ্গ লেখার সময়, বেঁচে আছেন। এঁরা সাক্ষ্য দিতে পারবেন যে, ঐ ব্যাপারে জীবনানন্দ দাশ আমার সঙ্গে গিয়ে কিভাবে তখন এঁদের সাহায্যপ্রার্থী ও শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

সাবিত্রীদার অক্ষমতার কথা বলে আসবার পর জীবনানন্দের বাড়ি অনেক দিন আর যেতে পারিনি। এই সময় একদিন—সেটা ছিল ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর (১৩৬১ সালের ৬ই কার্তিক) শনিবার—সকালে বাড়িতে খবরের কাগজ পড়বার সময় দেখি, ভিতরের পাতায় এক জায়গায় জীবনানন্দের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। লেখা আছে—গত বৃহস্পতিবার দেশপ্রিয় পার্কের নিকটে ট্রামের ধাক্কায় তিনি গুরুতর ভাবে আহত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এবং শুক্রবার রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটের সময় তাঁর মৃত্যু হয়।

খবরটা পড়েই আত্মীয় বিচ্ছেদের ন্যায় শোকাভিভূত হলাম। তখনই জীবনানন্দের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

জীবনানন্দের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সেখানে তাঁর আত্মীয়দের মুখে শুনলাম—কাগজে আমি যে বৃহস্পতিবার আহত হওয়ার কথা পড়েছি, সেটা ২১শে অক্টোবর নয়, তার আগের বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৪ই অক্টোবর।

আমি যে-কাগজে জীবনানন্দের মৃত্যু সংবাদ পড়ি সেটা একটা অতি বিখ্যাত বাঙ্গলা দৈনিক পত্রিকা। জীবনানন্দের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশের আগে, তাঁর ট্রাম দুর্ঘটনার কোন কথাই ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। দুর্ঘটনায় তাঁর পাঁজরা, কাঁধ ও উরুর হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। ১৪ই অক্টোবর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি মৃত্যুর সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে যে-ক'দিন বেঁচে-ছিলেন, তারও কোন সংবাদ ঐ কাগজে প্রকাশিত হয়নি। আমি তখন ঐ কাগজটাই শুধু পড়তাম। তাই জীবনানন্দের বাড়িতে ঐ সময় না যাওয়ায় তাঁর ঐ সময়কার কোন সংবাদই জানতে পারিনি। যদি জানতে পারতাম, তাহলে নিশ্চয়ই হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যেতাম।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরদিন সংবাদপত্র সমূহে তাঁর যে মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সে সবই ভিতরের পাতায়। আর বড় করেও তা প্রকাশিত হয়নি। তাঁর ঐ মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে সেদিন তাঁর কোন ফটোও কোন কাগজে প্রকাশিত হয়নি। এমন কি সব কাগজেই তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু ভুল সংবাদও তখন প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন—মৃত্যুকালে তিনি হাওড়ায় নরসিংহ

দত্ত কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তিনি স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান এক কন্যা রেখে গেছেন।

এই কথাগুলো এখানে আমার বলার হেতু এই যে, আজ জীবনানন্দের যে খ্যাতি, কেন জানি না, তাঁর মৃত্যুর শুধু আগেই নয়, মৃত্যুর ক'দিন পর পর্যন্তও তাঁর কবি-খ্যাতি দেশে তেমন প্রচারিত ছিল না।

তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর থেকেই প্রকৃত পক্ষে তাঁর কবি-খ্যাতি যে কোন কারণেই হোক ব্যাপক ভাবে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে তাঁর খ্যাতি শুধু মুষ্টিমেয় আধুনিক কবি ও আধুনিক কবিতার সমর্থকদের গণ্ডী ছাড়িয়ে বেশি দূর এগোতে পারে নি। অর্থাৎ তখন তাঁর কবিতার পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। তাঁর মৃত্যুর কদিন পর থেকে তাঁর অনুরাগীরা ত বটেই, এমন কি তাঁর কবিতার প্রতি যাঁরা বিরূপ ছিলেন, তাঁরাও তাঁর কবিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। যেমন, যে সজনীকান্ত দাস তাঁর 'শনিবারের চিঠি'তে দীর্ঘদিন ধরে জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন, তিনিও জীবনানন্দের মৃতুর পর শনিবারের চিঠিতে লিখেছিলেন—

'কবি জীবনানন্দের কাব্যের প্রতি আমরা যৌবনে যথেষ্ট বিদ্রূপতা করিয়াছি ; তাঁহার দুর্বোধ্যতাকে ব্যঙ্গ করিয়া বহু পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেও ছাড়ি নাই।...

এ কথা আজ স্বীকার করা কর্তব্য মনে করিতেছি যে, রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-সাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন। তিনি অকপটে সুদৃঢ় নিষ্ঠার সহিত কাব্য-সরস্বতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন।'

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমার 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' বইএর গল্প সংগ্রহের জন্য তখন আমি শরৎচন্দ্রের পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও পরিচয় ছিল, এই জেনে এক ছুটির দিন সকালে প্রেমেনবাবুর বাড়িতে গেলাম। যখন যাই, তখন তিনি তাঁর বাড়ির একতলার বৈঠকখানায় বসে কয়েক জনের সঙ্গে গল্প করছিলেন। বেশ মনে আছে, ঐ কয়েকজনের মধ্যে একজন ছিলেন, 'দেশ' পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক সাগরময় ঘোষ।

প্রেমেনবাবুর সঙ্গে তখন আমার পরিচয় ছিল না। আমি গিয়ে আমার একটু পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছে আসার উদ্দেশ্যটা বললাম। আর এও বললাম যে, শরৎচন্দ্রের অনেক বৈঠকী গল্প আমি ইতিমধ্যেই নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছি।

প্রেমেনবাবু আমাকে সমাদর করে বসিয়ে বললেন—শরৎচন্দ্রের বলা কি রকম গল্প সংগ্রহ করেছেন, দু-একটা আমাদেয় শোনান।

এই বলেই আবার বললেন—একটু থামুন। ধীরাজকে ডেকে আনি। সে এখানেই আছে।—বলে উঠে গেলেন। একটু পরেই তিনি যাঁকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, দেখি ইনি বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য। কলেজ জীবনে এবং তারপরেও কয়েকটা ছবিতে এঁর অভিনয়ও দেখেছি।

প্রেমেনবাবু এবং ধীরাজবাবু বসলেন। আগের অন্যান্যরা সকলে বসেই ছিলেন। আমি আমার সংগ্রহ থেকে শরৎচন্দ্রের বলা একটা গল্প শোনালাম। গল্পটা বললাম—শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে সাহিত্যিক 'বনফুলে'র কাছে যে 'গুরুদেবের জাহাজ ভক্ষণ' গল্পটা বলেছিলেন। দ্বিতীয় গল্প কোন্‌টা বলেছিলাম, সেটা আজ আর মনে নেই

দেখলাম, গল্প শুনে সকলেই খুব খুশী।

আমার মুখে শরৎচন্দ্রের বলা দুটি মজার গল্প শুনে, ধীরাজবাবু বললেন —আপনি দুটি গল্প শোনালেন, এবার আমি আপনাকে দুটি গল্প শোনাই। এই বলে তিনি আরম্ভ করলেন—

এক বিরাট ধনী ব্যক্তির দু মহলা বাড়ির বা'র মহলে একটি লোক চাকরের কাজ করে। চাকরের ঐ মনিবটি মস্ত ধনী হলে কি হবে, সে ছিল হাড়

কিপ্‌টে। ঐ কৃপণ মনিব চাকর-বাকরদের ঠিক মত বা প্রয়োজন মত কাপড় জামা কিনে দিত না। ফলে তারা ছেঁড়া কাপড় জামা, এমনকি ছেঁড়া গামছা পরেও কাটাত।

একদিন হ'ল কি, এক কৌপীনধারী নাগা সন্ন্যাসী বাড়ির বা'র মহল পেরিয়ে ভিতর মহলের কাছে এসে ভিক্ষা চাইতে লাগল।

তাকে দেখেই বাড়ির মালিক অর্থাৎ চাকরদের ঐ মনিব নাগা সন্ন্যাসীর কাছে এসে বল্‌লে—কি চাই? এখানে কেন, বাইরে চল।—এই বলে তাকে নিয়ে বাইরে এল।

এমন সময় বাড়ির বা'র মহলের চাকরটাকে দেখতে পেয়েই মনিব চীৎকার করে বলে উঠল—হতভাগা, কোথায় ছিলি? দেখিস্‌ নি, একজন নাগা সন্ন্যাসী বাড়ির ভিতরের দিকে যাচ্ছিল।

শুনে চাকর বললে—বাবু, আমি ওকে দেখেছি। আমি তো আপনার বাড়িতে এতদিন আছি, আপনি আমাকে যে কাপড় গামছা দিয়েছেন, তা ছিঁড়ে ছিঁড়ে এই হাল হয়েছে। আমাকে ছেঁড়াই পরে কাটাতে হয়। তাই ওকে দেখে আমার এই ছেঁড়া কাপড় গামছার সঙ্গে তুলনা করে ভাবলাম—ও বোধ হয়, আপনার আমার চেয়েও আরও কোন পুরনো চাকর। এতদিন আপনার কাজে হয়ত অন্য কোথাও ছিল, আজ আসছে।

এই গল্প বলে, ধীরাজবাবু বললেন—আর একটা গল্প বলি—

একটি ছেলে বি. এ. পাস করে অনেক দিন ধরেই চাকরির চেষ্টা করছে। কিন্তু কোথাও একটা সামান্য চাকরিও আর জোগাড় করতে পারছে না। সারা দিন এ অফিস সে অফিস করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সব জায়গাতেই গিয়ে দেখে—সামনে টাঙ্গানো 'নো ভেকেন্সি' অর্থাৎ চাকরি নেই।

দিনের পর দিন এইভাবে ব্যর্থ হয়ে সে বেচারা একদিন ঠিক করল—বেঁচে থেকে লাভ নেই! কি করে কি খাব? তার চেয়ে আত্মহত্যা করাই ভাল।

যেদিন আত্মহত্যা করবে বলে স্থির করেছিল, সেইদিন সকালে তার মনে এল—চাকরির জন্য বহু জায়গাতেই তো ঘুরলাম, শুধু একটা জায়গায় চিঁড়িয়াখানাটায় যাওয়া হয় নি। আজ ঐ জায়গাটায় গিয়ে একবার দেখি। তা না হলে মরেও আফ্‌শোষ থেকে যাবে যে, ঐ জায়গায় গেলে, হয়ত একটা চাকরি হতেও পারতো।

এই ভেবে সে সকাল ১০টায় চিঁড়িয়াখানায় গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে গিয়ে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করে, যৎসামান্য মাইনে দিলেও হবে—বলে একটা চাকরি প্রার্থনা করল।

ছেলেটি কতদূর লেখা পড়া করেছে, বাড়িতে কে আছে ইত্যাদি জেনে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ছেলেটিকে বললেন—দেখ, আমাদের চিঁড়িয়াখানায় এখন

কোন শিম্পাঞ্জী নেই। একটা ছিল, কিছুদিন আগে সেটা মারা গেছে। আমরা তার ছাল অর্থাৎ গায়ের চামড়াটা খুব যত্ন করে ছাড়িয়ে রেখে দিয়েছি। সেই চামড়াটাই কোন রকমে কায়দা করে তোমাকে পরিয়ে তোমাকে শিম্পাঞ্জী সাজাবো, তুমি শিম্পাঞ্জী সেজে শিম্পাঞ্জীর কামরায় থাকবে। যতক্ষণ চিঁড়িয়াখানা খোলা থাকবে—ধর ১০টা থেকে ৫টা—ঐ সময়টা তুমি ঐখানে থাকবে। তারপর দর্শকদের জন্য চিঁড়িয়াখানা বন্ধ হয়ে গেলে, তুমি পরচুলা খোলার মত ঐ খোলশটা খুলে রেখে বাড়ি যাবে। পরদিন আবার এসে ঐ রকম ১০টা—৫টা ডিউটি দেবে। মাইনে পাবে মাসে ৩০ টাকা। দর্শকরা শিম্পাঞ্জী দেখতে এলে শিম্পাঞ্জীরূপী তুমি এ ডাল ও ডাল করে তাদের খেলা দেখাবে। তোমার ঐ খেলায় তারা খুশী হয়ে তোমাকে যে কলাটা মুলোটা খেতে দেবে, সে তোমার উপরি পাওনা। ভেবে দেখ, এই চাকরি করতে পারবে? তাহলে কাল থেকেই কাজে লেগে যাও।

অনাহারক্লিষ্ট, নিরুপায় বেকার ছেলেটি সানন্দেই ঐ চাকরি নিতে রাজী হয়ে গেল। এবং পরের দিন থেকেই কাজে যোগ দিল।

ছেলেটি কিছুদিন হ'ল যথারীতিই কাজ করছে। এমন সময়, একদিন এক মহিলা কলেজের এক ঝাঁক ছাত্রী চিঁড়িয়াখানা দেখতে এসে ঐ শিম্পাঞ্জীর কামরায় কাছে এসে দাঁড়াল।

শিম্পাঞ্জীবেশী ছেলেটি এদের দেখে তার ঘরের সাজানো নকল গাছের এ ডাল ও ডাল করে খুব কসরৎ দেখাতে লাগল। এই কসরৎ দেখাতে দেখাতে হঠাৎ কি ভাবে ডাল থেকে হাত ফসকে সে একেবারে ছিটকে পাশের ঘরে গিয়ে পড়ল। এখন ঐ পাশের ঘরটা ছিল, একটা সিংহের ঘর। সিংহপ্রবর তখন শুয়ে ছিল।

সিংহ দেখেই তো ঐ শিম্পাঞ্জী ছেলেটি তার নকল সাজার কথা ভুলে গিয়ে, বাঁচাও, বাঁচাও, করে চীৎকার করে উঠল।

সিংহ মশায় শুয়ে শুয়েই একটু কেশর নাড়া দিয়ে খুব আস্তে আস্তে বল্‌ল —চুপ্! চুপ্! চাকরি রাখতে চাস্ তো চেঁচাস্ নে।

ছেলেটি সব বুঝে, আর কোন শব্দ না করে চুপ করে গেল।

এই বলে ধীরাজবাবু তাঁর গল্প শেষ করলেন। শিম্পাঞ্জী ছেলেটির মত আমরাও বুঝলাম, ঐ সিংহও আসল সিংহ নয়। সিংহের খোলশ-পরা একটি মানুষ। সিংহের খোলশ পরে সিংহের ঘরে রয়েছে। ধীরাজবাবুর গল্প শুনে সকলেই খুশী হলাম এবং হাসতেও লাগলাম।

আমাদের গল্প বলা শেষ হলে, প্রেমেনবাবু আমাকে বললেন—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার দু একবার আলাপ হয়েছিল, আমি একবার তাঁর বাজে শিবপুরের

বাড়িতেও গিয়েছিলাম। তবে ভাই, তাঁর বলা এ রকম কোন গল্প আমার জানা নেই।

সেদিন প্রেমেনবাবুর বাড়ি থেকে আসার পর, নানা প্রসঙ্গ নিয়ে পরে তাঁর বাড়িতে বহুবার গেছি। তখন তাঁকে প্রেমেনদা বলতাম, তিনিও আমাকে ছোট ভাইএর ন্যায় স্নেহ করতেন।

হুগলী জেলায় দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মভূমিতে তাঁর জন্ম দিনের উৎসবে বহুবার বক্তৃতা দিতে গেছি। ওখানকার উদ্যোক্তারা একবার সভার কয়েকদিন আগে আমাকে বললেন—এবার প্রেমেনবাবু সভাপতি, আর আপনি প্রধান অতিথি হয়ে যেতে হবে। আপনার সঙ্গে তো প্রেমেনবাবুর বিশেষ পরিচয় আছে, আপনি অনুগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর মতটা নিন।

প্রেমেনদাকে দেবানন্দপুরে যাবার কথা বলতে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু সভার দুদিন আগে আমাকে খবর দিলেন—বাড়িতে নানা কাজের জন্য ঐ দিন যেতে পারবেন না।

তখন আমি গিয়ে বললাম—সভায় আপনি সভাপতি বলে চিঠি ছাপা হয়ে গেছে যে!

বললেন—তুমি একটু বোস ভাই। তোমার হাত দিয়ে আমার একটা শ্রদ্ধার্ঘ্য এখনি লিখে দিচ্ছি। তুমি তো সভায় প্রধান অতিথি। তুমিই না হয় আমার এই লেখাটা সভায় পড়ে দিও।

একটু বসলাম। তিনি একটা লেখা আমার হাতে দিলেন। সেই লেখাটা নিয়ে ফিরে এলাম।

প্রেমেনদা যেতে পারলেন না বলে, তাঁর জায়গায় সাহিত্যিক রামপদ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। রামপদদাও আমাকে খুব স্নেহ করতেন।

আমাদের বক্তৃতা ছাড়া সভায় প্রেমেনদার ঐ লেখাটাও পড়া হয়েছিল। সেদিনের অর্থাৎ ১৩৬১ সালের ৩১ শে ভাদ্র শরৎ জন্ম দিনের সভার যে বিবরণ ক'দিন পরে ৪ঠা আশ্বিন তারিখে যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেখা হয়েছিল—

সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের এই উৎসবে পৌরোহিত্য করিবার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া সভার জন্য একটি লিখিত বাণী প্রেরণ করেন। এই বাণীতে তিনি বলেন—'ইতিহাসের পাতায় বিশিষ্ট জাতি হিসাবে আমাদের প্রদীপ্ত পরিচয় সত্যই খুব বেশী দিনের নয়। সে পরিচয় প্রধানতঃ সাহিত্যের গৌরবের উপরেই

প্রতিষ্ঠিত। যে দুর্দিন আমাদের চারিদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে, জাতি হিসাবে তাহা যদি নাও কাটাইয়া উঠিতে পারি, আমাদের সাহিত্যের দীপ্তি যে মানব সভ্যতার বিশ্ব-দীপালিতে চির অম্লান হইয়া থাকিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। চিরকালের জন্য সাহিত্যের এই অনির্বাণ দীপ যাঁহারা জ্বালাইয়া গিয়াছেন, শরৎচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যেও অদ্বিতীয়। তাঁহাকে অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানাইয়া আমরা নিজেরাই ধন্য। দেবানন্দপুর শুধু বাংলা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের সাহিত্যতীর্থ। এই তীর্থভূমিতে সমস্ত বাঙালী জাতির সঙ্গে আমার প্রণাম আমি পাঠাইলাম।'

১৩৩০ সালের ২১শে বৈশাখ (৫ই মে ১৯৩৩) তারিখে সন্ধ্যায় জওহর শিশু ভবনে (৩৪/১ জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-২০) কয়েকজন লেখক-লেখিকাকে অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, অমৃত, প্রসাদ, রঞ্জিৎ স্মৃতি পুরস্কার সমিতি ও মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রেমেনদা। সভায় গান গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

সেদিন অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য পেয়েছিলেন অমৃত বাজার পুরস্কার, আমাকে দেওয়া হয়েছিল যুগান্তর পুরস্কার। সেদিন আর আর পুরস্কার প্রাপক-প্রাপিকাদের মধ্যে ছিলেন—অখিল নিয়োগী, বাণী রায়, বেতারের ইন্দিরা দেবী ও কবিতা সিংহ।

অনুষ্ঠানের পর সভাপতি প্রেমেনদা, অমৃত বাজার ও যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ সহ পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক-লেখিকাদের নিয়ে একটা ফটো তোলা হয়।

সেদিন সভা শেষে বাড়ি ফেরার সময় তুষারবাবু তাঁর মোটরে আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়েও গিয়েছিলেন।

মন্মথ রায়

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ সেখানে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। তিনি গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাত্ররা একদিন তাঁকে বলেন—আমাদের জগন্নাথ হল থেকে আমরা প্রতি বছর 'বাসন্তিকা' নামে একটা সাহিত্য সংকলন বই বার করি। আমাদের এই সংকলন গ্রন্থের জন্য আমরা আপনার কাছ থেকে একটা কবিতা প্রার্থনা করছি।

ছাত্রদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তখন তাদের 'বাসন্তিকা' সংকলন গ্রন্থের জন্য একটা কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।

ঐ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন ঢাকায় যান, ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের 'প্রোভোস্ট' এবং জগন্নাথ হল থেকে প্রকাশিত 'বাসন্তিকা' পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন।

রমেশবাবু আমাদের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। রমেশবাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের ঐ সময়কার কিছু চিঠিপত্র আছে জেনে আমি একদিন সেগুলো দেখতে চাইলে তিনি দেখান। পরে তাঁরই নির্দেশে এবং তাঁর অনেকটা সহায়তায় ঐ সব নিয়ে, সঙ্গে আরও তথ্য এবং প্রসঙ্গ-কথা দিয়ে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় পর পর তিন সংখ্যায় 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' নামে একটা প্রবন্ধ লিখি। 'বাসন্তিকা' সংকলন গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথের লিখে দেওয়া ঐ কবিতাটির পাণ্ডুলিপি রমেশবাবুর কাছে পেয়ে তখন আমার ঐ প্রবন্ধে কবির হস্তাক্ষরেই কবিতাটিও প্রকাশ করেছিলাম।

পরে 'বাসন্তিকা' সংকলন গ্রন্থটি কেমন এবং কিভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি ছাপা হয়েছে দেখবার জন্য আমি একদিন রমেশবাবুর কাছে ঐ 'বাসন্তিকা' বইএর খোঁজ করি। তিনি তখন আমাকে বলেন—আমার কাছে এক কপিও ঐ বই নেই। তুমি নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাছে গিয়ে খোঁজ কর। তিনি সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁর কাছে ঐ বই থাকতে পারে।

রমেশবাবুর এই কথায় আমি একদিন মন্মথবাবুর বাড়িতে যাই। তাঁর

বাড়িতে এই আমার প্রথম যাওয়া। আমি গেলে, তিনি আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে খুব সমাদর করলেন।

আমি তাঁকে 'বাসন্তিকা' বইএর কথা বললে, তিনি বললেন—ভাই আমার কাছে মাত্র ১৩৩২ ও ১৩৩৩ এই দু বছরের 'বাসন্তিকা' আছে। এ দুটো তোমাকে দেখাচ্ছি।—এই বলে তিনি বই দুটো দেখালেন। দেখাবার সময় এও বললেন—আমাদের এই 'বাসন্তিকা' প্রকাশিত হ'ত প্রতি বছর নব বসন্ত আসার গোড়াতেই অর্থাৎ ফাল্গুনের একেবারে প্রথমেই

রবীন্দ্রনাথ 'বাসন্তিকা'র জন্য কবিতাটি লিখে দিয়ে ছিলেন ১৩৩২ সালের ৩রা ফাল্গুন তারিখে। মন্মথবাবুর কাছে 'বাসন্তিকা' পেয়ে দেখলাম, ১৩৩২ সালের এই বইয়ে কবিতাটি প্রকাশিত হয়নি। ভাবলাম, হয়ত কবিতাটি ঠিক সময়ে পাওয়া যায়নি বলেই, 'বাসন্তিকা' বইয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এরপর ১৩৩৩ সালের 'বাসন্তিকা' বইটা দেখলাম, তাতে রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি ছোট কবিতা ছাপা হলেও এই কবিতাটি ছাপা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কবিতা চেয়ে নিয়েও সে কবিতা কেন 'বাসন্তিকা'য় ছাপা হ'ল না এ সম্বন্ধে মন্মথবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছু বলতে পারলেন না। পরে রমেশবাবুকেও এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনিও কিছু বলতে পারলেন না। এ সম্বন্ধে পরে প্রকাশিত আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্র-নাথ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'বাসন্তিকা' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

এখানে 'বাসন্তিকা' সংকলন গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথের লিখে দেওয়া এই কবিতাটি সম্বন্ধে আর একটা কথা বলার আছে। সেই কথাটা বলি—

রমেশবাবু যখন এই কবিতার পাণ্ডুলিপিটি আমার হাতে দেন, তখন তিনি বলেছিলেন—কবি আমাদের 'বাসন্তিকা' কাগজের জন্য 'বাসন্তিকা' নাম দিয়ে এই কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন।

রমেশবাবুর এই কথা অনুযায়ী 'দেশ'য়ে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধে এবং পরে আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বইয়েও রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরেই কবিতাটি মুদ্রিত করে লিখেছিলাম—কবি ছাত্রদের অনুরোধে তখন এই 'বাসন্তিকা' কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন।

আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বই প্রকাশিত হ'লে, তখন ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের জগন্নাথ হলের এক ছাত্র এবং 'বাসন্তিকা' সংকলন গ্রন্থেরও অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা গণেশ বসু চিঠি লিখে আমাকে জানান—আমাদের অনুরোধে রবীন্দ্র-নাথ শুধু কবিতাটাই লিখে দিয়ে ছিলেন। কবিতার মাথায় বাঁ দিকের কোণে আণ্ডার লাইন-সহ যে বাসন্তিকা লেখা এবং বাসন্তিকা লেখার পর যে দাঁড়ি —এ সবই আমার লেখা, কবির লেখা নয়। আমাদের 'বাসন্তিকা' কাগজের

বাসন্তিকা।

এই কথাটি মনে রেখো, —
তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।
শুকনো ঘাসে শূন্য বনে, আপন মনে,
অনাদরে অবহেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

দিনের পথিক মনে রেখো, —
আমি চলেছিলেম রাতে
সন্ধ্যাপ্রদীপ নিয়ে হাতে।
যখন আমায় ওপার থেকে গেল ডেকে,
ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়,
আমি যে গান গেয়েছিলেম
জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ ফাল্গুন
১৩৩২

জন্য লেখা বলে কবির কাছ থেকে কবিতাটি নিয়ে আমিই তখন ঐ সব লিখেছিলাম। আমার এই লেখার সঙ্গে কবির ঐ কবিতার পাণ্ডুলিপির লেখা মিলিয়ে দেখলেই দুটো হস্তাক্ষরের তফাৎ বুঝতে পারবেন।

গণেশবাবুর চিঠি পেয়ে মিলিয়ে দেখলাম, দুই হস্তাক্ষরে তফাৎ তো আছেই, তাছাড়া এও ভাবলাম, রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখে কবিতার মাথায় এক কোণে হেডিং দিয়ে তার নীচে লাইন টেনে, হেডিংএর পাশে আবার একটা দাঁড়িই বা দেবেন কেন ? এ গণেশবাবুরই কাজ।

রমেশবাবু তখন না জেনে আমাকে ভুল বলায়, তাঁর কথামত আমিও ভুল লিখেছিলাম। রমেশবাবুর কথামত তখন 'দেশ'য়ে প্রকাশিত আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে এইরূপ আরও কয়েকটা ভুল লিখেছিলাম। পরে সেগুলো ধরতে পারায় আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে সেগুলো সংশোধন করে দিই। কিন্তু এই কবিতাটি সম্বন্ধে ঐ কথা জানতে না পারায় আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে সংশোধন করতে পারিনি। এই ভুলটা সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে অনেকেই নিশ্চিত হয়ে লিখবেন ঐ কবিতার শিরোনামও রবীন্দ্রনাথেরই লেখা। যেমন—'দেশ' পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় পঞ্চাশ বছরের 'সূচীপত্র' অধ্যায়ে লেখা হয়েছে—'৩৬ বর্ষ, ১৯৬৮—৬৯···৫ম সংখ্যা—বাসন্তিকা (কবিতা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

দেশ-এর ঐ সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যাতেই 'দেশ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের লেখক পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম ভট্টাচার্য লিখেছেন—'বাসন্তিকা মূল পাণ্ডুলিপি চিত্রসহ প্রকাশিত হয়েছে ৩৬ বর্ষ ৫ম সংখ্যায়।'

'দেশ' পত্রিকায় আমি যখন আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি লিখি, সেই সময় রমেশবাবু আমাকে বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ নারায়ণগঞ্জে এসে পেঁছিলে তাঁকে আমার মোটরে করে আমার ঢাকার রমনার বাড়িতে নিয়ে আসি। তিনি ঢাকায় এসে প্রথমে আমার অতিথি হন এবং আমার বাড়িতে কয়েকদিন থাকেন।

রমেশবাবুর এই কথা মত আমার প্রবন্ধে লিখেছিলাম—রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে প্রথমে রমেশবাবুর বাড়িতে উঠেছিলেন।

'দেশ'য়ে আমার ঐ প্রবন্ধ লেখার পর আমি আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বইটি লিখি। তখন রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় যাওয়ার সময়কার বিভিন্ন দৈনিক পত্রে প্রকাশিত সংবাদ সমূহ থেকে এবং তখনকার প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখা পড়ে, তাঁদের কারও কারও মুখে শুনেও জানতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে প্রথমে রমেশবাবুর বাড়িতে ওঠেন নি ; উঠেছিলেন বুড়ীগঙ্গার উপর অবস্থিত ঢাকার নবাবদের তুরাগ হাউসবোটে এবং প্রথমে সেখানেই কয়েকদিন ছিলেন।

এই জেনে আমার বইয়ে এই কথাই লিখি। অবশ্য আমার বইয়ে কোথাও ঘুণাক্ষরেও বলিনি যে, 'দেশ'য়ে প্রবন্ধ লেখার সময় রমেশবাবু আমাকে এ প্রসঙ্গে ভুল কথা বলেছিলেন।

ব্যাপারটা অতি সামান্য বা নগণ্যই। তবুও রমেশবাবু আমার বই পড়ে আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এবং বার বার সাক্ষাতে এবং চিঠিতে আমাকে বলতে থাকেন—তখনকার কাগজে যা লিখেছে এবং অন্যরা যা লিখেছে বা বলছে সব মিথ্যে। আমি তোমাকে যা বলেছি, তাই-ই ঠিক। তুমি নাট্যকার মন্মথ রায়ের কাছে যাও। তিনি জানেন। দেখবে, তিনি আমার কথাই সমর্থন করবেন—রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে প্রথমে আমার বাড়িতে উঠে ছিলেন।

রমেশবাবুর নির্দেশ মত মন্মথবাবুর বাড়িতে আবার একবার অর্থাৎ দ্বিতীয় বার যাই। তিনি সেদিন রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় যাওয়া নিয়ে অনেক কথা বললেও, রমেশবাবুর কথাটা কিন্তু সমর্থন করলেন না।

মন্মথবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে তাঁর কথা রমেশবাবুকে জানালে, তিনি কোন কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন।

মন্মথবাবুর বাড়িতে দুবার গিয়ে অনেক কথাবার্তা ও গল্প করে আসার ফলে তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তখন থেকে তাঁকে আমি দাদা অথবা মন্মথদা বলতাম।

এই মন্মথদার বাড়িতে আমি তৃতীয় বার যাই রমেশবাবুরই কারণে। তবে তাঁর কথায় বা নির্দেশে নয়। গিয়েছিলাম আমার নিজের গরজেই। সে ইতিহাসটা এবার বলি—

আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বই পড়ার পর রমেশবাবু বেতার ভাষণে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও শেষে তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে লেখেন—গোপালবাবু তাঁর 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে যে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে প্রথমে ঢাকার নবাবদের তুরাগ হাউস বোটে উঠেছিলেন, এটা ভুল। এ সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানবার জন্য আমি তাঁকে মন্মথ রায়ের কাছে পাঠিয়ে ছিলাম। তিনি ফিরে এসে বললেন—ঐ লেখাটা আমার বড় ভুল হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে তুরাগে ওঠেন নি, আপনার বাড়িতেই উঠেছিলেন। আমি বইয়ে একটা সংশোধন যোগ করে এবং সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে আমার ভুলটা সংশোধন করে দোব।

দেখলাম, মন্মথবাবুর যে মুখের কথা আমি রমেশবাবুকে বলেছিলাম, রমেশবাবু সেটাকে সম্পূর্ণ অসত্য করে ঐ কথা লিখেছেন।

এই সময় রমেশবাবুর ঐ আত্মজীবনী নিয়ে এক ব্যক্তি 'দেশ' পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর লেখায় স্পষ্টতঃ আমার নাম উল্লেখ না করলেও আমার প্রসঙ্গ এনেছেন দেখলাম।

তখন এ নিয়ে মন্মথদার আর মুখের কথা নয়, একেবারে তাঁর লেখা নিয়েই একটা উত্তর দেবার জন্য মন্মথদার বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনেছিলাম তিনি 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' নামক সংকলন গ্রন্থে যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ যে প্রথমে তুরাগ হাউস বোটে উঠেছিলেন, সে কথা আছে।

মন্মথদার বাড়িতে গিয়ে ঐ 'আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' বইটা দেখতে চাইলে, তিনি বললেন—ভাই, বইটা এখনও পাইনি। ঐ বইএর সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, আর উপদেষ্টা বা সভাপতি রমেশ মজুমদার। তুমি আশুবাবুর বাড়ি যাও, গেলেই বইটা পাবে।

এই শুনে তখনই গেলাম বেহালায় আশুবাবুর বাড়িতে। তিনি বই দিলে দেখলাম, মন্মথদা তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়ে প্রথমে ঢাকার নবাবদের তুরাগ হাউস বোটে উঠেছিলেন।—এই লেখাটা নকল করে এনে, এর সঙ্গে আমার পক্ষের আরও বহু যুক্তি দেখিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় একটা চিঠি লিখেছিলাম। 'দেশ'য়ে রমেশবাবুর আত্মজীবনীর আলোচনা করতে গিয়ে যিনি আমার প্রসঙ্গ এনেছিলেন, চিঠিটা তাঁরই লেখার বিরুদ্ধে হলেও, আসলে ছিল আমার বিরুদ্ধে রমেশবাবুর লেখারই উত্তর।

রমেশবাবু তখন সুস্থ শরীরেই জীবিত ছিলেন। তিনি 'দেশ'য়ে আমার চিঠি পড়ে চিঠির কোন উত্তর দিতে পারেন নি।

মন্মথদার কাছে শেষ যাই, দার্জিলিংয়ে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের একটা প্রসঙ্গ নিয়ে। সেই কাহিনীটা এবার বলছি—

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন—

'দার্জিলিং গিরিশৃঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত কবি নজরুল ইসলামের মুলাকাত হয়। এই সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ হাবিলদার-কবি স্বয়ং প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে এই নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাটি ছিল—'কবি হেসে বললেন, সজনে গাছকে কোনো রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেননা চমৎকার ফুল-ঝুরির মতো ফুল সেজে থাকে।'...কবি হাসতে হাসতে বললেন, 'এইরকম আর একটি জীবের নাম করা চলে, দেখতে সে বেশ সুশ্রী, কিন্তু সেও ঠিক এই কারণে সাহিত্যের আসরে একঘরে হয়ে আছে।' আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী।'

...রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটিলেন। তাহার প্রকাশ হইল কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় 'নবীন কবি' প্রবন্ধ। শনিবারের চিঠির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া 'সাহিত্যিক মোরগের লড়াই' কথাটা তিনি ব্যবহার করিলেন।...

পূর্বের 'সজনে ফুল' ও 'মুরগী'র ঘা মনে ছিল, নূতন করিয়া সাহিত্যিক

মোরগের উপমা তাহাতেই জন্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল ১১ই পৌষে (২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩১) অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়া।...আমরা 'জয়ন্তী-সংখ্যা' প্রকাশ করিয়া ব্যজস্তুতিচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র-বিদ্বেষণ করিয়া বসিলাম। শ্রীঅমল হোম প্রমুখ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা লক্ষ্য হইলেও সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না। ...মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসা পরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল।'

'শনিবারের চিঠি'র মলাটে থাকত মোরগের ছবি। আর 'সজনে' শব্দের সঙ্গে সজনীকান্তের নামেরও অনেকটা আক্ষরিক মিল থাকায় সজনীকান্ত ভেবে-ছিলেন, কবি তাঁকেই লক্ষ্য করে ঐ কথাগুলো বলেছিলেন। সত্যই কবি সজনীকান্তকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন কিনা তা বলা যায় না। কেউ কেউ বলেন, সজনীকান্ত বা তাঁর 'শনিবারের চিঠি'র দল কবিকে যেভাবে আক্রমণ করতেন, তাতে করে কবির পক্ষে ঐ কথা বলা হয়তো একেবারে অসম্ভবও ছিল না।

কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় 'নবীন কবি' প্রবন্ধটা দেখেছি। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত তরুণ কবি বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি কবিতা পড়ে, সেই কবিতাগুলির প্রশংসা করেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গত লিখেছিলেন—'নিঃসহায় মোরগ ও মেড়ার লাঞ্ছনায় যে আনন্দোচ্ছ্বাস নিঃশেষিত হলে অপেক্ষাকৃত লঘুতর অপরাধ হ'ত, আমাদের সেই দুয়ো দেবার দুর্দম নেশাকে আমরা সকল উপলক্ষেই ভোঁতা করবার চেষ্টা করি বলে বাংলাদেশে কোনো বড়ো কাজই ভদ্রভাবে বেড়ে উঠবার সুযোগ পেল না। নিজের দেশের মানুষকে এবং কাজকে নিজের হাতে খর্ব করবার শখ আমাদের কিছুতেই মিটতে চায় না। সেই শখ বিছুটির মতো গজিয়ে ওঠে, আমাদের রাষ্ট্রসভায়, ধর্ম-সম্প্রদায়ে, সাময়িক পত্রে, জনসেবাকর্মে, ছাত্রদের হস্টেলে। আমাদের সাহিত্যবিচারে মনন বস্তুর দৈন্য যথেষ্ট, সেই অভাবকে ঢেকে দিই দুয়ো দেবার উত্তেজক মসলায়। যাকে আমরা ভালো বলতে চাই, তাকে ভালো বলেই আনন্দ পাইনে, তাকে পক্ষভুক্ত করে নেই এবং আর একজনকে প্রতিপক্ষ খাড়া করে তবে আমাদের শখ মেটে। একজন গুণীর পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার উপলক্ষে আর একজনের প্রতিপত্তিকে ধূলিশায়ী করবার যে উৎসাহ, সে সাহিত্য নয়, সে সাহিত্যিক মোরগের লড়াই। এই লড়াইয়ে কোনো দিন আমি যোগ দিই নি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েছি।'

সজনীকান্তর 'আত্মস্মৃতি' পড়ে জানা যায়, দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, নজরুল স্বয়ং সেই সাক্ষাতের কথা ১৩৩৮

সালের আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশ' মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধকারে প্রকাশ করেছিলেন।

এই আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশ' পত্রিকা কোথাও পাইনি, তাই কারও কারও লেখায় ঐ রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের কথা কিছু কিছু পেলেও, সমস্তটা পেলাম না। এই যে কারও কারও লেখার কথা বললাম, এঁদের কয়েকজনের লেখা এখানে উদ্ধৃত করছি—

১৩৬০ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যা 'শিক্ষাব্রতী' পত্রিকায় অখিল নিয়োগী তাঁর 'রবীন্দ্র-স্মৃতিকথা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

পুজোর ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াতে গেছি। সেখানে গিয়ে কবি নজরুল ইসলাম আর নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে দেখা।

এরই মধ্যে খবর পাওয়া গেল—রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন দার্জিলিং-এ আমাদের খুবই কাছে।

নজরুল প্রস্তাব করলেন, একদিন দলবেঁধে কবির কাছে যাওয়া যাক।

যে কথা সেই কাজ।

আমরা রওনা হলাম কবি-সকাশে।

নজরুলকে নিজের পাশে পেয়ে কবি আজ ভারী খুশি।

কথার ওপর কথা চলল—বাঙলা সাহিত্যের গল্পের কথা, নাটকের কথা, গানের কথা, বিদেশী কবিদের কথা। আমরা শুধু মুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছি।

নজরুল সেই সময় মন্মথ রায়ের কয়েকটি নাটকে গান রচনা করে দিয়েছিলেন। সেই নাটকগুলি কেমন জমেছিল কবি জিজ্ঞাসুনেত্রে সে প্রশ্ন করলেন এবং নানারকম গানের সুর নিয়ে বেশ কিছুটা রসিকতা করতেও ছাড়লেন না।

বিদেশী কবি দানেনৎশিও সম্পর্কেও খানিকক্ষণ আলোচনা চলল।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র' পুস্তকে নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন—

'নজরুল-জীবনীকার আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ একদিন আলাপ-প্রসঙ্গে নজরুলকে তুলনা করেন ইতালীয় কবি দানুন্সিজিওর সঙ্গে। নজরুল ১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীঅবনী রায়, শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীপ্রবোধ গুহ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ স্নেহের সুরে তাঁকে বলেন, 'ইতালীতে এক দ্বীপের মাঝখানে বাস করেন দানুন্সিজিও, তিনি তোমার চাইতেও পাগল।'

আবদুল কাদির এই লেখাটা উদ্ধৃত করেছেন রফিকুল ইসলামের 'নজরুল জীবনী'র ৫৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা থেকে।

১৩৬০ সালের শারদীয় 'অনুবাদ' পত্রিকায় (ত্রয়োদশ বর্ষ) তিতাস

চৌধুরী তাঁর 'নজরুল-রবীন্দ্র সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সপ্তম সাক্ষাৎকারটি ঘটে ১৯৩১ সালের ২০শে জুন—দার্জিলিঙে। নজরুল দার্জিলিঙে 'বর্ষবাণী' পত্রিকার সম্পাদিকা জাহানারা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সবান্ধবে। সেই সুবাদেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়।'

এখানে দেখছি, দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের দিনটা নিয়ে এই লেখকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আমার মনে হয়, তিতাস চৌধুরী বর্ণিত তারিখটাই ঠিক।

রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৭ সাল বা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুন-জুলাইয়ে দেশে ছিলেন না, বিদেশভ্রমণে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১-য়েই ঐ সময় দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন। আবদুল আজীজ আল-আলম তাঁর সম্পাদিত 'নজরুল রচনা-সম্ভার' ২য় খণ্ড গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'কয়েকটি অটোগ্রাফ' অধ্যায়ে নজরুলের সাতটি ছোটো কবিতা ছেপেছেন। এখানে মুদ্রিত ৫ ও ৬ সংখ্যক কবিতায় দেখা যায়—নজরুল কবিতা লিখে কবিতার শেষে স্থান, তারিখ দিয়েছেন যথাক্রমে—দার্জিলিঙ ১৬.৬.১৯৩১ ও দার্জিলিঙ ২০শে জুন ১৯৩১ ইং), (পৃ ২৬৪)।

দেখা যাচ্ছে, ১৯৩১ সালে দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের সময় সেখানে মন্মথ রায়ও উপস্থিত ছিলেন। ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশ' পত্রিকা কোথাও না পাওয়ায়, সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে যা লিখেছেন এবং অখিল নিয়োগী আর আবদুল কাদির যা যা বলেছেন, সেসব ঠিক কিনা, এবং এঁদের বলা কথা ছাড়া রবীন্দ্র-নজরুলের মধ্যে আরও কী কী কথা হয়েছিল, জানবার জন্য আমি একদিন মন্মথদার বাড়িতে গিয়েছিলাম।

আমি মন্মথদাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা দাদা, দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের যে সাক্ষাৎ হয়, আপনিও তো তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন? এই বলে, সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে সজনেফুল আর মুরগী-র কথা নিয়ে যা লিখেছেন, তা বললাম। বলে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের সামনে রবীন্দ্রনাথ কি ঐ ধরণের কথা বলেছিলেন?

শুনে মন্মথদা বললেন—'সেদিন কী সব কথা হয়েছিল আজ আর কিছু মনে নেই। তবে একটা কথা এখনও পরিষ্কার আমার মনে আছে। সেটা বলছি—'দার্জিলিঙে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে বললেন—আপনি এসেছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্য অমর হল। অমর হয়ে থাকবে।'

রবীন্দ্রনাথ বললেন—তা বলা যায় না। কার সাহিত্য অমর হবে, আর কার সাহিত্য হবে না। তবে আমার মনে হয়, আমার কিছু গান থেকে যাবে।

আমার সঙ্গেই কাগজ কলম ছিল। আমি মন্মথদার মুখে ঐ কথা শুনে বললাম—কথাগুলো আবার বলুন, আমি লিখে নিই।

তিনি আবার বললেন। আমি লিখে নিলাম।

পরে বললেন, কাগজটা দাও। আমি সই করে দিই।

আমি কাগজটা দিলে তিনি লেখাটা পড়ে, তাতে নিজের নাম সই করে দিলেন।

এরপর মন্মথদা বললেন—আর একটা কথা হয়েছিল মনে পড়ছে। আমার নাটকের গান নিয়ে তিনি আমাকে কয়েকটা কথা বলেছিলেন। আমি গান লিখতে পারি না। আমার চার-পাঁচটা নাটকে নজরুল গান লিখে দিয়েছিলেন। আমার 'কারাগার' (১৯৩০) নাটকেও নজরুল গান লিখে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ঐ সাক্ষাতের কয়েক মাস আগে মনমোহন থিয়েটারে আমার 'কারাগার' নাটক মাত্র ১৮ রজনী অভিনয়ের পরই তখনকার ব্রিটিশ শাসকের রাজরোষে অভিনয় নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এতে নজরুলের গানগুলি আরও জনপ্রিয় হয়ে জাতির মর্মবাণী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঐ গানগুলি নিয়েই ক'টা কথা বলেছিলেন।

এরপর মন্মথদা বললেন,—আমি কখনো গান লেখার চেষ্টাও করি নি। একবার একটা ছড়া লিখেছি মাত্র। এই বলে, তিনি তাঁর তখনকার সমস্ত লেখার ভাণ্ডারী তাঁর স্নেহের পৌত্রী কেকাকে বললেন—সেই ছড়াটা বার কর।—তিনি লেখাটা বার করলে, মন্মথদা তাঁকে বললেন—ঐটা আমার প্যাডের কাগজে লেখ। গোপালকে ছড়াটা দোব।

মন্মথদার প্যাডের কাগজে তাঁর পৌত্রী লিখলেন—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
বিশ্বযুদ্ধ দেখে কাৎ।
চলে এলেন জোড়াসাঁকো
ভাঙা মন জুড়লো নাকো।
অভিমানেই গেলেন চলে
সভ্যতাটা অসভ্য বলে।
হায় হায় রবীন্দ্রনাথ
তোমার বিহনে আমরা অনাথ।
ফিরে এস আমাদের বুকে
পৃথিবী থাক চিরসুখে।

এরপর মন্মথদা ঐ লেখাটা নিয়ে লেখার পাশে লিখলেন—আমার লিখিত জীবনের প্রথম ছড়া এবং বোধ করি এই শেষ।

মন্মথ রায়

পরে আবার এর শেষে লিখলেন—

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
সাহিত্যসিন্ধু—
মন্মথ রায়

আমার হাতে কাগজটা দিলে, আমি পড়ে বললাম—দাদা, আমার নামের শেষে আবার এ কী লিখেছেন ?

বললেন—ঠিক আছে।

১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশ' পত্রিকায় নজরুলের লেখা না পেলেও মন্মথদার কথা, অখিল নিয়োগী এবং আবদুল কাদিরের লেখা থেকে দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুলের কথোপকথনের কিছু কিছু পেলাম। আর পাওয়া যাচ্ছে—১৩৩৮ সালের কার্তিক মাসের 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ সাহিত্য' বিভাগ থেকে।

আশ্বিনের 'স্বদেশে' নজরুলের লেখা পড়েই 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস পরের মাসে তাঁর কাগজে মূলতঃ নজরুলের লেখা থেকে রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করে করে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে-ছিলেন। এই প্রবন্ধে আগে সজনীকান্তর 'আত্মস্মৃতি' থেকে রবীন্দ্রনাথের উক্তি বলে যে 'সজনেফুল' ও 'মুরগী'র কথা উদ্ধৃত করেছি, সে কথা সজনীকান্ত উদ্ধৃতিচিহ্ন দিয়ে 'শনিবারের চিঠি'তেও উদ্ধৃত করেছেন দেখছি।

আর একটা কথা—অখিল নিয়োগী এবং আবদুল কাদির তাঁদের লেখায় যে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ইতালীয় কবি 'দানেনৎসিও'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, কেন বা কী কথার পর রবীন্দ্রনাথ ঐ তুলনা করেছিলেন সজনী-কান্তর 'সংবাদ সাহিত্যে'র উদ্ধৃতি থেকে তা পরিষ্কার জানা যায়। সজনী-কান্ত লিখেছেন—'তিনি (নজরুল) বললেন—আচ্ছা আপনি যখন ইটালি গিয়েছিলেন দ্যানানৎজিওর সঙ্গে কোনো দিন কথা হয়েছিল ?

কবি বালকের (?) মতো হেসে বললেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কী করে ? তিনি যে তোমার চাইতেও পাগল।...এমন বিলাসী কবি জগৎ আর পেয়েছে কিনা সন্দেহ।...একবার তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। দলে দলে সে দেশের মেয়েরা শুধু তাঁকে চোখের দেখা দেখবার জন্যে পাগলের মতো ছুটল।'

সজনীকান্তর 'সংবাদ সাহিত্যের' উদ্ধৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের সেদিনের আরও দু-একটা কথা পাওয়া যাচ্ছে। সজনীকান্ত লিখেছেন, এই সাক্ষাৎকালে রবীন্দ্রনাথ সলজ্জে হাস্যের সহিত বললেন—'ছবি হ'ল আমার তৃতীয় পক্ষ।'

কবির এই কথা নিয়ে সজনীকান্ত তাঁর কাগজে মন্তব্য করেছিলেন—

'তাই! আমরা এতকাল ভাবিয়া বিস্মিত হইতে ছিলাম যে ধরার দুলাল রবীন্দ্রনাথ ধুলোমাটির ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া ঊর্ধ্বে শূন্যলোকে এমনভাবে বিচরণ করেন কি করিয়া? দুই পক্ষের জোরেই পক্ষীরা যেভাবে শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হয়—তৃতীয় পক্ষ থাকিলে তো কথাই নাই।'

এবার সজনীকান্ত তাঁর 'সংবাদ সাহিত্যে' আবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'তারপর দূরে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—কবির উদয় পূর্বাকাশে গানের ভিতর দিয়ে; কিন্তু অস্ত তার পশ্চিমে রঙের খেলার মাঝখানে। তাই রঙীন যা কিছু সব ওদেশেই পাঠাই।'

দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাতের কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে ছিলেন, তখনই ১৯৩০ সালে ইউরোপে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। সেই তাঁর আঁকা ছবির প্রথম প্রদর্শনী।

সজনীকান্তর উদ্ধৃতিতে 'রঙীন যা কিছু সব ওদেশেই পাঠাই'—ইত্যাদি দেখে মনে হয়, সেদিন রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন আগে ইউরোপে প্রদর্শিত তাঁর ছবির কথাই ইঙ্গিতে বলেছিলেন।

সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি', তাঁর 'শনিবারের চিঠি,' অখিল নিয়োগীর লেখা, রফিকুল ইসলামের 'নজরুল জীবনী' প্রভৃতি থেকে দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের কিছু কিছু কথা জানা গেল। আর অতিরিক্ত কিছু জানা গেল নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মুখ থেকে।

১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'স্বদেশ' পত্রিকাটি পেলে স্বয়ং নজরুলের লেখা থেকে সেদিনের রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাতের আরও অনেক কথা জানা যেত।

শিশির কুমার ভাদুড়ি

কলকাতায় স্কটিশ চার্চ কলেজে তখন পড়ি। সেই সময় একবার পূজার আগে আমাদের কলেজের সোসাল গ্যাদারিং বা বাৎসরিক প্রীতি সম্মিলনে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়িকে প্রথম দেখি। সেবার তাঁকে ঐ সম্মিলনে প্রধান অতিথি হিসাবে আনা হয়েছিল।

সেদিন শিশিরবাবু স্কটিশ চার্চ কলেজে এসে বলেছিলেন—আমার কলেজ জীবনে আমিও এই কলেজেরই ছাত্র ছিলাম। আমি যখন কলেজে ভর্তি হই, তখন কলেজের নাম ছিল জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন।[১]

আজ এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, কলেজের এই হলেই বি. এ. পড়ার সময় এখানে আমরা সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের অভিনয় করেছিলাম। তোমাদের আজকের এই প্রীতি সম্মেলনের মত আমাদেরও সেদিনটা ছিল একটা প্রীতি সম্মেলনের দিন। 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে আমি ব্রুটাসের চরিত্রে অভিনয় করে ছিলাম। এখন আমার স্মৃতি থেকে সেই ব্রুটাস চরিত্রের কিছু সংলাপ তোমাদের শোনাই—

এই বলে শিশিরবাবু বেশ অনেকক্ষণ ধরেই ব্রুটাসের বহু সংলাপ আবৃত্তি করে শোনালেন।

শিশিরবাবু এক তো কিছুদিন বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন, তার উপর ছিলেন সুদর্শন ও সুবিখ্যাত অভিনেতা। তাই তাঁর কণ্ঠে সেদিন ব্রুটাস চরিত্রের সংলাপ শুনে সভার সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

ঐ সভার অনেকদিন আগেই পরিচিতদের মুখে শুনেছিলাম—শিশিরবাবু বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে থিয়েটারে অভিনয়ের জগতে চলে আসেন।

আমাদের কলেজে সেদিনের সেই সভার পর আমি 'চাণক্য' এবং 'টকি অব্ টকিজ' বা রীতিমত নাটক এই সিনেমা দুটির প্রধান ভূমিকায় শিশিরবাবুর অসাধারণ অভিনয় দেখেছি। 'সীতা' নাটকে রামের ভূমিকায় তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয়ও দেখেছি।

কলেজ জীবনের পর আমি যখন 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় কাজ করতাম, তখন 'ভারতবর্ষ' অফিসের নীচের তলায় 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' এই বইয়ের দোকানে শিশিরবাবুকে আসতে প্রায়ই দেখতাম। তিনি আসতেন

'ভারতবর্ষ' এবং 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' এই দুটো প্রতিষ্ঠানেরই মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। এক সময় হরিদাসবাবুদেরও 'আর্ট থিয়েটার' নামে একটা পেশাদারী থিয়েটারের দল ছিল।

হরিদাসবাবুদের বইএর দোকান থেকে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে শিশিরবাবু তাঁর নাট্যমন্দিরে অভিনয় করেছিলেন। আর সিনেমা করবার জন্য শিশিরবাবু শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'র অভিনয় স্বত্বও কিনে নিয়ে রেখেছিলেন। তবে তিনি এ বইয়ের সিনেমা করতে পারেন নি। পরে অন্যাকে তিনি ঐ স্বত্ব বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

আমি তখন শরৎচন্দ্রের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত ও ভক্তজনদের কাছ থেকে তাঁর চিঠিপত্র, বৈঠকী গল্প এবং তাঁর সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি। সেই সময় যখন শরৎচন্দ্রের আর এক বন্ধু শিশির ভাদুড়ির কাছে যাব ভাবছি, তখন একদিন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানেই শিশিরবাবুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। হরিদাসবাবু শিশিরবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—গোপাল, শরৎদার চিঠিপত্র সংগ্রহ করছে। আপনাকে লেখা শরৎদার কোন চিঠি আছে কি?

শিশিরবাবু বললেন—ছিল তো কয়েকটা, সে আর খুঁজে পাব কি?

আমি বললাম—তাহলে আমি কি একদিন, আপনার বাড়িতে যাব?

শিশিরবাবু বললেন—খুঁজে দেখি, পেলে আমিই এখানে এসে আপনাকে দিয়ে যাব।

শিশিরবাবু আর একদিন হরিদাসবাবুর কাছে এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—শরৎচন্দ্রের চিঠি খুঁজে ছিলেন?

—খুঁজে ছিলাম, কিন্তু পেলাম না।

আরও কিছুদিন পরের কথা। আমাদের ভারতবর্ষ পত্রিকায় তখন 'পট ও পীঠ' নাম দিয়ে একটা নতুন 'সিনেমা-থিয়েটার' বিভাগ খোলা হয়েছে। সেই সময় এই নতুন বিভাগ নিয়ে আমি একদিন হরিদাসবাবুর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় শিশিরবাবু হরিদাসবাবুর কাছে এলেন। তাঁকে দেখে হরিদাসবাবু বললেন—আমাদের কাগজে একটা চিত্র ও নাট্যবিভাগ খুলেছি। সেদিন আপনি কোথায় নাটক সম্বন্ধে কি বক্তৃতা দিয়েছেন, আপনার একটা ফটো দিয়ে সেই সংবাদটা আমাদের কাগজের নাট্যবিভাগে ছাপতে চাই। আপনার একটা ফটো পাঠিয়ে দিলে বড় ভাল হয়।

শিশিরবাবু উত্তরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন—ফটো এখন কোথায় পাই বলুন তো? আর তাছাড়া ও ছেপেই বা লাভ কি?

হরিদাসবাবু বললেন—না, তা হোক্, আমরা ছাপ্‌বো। আপনি একটা ফটো পাঠিয়ে দেবেন।

ঐ সময় আমি বললাম—পরিমল গোস্বামী মশায়ের কাছে আপনার বিভিন্ন ভঙ্গীর অনেক ফটো দেখেছি। চুরুট হাতে আপনার একটা আবক্ষ সুন্দর ফটো তাঁর কাছে দেখেছি। যদি বলেন তো, সেইটা এনে ছাপতে পারি।

শিশিরবাবু এবার বললেন—এখান থেকে আমি এখন পরিমলের কাছেই যাব। আচ্ছা আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমি একটা ফটো তার কাছ থেকে চেয়ে আপনাকে দোব।

এরপর শিশিরবাবু হরিদাসবাবুর সঙ্গে অন্য আর দু'চারটা কথা বলে উঠলেন। আমিও শিশিরবাবুর সঙ্গে সঙ্গে চললাম। বাইরে রাস্তায় শিশিরবাবুর মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। শিশিরবাবু মোটরের কাছে এলে ড্রাইভার সামনের সিটের দরজা খুলে দিল। শিশিরবাবু সেই খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন—আসুন, এই সামনে আসুন। ব'লে আমাকে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে, তারপর আমার পাশে তিনি বসবেন, এরূপ ইঙ্গিত করলেন।

আমি বললাম—সামনে সকলেই ঠেসাঠেসি করে কেন? আপনি ওখানে বসুন, আমি পিছনে বসছি।

—না, না, সামনে আসুন।

—না আমি পিছনেই বসি।

শিশিরবাবু বললেন—তবে তাই বসুন।

আমি পিছনের দরজা খুলে গাড়ীর ভিতরে উঠে দেখি, সেখানে সিটের কোন নামগন্ধই নেই। সিট খোলা, সে জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে। তাইতো এখানে এখন বসি কোথায় ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, এক কোণে একটা ছোট বেতের 'মোড়া' রয়েছে। সেটাই টেনে নিয়ে বসলাম।

এখন বুঝলাম, সামনে বসবার জন্য শিশিরবাবু কেন অত করে বলছিলেন।

পরিমলবাবুর বাড়ী নিকটেই ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে গিয়ে পড়লাম। শিশিরবাবু পরিমলবাবুর ঘরে বসে পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে বললেন—দেশলাই দাও। আজ সকালে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, চুরুট আর খাব না। কিন্তু পারা গেল না। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবার জন্যেই তো প্রতিজ্ঞা করা কি বল?

শিশিরবাবু চুরুট ধরালেন, তারপর আমাকে দেখিয়ে একটা ফটো দেবার কথা বললেন। আমি যে ফটোটা চাই সেই ফটোটার কথা বললে, পরিমলবাবু খুঁজে সেই ফটোটা আমায় দিলেন।

শিশিরবাবু আমাকে বললেন—কই দেখি কি ফটো নিচ্ছেন?

আমি তাঁর হাতে ফটোটা দিলে, তিনি দেখে আমার হাতে দিয়ে বললেন—ঠিক আছে, এইটাই নিন।

—এই ফটোটাই চাই ছিলাম।

আমি এবার শিশিরবাবুকে বললাম—শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত মজলিসী মানুষ ছিলেন। আপনার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যে সব গল্প-আলাপ হ'ত, তার কিছু শোনান না। আমি 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' নাম দিয়ে একটা বই লিখছি। আপনার কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের দু-একটা মজার গল্প পেলে ঐ বইয়ে দিয়ে দোব।

—শরৎচন্দ্র সত্যাই খুব মজার মানুষ ছিলেন। তাঁর বলা গল্প সংগ্রহ করে যদি একটা বই করতে পারেন তো সত্যি একটা ভাল কাজ হবে। বসওয়েল যেমন করেছেন জনসন সম্বন্ধে। শরৎচন্দ্র অনেক দিন অনেক গল্প শুনিয়েছেন। কিন্তু সে সব আজ আর কিছুই মনে নেই।

এই সময় পরিমলবাবু শিশিরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—শরৎচন্দ্র আর আপনাকে নিয়ে একটা গল্প প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর কাছে শুনেছিলাম, সেটা কি সত্যি ?

শিশিরবাবু বললেন—কি গল্প ?

—শরৎচন্দ্রের কোন একটা বইয়ের নাট্যাভিনয় নিয়ে শরৎচন্দ্র আপনাকে বলেছিলেন—শিশির আমার বইয়ের পাত্র-পাত্রীদের মুখের ডায়লগ আদৌ বদলাবে না। আমার বইয়ের ডায়লগ কুকুরের মুখ দিয়ে বেরুলেও লোকে শুনবে।—এরই উত্তরে আপনি শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—না দাদা তা নয়, বরং এই শিশির ভাদুড়ি যদি রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ. বি. সি. ডি করে চীৎকার করে যায়, তাহলে লোকে মন দিয়ে শুনবে ?[২]

শিশিরবাবু মুচ্‌কি হেসে বললেন—একবার ঐ ধরণের একটা কথা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হয়েছিল বটে। আমি বলেছিলাম—অন্য লোকেও তো আপনার বইএর অভিনয় করেছিল। তারা জমাতে পেরেছিল ?

এরপর শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আরও কয়েকটা টুকি-টাকি কথা হ'ল।

শিশিরবাবু পরিমলবাবুর বাড়িতে বসে আড্ডা জমাতে লাগলেন। আমি তাঁর ফটোটা নিয়ে চলে এলাম।

শিশিরবাবুর সেই ফটোটা এনে আমরা ১৩৬০ সালের মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় 'পট ও পীঠ' বিভাগে ছেপেছিলাম। ফটোর নীচে 'নাট্যাচার্য শিশিরকুমার' লিখে সঙ্গে এও লিখে ছিলাম—(১৯৫১ সনে পরিমল গোস্বামী কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ)।

১৯৫৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর শ্রীরঙ্গম্ রঙ্গমঞ্চের তেত্রিশতম বাৎসরিক উৎসবে শিশিরবাবু যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন—ঐ পট ও পীঠ' বিভাগে সেই বক্তৃতার অনেকটা দিয়ে তার সঙ্গে এই ফটোটা ছেপে ছিলাম।

প্রসঙ্গ কথা

১. শিশিরকুমার ভাদুড়ির ন্যায় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনিষ্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর 'শিশির-কুমার ভাদুড়ি' প্রবন্ধে এই কলেজ সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন—১৯০৮ সালে দুটো স্কচ্ মিশনারী কলেজ জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনিষ্টিটিউশন এবং ডাফ কলেজ মিলে একটি কলেজ হয়, নাম হয় স্কটিশ চার্চেস কলেজ।

পরে স্কটল্যাণ্ডে ওদের খ্রীষ্টান প্রেসবিটেরিয়ান দলের ধর্ম সংক্রান্ত মত-ভেদের সমাধান হলে যখন একটি মাত্র স্কটিশ চার্চ পুনস্থাপিত হ'ল, তখন স্কটিশ চার্চেস কলেজের নামও পাল্টে গিয়ে হ'ল—স্কটিশ চার্চ কলেজ।

সুনীতিবাবু লিখেছেন—দুটো স্কচ্ মিশনারী কলেজ জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনিষ্টিটিউশন এবং ডাফ কলেজ মিলে একটি কলেজ হয়েছিল। একথা বললেও সুনীতিবাবু কিন্তু কলকাতার কোথায় কোথায় ঐ দুটো কলেজ ছিল, তা বলেন নি।

২. পরিমলবাবু শিশিরবাবুকে বলেছিলেন—'শরৎচন্দ্রের কোন একটা বইএর নাট্যাভিনয় নিয়ে শরৎচন্দ্র আপনাকে বলেছিলেন—শিশির আমার বইএর পাত্র-পাত্রীদের মুখের ডায়লগ আদৌ বদলাবে না।…'

এ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী, তাঁর স্নেহভাজন অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে এবং অন্যত্রও যা শুনেছি তা এই—

শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' উপন্যাসের শেষে আছে—

'জীবানন্দের যে হাতটা স্খলিত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল (ষোড়শী) তাহা নিজের মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল—নৌকা প্রস্তুত কোন মতে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারলেই আমার এই সকল কাজের বড় কাজটা সারা হয়।

শুনিয়া জীবানন্দ কহিল—আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ?

ষোড়শী কহিল—যেখানে আমার দুচোখ যাবে।

—কখন যেতে হবে ?

—এখনই। সাহেব এসে পড়ার আগেই।

…জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

দেনাপাওনা উপন্যাসের নাট্যরূপ হ'ল—ষোড়শী। শরৎচন্দ্র ষোড়শী নাটকের শেষে ঐ উপন্যাসের ন্যায় জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরে চলে গেল—এই-ই রাখেন।

শিশিরবাবু তাঁর 'নাট্য মন্দিরে' ষোড়শী নাটকের অভিনয় করেছিলেন। নাটক মঞ্চস্থ করার আগে শিশিরবাবু ষোড়শীর এই শেষাংশ নিয়ে শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন—শরৎদা, রুগ্ন জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরে চলে গেল, নাটকে এটা দেখালে নাটক জমবে না, ওখানে জীবানন্দকে মেরে ফেলতে হবে, ওর মৃত্যু দেখাতে হবে। তবে নাটক জমবে।

এই শুনেই শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—কিছু বদলানো চলবে না। উপসংহার কেন, একটা ডায়লগ পর্যন্তও বদলাতে দোব না। আমার দেওয়া ডায়লগ মানুষের মুখে কেন, কুকুরের মুখ দিয়ে বেরোলেও লোকে শুনবে।

শরৎচন্দ্রের এই কথায় শিশিরবাবুও উত্তেজিত হয়ে বললেন—না, শরৎদা তা নয়। ডায়লগ যত ভালই হোক, ভাল অভিনয় করতে না পারলে, লোকে তা শুনবে না। ভাল অভিনেতা চাই। এই শিশির ভাদুড়ি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোন ডায়লগ না বলে, যদি শুধু এ. বি. সি. ডি বলেও যায়, তাহলেও লোকে মন দিয়ে শুনবে।

এই নিয়ে তখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শিশিরবাবুর আরও সামান্য দু'একটা কথা হলেও, শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত শিশিরবাবুর কথাই মেনে নিয়ে ছিলেন।

হেমচন্দ্র ঘোষ

বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন রচিত 'বক্সা থেকে দেউলি' গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রসঙ্গতঃ এক জায়গায় বলেছেন—'শরৎচন্দ্র আমাকে বলিয়া ছিলেন, 'পথের দাবী'র মালমশলা তিনি সংগ্রহ করিয়া ছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া।'

এই মহান্ বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ ছিলেন, বিখ্যাত বৈপ্লবিক সংস্থা 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'' বা সংক্ষেপে বি. ভি. পার্টির সর্বাধিনায়ক। ইংরাজ আমলে ইনি জীবনের সুদীর্ঘ প্রায় ৩৫টি বছর কাটিয়েছেন জেলে ও অন্তরীণ অবস্থায়। অমর শহীদ বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, ভবানী ভট্টাচার্য প্রভৃতি ছিলেন, এঁর বি. ভি. পার্টিরই প্রথম শ্রেণীর কর্মী।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্যই আমি এই হেমবাবুর কাছে যাই। তাঁর কাছ থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যে সব কথা জানি, সে সব আমার শরৎচন্দ্র ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ) গ্রন্থের 'বিপ্লবীদের বন্ধু' অধ্যায়ে বিস্তৃত বলেছি। এখানে তার কিছু বলছি—

হেমবাবু একদিন আমাকে বলেছিলেন—শরৎচন্দ্র আমার চেয়ে ৮ বছরের বড় ছিলেন। তাই আমি তাঁকে দাদা বলতাম, তিনিও আমাকে ছোট ভাইএর মতই স্নেহ করতেন। দাদা বাজে শিবপুরে থাকাকালে আমি যখনই জেলের বাইরে থাকতাম, তখনই তাঁর কাছে যেতাম। তাঁর সামতাবেড়ের বাড়িতেও কয়েকবার গেছি। সামতাবেড়েয় গেলে তিনি অন্ততঃ দুএক দিন সেখানে রেখে তবে আমাকে ছাড়তেন। দাদার কাছে গেলে তিনি আমার বিপ্লব জীবনের কথা এবং আমার পরিচিত বিপ্লবীদের কাহিনী শুনতেন।

হেমবাবু আমাকে বলে ছিলেন—আমাদের বি. ভি. দলের আদর্শ ছিল—এ দেশের প্রধান প্রধান শাসক ইংরাজদের নিধন করে করে ঐ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ভীষণ আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা। যার ফলে কোন ইংরাজই আর ঐ শাসকের গদিতে বসতে সাহস করবে না এবং শেষে ইংরাজ এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।

দলের এই নীতি নিয়েই আমাদের বিনয় বসু ঢাকার আই. জি. লোম্যানকে খতম করেছিল। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংসে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল, ভবানী ভট্টাচার্য গবর্ণর এণ্ডারসনকে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল। মেদিনীপুরে আমাদের দলের কর্মীরা পর পর তিনজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে—পেডি, ডগলাস ও বার্জকে-নিধন করেছিল, ইত্যাদি।

বি. ভি. দলের কাগজ 'বেণু'তে শরৎচন্দ্রের 'যুব-সংঘ' ও 'নতুন প্রোগ্রাম' নামে দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া 'বিপ্রদাস' উপন্যাসেরও দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। 'বেণু'তে এই বিপ্রদাস প্রকাশের কথা নিয়ে হেমবাবুকে একদিন প্রশ্ন করলে সেদিন তিনি বলেছিলেন—

আমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ দাদা আমাদের কাছ থেকে কোন দক্ষিণা না নিয়ে যখন বেণুতে একটা উপন্যাস লিখবেন বললেন, তখন আমি বলে ছিলাম—দাদা, জমিদার ও প্রজাদের কথা নিয়ে আমাদের একটা উপন্যাস দিন। জমিদারি প্রথা যখন যাচ্ছেই না, তখন জমিদার ভাল হলে, প্রজাদের যে মঙ্গল, তারা যে সুখে থাকে সেইটাই দেখাবেন। কারণ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সব জমিদারই প্রজাপীড়ক বা অত্যাচারী হয না। জমিদার ভাল হলে নিজের জমিদারিতে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, অতিথিশালা প্রভৃতি করে দেয়। পুকুর কাটায়, খাল কাটায়, রাস্তা তৈরি করে দেয়, এইরূপে নানা ভাল কাজ করে।

দাদা বলেছিলেন—আচ্ছা দেখি, তাই না হয় লিখব।

লিখতে আরম্ভ করে দাদা সেই সময় আমাকে একদিন বলে ছিলেন—আমার এক আপন মামা আছেন, তাঁর নাম বিপ্রদাস। তিনি অতি ধার্মিক লোক। তাঁর নাম দিয়েই উপন্যাসের নামকরণ করেছি এবং উপন্যাসে তাঁকে এক প্রধান চরিত্ররূপে দাঁড় করাব ঠিক করেছি।

দাদা 'বেণু'র প্রথম কিস্তির লেখা দিলে দেখলাম, তিনি আমার কথা রেখেছেন। জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকদের দাবীর কথা নিয়েই বই আরম্ভ করেছেন। পরে আরও লেখা পেয়ে দেখলাম, তিনি একজন আদর্শ জমিদারও চিত্রিত করবার চেষ্টা করছেন।

এরপর আমরা জেলে চলে যাওয়ায় 'বেণু' বন্ধ হয়ে যায়। দাদাও তখন ঐ লেখা অন্য কোথাও আর না দিয়ে বন্ধ করে দেন।

বছর দুই পরে দেখলাম—আমাদের 'বেণু'তে বিপ্রদাসের যে অংশ প্রকাশিত হয়েছিল, সেটা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে। তারপরে বিচিত্রায় আরও ধারাবাহিকভাবে লিখে দাদা 'বিপ্রদাস' উপন্যাস শেষ করেন। খুব সম্ভব বিচিত্রা-সম্পাদক উপেন গাঙ্গুলীর আগ্রহেই বিচিত্রায় লিখেছিলেন।

আমরা তখন জেলে। জেলে বসেই বিচিত্রায় প্রকাশিত সমগ্র বিপ্রদাস পড়ে দেখলাম—দাদা বইয়ে প্রথমেই যা কৃষক আন্দোলনের কথা বলে ছিলেন, বইয়ে আর কোথাও তাদের আন্দোলন বা সভা-সমিতির কথা বলেন নি। তিনি বিপ্রদাসকে একজন ভাল জমিদার করেছেন বটে, কিন্তু সে তেমন কিছু নয়। বেণুতে প্রকাশিত অংশের পর থেকে বিপ্রদাস উপন্যাসকে দাদা মূলতঃ একটি হৃদয়-সর্বস্ব উপন্যাসে পরিণত করেন। সেখানে জমিদার সাধারণ প্রজাদের কথা আর তেমন চিন্তা করেন না। বই শেষও হয় অন্যভাবে।

বেণুতে 'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হওয়ার সময় আমরা যদি তখন জেলে না যেতাম, তাহলে বেণু বন্ধ হত না। আর আমরাও দাদাকে বলে তাঁর বিপ্রদাসকে আর একটি রাজনৈতিক উপন্যাসে পরিণত করতে পারতাম। কিন্তু আমরা জেলে যাওয়ায় সে সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি।

'পথের দাবী' রচনার সময় আমি দাদাকে বহু বিপ্লবীর কাহিনী শুনিয়ে ছিলাম এবং বলেছিলাম উপন্যাসে বিপ্লবী নায়ককে তাঁর বৈপ্লবিক গুণাবলীর সঙ্গে ভাল একজন চরিত্রবান, খাঁটি আদর্শবাদী মানুষ হিসাবেও চিত্রিত করবেন। কারণ, আসল বিপ্লবীরা তাই-ই। 'পথের দাবী' লেখার সময় স্নেহবশতঃ আমার কথা কিছুটা শুনেছিলেন, তা তাঁর পথের দাবী পড়ে জেনেছি।

বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ বিপ্লবী মহলে বয়োজ্যেষ্ঠ বলে 'বড়দা' নামে পরিচিত ছিলেন। আমিও তাঁকে বড়দাই বলতাম। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও, পরে তাঁর খোঁজ খবর নিতে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম।

অনেক দিন তাঁর কাছে যাতায়াতের ফলে তিনি আমাকে ছোট ভাইএর মত স্নেহ করতেন। আমার সংসারের অর্থাৎ আমার স্ত্রী ও পুত্রের সংবাদ নিতেন। বড়দা আমার পুত্র দীপঙ্করকে জ্যাঠামশায় বলতেন। আমাকে চিঠিও লিখতেন। আমাকে লেখা তাঁর একটা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

10/1B Rajani Bhattacharja Lane
Calcutta-26

পরম কল্যাণীয়,

স্নেহের গোপাল,

অনেক দিন তোমার কোন সংবাদ পাচ্ছি না। সেইজন্য বিশেষ আমি চিন্তিত। বৌমা ও জ্যাঠা মহাশয় কেমন আছেন? সমস্ত সংবাদ অতি সত্বর আমাকে জানাবে। তুমি কেমন আছ আমাকে জানাবে। আমি তোমাদের জন্য খুব চিন্তায় থাকি। অতি সত্বর তোমাদের কুশল সংবাদ দিবে। ইতি—

আংপত্র
অশেষ কল্যাণকামী 'বড়দা'
(হেমচন্দ্র ঘোষ)

একবার তাঁর কাছে গেলে হাওড়ার অশোক রঞ্জন বৈতালিক বড়দার ও আমার একসঙ্গে একটা ফটো তুলেছিলেন।

বড়দা আমাকে এত স্নেহ করতেন যে, আমি একনিষ্ঠ ভাবে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে চর্চা ও গবেষণা করছি বলে, তাঁর কাছে শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাসে'র যে দশ পাতা পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষিত ছিল, তা আমাকে দেন। বড়দার দেওয়া শরৎচন্দ্রের নিজের হাতে লেখা 'বিপ্রদাসে'র সেই দশ পাতা পাণ্ডুলিপি আজও আমার কাছেই রয়েছে। আমাকে লেখা বড়দার চিঠিও রেখে দিয়েছি।

বাড়িতে সাহিত্যের হাওয়া

আমার বাবা মা খুব ভাল গল্প বলতে পারতেন। আমাদের ছেলে বেলায় তাঁরা আমাদের ভাইবোনদের নানা ধরণের অনেক গল্প এবং প্রচুর ছড়া বা কবিতা, বিশেষ করে উপদেশ মূলক ছড়া শোনাতেন।

এই কারণেই হয়ত আমি আমার ছেলেবেলা থেকেই অর্থাৎ স্কুল জীবন থেকেই গল্প কবিতা লিখতে শুরু করি। পরে কলেজ জীবনেও লিখি। এইভাবে নিজের খেয়ালেই লিখলেও লেখা ছাপাবার জন্য কোন মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় কোন দিনই লেখা পাঠাই নি। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় যখন প্রথম আমার লেখা ছাপা হ'ল, তখন সম্পাদক নিজেই আমাকে লেখা দিতে বলেছিলেন। সে কথা আগে 'চাকরি' অধ্যায়ে বলেছি।

'ভারতবর্ষে' লেখা প্রকাশিত হওয়ার আগেই আমার 'তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর' কবিতার বইটি নিজের ব্যয়ে ছেপে প্রকাশ করে ছিলাম। ঐ সময়কার অর্থাৎ প্রথম জীবনের লেখা আর একটি কবিতার বই এবং দুটি গল্পের বই এর কিছুদিন পরে পরেই ছাপা হয়। দ্বিতীয় কবিতার বইটিও আমি নিজের টাকাতেই ছাপি, এ বইএর নাম—ফাঁদ ও ফন্দি। সমিল কবিতার ছন্দে সমাজের কয়েক জনের ফাঁদ ও ফন্দির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গল্পের বই দুটির নাম যথাক্রমে—বাজখালির মাঠ এবং শ্যামলপুরের সাঁকো। শেষের বইটি সচিত্র এবং বিশেষ করে ছোটদের জন্য লেখা। গল্পের বই দুটির প্রকাশক ছিলেন, কলকাতার 'টিচার্স বুক স্টল'।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কাজে যোগদানের পর থেকেই আমার সত্যকার সাহিত্য জগতে প্রবেশের পথ প্রশস্ততর হয়। 'প্রবাসী' এবং 'ভারতবর্ষ' তখনও দেশের দুটি সুবিখ্যাত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। 'প্রবাসী'তে দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রনাথ লেখা দিয়ে এবং 'ভারতবর্ষে' দীর্ঘকাল ধরে শরৎচন্দ্র লেখা দিয়ে, এই দুটি পত্রিকাকে গৌরবান্বিত করেছিলেন।

'ভারতবর্ষে' এসে এখানে এবং এখানকার সূত্রেও যেমন দেশের বড় বড় সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল, তেমনি 'ভারতবর্ষ' ছাড়া অন্যান্য পত্র-পত্রিকায়ও আমার প্রচুর লেখা ছাপা হতে লাগল। একের পর এক করে নানা বিষয়ের বইও প্রকাশিত হতে লাগল।

আমি প্রথম জীবনে কবিতা ও গল্প লিখলেও, এমন কি এক সময় একটা

অসমাপ্ত উপন্যাস লিখলেও, ঘটনা চক্রে সেই যে ভারতবর্ষ সম্পাদক ফণিদার নির্দেশে পড়াশুনা করে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করি, সেই থেকে খেটে ঐ প্রবন্ধ লেখা আমার আজও চলেছে। এবং নানা বিষয়ের উপর তথ্য ও সত্য আবিষ্কারের নেশায় গবেষণা করে ও লিখে দিন কাটছে।

আমার ন্যায় আমার স্ত্রী এবং পুত্রও সাহিত্য চর্চা করে চলেছে। স্ত্রীর সাহিত্যের সঙ্গে আছে গান, পুত্রের সাহিত্যের সঙ্গে আছে চিত্রাঙ্কন।

আমার স্ত্রীর লেখা প্রথম কবিতার বই 'কবিতা ও গান' এর ভূমিকায় বা 'আমার কথা'য় সে যা লিখেছে, এখানে সেই লেখাটা তুলে দিচ্ছি। এতে তার সাহিত্যের ও গানের চর্চার কথা জানা যাবে—

আমার কথা

অল্প বয়স থেকেই কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে আসছি। ছাপা হয়েছে কিন্তু খুবই কম।

কলেজে যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী ছিলাম, সেই সময় কলেজ ম্যাগাজিনে প্রথম আমার একটি বড় গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। পরে বিবাহের পর আমার স্বামী গোপালচন্দ্র রায়ের আগ্রহে 'ভারতবর্ষ'' মাসিক পত্রিকায় আমার কবিতা ও প্রবন্ধ ছাপা হয়।

হাওড়া গার্লস হাই স্কুলে (বর্তমান নাম হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুল) একটানা দীর্ঘ ৩৮ বৎসর কাল শিক্ষয়িত্রী থাকার পর সম্প্রতি অল্প কয়েকদিন হ'ল অবসর গ্রহণ করেছি। স্কুলে বরাবরই উপরের ক্লাসগুলিতে ইংরাজি পড়াতাম। তখন কোন কোন শিক্ষিকা বান্ধবীর, বিশেষ করে ছাত্রীদের অনুরোধে স্কুল ম্যাগাজিনে মাঝে মাঝে ইংরাজি কবিতা লিখে দিতাম, ছাপা হ'ত।

অন্যত্রও কোথাও কোথাও লেখা দিতে হয়েছে এবং ছাপাও হয়েছে।

একেবারে বালিকা বয়স থেকেই গান গেয়ে ও গানের চর্চা করে আসছি। নিজে কিছু গান লিখেওছি এবং কয়েকটি গানের স্বরলিপিও তৈরি করেছি।

আমার স্বামী দীর্ঘকাল ধরেই আমাকে বলে আসছেন—তোমার কিছু কিছু বাংলা ও ইংরাজি কবিতা এবং কয়েকটি গান ও গানের স্বরলিপি নিয়ে একটা বই করে দিই।

আমাদের একমাত্র সন্তান শ্রীমান্ দীপঙ্করও (বর্তমানে আমেরিকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক) আমার একটি কবিতা সংকলন বই-এর কথা বলছে।

আমি আমার স্বামীর 'শরৎচন্দ্র' প্রভৃতি অনেক বইয়ের প্রকাশিকা হয়েছি।

দীপঙ্করেরও এখন পর্যন্ত বাংলায় লেখা দুটি গল্পের বই এবং ইংরাজিতে লেখা একটি কবিতার বই—আমার স্বামী ও আমি দুজনে প্রকাশ করেছি। তবুও আমার নিজের কোন বই ছাপাই নি।

এবার আমার স্বামীর একান্ত আগ্রহেই এই বইটি করতে বাধ্য হয়েছি। এতে বাংলা কবিতা, ইংরাজি কবিতা এবং গান ও গানের স্বরলিপিও দিয়েছি।

অবসর সময়ে বাংলা ও ইংরাজিতে দু চার লাইনের ছোট ছোট কবিতা বা কবিতা-কণা লিখে থাকি। এই বইয়ে ঐরূপ কয়েকটি ছোট কবিতাও দিয়েছি।

যাঁর একান্ত আগ্রহে এই বই, আমার সেই স্বামীই হয়েছেন এই বইয়ের প্রকাশক।

'কবিতা ও গান' প্রকাশিত হলে বইটি পড়ে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক, প্রবীণ অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

'শ্রীগোপালচন্দ্র রায় বিখ্যাত তথ্যসন্ধ গবেষক। তাঁরই সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী মীনাক্ষী রায় ও পুত্র দীপঙ্কর রায়ের ইংরাজিতে সাহিত্য চর্চার সংবাদ আমি রাখি। শ্রীমতী রায়ের 'কবিতা ও গান' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতায় ভরা কবিতাগুলি হয়তো আজকের ভঙ্গিকে অনুসরণ করেনি, কিন্তু সন্দেহ নেই তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিমতায়। হৃদয়ানুভূতির নিভৃত উচ্চারণে কবিতাগুলি স্নিগ্ধ, চারুবাণীর নিদর্শন। কয়েকটি গানের লিরিক সত্যই মর্মস্পর্শী। শ্রীমতী রায়ের কাছ থেকে আরো কবিতা আমরা আশা করি।'

গৃহিণীর এই কবিতার বইটি যখন ছাপা হচ্ছে, সেই সময় একদিন আমি 'চতুরঙ্গ' মাসিক পত্রিকার অফিসে যাই। সেদিন আমার হাতে আমার স্ত্রীর ঐ 'কবিতা ও গান' বইএর প্রথম 'ফর্মা'র প্রুফটা ছিল। 'চতুরঙ্গ' অফিসে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত—১ম পর্ব সম্বন্ধে আমার একটা লেখা (ঐ বইয়ে যে সব ছোট বড় ভুল আজও সমানে ছাপা হচ্ছে, আমার লেখায় সেগুলো দেখিয়েছি) কয়েক মাস পড়ে আছে, কবে ঐ লেখাটা ছাপা হবে তারই খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।

আমি গেলে 'চতুরঙ্গে'র নির্বাহী সম্পাদক বা কার্যকারী সম্পাদক আবদুর রউফ সাহেব আমাকে বললেন—শরৎচন্দ্রের জন্ম তারিখ ৩১শে ভাদ্র। তাই আপনার শরৎচন্দ্র বিষয়ক লেখাটা 'চতুরঙ্গে'র ভাদ্র সংখ্যায় অর্থাৎ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ছাপতে দিয়েছি। ছাপা হচ্ছে।

এই সময় আমি আমার স্ত্রীর কবিতার বইয়ের যে প্রুফটা হাতে ছিল রউফ

সাহেবকে দেখাই। তিনি প্রুফে প্রথম কবিতাটি পড়েই বললেন—এই কবিতাটি দিন। এখনই এ মাসের 'চতুরঙ্গে' ছাপবো। কবিতাটি আমি দিলে ঐ ভাদ্র বা সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'চতুরঙ্গে' আমার প্রবন্ধ এবং আমার স্ত্রীর কবিতা একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদকের আগ্রহে 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত আমার স্ত্রীর সেই কবিতাটি হ'ল—

একটি সকাল

অনেক—অনেক রাত পার হয়ে এসে
পেয়েছি একটি সকাল—
একান্ত আমার। উথাল পাথাল
কত কুণ্ঠিত দিনের পারাবার
দিয়েছি যে পাড়ি—লইতে হিসাব তার
মন নাহি চাহে। মূর্খ উচ্ছ্বাসের
অক্ষম তরীখানি—নির্বাসিত বালুচরে
এসেছি যে ফেলে। অনাবিল মুহূর্তের তরে
প্রতীক্ষা আগন্তুক মনের। উদাসী ক্ষণের
মৌন অবসান। অপ্রগলভ উল্লাসের
আরক্তিম উষ্ণ সাড়া—দিয়ে যায় পাড়ি—
দিগন্তের রক্তসাগর আবেশে সন্তরি।
রবাহূত অনাহূত পুরানো যে দিন
অতিথি সূর্যেরে জানায় অমলিন
সৌম্য আমন্ত্রণ।—তারপর চলে যায়
আতুর উদাসী বনভূমি ছায়—
কুয়াসা হাউই হয়ে কোথায় মিলায়
তারা—অতীতের কোন্ হিম মাসে,
হেমন্তের নিমন্ত্রণহীন সকরুণ ঘাসে।
অন্ধকার স্তব্ধ গাঢ় সৈকত
পার হয়ে—স্থূল শতাব্দীর বিগত
আর্তিকে নির্বাসন দিয়ে,
আনন্দ রহস্যঘন সম্ভার নিয়ে
সোনালি সূর্যের স্বচ্ছ প্রকাশ—
অনাদির নীল দিগন্তে। অব্যক্ত বিকাশ
পূর্ব তোরণে-তোরণে। শিশিরের লাবণ্য সাগরে
তুলেছে যে ঢেউ—একটি সকাল। আমারই তরে—
শুধু আমারি হৃদয়ের শঙ্খ মিনারে—

দীপঙ্করের আঁকা ক'টি ছবি—



'সপ্তহীরা' রহস্য উপন্যাসের একটি ছবি



একজনের ছড়ার বইয়ের একটি ছড়ার সঙ্গে মিলিয়ে এঁকে দেওয়া ছবি





এই ছবিটি আমেরিকার 'গগ'ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল

ধানের সবুজ গুচ্ছের কিনারে-কিনারে,
স্বচ্ছন্দ পরিতৃপ্ত আকাশের মতো—
সুনিশ্চিত—স্বাগত—দিগন্তবিস্তৃত।
আনন্দ উল্লাস প্লাবন বয়ে বয়ে যায়,
ডাক দিয়ে মেঘে মেঘে কোথায় মিলায়।
নরম নদীর জলের গন্ধটুকু মেখে—
আপন বুকের ঢেউয়ে কান পেতে রেখে
আমাকে শোনাতে চায় আগামী বারতা,
আমারি একটি সকাল—অস্ফুট সে কত কথা,
অনির্বচনীয়, অব্যক্ত, তবু একান্ত আমার—
উত্তরণ আলোর নীড়ে—পেরিয়ে আঁধার।

আমার এবং আমার স্ত্রীর ন্যায় আমার পুত্রও তার অল্প বয়স থেকেই গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি লিখে আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছবিও এঁকে চলেছে।

দীপঙ্কর যখন স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ে তখন সে 'সপ্তহীরা' নামে একটা রহস্য-উপন্যাস লিখলে, তখনই সেটা ছেপে দিই। ঐ বইএর মলাটের এবং বইএর ভিতরের সব ছবিও তারই আঁকা।

দীপঙ্কর যখন বি. এস.-সি পড়তো তখন সে 'প্রলাপ' নামে বেশ বড় আকারের একটা হাতে লেখা পত্রিকা দু'বছর বার করেছিল। তাতে তার বন্ধুদের কারো কারো লেখা থাকলেও, তার নিজের লেখাই থাকতো সব চেয়ে বেশী। আর প্রলাপের রঙীন মলাট থেকে শুরু করে ভিতরের নানা ধরণের সমস্ত ছবিই ছিল তার আঁকা।

দীপঙ্কর স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই প্রচুর গল্প, কবিতা, ছড়া লিখলেও এবং এক রঙা ও বহু রঙা অসংখ্য ছবি আঁকলেও, সে যখন এম. এস.-সি পড়ে তখনই তার লেখা ১৮টা ছোট গল্প নিয়ে একটা বই ছেপে দিই। দীপঙ্করই বইএর নাম দেয়—'সেই অস্তিত্ব, এই অনুভব!' এই বইএর মলাটের ছবিও তারই আঁকা। এই সময়েই একজনের 'বলছি শোন' নামের একটা ছড়া ও ছবির বইয়ের সমস্ত ছবিই এঁকে দিয়েছিল দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে এবং বিজ্ঞান কলেজে এক বছর এম. ফিল পড়ে পাস করে পি. এইচ-ডি ডিগ্রী লাভের জন্য আমেরিকায় চলে যায়, সেখানে গিয়েও তার বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য এবং ছবি আঁকার কাজও সমানে চলে। ওখানকার কাগজে কাগজে তার আঁকা ছবি এবং কবিতাও প্রকাশিত হয়। দেশে থাকতে দীপঙ্করের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'একক' পত্রিকায়, আর তার গল্প প্রথম প্রকাশিত হয় দ্বিজেন ঘোষের 'মুখর' পত্রিকায়।

দীপঙ্কর আমেরিকায় গিয়ে সেখানে ইংরাজি কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পর পর তিনবারই প্রথম হয়ে পুরস্কার লাভ করে। একবার তার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী এক কবি।

দীপঙ্কর পি. এইচ-ডি ডিগ্রী লাভের পর নিউইয়র্কে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পোস্ট ডক্টরেট করছে, সেই সময় একবার বাড়ি এসে আমাকে বললো—একটা ইংরাজি কবিতার বই লিখে এনেছি, এটা ছেপে বার করে দাও। বইএর নাম দিয়েছি—Time and other Realities. বইএর কভার তো আমার আঁকাই, ভিতরে আমার আঁকা দশটা ছবিও থাকবে।

দীপঙ্করের এই ইংরাজি কবিতার বই প্রকাশিত হ'লে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক, গবেষক ও লেখক, ইংরাজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পড়ে বলেন—

'শ্রীদীপঙ্কর রায়ের কাব্যগ্রন্থ 'Time and other Realities' পড়ে আনন্দ পেয়েছি। এই কবিতাগুলি থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, দীপঙ্কর বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় তাঁর যথেষ্ট অধিকার আছে। কবিতাগুলির পটভূমিকা, ভাবধারা ও চিন্তার ঐশ্বর্য থেকে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, লেখকের মনের দিগন্ত দূর বিস্তৃত। কবির ব্যবহৃত ভাষা ও চিত্রকল্প খুবই আধুনিক, হয়তো এর ফলে অনেকে তাঁর রচনার মাধুর্য সম্যকভাবে আস্বাদন নাও করতে পারে।

প্রথম দীর্ঘ কবিতাটি আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে। ছবিগুলির ব্যঞ্জনা ও গতিশীলতা নিশ্চয়ই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট কবিতাগুলির রসাস্বাদন সহজতর হবে।'

দীপঙ্করের বইয়ে চিত্তরঞ্জনবাবুর সব চেয়ে ভাল লাগা কবিতাটি এখানে দিলাম —

TIME AND OTHER REALITIES

The time was short, the time was blue
In a way, the old time was new
Time was blended in the blue color
Of a plastic toy-mirage,
Time was served on the dinner table
With a long gone image.

Time was given to the old lady

Fading in her portraits, given with
The compliments of her time—
Two of time's favorite most feathers,
One on her dinner plate
And one in her bleeding neck.

It was too late to be early
At that time, too dark to see
Justice from crime ; I was down,
Down on the ground, scattered
Away from the rest of the boys,
Looking for my toys, lost in my games
Of keeping up with time, and crawling
Round and round in racing and chasing
Like a dry pen on a pensive polygraph,
Dragging and drifting my knees
On the stone-faced ground,
I ended up facing
A fading away photograph,
As if it was waiting for ages,
Only for me to be found.

Moving slowly in the frame of gold,
The old lady turned around and said—
'Take the fake, take the pure
and don't miss the overture'.

Time has created time's own mistry
As we have created onr own history
History of this world—only a history
Of our wars, rather than a history
Of the mankind. We found blood drops
In the morning dew, we found
Dew drops on burnt out clocks
We found time locked in a black box—

Suffocating slowly in a black majic box.

Time has broken time's own rules
By mixing and melting the frozen tools
Of both failures and freedoms,
Deflating and depicting fragments of ages,
Making and breaking cravats and cages.
Time and time's forbidden seeds, while
Adding salt to the coldest ice cubes
Of solidified pains, have lived in the veins
Of tomorrow's blood, and like a forgotten smell
Live in the alembics of the human race,
Live like a spider inside the heart,
Like a gray hair inside the brain,
Like a tumour in socially required manners,
And carries this useless 'love' through our times,
Through our own dog days of growing
Gradually in to the growth of our deaths.
'....and don't miss the overture'
The dying lady turned around and said.
Time was short, time was quiet,
So quiet that you could hear the moonlight
Falling on the snow, and hear your own blood.
So quiet that you could see your fuzzy future,
Feel your guilty present, and smell your lungs
So quiet that you could hear the spins
Aligning in a ferromagnet, so quiet that
You could see your own death and read
The different faces of your faith,
So quiet that you could probably fall in love!
But before any of these you'll try, and
Way before you'll meet your lover,
The dinner will be over,
The time will be over.

'Take the fake take the pure,
And don't miss the overture'—
The old lady turned around and said.

The fat old man on my block,
Who often wondered about the
'Medical lecture of Nicholas Tulp',
Who used to talk about his silver spoon
And his golden fork, and about Godel's Work.
Who loved to listen to 'Rosenkavalier' with
A cup of dream, he used to have a
Top-less hat on his hanger. And like him,
The decapetated man in my head
Who always tried to own my head,
Accuses me often of wearing his head.
We all gather together around the table
(Where the dying lady sits)
We talk about our bread butter and cheese
Talk about a pedant or a pebble, and
Through these cranial conversation we make.
Come out the decapetated man living in
Our heads, comes out the blood. Florid blood
And dark red blood of our renamed, rotten
Dreams start to drip (down our hands,
Down our forks, down our spoons, on to
The snowball food on our crambly holy cribs).

The fat old man on my block, who
Asked me once, if I had a lighter,
And if I knew anything about entropy
Or love, also wanted to know
If really she was dying.

You stand straight without a blink
Next to the grave of the old story teller.

The time remains quiet, time telling clocks
Are quiet ; so quiet that you can hear your
Shadow falling on the dead man's stomach.
So quiet that you can hear across the medow
Dali's clocks melting, so quiet that you can
Feel the time shrinking into other times.
You walk across the shrinking time,
You shrink inside your walking time,
You walk across the changing time,
Across love, peace and your other fantasies,
Across few deaths and across few deserts.
But it's still a shadow on the run,
Chasing time, chasing killers, chasing all your dealers
Of silver spoons and antiques, chasing all the
Realities you've always tried to hide from.
It's your lonely long shadow chasing your dream,
Changing your silence into your scream.
You walk across your time, you walk across the street.
You, bleeding head, bleeding feet blind,
You live and you live to die
You shout and you laugh to cry.
The red dust covers your feet, the rust
Covers your origin and axes
Like blue flies covered these faces
Lying across your past. You walk through
The past, counting all your fused lights of life
You walk down the streets of foggy yellow nights.

You walk across your brain
In your stormy bloody dreams
You walk upto your dinner table
And the dying lady says
'Take the fake take the pure
And don't miss the overture'.

কৃষি—

আগে আমাদের গ্রামের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে যে প্রায় ৪০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের কাদুয়ার মাঠ বা কেদোর মাঠের কথা বলেছি, সেই মাঠের আকার অনেকটা অগভীর একটা সরার মত। মাঠের চার পাশ ক্রমশঃ একটু একটু ঢালু হয়ে হয়ে প্রশস্ত মাঝখানটায় এসে মিশেছে।

এই মাঠটি প্রধানতঃ এক ফসলা। এখানে কেবল হৈমন্তী ধানেরই চাষ হয়। সম্প্রতি (এই প্রসঙ্গ লেখার বছর দশেক আগে থেকে) মাঠের চার ধারে কোথাও কোথাও গভীর নলকূপ বসিয়ে, আবার ডি. ভি. সি-র জল পাওয়ার ফলে মাঠে অধিক ফলনশীল গ্রীষ্মের ধানের চাষও হচ্ছে।

এই মাঠে হৈমন্তী ধানের চাষে বেশ কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। মাঠের চার পাশে কিছু কিছু অংশে সাধারণ রোয়া চাষ হলেও মাঠের অধিকাংশটাই বুনন ধানের চাষ। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিকে মাঠে লাঙ্গলে (আজকাল ট্রাক্টরও হয়েছে) চাষ দিয়ে ছিটিয়ে ধান বোনা হয়। পরে বৃষ্টির জল মাঠে একটু একটু করে জমার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের ধান গাছও বড় হ'তে থাকে। এক সঙ্গে অধিক জলের চাপে বা বন্যার জলে এই সব ধান গাছ জলের তলায় তলিয়ে না গেলে, চার পাঁচ ফুট পর্যন্ত জলেও এই সব ধান গাছ দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে থেকে জলের উপরে এক ফুট দেড় ফুটের মত অগ্রভাগে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। সেই সব শাখা প্রশাখা থেকে ধানের শীষ বার হয়। অধিক জলে ফলা আমাদের অঞ্চলের এই সব ধানের নাম—বাঁকুই, পানকলস, কাঁটিসার ইত্যাদি।

এই বিরাট মাঠে বৃষ্টির জল এবং মাঠের আশপাশের বহু জায়গার অতিরিক্ত বৃষ্টির জলও নানা খাল দিয়ে এসে জমে। কিন্তু এত বড় মাঠের জল নিকাশের মাত্র দুটি পথ আছে। দুটি পথই মার্টিন রেলের (কিছু দিন হ'ল মার্টিন রেল বন্ধ হয়ে গেছে) নীচে দুটি পুল দিয়ে—একটি দক্ষিণ দিকে আর একটি পূর্ব দিকে। দক্ষিণের জলপথটি কিছুটা প্রশস্ত হলেও পূবেরটি সংকীর্ণ। মাঠের জল এই দুই পথ দিয়ে বেরিয়ে সংলগ্ন দুদিকের দুটি খালে গিয়ে পড়ে, আর খালের ঐ জল গিয়ে পড়ে গঙ্গায়।

এই বিশাল মাঠের জল নিকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষায়, শরতে, হেমন্তে যখনই প্রবল বৃষ্টি হয়, তখনই মাঠে জল জমে মাঠের ধানের গাছকে ডুবিয়ে দেয়। কখন হেমন্তের শেষে বা শীতকালে প্রবল বৃষ্টি হলে, মাঠের

পাকা ধানও জলের তলায় ডুবে গিয়ে নষ্ট হয়। এই মাঠে চাষ করে ফসল পাওয়া এতই অনিশ্চিত যে, এই অঞ্চলের লোকের মুখে এই কথাটা প্রবাদ বাক্যের মতই ঘোরে—কেদোর মাঠে চাষ, ভাবনা বার মাস।

অথচ মাঠের এ‍ঁটেল মাটি, খুবই উর্বর।

যে বছর মাঠের ধান গাছ জলে ডুবে নষ্ট হয় না, সে বছর শরতের পর থেকে মাঠের জল কমতে থাকলে, হেমন্তে শীষের ভারে ধানের গাছ জলের উপর শুয়ে পড়ে। হেমন্তে বা শীতে মাঠের চার ধারে জল না থাকায় সে সব জায়গায় চাষীরা শুকনো ধান গাছ কাটে। মাঠের মাঝে তখনও জল থাকায় সেখানে চাষীরা জলে দাঁড়িয়ে হাত দেড়েক করে ধান সমেত ভিজা ধানগাছ কেটে আঁটি বেঁধে (স্থানীয় ভাষায় এই আঁটিকে বলে বিঁড়ে) শালতিতে (ছোট নৌকায়) চাপিয়ে খাল ধরে বাড়িতে নিয়ে আসে।

এখন এই বিশাল মাঠের মধ্যেকার এই খালের কথা কিছু বলি—মূল খাল, শাখা খাল করে মাঠে ঐ শালতি ও ডোঙা যাতায়াতের জন্য অনেক খাল আছে। কিন্তু এই সব খাল যে কোন্ যুগে কতকাল আগে কাটা হয়েছিল, তা কেউ বলতে পারে না। মাঠের সেই বহুকাল আগের কাটা খাল ক্রমশঃ মজে গিয়ে গিয়ে একরূপ মাঠের আশপাশের জমির সমান স্তরে এসে যায়। তাই চাষীদের ঐ 'বিঁড়ে' ধান বোঝাই করা শালতি বরাবরই ঠেলে ঠেলেই আনতে হয়। মাঠের মাঝখান ছাড়িয়ে উপরের দিকে খালে প্রায় জল না থাকায়, কিংবা নাম মাত্র থাকায় চাষীদের বোঝাই শালতি ঠেলে আন্‌তে খুবই কষ্ট হ'ত।

কেদোর মাঠ মূলত এক ফসলা—হৈমন্তী ধান চাষের—মাঠ হলেও তখন এখানে বোরো চাষও কিছু কিছু হ'ত। চাষীরা সাধারণতঃ মাঘ মাসে রোয়া করে চৈত্র-বৈশাখে ধান কাটতো। এই বোরো চাষ হ'ত মাঠের বিলগুলোর গায়ে গায়ে। কারণ, বিল থেকে সেচের জল পাওয়া যেত। মাঠে ছোট বড় করে প্রায় শ'খানেক বিল আছে।

মাঠে যে প্রচুর মজা খাল রয়েছে, সেগুলো একটু গভীর করে কাটা হলে এবং খালের সেই জল বেঁধে রাখলে খালে বরাবরই জল থাকে, তাতে মাঠে আরও প্রচুর বোরো চাষ হতে পারে। তাছাড়া খালে জল থাকলে হৈমন্তী ধানের 'বিঁড়ে' বোঝাই শালতি নিয়ে যেতে চাষীদের সুবিধা হয়।

মাঠের এই খাল সংস্কার এবং বর্ষার সময় মাঠের অতিরিক্ত জমা জল নিকাশের ব্যবস্থার জন্য তখন 'কাদুয়া খাল সংস্কার সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করে ছিলাম। আমি ছিলাম ঐ সমিতির সম্পাদক।

মাঠের পূর্বদিকে মার্টিন রেলের নীচে দিয়ে জল নিকাশের পথের সংলগ্ন মাঠের বাইরে যে বড় খাল, সেই খালের মুখেই একটা বেশ মোটা বাঁধ বাঁধা থাকে। গ্রীষ্মকালে আশপাশ থেকে মাটি এনে প্রতি বছরই শক্ত করে এই

বাঁধটা বাঁধা হয়। বাঁধ কাটান হয় কার্তিকের শেষে অথবা অগ্রহায়ণের প্রথমে।

কেদোর মাঠে ছোট বড় করে যে প্রায় এক শ' বিল আছে। গ্রীষ্ম কালে মৎস্যজীবীরা ঐ সব বিলের মাছ ধরলেও একেবারে নিঃশেষ করে ধরতে পারে না। কিছু না কিছু মাছ থেকেই যায়। তাছাড়া বর্ষার সময় মাঠের পাশ্ববর্তী অনেক গ্রামের পুকুরের মাছও জলে ভেসে এসে মাঠে পড়ে। এই সব মাছের ডিম থেকে আপনা হতেই প্রতি বছর মাঠে প্রচুর মাছ জন্মায়। আষাঢ়ে ডিম ফোটা এই মাছ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘে বড় হয়।

মাঠের পূর্ব দিকে জল নিকাশের পথের সংলগ্ন খালের মুখে যে বাঁধের কথা বলেছি, জেলেরা সেই বাঁধ কাটিয়ে মাছ ধরে এই সময়েই। অগ্রহায়ণ মাস থেকে প্রায় তিন মাস ধরে মাঠ শুকিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত যখন মাঠের জল এই পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তখন ঐ জলের সঙ্গে মাঠের প্রচুর মাছও যায়। জেলেরা খালের মুখে নানা ধরণের জাল পেতে ঐ মাছ ধরে এবং মাছ বেচে লাভও করে প্রচুর।

খালের এই মুখটা অর্থাৎ বাঁধ দেওয়ার জায়গাটা স্থানীয় এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিরাট ধনী জমিদারের খাস এলাকার ছিল। তিনি প্রতি বছর জেলেদের কাছ থেকে বেশ কয়েক হাজার টাকা নিয়ে তাঁর এই জায়গাটা জমা বিলি করতেন।

বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টি হলে মাঠে যাতে না জল জমে, সেজন্য এই বাঁধ কাটিয়ে এখান দিয়ে জল বার করা একটা সহজ পথ। অথচ প্রতাপান্বিত জমিদার এই বাঁধ সেই অগ্রহায়ণের আগে, বড় জোর কার্তিকের মাঝামাঝির আগে কিছুতেই কাটাতে দিতেন না।

কেদোর মাঠে বর্ষায় প্রায় প্রতি বছরই অতিরিক্ত জল জমে। মাঠের জল নিকাশের জন্য বাঁধ কাটানোর অনুরোধ নিয়ে গেলে তিনি বলতেন—এখন বাঁধ কাটলে জলের সঙ্গে মাছের ডিম এবং নতুন চারা মাছও সব বেরিয়ে যাবে। পরে মাঠে আর মাছই তো থাকবে না। তাই আমার ঐ জমা বিলির হাজার হাজার টাকা দেবে কে? মাঠ ডুবে গেল তাতে আমার কি?

একবার বর্ষাকালেও নয় বৈশাখ মাসেই প্রবল বর্ষণে কেদোর মাঠ গেল ডুবে। সে দিনটা আমার আজও মনে আছে। এই জন্য যে, সেদিন ছিল ২৫শে বৈশাখ। তখন পশ্চিম বঙ্গে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিন বলে ছুটির দিন হিসাবে চালু হয়ে গেছে। ঐ ছুটির দিনে আমাদের ওখানকার এম. ই. স্কুলের হল ঘরে—(আমি তখন এই স্কুলের সেক্রেটারি, পরে এই স্কুল হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে উন্নীত হয়েছে) আমাদের ইউনিয়নের হেল্‌থ সেন্টারের স্থান নির্বাচন নিয়ে একটা সভা ডেকেছি। আর ঐ দিনই বিকালে

আমতায় একটি পাঠাগারে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার বক্তৃতা দেওয়ারও কথা। তাই ২৪শে বৈশাখ প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও কলকাতা থেকে বাড়ি গিয়েছিলাম। বাড়ি গিয়ে দেখি—কেদোর মাঠ ডুবে অর্থাৎ মাঠে জল জমে সমুদ্রবৎ হয়ে গেছে।

সকালে হেল্‌থ সেণ্টারের মিটিং কোন রকমে সারলাম। বিকালে রবীন্দ্র-সভায় থাকতে পারবো না ভেবে দুপুরে বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটা লেখা লিখে আমতার পাঠাগারের উদ্যোক্তাদের হাতে দিই। দিয়ে, মার্টিনের রেলের নীচের সেই পুলের জল নিকাশের পথের কাছের বাঁধটা কাটানো যায় কিনা দেখতে গেলাম। ওখানকার স্থানীয় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গেও দেখা করলাম। তাঁদের কয়েকজনকে নিয়ে সন্ধ্যার পর জমিদারবাবুর কাছে বাঁধ কাটানোর অনুরোধ নিয়ে দেখাও করলাম।

তিনি বললেন—অনেক টাকা খরচ করে ঐ বাঁধ বাঁধা হয়েছে। এখন বাঁধ কাটালে এ বছর আর বাঁধ বাঁধা যাবে না। তাহলে আমার জেলে বিলির টাকাটা দেবে কে? ও বাঁধ আমি কিছুতেই কাটাতে দোব না। মাঠ ডুবে গেল, তাতে আমার কি? বাঁধ কাটতে গেলে লাঠালাঠি খুনোখুনি হয়ে যাবে এই বলে দিচ্ছি।

জমিদারের কাছ থেকে ফিরে এসে সঙ্গী একজনের বাড়িতে রাত্রে থাকলাম। ঐ রাত্রেও প্রবল বৃষ্টি। সকালে উঠে একেবারে সিধা কলকাতায় আমার বাসায় চলে এলাম। এসে কয়েকটা দরখাস্ত লিখে, সেই সব দরখাস্ত হাতে নিয়ে, সেচ মন্ত্রী, হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়ার এস. ডি. ও-র সঙ্গে দেখা করলাম। হাওড়া জেলায় দুটা মহকুমা—উলুবেড়িয়া ও হাওড়া। ঐ বাঁধ যে জায়গায় সেটা হাওড়া মহকুমায়। এবং হাওড়া মহকুমার অন্তর্গত বড়গাছিয়া থানার অধীন।

আমার দরখাস্তে বক্তব্য ছিল—বাঁধ কাটিয়ে মাঠের জল বার করে দিতে পারলে, মাঝ মাঠে না হলেও মাঠের চার পাশের উঁচু লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির জল নেমে যাবে। জ্যৈষ্ঠের খর রৌদ্রে মাঝ মাঠেরও অনেকাংশের জল শুকিয়ে যাবে। তখন আবার চাষীরা মাঠে চাষ করতে পারবে।

সেচমন্ত্রী, জেলা শাসক, হাওড়ার মহকুমা শাসক সকলেই আমার দরখাস্তের বক্তব্য সমর্থন করলেন। এই সময় আমি হাওড়ার জেলা শাসক ও মহকুমা শাসককে বললাম—বাঁধ কাটাতে গেলে খুনোখুনি হতে পারে। তাই আপনারা বড়গাছিয়া থানার ও. সি.-কে (দারোগাকে) লিখে দিন, তিনি যেন কিছু পুলিশ পাঠিয়ে দেন। পুলিশের উপস্থিতিতেই আমাদের লোকজন বাঁধ কেটে দেবে।

এঁরা লিখে দিলে, সেই লেখা নিয়ে বড়গাছিয়া থানার ও. সি-র সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি কিছু পুলিশ আমার সঙ্গে দিলেন। সেই পুলিশ

বাহিনী নিয়ে বাঁধ কাটান হ'ল। অত পুলিশ দেখে জমিদার আমাদের কাছে এলেন না। মাঠের জল বেরিয়ে যাওয়ায়, সে বছর মাঠে বেশ ভালই চাষ হয়েছিল।

এরপর থেকে একটা অলিখিত ব্যবস্থাই হয়েছে এই যে, মাঠে অতিরিক্ত জল জমলেই জল নিকাশের জন্য ঐ বাঁধ কাটিয়ে লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির ধান রক্ষা করা হয়। জমিদার আর বাধা দেন না।

মাঠের অতিরিক্ত জমা জল নিকাশের জন্য মার্টিনের রেলের নীচের ছোট পুল যাতে আরও বড় করানো যায়, এজন্য তখন আমি মার্টিন রেল কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে বেশ যোগাযোগ করেছিলাম। সেই সময়কার আমাকে লেখা সরকারের সেচ বিভাগের চিঠিগুলির মধ্যে একটা কীটদষ্ট চিঠি দেখছি, আজও আমার পুরনো কাগজ-পত্রের মধ্যে রয়েছে। সেই চিঠিটা এই লেখার সঙ্গে দিলাম।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগের এই চিঠি পেয়ে তখন মার্টিন রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে যাই।

ঠিক এই সময়টাতেই মার্টিন রেল কর্তৃপক্ষ লোকসানের জন্যই তাঁদের দীর্ঘকালের এই রেলপথ বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন। এর কিছুদিন পরেই মার্টিন রেল উঠেও গেল।

মার্টিনের রেল বন্ধ হলেও রেলপথের জায়গাটা মার্টিনেরই থেকে যায়। তখন সেচ বিভাগ মার্টিন কর্তৃপক্ষকে না পেয়ে অপরের পরিত্যক্ত জায়গায় একা কিছু করতে চাইল না।

ফলে কেদোর মাঠের অতিরিক্ত জমা জল দ্রুত নিকাশের জন্য মার্টিন রেলের নীচের সেই ছোট পুল আর বড় করা গেল না। তবে মাঠের জল নিকাশের প্রয়োজন হলে আগে জমিদারের যে বাঁধ আদৌ কাটানো যেত না, আমাদের সেই সংগ্রামের ফলে এখন প্রয়োজন বোধে সহজেই কাটানো যায়।

মাঠের মধ্যেকার সেকালের মজা খাল, সে মজা খালও আজ আর নেই।

আমাদের কাদুয়া খাল সংস্কার অন্দোলনের কয়েক বছর পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন দেশের বহু জায়গায় ডি. ভি. সি. প্রভৃতির সেচের জল সরবরাহ করে গরম কালে অধিক ফলনশীল ধানের চাষের ব্যবস্থা করেন, তখন সরকার আমাদের এখানেও আমাদের মাঠের ঐ মজা খাল এবং আরও কিছু নতুন খাল কেটে অধিক ফলনশীল ধানের চাষের ব্যবস্থা করেছেন।

স্বাস্থ্য—

স্বাধীনতা লাভের অল্প কিছু দিন পরেই পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ

Bengal Form No. 5.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

All correspondence should quote the Number, Date and Subject of any previous Correspondence.

OFFICE OF THE Executive Engineer,
Hooghly Irrigation Division
Addison House
Alipur.

Memorandum No 1258 – 33-11/45, dated the 10-3-1951

To Sree Gopal Chandra Roy,
Secretary, Kandua Khal Sanskar Samity,
26, Madan Boral Lane, Bowbazar, Calcutta.

Subject :- Mat ... to his petit... ed 28-11-50.

Ref: ... petition dated ... -50.

Dear Sir,

You are advised to approach the Railway authorities first with details of your difficulties as the bridge belongs to them.

Action as necessary, will be taken on hearing from you the replies of the railway authority.

Yours faithfully,

12/3/51

Executive Engineer,
Hooghly Irrigation Division
(formerly Damodar Division).

SD.9/3.

ACJP—A 663—1950-51—13,46,000

বিধানচন্দ্র রায় স্থির করেন—গ্রামাঞ্চলে সুচিকিৎসার জন্য প্রতি ইউনিয়নে একটা করে ইউনিয়ন হেল্‌থ সেণ্টার এবং প্রতি থানায় একটা করে থানা হাসপাতাল স্থাপন করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন হেল্‌থ সেণ্টারে একজন পাস করা ডাক্তার, একজন পাস করা কমপাউন্ডার, একজন পাস করা নার্স থাকবে এবং অন্যান্য কর্মচারীরাও থাকবে। হেল্‌থ সেণ্টারে আউটডোর বা বহির্বিভাগে রোগী দেখা ছাড়া, এখানে থাকবে চারটি মেটারনিটি বেড্ এবং ছ'টি জেনারেল বেড্। যেখানে এই ইউনিয়ন হেল্‌থ সেণ্টার হবে, সেখানে এই হাসপাতালের জন্য স্থানীয় লোকদের কম করে সুবিধা মত জায়গায় এক লপ্তে ৫ বিঘা জমি দিতে হবে এবং অন্ততঃ হাজার পাঁচেক টাকাও দিতে হবে। এই হাসপাতাল তৈরির জন্য যত লক্ষ টাকাই লাগুক তা সরকার দেবে, আর হাসপাতাল চালাবার সমস্ত খরচপত্র সরকারই বহন করবে। হেল্‌থ সেণ্টার মনোনয়নের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট সিভিল সার্জন, মনোনীত এম. এল. এ. প্রভৃতিদের নিয়ে একটা কমিটি থাকবে।

ইউনিয়ন হেল্‌থ সেণ্টারের ন্যায় থানা হাসপাতালের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থাই হবে। তবে থানা হাসপাতালের জন্য স্থানীয় লোকদের দেয় জায়গা এবং টাকা ইউনিয়ন হেল্‌থ সেণ্টারের তুলনায় বেশী দিতে হবে। আর সরকারও এখানে ডাক্তার, নার্স, কমপাউনডার, রোগীর বেড্ ইত্যাদি সবই অনুপাতে বেশী রাখবে।

থানা হাসপাতাল বেশ বড় ব্যাপার। তাই ছোট ইউনিয়ন হেল্‌থ সেণ্টারের দিকেই গ্রামের মানুষ নজর দিল বেশী। কিন্তু নজর দিলে কি হবে? ইউনিয়নে অত হাসপাতাল করার জন্য সরকারের টাকা কোথায়? তাই তখন অল্প যে কয়টা ইউনিয়ন হেল্‌থ সেণ্টার চালু হয়, তার জন্য সরকারের উপর মহলে যাঁর বেশ প্রভাব ছিল এবং যাঁর ঐ উপর মহলে ঘোরাঘুরি ও ধরাধরি করার ক্ষমতা ছিল, তিনিই কেবল তাঁর অঞ্চলে ইউনিয়ন হেল্‌থ সেণ্টার করাতে পেরেছিলেন।

আমি আমার এই বইয়ে আগে দেখিয়েছি—হাওড়ার সিভিল সার্জন কবি মুনীন্দ্রপ্রিয় তালুকদার আমার বিশেষ বন্ধু স্থানীয় ছিলেন। অ্যাসিষ্টাণ্ট সিভিল সার্জন ডাঃ ইন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন তাই। এঁদের উভয়ের বাসাতেই বিশেষ করে সিভিল সার্জনের কোয়ার্টারে খুব জাঁক জমকে আমাদের সাহিত্য বাসরের ক'বার অধিবেশন করাই। ইন্দুবাবুর আগ্রহে তাঁর হাওড়ার বাড়িতে সাহিত্য বাসরের একবার 'বসন্ত উৎসব' হয়েছিল। তাতে কবি-দম্পতি নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন। আবৃত্তি, নাচ, গান প্রভৃতির মাধ্যমে খুব জমাটি সভা হয়েছিল।

ইউনিয়ন হেল্থ সেণ্টার হচ্ছে শুনে, আমি এই মুনীন্দ্রবাবু এবং ইন্দুবাবুর শ্বারস্থ হলাম। ডাঃ তালুকদার বললেন—আপনার ওখানে যাতে একটা হেল্থ সেণ্টার হয়, তার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আমাদের হেল্থ সেণ্টার নির্বাচন কমিটির সদস্যদের অর্থাৎ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতিকেও আমি বলবো। আপনি কেবল হাসপাতালের জন্য এক প্লটে ৫ বিঘা জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আর সম্ভব হলে হাজার পাঁচেক টাকা সংগ্রহ করুন। আপনার ওখানে আমি একটা হেল্থ সেণ্টার করে দোবই।

এরপর তিনি হেল্থ সেণ্টার নির্বাচনের ব্যাপারে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়া আরও কে কে সদস্য আছেন, তাঁদের নামও বললেন। দেখলাম, তাঁদের মধ্যে দুএকজন আমার বিশেষ পরিচিত। পরে তাঁদের কাছে গিয়েও এ ব্যাপারে আবেদন জানালাম।

এদিকে হাসপাতালের জন্য জমি সংগ্রহে আমাকে প্রথমটায় বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। অতটা জমি সহজে কেউ দিতে চাইছিল না। টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েও পাচ্ছিলাম না। শেষে আমাদের পাশের রামচন্দ্রপুর গ্রামের গোবর্ধন পালের কাছে একদিন সকালে গেলাম। মনে আছে, সেদিনটা ছিল—দোলযাত্রা বা হোলি পর্বের দিন। গোবর্ধনের কাছে যাবার সময় পথে ছেলেরা গায়ে প্রচুর রঙ্ দিল। গোবর্ধন আমার ছোট ভাইএর মত, খুবই স্নেহ-ভাজন। তাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলায়, সে এক কথায় রাজী হয়ে তার বাড়ির নিকটে বড় পুকুরের পাড়ে ৫ বিঘার মত জমিটা বিনামূল্যে সরকারকে দিতে সম্মত হ'ল।

এই হাসপাতালের জন্য জায়গা পেয়ে যাওয়ায় আমার কাজ খানিকটা এগিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই সিভিল সার্জন এবং অ্যাসিষ্টাণ্ট সিভিল সার্জনকে জায়গার কথাটা জানিয়ে এলাম। এরপরও এই হাসপাতাল নিয়ে এঁদের কাছে এবং হাসপাতাল নির্বাচন কমিটির পরিচিত সদস্যদের কাছে অনবরত যাতায়াত করতে থাকি। এই সময় অ্যাসিষ্টাণ্ট সিভিল সার্জন ইন্দুবাবু হাসপাতাল নির্বাচন কমিটির দু জন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের দেওয়া জায়গাটা দেখতে এলেন। দেখে পছন্দও করে গেলেন।

যেহেতু আমাদের ইউনিয়নে হেল্থ সেণ্টার করাচ্ছি, সেজন্য ঐ সময় আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে সভাপতি করে ইউনিয়নের গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটা হাসপাতাল কমিটি গঠন করে দিয়েছিলাম। আমি ছিলাম ঐ কমিটির অন্যতম সম্পাদক।

একদিন আমাদের কমিটির সভায় জমি ঠিক করতে পেরেছি ব'লে, দেয় ৫

হাজার টাকাটার কথা উত্থাপন করি। সভায় অবশ্য সেদিন এও বলি—টাকা যাতে দিতে না হয় আমি তারই চেষ্টা করবো। আশা করছি, টাকা দিতে হবে না। কারণ, আমি জানি, আমাদের এই হাওড়া জেলাতেই কিছুদিন আগে একজন এম. এল. এ. নিজের প্রভাবে বিনা টাকায় শুধু মাত্র জমি দিয়েই হাসপাতাল করিয়েছেন। আমি সিভিল সার্জনের কাছে এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই নজীরটা তুলে ধরবো। আমার বিশ্বাস সিভিল সার্জন টাকার ব্যাপারে তেমন জোর দেবেন না।

পরে একদিন সিভিল সার্জনের বাড়িতে গিয়ে যেই তাঁকে বলেছি—দাদা, ঐ ৫ হাজার টাকাটা আর দিতে পারবো না। জমি দিচ্ছি, এতেই আমাদের হাসপাতালটা করে দিন। টাকা ছাড়াও তো…

আমার এই কথার মধ্যেই মুনীন্দ্রপ্রিয়বাবু বলে উঠলেন—গোপালবাবু, আপনি বলছেন টাকা দিতে পারব না, কিন্তু এইমাত্র আপনাদের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট যাঁকে আপনি স্বাস্থ্যকেন্দ্র কমিটির প্রেসিডেণ্ট করেছেন, তিনি এখানে এসে বলে গেলেন—স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য দেয় ৫ হাজার টাকাটা আমরা শীঘ্রই দিয়ে যাব।

এই শুনে আমি আর কি বলবো! শুধু বললাম—তাহলে তো ভালই হ'ল। টাকাটা ছাড় করাবার জন্য আপনাকে আর আপনাদের কমিটির কাকেও কিছু বলতে হবে না।

সিভিল সার্জনের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে একেবারে সিধা গেলাম আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কাছে। তিনি তখন হাওড়া শহরে একজনের একটা বড় লোহার কারখানায় ম্যানেজারি করতেন। গিয়ে ঐ প্রেসিডেণ্টকে বললাম—আপনি সিভিল সার্জনকে বলে এসেছেন ৫ হাজার টাকা দেবেন?

—হাঁ।

—টাকাটা কি আপনার ইউনিয়ন বোর্ডের তহবিল থেকে দেবেন, না চাঁদা তোলা হবে?

—কিছু করতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করেছি। যে গ্রামে হাসপাতাল হচ্ছে, সেই রামচন্দ্রপুর গ্রামই ঐ টাকাটা দেবে। ওদের গ্রামের একটা শিবোত্তর বড় পুকুর আছে। সেই পুকুরটা জেলেকে জমা বিলি দিয়ে তার কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে ওরা আমাদের দেবে।

এরপর প্রেসিডেণ্ট মশায় যে কথাটা বললেন, সে-কথা শুনে আমি প্রায় হতবাক্ হয়ে গেলাম। তিনি বললেন—দেখুন গোপালবাবু, আপনি এক তো এই দুর্লভ জিনিষ হাসপাতালটা আনলেন। তার উপর আবার বিনা টাকায় যদি হাসপাতালটা করিয়ে দেন, তাহলে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়ে

আমার কি একটু সম্মানে লাগে না ! তাই আমি টাকাটা দোব বলে এসেছি। এই টাকার জন্য আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। এ আমিই ব্যবস্থা করে একদিন সিভিল সার্জনের হাতে নিয়ে আসবো।

যথা সময়ে সরকার কর্তৃক আমাদের হেলথ সেণ্টার নির্বাচিত হ'ল। পরে সরকারী টাকায় হাসপাতালের জন্য বাড়িঘর ইত্যাদি তৈরি হল। ঘর বাড়ি হয়ে গেলে, ডাক্তার, নার্স প্রভৃতিরা এলেন এবং হাসপাতালও চালু হয়ে গেল।

হাওড়ার সিভিল সার্জন বন্ধুবর কবি মুনীন্দ্রপ্রিয় তালুকদারের বিশেষ চেষ্টায় আমাদের এই হাসপাতাল যে তখন সম্ভব হয়েছিল, এটা স্বীকার করতেই হবে।

পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে সেদিনের সেই হাসপাতাল আজ আরও বড় হাসপাতালে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষা—

বালক বিদ্যালয়—

'আমাদের অঞ্চল ও আমার ছেলেবেলা' অধ্যায়ে আমাদের এখানে বনেশ্বরপুরে আমাদের তিনখানা গ্রামের নামে একটি উন্নতমানের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং আনুলিয়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে বলেছি।

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়টি সামান্য একটি পাঠশালা থেকে বহু বছর ধ'রে উন্নতির দিকে ক্রমবর্ধিত হয়ে, আজকের এই রূপ ধারণ করেছে। এই বিদ্যালয় যখন এম. ই. বা মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল, তখন কয়েক বছর আমি এই বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি বা সম্পাদক ছিলাম। তখন এই এম. ই. স্কুলকে জুনিয়র হাই স্কুল করার অর্থাৎ স্কুলকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীতে উন্নীত করার চেষ্টা করেছিলাম।

স্কুলে সম্পাদক থাকার আগে এবং পরেও অনেক দিন পর্যন্ত এই স্কুলের সঙ্গে আমার বরাবরেরই একটা যোগ ছিল। স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহে আমাদের অঞ্চলের ধনী ব্যক্তিদের কাছে দল বেঁধে ঘুরেছি। কখন কখন স্কুলে (অবৈতনিক ভাবে) শিক্ষকতাও করেছি।

বালিকা বিদ্যালয়—

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন আমাদের তিনখানা গ্রামের বয়োবৃদ্ধ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরা আনুলিয়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় বা বালিকাদের জন্য একটি পাঠশালা খুলে ছিলেন। শিক্ষক ছিলেন একজন। তাঁর বাড়ি ছিল মেদিনীপুরে।

এই শিক্ষক মশায় বাড়ি গেলে, কিংবা অসুখে পড়লে, আমি তখন বাড়িতে

থাকলে এই বালিকা বিদ্যালয়ে (অবৈতনিক ভাবেই) পড়িয়েছিও। একখানা ঘরের এই বিদ্যালয়টি ছিল ছিটেবেড়ার, ছাউনি ছিল খড়ের। কিছুদিন চলার পর হঠাৎ একরাত্রে এই খড়ের পাঠশালা ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানাভাবে পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেল। মেদিনীপুরের শিক্ষক মশায়ও চিরদিনের জন্য তাঁর দেশে চলে গেলেন।

এরপর আরও কয়েক বছর কেটে গেল। পূর্বোক্ত বয়োবৃদ্ধ বিদ্যোৎসাহীরা আবার একটা বালিকা পাঠশালা খুললেন। পাঠশালার নিজস্ব ঘর না থাকায়, একবার এখানে, একবার ওখানে এইভাবে পাঠশালা বসত। ছাত্রী সংখ্যা খুবই অল্প। তাদের যৎসামান্য বেতন, আর কারও কারও দেওয়া চাঁদায় কোন রকমে শিক্ষক মশায়কে কিছু কিছু দেওয়া হ'ত। তখন ঐ পাঠশালা ছিল একরূপ না চলারই মত।

ঠিক এই সময়টায় দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। দেশের স্বাধীন সরকার দেশে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারেও মন দিলেন। তখন সরকার মেয়েদের শিক্ষার জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ও অনুমোদন করতে লাগলেন। তবে সংখ্যায় নিতান্তই কম। সরকারের উপর মহলে প্রভাব থাকলে এবং জোর তদ্বির করতে পারলে, একটা স্কুলের অনুমোদন আদায় করা যায়, নইলে কোনই আশা নেই।

এই সময় লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে সরকারের ঐ উপর মহলে আমার একটু আধটু পরিচিতি থাকায়, বেশ কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর একটি বালিকা বিদ্যালয় অনুমোদন করাই। স্কুল হ'ল। স্কুলের জন্য একজন সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকও আনলাম। ইনি পূর্ববঙ্গের মানুষ—নাম ক্ষেত্রমোহন দাস ভৌমিক। এঁর শ্বশুরমশায় কলকাতায় আমার পরিচিত ছিলেন। ক্ষেত্রবাবুকে এনে আমার এক জ্ঞাতি দাদার বৈঠকখানায় তাঁর সপরিবারে থাকার ব্যবস্থাও করে দিলাম। এই ক্ষেত্রবাবু আজ আমাদের এ অঞ্চলের একজন স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন।

ক্ষেত্রবাবুকে আনার পরই একজন ধনী দাতাকে ধরি। ইনি কলকাতা-বাসী আনুলিয়ার বৈদ্যনাথ দাস।

পাঠশালার আগের শিক্ষক ম্যাট্রিক পাশ ছিলেন না বলে তাঁকে সরকার অনুমোদিত নতুন বিদ্যালয়ে আর রাখা গেল না। তবে এই সময় কলকাতার পি. এম. জি বা পোষ্টমাস্টার জেনারেলকে ধরে এখানে যে সাব পোষ্ট অফিস আনাই সুপারিশ করে তাঁকে তার পোষ্ট মাস্টার করানো হ'ল।

এরপর আনুলিয়ার রুক্মিনী মণ্ডলের দেওয়া জায়গায় এবং প্রধানতঃ বৈদ্যনাথবাবুর এবং আরও কারও কারও দেওয়া কিছু অর্থে বিদ্যালয় গৃহ গড়ে উঠল। স্কুলও এখানে চলে এল।

ক্রমে স্কুলের ক্লাস বাড়তে লাগল, একজন একজন করে শিক্ষকও নেওয়া চলল। বৈদ্যনাথবাবু বেশী টাকা দেওয়ায় তাঁর মায়ের নামেই বিদ্যালয়ের নামকরণ হ'ল।

এই বিদ্যালয়ের প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন এর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকলেও, পরে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় আর তেমন যুক্ত থাকতে পারি নি। তখন গ্রামের বিদ্যোৎসাহীরা এই বিদ্যালয়কে ক্রমশঃ বড় করে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। অবশ্য তখনও এই স্কুলের সঙ্গে একটা ভাল রকম যোগসূত্র আমার ছিলই।

নৈশ বিদ্যালয়—

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারও দেশের সার্বিক উন্নয়নে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করেন, সে সবের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্ক শিক্ষাও ছিল অন্যতম।

বাঙলায় সাক্ষরতা প্রচারে ও প্রসারে যিনি ছিলেন অন্যতম পুরোধা, বর্ণপরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা সেই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মশায়ের মৃত্যুর [redacted] শত বৎসর সম্প্রতি পূর্ণ হ'ল। এই সময় থেকেই, বিদ্যাসাগর মশায়কে স্মরণ করেই যেন পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও পশ্চিম বঙ্গের সমাজ সেবী মানুষরা পুরো উদ্যমে আগিয়ে এসেছেন দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্রত নিয়ে। এঁরা কাজে সফলতাও অর্জন করছেন।

স্বাধীনতা লাভের পরেই যখন নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান প্রথম শুরু হয়, তখন সরকারের পক্ষ থেকে এর পরিচালনার বা দেখাশুনার ভার ছিল জেলায় জেলায় ডিস্ট্রিক্ট সোসাল এডুকেশন অফিসার বা জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিকের উপর।

তখন সরকারের তরফ থেকে যে সব নৈশ বিদ্যালয় বা বয়স্ক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, সেই সব বিদ্যালয়ে একজন করে স্থানীয় কোন ব্যক্তি শিক্ষকতা করতেন। সেজন্য সরকার তাঁকে যৎসামান্য বেতন দিতেন। ঐ সব স্কুলে সরকার থেকে প্রথম পাঠ্য বই, স্লেট, পেনসিল, নানা ধরণের শিক্ষা সংক্রান্ত লেখা চার্ট, হ্যাসাক আলো, কেরোসিন, বাতি ইত্যাদি, কিছু আনুসঙ্গিক খরচও দেওয়া হ'ত। তখন আমাদের এখানে ট্রানজিস্টার রেডিও চালু হয় নি। তাই সংখ্যায় খুবই অল্প হলেও কোন কোন নৈশ বিদ্যালয়ে ব্যাটারি চালিত রেডিও দেওয়া হ'ত। আর সাধারণভাবে লোকশিক্ষা বা বয়স্ক শিক্ষার জন্য কোন কোন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে মাঝে মাঝে যাত্রা, কথকতা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা হ'ত। এর খরচ দিতেন সরকার।

তখন যে সব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নৈশ বিদ্যালয় বা বয়স্ক বিদ্যালয় চালাতেন, জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিকের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ থাকলে

তাঁরা শিক্ষকের বেতন পেতেন না বটে, তবে বই, স্লেট, পেনসিল, চার্ট ইত্যাদি পেতেন।

ঐ সময় আমাদের গ্রামে হাটতলায় আমিও একটি বয়স্ক বিদ্যালয় বা নৈশ বিদ্যালয় চালাতাম। আমাদের গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য যে ক্ষেত্রমোহন দাস ভৌমিককে শিক্ষক হিসাবে নিয়ে যাই, তিনিই সন্ধ্যার দিকে বয়স্ক বিদ্যালয়ে পড়াতেন। তাঁর বেতন দিতাম আমি নিজেই। প্রথম দিকে এই বিদ্যালয়ের জন্য বই, স্লেট, পেনসিল, হ্যারিকেন, কেরোসিন ইত্যাদি সবেরই ব্যয় বহন করতাম আমি। আমি নিজেও কখন কখন পড়াতাম।

আমাদের হাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক ছিলেন তখন মন্মথনাথ রায়। এই মন্মথবাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলে, পরে এই পরিচয় বন্ধুত্বের পর্যায়ে গিয়ে পোঁছলে এবং তিনি আমাদের কাজে সন্তুষ্ট হলে আমি আমার নৈশ বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষকের বেতন বাদে মন্মথবাবুর কাছ থেকে সকল সুযোগ সুবিধাই, এমন কি হ্যাসাক আলো, ব্যাটারি চালিত বুশ রেডিও পেয়েছিলাম। একবার যাত্রা করানোর জন্য কিছু টাকাও পেয়েছিলাম।

কিন্তু এত সব পেলে এবং আমাদেরও প্রবল উৎসাহ থাকলে কি হবে? আসল যারা বয়স্ক ছাত্র, তাদের নিয়মিত নৈশ বিদ্যালয়ে আনাই ছিল সব চেয়ে বড় সমস্যা। এই বয়স্ক ছাত্রদের প্রায় সকলেই ছিল, চাষী ও মুটে মজুর। এরা বর্ষার সময় মাঠে লাঙ্গল দেওয়া, রোয়া, নিড়েন দেওয়া প্রভৃতি নানা ধরণের চাষের কাজে ব্যস্ত থাকে, হেমন্তে ও শীতে এরা ফসল কাটা, ফসল তোলা নিয়েও ব্যস্ত। আর এজন্য খাটতেও হয় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। বছরের অন্যান্য সময়েও এদের কিছু না কিছু কাজ করতেই হয়। এদের সত্যিকারের অবসর থাকে খুবই কম। দিনের অত পরিশ্রমের পর রাত্রে এরা পড়তেই আসতে চায় না।

আমার বিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্ররা যাতে বিদ্যালয়ে নিয়মিত আসে, সেজন্য আমি হাটতলায় মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি কিনেও এদের খাইয়েছি। তবুও এদের নিয়মিত আনতে পারি নি।

এই নৈশ বিদ্যালয় চালানোর সময় গ্রামের এবং আশ পাশের গ্রামের অনেকের সহানুভূতি পেয়েছি, কিন্তু নৈশ বিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র আনার ব্যাপারে এঁরাও কিছু সাহায্য করতে পারেন নি।

প্রথম প্রথম উৎসাহে যে সব ছাত্র বিদ্যালয়ে এসেছিল, একটু আধটু শিখতে থাকলেও, ক্রমশঃ বাড়ির ও গৃহস্থালীর কাজের চাপে তাদের সে উৎসাহও কমে যেতে লাগল।

এইভাবে বেশ কিছুদিন বিদ্যালয় চালাবার পর মূলতঃ ছাত্রের অভাবেই বিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে হ'ল। তখন সরকারের দেওয়া রেডিও, হ্যাসাক ইত্যাদি সরকারের হাতে ফেরৎ দিয়ে এলাম।

পাঠাগার : পাঠাগার আন্দোলন ও বই মেলা—

১৩৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন পাস হওয়ার ফলে এখন সারা পশ্চিম বঙ্গে সরকার পোষিত হাজার হাজার গ্রামীণ পাঠাগার, শহর গ্রন্থাগার ইত্যাদি হয়েছে। এই সব পাঠাগারের কর্মীরা সরকার থেকে ভাল মতই বেতন পেয়ে থাকেন।

এই সরকার পোষিত পাঠাগারগুলি বাদে হাজার হাজার—বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পরিচালিত—পাঠাগারও দেশে রয়েছে। সব দিক থেকেই এই সব পাঠাগারের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কোন রকমে চলে।

কয়েকজন বিদ্যোৎসাহীকে নিয়ে আমি একসময় গ্রামের হাটতলায় একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেছিলাম। আমাদের গ্রামের একজন শিক্ষক মশায় বিকালে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিনা বেতনে কাজ করতেন, পাঠকদের বই লেন দেন করতেন। বইএর সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না।

এই পাঠাগার তখন অনেকদিন ভালই চলেছিল।

গ্রাহকদের মাসিক চাঁদা এবং পাঠাগার পরিচালক সমিতির সদস্যদের বিশেষ চাঁদা ছাড়া একবার সরকারের কাছ থেকে সাত শ টাকা বই কেনার জন্য পেয়েছিলাম বা আদায় করেছিলাম। তখন বইএর দাম এখনকার মত আকাশ ছোঁয়া ছিল না। ঐ সাতশো টাকাতেই তখন অনেকগুলো বই কিনতে পেরেছিলাম। অনেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও বই সংগ্রহ করতাম।

তখন সাধারণতঃ আমাদের হাওড়া জেলার এক পাঠাগারের সঙ্গে অন্য পাঠাগারেরও যোগাযোগ ছিল। এই সময়েই আমরা আমাদের জেলার বেশ কয়েকজন পাঠাগার পরিচালক মিলে 'হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ' করেছিলাম। আমাদের সেই পাঠাগার সংঘের কর্মীদের ফটো সহ যে সংবাদ তখন আমরা ১৩৫৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'র সাময়িকীতে প্রকাশ করেছিলাম, তা এখানে উদ্ধৃত করছি—

হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন

সম্প্রতি হাওড়া গার্লস কলেজে হাওড়ার প্রায় ১০০ পাঠাগারের প্রতিনিধিদের লইয়া হাওড়া জেলা পাঠাগার সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। হাওড়ার জেলা শাসক শ্রীরণজিৎ কুমার রায় আই-সি-এস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এম. এল. এ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-গ্রন্থাগারিক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। হাওড়া জেলার সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীমন্মথনাথ রায়ের সহায়তায় সম্মেলনটি বিশেষ ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হয়। সম্মেলনে মোট ২৪ জন সদস্য লইয়া বর্তমান বৎসরের জন্য একটি কার্যকরী

সমিতি গঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে সমিতির কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। সভাপতি শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় এম. এল. এ. সহ-সভাপতি—অধ্যক্ষ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অমরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় সহ-সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, শ্রীহেমন্ত কুমার ভট্টাচার্য, কোষাধ্যক্ষ—শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়।

এই সময় আমরা একবার আমাদের পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে জেলার গ্রন্থাগারিকদের এক সপ্তাহ ধরে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা করেছিলাম।

এ সম্বন্ধেও ১৩৫৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় সাময়িকীতে যে সংবাদ প্রকাশ করেছিলাম, তা এই—

হাওড়ায় গ্রন্থাগারিক শিক্ষা সপ্তাহ

হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘের উদ্যোগে গত ৪ঠা জানুয়ারি হইতে ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত এক সপ্তাহব্যাপী হাওড়া গার্লস কলেজে গ্রন্থাগারিক শিক্ষা ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। হাওড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় দেড়শত গ্রন্থাগার ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকদিগের অধ্যাপনা ব্যতীত বিভিন্ন দিনের সভায় পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সভাপাল শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি ডঃ ডি. এম. সেন, জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ডঃ কেশবন্, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-গ্রন্থাগারিক সুবোধ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সমাজ শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক নিখিলরঞ্জন রায়, হাওড়া জেলার জনশিক্ষা প্রাধিকারিক মন্মথনাথ রায় ও বিখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল, মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ প্রভৃতি গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

যে দিনের সভায় বনফুল ও মনোজ বসু গিয়ে ছিলেন, কলকাতা থেকে সেদিন আমিই তাঁদের আমাদের ঐ সভায় নিয়ে গিয়ে ছিলাম। আগে 'বনফুল' প্রবন্ধে আমি সে কথা বলেছি।

আমাদের এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সময় আমরা জেলার বিভিন্ন স্থানের পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব ইত্যাদিতেও যোগ দিতাম। এইরূপ একটি সংবাদ আমরা ১৩৬০ সালের ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষের সাময়িকীতে প্রকাশ করে ছিলাম। সংবাদটি এই—

কবি নবকৃষ্ণ স্মৃতি উৎসব

সম্প্রতি কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের জন্মস্থান হাওড়া জেলার নারিট গ্রামে তাঁহার স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই সঙ্গে নারিট নবকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার

এবং নারিট বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রেরও বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়া ছিলেন উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক শ্রীহীরালাল রায়। ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম. এল. এ, পশ্চিম বঙ্গ সমাজ শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, হাওড়া ও হুগলী জেলার সমাজ শিক্ষার প্রাধিকারিক শ্রীমন্মথনাথ রায়, সাহিত্যিক শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়, শ্রীতুলসী দাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এই সংবাদের সঙ্গে প্রকাশিত ছবির ক্যাপশন ছিল—কবি নবকৃষ্ণ স্মৃতি উৎসবে সমবেত সুধীবৃন্দ। এখানে প্রকাশিত সংবাদে মন্মথনাথ রায়কে হাওড়া ও হুগলী জেলায় সমাজ শিক্ষার প্রাধিকারিক বলা হয়েছে। কারণ, মন্মথবাবু ঐ সময় হাওড়া ছাড়া হুগলী জেলারও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের ভার নিয়েছিলেন।

আমাদের এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সময় আমরা হাওড়ায় বইএর প্রদর্শনী এবং বই মেলাও করেছি। আমাদের এই সব কাজে হাওড়ার ডি. এস. ই. ও-(ডিস্ট্রিক্ট সোসাল এডুকেশন অফিসার) বা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীমন্মথ নাথ রায় ছিলেন আমাদের প্রধান সহায়ক ও উপদেষ্টা।

কিছুদিন হ'ল পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত জেলার ডি. এস. ই. ও.-র হাত থেকে লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার বিভাগটি নিয়ে পৃথক ডি. এল. ও. বা ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি অফিসারের পদ সৃষ্টি করে তাঁর হাতে দিয়েছেন। সমাজশিক্ষা ডি. এস. ই. ও.-র হাতেই আছে।

আমাদের সেই সময়কার গ্রন্থাগার আন্দোলনে বইমেলা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে আমাদের বন্ধু-স্থানীয় হাওড়ার সেই সময়কার ডি. এস. ই. ও. ঐ মন্মথবাবু অনেক দিন পরে আমাকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর সেই চিঠিটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

পরম প্রীতিভাজনেষু,

দীর্ঘকাল আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সংঘটিত হয় নি। জানি না এই ব্যবধান আমাদের মধ্যে মানসিক কোন ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে কিনা।

একটি বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনে আপনার জেলা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জানি না আপনার স্মরণ আছে কিনা আন্দোলনের একটি বিশেষ অঙ্গ 'বইমেলা', হাওড়াতেই প্রথম বইমেলার আয়োজন হয়েছিল। ক্রমাগত কয়েক বৎসর এই মেলা চলেছিল।

জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ হাওড়াতেই প্রথম স্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সত্যকার ইতিহাসে হাওড়ার অবদান উল্লেখ যোগ্য। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আপনার সঙ্গে একদিন মিলিত হতে চাই।

কুশলকামনাকারী শুভাথী

মন্মথ রায়

মন্মথবাবু যদিও আজ অশীতিপর বৃদ্ধ, তবুও তিনি শরীরে ও মনে বেশ সুস্থ। আমাকে লেখা তাঁর এই চিঠিটি আমি যত্ন সহকারে রেখে দিয়েছি।

মন্মথবাবু যে বলেছেন—'হাওড়ার অবদান উল্লেখযোগ্য', এই 'হাওড়ার অবদান' হ'ল আমাদের হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি এসোসিয়েশন বা হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘের অবদান।

আমাদের বে-সরকারী সংস্থা হাওড়া জেলা পাঠাগার সংঘ বা হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি এসোসিয়েশন-এর পরিচালক সমিতির কোন পদে মন্মথবাবু সরকারী অফিসার হিসাবে না থাকলেও তিনি ছিলেন আমাদের জেলা পাঠাগার সংঘের প্রধান উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক।

আজ কলকাতা-সহ সারা পশ্চিম বঙ্গের সর্বত্রই নানা সময়ে বই মেলা হচ্ছে, এই সব মেলার অনেক আগেই আমরা—হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের কর্মীরা—হাওড়ায় সর্বপ্রথম বইমেলা শুরু করি। আমাদের এই বই মেলা তখন বেশ কয়েক বছর চলেছিল।

হাওড়ার এই বইমেলা প্রসঙ্গে ১.২.১৩৫৯ তারিখের 'দেশ' পত্রিকার বই মেলা সংখ্যায় সুনীল দাস তাঁর 'ঝাঁকা মুটে থেকে বইমেলা' প্রবন্ধে লিখেছেন—'আক্ষরিক অর্থে বইমেলা যার জন্ম হয়েছে এই শতকের পঞ্চাশের দশকে, কলকাতায় নয় হাওড়ায় ১৯৫৭ সালে। এই মেলার উদ্যোক্তা ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের গোষ্ঠবিহারি চট্টোপাধ্যায়। প্রথম মেলা বসে হাওড়া গার্লস স্কুলে, কয়েক বছর পর স্থান পরিবর্তন করে সে মেলা উঠে আসে হাওড়া গার্লস কলেজে, পরে জেলা গ্রন্থাগার গৃহ হয়ে খোদ হাওড়া শহরে। শুধু হাওড়াবাসীরা কেন, কলকাতা-সহ আশপাশের বহু গ্রন্থপ্রেমী এই মেলায় এসেছেন। কলকাতার বইমেলা শুরু হয়েছে এর অনেক পরে ১৩৫৯ সালে, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে।'

সুনীলবাবু লিখেছেন—হাওড়ার বই মেলার উদ্যোক্তা ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের গোষ্ঠবিহারি চট্টোপাধ্যায়। গোষ্ঠবাবু ছিলেন হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বা সম্পাদক। সম্পাদক হিসাবে এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ পরিশ্রম তো করবেনই, তাছাড়া এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে বই মেলা করা এবং সেই বই মেলাকে সার্থক করে তোলার ব্যাপারে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি এসোসিয়েশনের বহু সদস্যই, বিশেষ করে কার্যকরি

সমিতির সদস্যবৃন্দ, আরও বিশেষ করে দুই সহকারী সম্পাদক পরিশ্রম করে ছিলেনই। আর আমাদের পাঠাগার সংঘের উপদেষ্টা হাওড়ার ডি. এস. ই. ও. মন্মথ রায় মশায়ও তখন এ ব্যাপারে অনেক কাজ করেছিলেন।

সুনীলবাবু লিখেছেন—হাওড়ার বইমেলা শেষে বসেছিল 'পরে জেলা গ্রন্থাগার গৃহ হয়ে খোদ হাওড়া শহরে।' হাওড়া গার্লস স্কুল (বর্তমান নাম হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুল), হাওড়া গার্লস কলেজ (বর্তমান নাম হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ) এবং হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার গৃহ—সবই 'খোদ হাওড়া শহরে' অবস্থিত। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানই পরস্পর হাঁটাপথে দু'মিনিটেরও কম পথ ব্যবধানে অবস্থিত।

সড়ক—

আমাদের হাওড়া জেলায় আগেকার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের (বর্তমান নাম জেলা পরিষদ) অধীনে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটা রাস্তা আছে, নাম—হাওড়া-আমতা রোড। আমার যৌবনকাল পর্যন্ত দেখেছি—এই রাস্তায় কেবল হাওড়া শহর থেকে প্রায় ১০/১২ কিলোমিটার ডোমজুড় পর্যন্ত অর্থাৎ এই সমস্ত রাস্তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাকা রাস্তা বা পীচ রোড ছিল এবং এই রাস্তায় নিয়মিত বাস যাতায়াত করতো। হাওড়া-আমতা রোডের বাকি বেশী অংশটাই ছিল কাঁচা রাস্তা বা মাটির রাস্তা। মাটির রাস্তা হলেও এই রাস্তায় কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পয়সায় মাটি পড়তে কখনো দেখিনি।

হাওড়া শহরের পর থেকে এই হাওড়া-আমতা রোডের একেবারে গা দিয়েই মুন্সিরহাট পর্যন্ত অর্থাৎ মোট রাস্তার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তখন চলতো মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেল। তারপর এই রেল পথ হাওড়া-আমতা রোড ছেড়ে মুন্সিরহাটের পর থেকে মাজু ইত্যাদি গ্রাম হয়ে বিশাল কেদোর মাঠের পাশ দিয়ে কতকটা চক্রপথে আমতায় গিয়ে পেঁছিত।

হাওড়া-আমতা রোডের শেষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় ১০/১১ কিলোমিটার মুন্সিরহাট থেকে আমতা পর্যন্ত রাস্তাটা সিধা। এই রাস্তা কোথাও গ্রামের মধ্য দিয়ে, কোথাও বা কেদোর মাঠের মধ্য দিয়ে আমতায় গিয়ে পেঁচেছে।

মুন্সিরহাট থেকে ৭ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং আমতা থেকে ৩/৪ কিলোমিটার উত্তরে এই রাস্তার গায়েই আমাদের গ্রাম আনুলিয়া। আমাদের গ্রামের দক্ষিণে এই রাস্তার দু পাশে কোন গ্রাম নেই। শুধু কেদোর মাঠ। তাই এখানে এই রাস্তাও গেছে ঐ কেদোর মাঠের মধ্য দিয়েই।

আগে বলেছি, এই রাস্তায় মাটি পড়তে আমি কখনো দেখিনি, তারফলে অনেককাল আগেকার এই বাঁধ বা রাস্তা উঁচু থাকলেও ক্রমশঃ ক্ষয়ে ক্ষয়ে বেশ নীচু হয়ে গিয়েছিল। কোথাও কোথাও রাস্তা পাশের কেদোর মাঠের সমান

স্তরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। এক জায়গায় তো কেদোর মাঠের জমির স্তরের চেয়েও নীচু হয়ে গিয়েছিল।

কেদোর মাঠের জল নিকাশের সুব্যবস্থা না থাকায় তখন প্রায় প্রতি বৎসরই বর্ষার সময় এই বিরাট মাঠ ডুবে গিয়ে সমুদ্রবৎ হয়ে যেত। তখন আমাদের গ্রামের পর দেড় কিলোমিটারের মত এই রাস্তা ডুবে যেত। রাস্তায় জল হ'ত এক হাঁটু থেকে এক কোমর পর্যন্ত। আর ঐ সব চেয়ে নীচু জায়গাটায় জল হ'ত আরও বেশী। এই জায়গাটায় মাঠের জল শুকিয়ে যাওয়ার পরেও পাশের খালের জলের সঙ্গে একাকার হয়ে মাঘ-ফাল্গুন মাস পর্যন্তও থাকতো।

বর্ষা ও শরৎকালে এই দেড় কিলোমিটার জলপথটা আমাদের যাতায়াত করতে হ'ত শালতিতে বা যাত্রীবাহী এক প্রকারের ছোট নৌকায়। ভাড়া ছিল—এক পয়সা, বড় জোর দেড় পয়সা। তখন আধ পয়সা চালু ছিল এবং ৬৪ পয়সায় এক টাকা হ'ত।

কেদোর মাঠের পর হাওড়া-আমতা রোডের শেষ বাকি অংশটা কয়েকটা গ্রামের মধ্য দিয়ে গেলেও, বর্ষাকালে ঐ সব গ্রামের মধ্যেও কোথাও কোথাও পথের পাশের পুকুরের জমা জলে রাস্তা ডুবে যেত।

এই ছিল বর্ষাকালে এবং বর্ষাকালের ক'মাস পর পর্যন্ত আমাদের এখানকার বড় রাস্তা বা রাজপথের অবস্থা। অন্য সময়ে অথাৎ গ্রীষ্মে ও শীতে এই প্রধান পথে গরুর গাড়ী যাতায়াতের জন্য পথে জমতো ধুলোর রাশি।

স্বাধীনতা লাভের কিছুদিন পরের কথা। ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু তখন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। তিনি একবার উৎসাহী হয়ে হাওড়া-আমতা রোড দেখবার জন্য নিজের মোটরে করে ডোমজুড়ের পরেও সামান্য কিছুটা মাটির পথও দেখে এসেছিলেন। দেখে এসে তিনি তাঁর সরকারের রাস্তা বিভাগকে বলেন—ডোমজুড়ের পর থেকে আমতা পর্যন্ত বাকি রাস্তাটা সমস্তই পাকা হোক্, হওয়া দরকার।

ডঃ কাটজুর এই পথ পরিদর্শন এবং এই পথ সম্বন্ধে তাঁর অভিমতের খবরটা তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরটা পড়ে আমি তখনই হুগলীর চুঁচুড়ায় পি. ডবলিউ. ডি. বিভাগে এবং পরে হাওড়া কোর্টের কাছে হাওড়ার পি. ডবলিউ. ডি. বিভাগেও খোঁজ নিই। কয়েকদিন যাতয়াত করে জানতে পারি—হাওড়া থেকে আমতা পর্যন্ত রাস্তা পাকা হবে ঠিকই, তবে কিন্তু ঠিক হাওড়া-আমতা রোড নয়। এই রাস্তার মুন্সিরহাট পর্যন্ত পাকা হবে। মুন্সিরহাটের পর মার্টিন রেলের গা দিয়ে যে রাস্তা মাজু প্রভৃতি গ্রাম হয়ে আমতায় গিয়ে ঠেকেছে, সেই রাস্তাটা পাকা হবে।

আর এও শুনলাম, মাজুর পরে মার্টিন রেলের যে পানপুর স্টেশন আছে তার সংলগ্ন ভাণ্ডারগাছা গ্রামের অধিবাসী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেভিনিউ

বোর্ডের মেম্বার, অত্যন্ত প্রভাবশালী উচ্চপদস্থ অফিসার সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আই. সি. এস-এর আগ্রহেই রাস্তাটা এদিক দিয়ে হবে। আরও শুনলাম—সত্যেন্দ্রনাথবাবুর বৈবাহিক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই রাস্তা বিভাগের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার। অতএব মুন্সিরহাটের পর থেকে মার্টিন রেলের গায়ের রাস্তাই যে পাকা হবে এটা একরূপ স্থির। বুঝলাম—কলকাতা থেকে মোটরে সত্যেন-বাবুর বাড়ি যাতায়াতের সুবিধার জন্যই পীচ্ রোডটা হয়ত এদিক দিয়ে হচ্ছে।

এই খবর শুনে খুবই দমে গেলাম। তবে একেবারে হতাশ হলাম না। মার্টিন রেল থাকায় মুন্সিরহাটের পর থেকে মাজু, পানপুর, ভাণ্ডারগাছা প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের যাতায়াতে সুবিধা রয়েছে। অথচ আমাদের অঞ্চলের অর্থাৎ মুন্সিরহাট থেকে আমতা—হাওড়া-আমতা রোডের এই অঞ্চলের লোকদের যাতায়াতে কষ্টের শেষ নেই। বর্ষায় যেমন এ অঞ্চলের অনেকটা পথ জল ভাঙতে হয়, অন্য সময়ে এ দিকের প্রধান রাস্তা হিসাবে মালবাহী গরুর গাড়ী-ইত্যাদি চলায় মাটির পথ প্রচুর ধূলিময় হয়।

তাই রাজ্যপালের প্রস্তাবিত হাওড়া-আমতা রোডের শেষাংশ অর্থাৎ মুন্সির-হাট থেকে আমতা পর্যন্ত রাস্তাটা যাতে আমাদের দিক দিয়েই যায়, তার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম। এজন্য আমার সমর্থনে প্রথমে এ অঞ্চলের লোকদের গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করলাম। তারপর ঐ গণস্বাক্ষর সহ আমার একটি আবেদন পত্র একেবারে খোদ রাস্তা বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মশায়ের হাতে দিলাম।

রাস্তা বিভাগের অর্থাৎ পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী তখন বিমলচন্দ্র সিংহ। কিন্তু তিনি অসুস্থতার জন্য তখন সুইজারল্যাণ্ডে। তাঁর কাজ দেখেন সেচ-মন্ত্রী ভুপতি মজুমদার।

ভূপতিবাবু তাঁর ভাই শৈলেশ মজুমদারকে যে 'সৈনিক' সাপ্তাহিক পত্রিকা করে দিয়েছিলেন, আমি তখন সন্ধ্যার দিকে পার্ট টাইম হিসাবে ঐ পত্রিকায় কাজ করি। ভূপতিবাবু একরূপ রোজই সন্ধ্যার সময় সৈনিক অফিসে আসেন। এসে আমাদের সঙ্গে নানা গল্প করেন। বিশেষ পরিচিত ভেবে অনেক আশা নিয়েই তাঁর হাতে রাস্তার দরখাস্তটা দিয়ে রাস্তা সম্বন্ধে সকল কথাই তাঁকে বলি। শুনে তিনি বললেন—তোমাদের ওদিক দিয়ে রাস্তা হবে না, সত্যেনের বাড়ির দিক দিয়েই রাস্তা হবে। আমি সত্যেনের বাড়ি গেছি। সত্যেন আমার বাল্য বন্ধু। হুগলিতে আমরা একসঙ্গে পড়েছি। ওর বাবা তখন হুগলী কোর্টে ওকালতি করতেন।

দেখলাম পূর্তমন্ত্রী স্বয়ং ভূপতি মজুমদারও আমার বিপক্ষে। অগত্যা আমি মন্ত্রীর আশা ছেড়ে আলিপুরে ভবানী ভবনে সুপারিনটেনডেণ্টিং ইঞ্জিনীয়ার রোড প্ল্যানিং, সুপারিনটেনডেণ্টিং ইঞ্জিনীয়ার রোড কনসট্রাকশন প্রভৃতির কাছে যাতায়াত করতে থাকি। তাঁরা একদিন আমাকে পরিষ্কার বললেন—মন্ত্রী ধরতে পারবেন? তাহলেই আপনার দিক দিয়ে রাস্তা হবে।

নচেৎ নয়। কারণ, আমাদের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের নির্দেশ মার্টিন রেলের গা দিয়েই রাস্তা হবে।

বড় চিন্তায় পড়লাম। কি করা যায় কেবলই ভাবছি। ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই বিমল সিংহ মশায় সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে এসে নিজের দপ্তর, পূর্তবিভাগের ভার নিলেন।

এই সময় একদিন আমি আমাদের ভারতবর্ষ পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে অর্থাৎ বিমলবাবুদের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। বিমলবাবু কংগ্রেস দলের মন্ত্রী, আমাদের ফণিদাও কংগ্রেসের এম. এল. এ.। তাছাড়া বিমলবাবু ছিলেন আমাদের ভারতবর্ষ পত্রিকার নিয়মিত লেখক। আমি তখন ভারতবর্ষ পত্রিকায় একটানা লিখে চলেছি। বিমলবাবু আমার লেখার সঙ্গেও কিছুটা পরিচিত ছিলেন। সেদিন বিমলবাবুর কাছে যাবার সময় আমার বক্তব্য দরখাস্ত আকারেই লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। লেখাটা তাঁকে পড়ে শোনালাম, শেষে লেখাটা তাঁর হাতে দিলাম।

সব শুনে বিমলবাবু বললেন—ওদিকে ট্রেন রয়েছে, ওদিকে পাকারাস্তা হবে কেন? রাস্তাটা আপনাদের এদিক দিয়েই তো হওয়া উচিত।

আমি তখন সত্যেনবাবুর প্রভাব, তাঁর বৈবাহিকের ক্ষমতা সমস্তই বিমলবাবুকে বললাম। শুনে বিমলবাবু বললেন—আচ্ছা দেখছি, তবে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান, রাস্তা আপনার দিক দিয়েই হবে।

বিমলবাবু তাঁর এই কথা রেখেছিলেন। তিনি আমার আবেদনে মুন্সির-হাটের পর থেকে রাস্তাটা মার্টিন রেলের পাশে না দিয়ে আমাদের দিকে করে দিয়ে ছিলেন।

হাওড়া-আমতা রোডের ডোমজুড়ের পর থেকে বাকি অংশটাও পাকা রাস্তা হবে, স্থির হয়ে যাওয়ায়, কিছুদিন পরে কলকাতার এক ভদ্রলোক, এই রাস্তার ব্যাপারে আমারও কিছুটা যোগাযোগ আছে জেনে, এক রবিবার আমার গ্রামের বাড়িতে এসে হাজির। এসে আমাকে বললেন—আমি একজন গবর্ণমেন্ট কনট্রাকটর। হাওড়া-আমতা রোডের জন্য যে ইটের প্রয়োজন, সেই ইট দেওয়ার অর্ডারটা আমি পেয়েছি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কোথাও সুবিধামত জমি পাচ্ছি না যে ঐ অত ইট তৈরি করাই। আপনি অনুগ্রহ করে আপনাদের এখানে কোথাও যদি একটা বেশ বড় জমি দেখে দেন তো বড় উপকার হয়। সেই জমিটা কিনে সেখানে ইট তৈরি করাই।

এই ইটের কনট্রাকটরের বিশেষ অনুরোধে এখন আবার উপযুক্ত জমির খোঁজে লাগতে হ'ল। আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমে হাঁটা পথে মিনিট

তিনেকের পথ দূরে কেদোর মাঠে এক ব্যক্তির এক লক্তে ১৬ বিঘায় একটা জমি ছিল। জমির যিনি মালিক তাঁর বাড়ি ছিল আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে পাটখালি গ্রামে। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁর বাড়িতে গেলাম। হাওড়া শহরে শালখিয়ায় তাঁর চুণ-শুরকির দোকান। তিনি শালখিয়ায় তাঁর দোকানে একদিন দেখা করতে বললেন। আবার গেলাম সেখানে। এইভাবে কয়েকদিন যাতায়াতের পর তিনি একদিন তাঁর ঐ জমি বিক্রি করবেন বলে মত দিলেন।

পরে ইটের কনট্রাকটর ঐ জমি কিনে নিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বিরাট এক ইটখোলার কাজও শুরু হয়ে গেল। এই সময় কনট্রাকটর আবার একদিন আমাকে বললেন—দাদা, আমি তো কলকাতায় থাকি। সেখান থেকে প্রতিদিন ঠিক সময়ে এসে এই ইটখোলার কাজ দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি অনুগ্রহ করে আমার ইটখোলার জন্য আপনার এই অঞ্চলের লেখাপড়া জানা কোন এক ভদ্রলোককে যদি ম্যানেজার ঠিক করে দেন তো বড় বাধিত হই।

তখন আমি আমাদের পাশের গ্রাম বানেশ্বরপুরের বিশ্বাসী ও সৎ, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক বলাইলাল সেনাপতিকে ঐ ইটখোলার ম্যানেজার করে দিলাম। শুধু এই নয়, একবার এমনও হয়েছে, ইটখোলায় ইট পোড়ানোর জন্য কয়লা নেই, ঐ সময় আমাদের বাড়ির ইট পোড়াবার জন্য যে কয়লা ছিল, সেই কয়লাও এঁদের ধার দিয়েছিলাম। পরে এঁরা সে কয়লা শোধ দেন।

যাক্, আমার অনুরোধে পূর্তমন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ মশায় তখন সঙ্গত বিবেচনা করেই আমাদের অঞ্চলের এই রাস্তাটা করে দিয়েছিলেন।

পরে শুনেছি, সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি মশায় মুন্সিরহাটের পর থেকে মার্টিন রেলের গা দিয়ে পীচ রোড করাতে না পেরে হাওড়া-উলুবেড়িয়া রোডের রানীহাটি থেকে আমতা পর্যন্ত একটা পীচ রোড করান। ঐ রাস্তাটা তাঁর বাড়ির কাছ দিয়েই গেছে। তখন এই দলাদলির ফলেই সত্যেনবাবু নিজের প্রভাবে এই নতুন পাকা রাস্তাটা করিয়ে ছিলেন। এটা ভালই বলতে হবে। তবে এই রানীহাটি-আমতা পথ দিয়ে গিয়ে দেখেছি—রাস্তা হওয়ার জন্য রাস্তার দু পাশে বহু লোকের বহু ধান জমি চিরতরে চলে গেছে। যাক্, তবুও এই পাকা রাস্তা বা বাস চলাচলের রাস্তা হওয়ায় যে লোকের মহা উপকার হয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। বিশেষ করে মার্টিন রেল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই উপকারটা আরও বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

ডাকঘর—

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকারের ডাক বিভাগ স্থির করেন, কাজের সুবিধার জন্য গ্রামাঞ্চলের বড় পোস্ট অফিসের অধীনে দু একটা করে ছোট

ছোট সাব পোষ্ট অফিস খোলা হবে। এই খবরটা জানতে পেরেই আমি তখনই আমাদের অঞ্চলে একটা সাব পোষ্ট অফিস করার জন্য কলকাতায় পোষ্ট মাস্টার জেনারেলের কাছে দরখাস্ত করলাম। শুধু দরখাস্তই নয়, এজন্য ধরাধরি এবং ঘোরাঘুরিও করতে লাগলাম। আমাদের পোষ্ট অফিস তখন আমতা। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে। আমি চাইলাম, আমতা পোষ্ট অফিসের অধীনে আমাদের অঞ্চলে একটা সাব পোষ্ট অফিস হোক্।

এ নিয়ে উপর মহলে রীতিমত ধরাধরি ও তদ্বির করার ফলে আমার আবেদন যথা সময়ে মঞ্জুর হ'ল এবং আমার গ্রাম আনুলিয়ার নামে ঐ পোষ্ট অফিসটি হ'ল।

আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে জেলা বোর্ডের বড় রাস্তার গায়ে আমার এক আত্মীয়র টিনের ছাওয়া ও টিন দিয়ে ঘেরা এবং মেঝে সিমেণ্ট করা একটি পরিত্যক্ত দোকান ঘর ছিল। সেই ঘরেই প্রথম 'আনুলিয়া ডাকঘর' হ'ল। ডাকঘরের জন্য আমিই চেয়ার, টেবিল, কাঠের বাক্স ইত্যাদি সংগ্রহ করলাম। এরপর আমতা পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার মশায়কে বলে আমাদের গ্রামেরই একজনকে এখানে পোষ্ট মাষ্টার এবং গ্রামের আর একজনকে পিওন নিয়োগ করানো হ'ল।

এরপর আমার চিন্তা হ'ল—পোষ্ট অফিসে চিঠিপত্র এবং মণি অর্ডারে টাকা পয়সা ইত্যাদি না এলে গেলে আমাদের এই নতুন পোষ্ট অফিস চলবে কি করে? এ সব না হ'লে তো পোষ্ট অফিস আপনা হতেই উঠে যাবে!

এই চিন্তা করে ঐ সবেরও একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা করলাম। যেমন—আমি তখন ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় কাজ করি। আমাদের এই কাগজ গ্রাহকদের কাছে পাঠাবার জন্য এবং লেখক ও গ্রাহকদের কাছে চিঠিপত্র লেখার জন্য প্রতি মাসে প্রচুর স্ট্যাম্প ও পোষ্ট কার্ড লাগে।

আমি দু এক দিন ছাড়াই বাড়ি গিয়ে আমাদের নতুন পোস্ট অফিস থেকে নিজের টাকায় ঐ সব স্ট্যাম্প ও পোষ্ট কার্ড কিনে এনে ভারতবর্ষ অফিসে দিতাম এবং পরে সেখান থেকে টাকাটা নিতাম। ঐ সময় আমার টাকায় আমাদের অঞ্চলের তিন জনের নামে, কলকাতা থেকে তিনটি দৈনিক পত্রিকা যাতে প্রতি দিন ডাকে যায়, তারও ব্যবস্থা করে ছিলাম। আমাদের গ্রামের কলকাতাবাসী ধনী বৈদ্যনাথ দাসের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে কলকাতার ও গ্রামের কয়েকজনের কাছে দিয়েছিলাম। তারা সেই টাকা নিয়ে কেউ গ্রামের নতুন ডাকঘর থেকে মণি অর্ডার করতো, আবার কেউ বা কলকাতা থেকে আমাদের গ্রামের কারও কাছে মণি অর্ডার করতো। এইভাবে নতুন ডাকঘর থেকে মণি অর্ডার যেত, আবার নতুন ডাকঘরে মণি অর্ডার আসতো। নতুন ডাকঘরকে স্থায়ী করার

জন্য তখন বেশ কিছু দিন এইরূপ নানা পন্থা অবলম্বন করেছিলাম। গ্রামের অনেককে চিঠিপত্র লেখার কথাও বলতাম। আর নিজে ত লিখতামই।

এইভাবেই আমাদের নতুন ডাকঘর টিকে গেল। এই ডাকঘর এখন আগের জায়গা থেকে উঠে এসে আনুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের বাইরের একটা অংশে স্থাপিত হয়েছে।

এখন আমাদের পাশাপাশি শুধু তিনখানা গ্রামেই একটি বড় হাসপাতাল, একটি খুবই উচ্চ মানের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, একটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, একটি জুনিয়ার হাই স্কুল, গোটা কয়েক প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারী সাহায্য পুষ্ট একটি গ্রামীণ পাঠাগার, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, পঞ্চায়েত অফিস, সমবায় বিপনন কেন্দ্র থাকায়, গ্রামের হাটতলায় এবং তার আশপাশে নানান্ ধরণের অসংখ্য দোকান হওয়ায়, আর এ অঞ্চলে লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং শিক্ষার প্রসার হওয়ায়—আমাদের সেদিনের সেই নতুন ডাকঘর আজ সর্বদাই ব্যস্ত ও কর্মচঞ্চল ডাকঘরে পরিণত হয়েছে।

আরও কয়েকটি ছোট খাট কাজ—

গ্রাম সেবা বা গ্রামের কাজ নিয়ে যখন খুব মত্ত ছিলাম, সেই সময় আমাদের এখানে হাটতলায় একটা সমবায় বিপনন কেন্দ্র খোলার চেষ্টা করে ছিলাম। কিন্তু পারি নি। মাঝখান থেকে এজন্য কাগজপত্র ছাপানো, কিছু জিনিসপত্র কেনা ইত্যাদিতে যে প্রাথমিক অর্থব্যয় হয়েছিল, তার অর্থদণ্ড আমাকেই দিতে হয়েছিল।

আমাদের পাশাপাশি তিনখানা গ্রামের নামে তখন একটা 'আনুলিয়া, রামচন্দ্রপুর ও বানেশ্বরপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি'ও করেছিলাম।

গুরুসদয় দত্ত তাঁর ব্রতচারীদের একটা 'স্লোগান' দিয়েছিলেন—চল্ আয় কচুরি নাশি। ঐ রাক্ষসী বাঙ্গলা দেশেয় দিচ্ছে গলায় ফাঁসি।

কচুরি পানার বনে মশা জন্মায়, তাই তখন আমাদের এই পল্লীমঙ্গল সমিতির কর্মীরা নিজেরাই এ অঞ্চলের কয়েকটা বড় পুকুরে বহু কাল থেকে জমে থাকা পানা তুলে পুকুর পরিষ্কার করে দিয়ে ছিলাম।

তখন আমাদের পল্লীমঙ্গল সমিতির কর্মীরা নিজেরাই মাটি কেটে, মাটি বয়ে এখানকার কয়েকটা ছোটখাট রাস্তাও মেরামত করেছিলাম।

‘নিখাকী মায়েদের’ ২০/৪০ বছর অনাহারে থাকার রহস্য বেফাঁস

১৯৫৩ সালে কলকাতার ইণ্টালী অঞ্চল থেকে প্রকাশিত তখনকার বাংলা দৈনিক ‘সত্যযুগ’ পত্রিকায় আমার একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। আমার প্রবন্ধ নিয়ে বিভাগীয় সম্পাদক প্রবন্ধের নাম করণ করেছিলেন—‘নিখাকী মায়েদের ২০/৪০ বছর অনাহারে থাকার রহস্য বেফাঁস।’ আমি প্রবন্ধের নাম ‘নিখাকী রহস্য’ না কি দিয়েছিলাম আজ আর মনে নেই। যাই হোক্, সেই সম্পাদকের দেওয়া নাম দিয়েই আমার ঐ সমস্ত প্রবন্ধটা এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

‘গত ২১শে জুলাই ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় প্রকাশিত এক সচিত্র বিস্ময়কর কাহিনীতে বলা হয় যে, নবদ্বীপে ‘অনাহারী মা’ নামে এক মহিলা ৪০ বৎসর একটানা নির্জলা উপবাস করিয়া সুস্থ ও সবল শরীরে বাস করিতেছেন। কিছুদিন পূর্বে কলকাতার প্রায় সকল বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী দৈনিক পত্রিকায় এই ধরণের আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার নিকটবর্তী কুমারপুর গ্রামের ‘নিখাকী মা’ নামে খ্যাত জনৈকা মহিলা গত কুড়ি বৎসর কোনরূপ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করিয়া সুস্থ ও সবল দেহে যথারীতি কাজকর্ম করিয়া বাঁচিয়া আছেন।

এই নিখাকী মার প্রচারের জন্য কয়েকজন উৎসাহী যুবক নিখাকী মা’কে কলকাতায় আনিয়া গত ৮ই জুলাই কলিকাতার ডাক্তার লেনে এক সাংবাদিক সম্মেলনেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমিও একজন সাংবাদিক হিসাবে উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিয়া ছিলাম। ‘নিখাকী মা’র সুদীর্ঘ নিরম্বু উপবাস সম্বন্ধে আমার যে বাস্তব অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহা বর্তমানে প্রকাশ করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিতেছি।

উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে ‘নিখাকী মা’র, সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর নিরম্বু উপবাসের কাহিনী অনেকে বিশ্বাস করিলেও, আমরা কয়েকজন এ সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ চাই। তখন সম্মেলন আহ্বানকারী শ্রী এইচ. মৈত্র বলেন যে, হাওড়ার একজন চিকিৎসক ‘নিখাকী মা’কে একবার একটানা সাড়ে সাত দিন আটক রাখিয়া দেখিয়াছেন যে, তিনি ঐ সময়ের মধ্যে কোনও খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করেন নাই। এখন গবর্ণমেণ্ট বা আপনারা ইঁহাকে পরীক্ষা করিয়া

দেখিতে পারেন এবং এই নিথাকী মা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট ও আপনাদের কিছু কর্তব্য আছে বলিয়াও মনে হয়।

সাংবাদিকদের পক্ষ হইতে আমি স্বেচ্ছায় তীব্র কৌতূহলের বশে কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা নিথাকী মাকে কোন হাসপাতালে রাখিয়া পরীক্ষা করাইয়া ইঁহার এই উপবাসের সত্যাসত্য প্রমাণের জন্য অগ্রণী হই। কিন্তু নিথাকী মা হাসপাতালে থাকিতে কোন প্রকারে রাজী না হওয়ায় তাঁহাকে আমার কলিকাতার বাড়িতেই লইয়া আসি। এর পর আমি কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক যেমন—প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের ডাঃ অমিয়কুমার বসু এম এস সি. এম বি, এম আর সি পি, ইসলামিয়া হাসপাতালের ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এম-এ, বি এস সি, এম বি, বি এস, ডি টি এস, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম বি, এম আর সি পি, স্যার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ হিমংশু রায় এম ডি, কারমাইকেল কলেজের ডাঃ বৈদ্যনাথ ভাদুড়ি, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির সহিত যোগাযোগ করিতে থাকি এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়িতে রাখিয়া নিথাকী মা'র কিছু না খাওয়ার ব্যাপারটাও লক্ষ্য করিতে থাকি।

পূর্বোক্ত এইচ. মৈত্র নিথাকী মা'কে সঙ্গে লইয়া আমার বাড়ীতে আসেন। নিথাকী মার সঙ্গে একটি টিনের মাঝারি সুটকেশ ছিল। সুটকেশের মধ্যে কি আছে আমি দেখিতে চাহিলে, শ্রীমৈত্র আমায় বলেন যে, মাত্র তিনখানি কাপড় সুটকেশের মধ্যে আছে, এ ছাড়া আর কিছু নাই। মৈত্রের কথায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিলেও তখন আর কোন প্রশ্ন করি নাই।

নিথাকী মা নির্জনে একা একা অনেকক্ষণ ধরিয়া তপ-জপ, তাঁহার ইষ্ট দেবতার পূজা করিবেন বলায় ছাদের উপরে একখানি পৃথক ঘর তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল। আবার এই পূজা ও তপ-জপের জন্য যখন শুনিলাম যে, নিথাকী মা দিনে রাত্রে দুই-তিনবার স্নানও করিবেন, তখন ভাবিলাম—স্নানের সময় অতি অনায়াসেই তো তিনি তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারেন। তবুও ভাবিলাম, আচ্ছা জল খান, খাদ্য ব্যতীত কিভাবে থাকেন তাহারই পরীক্ষা চলুক।

পরদিন নিথাকী মা-র সুটকেশের মধ্যে কাপড় ছাড়া আর কিছু আছে কিনা দেখিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইল এবং সুটকেশ খুলিবার জন্য নিথাকী মাকে বলিলাম। নিথাকী মা সুটকেশ খুলিতে রাজী হইলেন না। তিনি একবার বলিলেন—'এর মধ্যে আমার ঠাকুর আছে। আমি যেখানে যাই, সুটকেশে আমি মাথা দিয়ে রাখি, সুটকেশ আদৌ ছাড়িনি।' আবার বলিলেন, 'সুটকেশ এখন খুললে এখনি মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।'

নিখাকী মার এই কথাগুলি শুনিয়াই আমার কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল এবং আমি বলিলাম—'মুখ দিয়ে রক্ত উঠে সে আমার উঠবে, আমিই সুটকেশ খুলব।' আমার এই কথা এবং আরও অনেক বলাবলির পর নিখাকী মা সুটকেশটি খুলিলেন। সুটকেশ খুলিয়াই তিনি সুটকেশের মধ্য হইতে কাপড়ের একটি পুঁটুলী নিজের কোলের দিকে লইয়া গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন। আমি সেই পুঁটুলীটিই দেখিতে চাহিলাম। তিনি দেখাইতে চাহিলেন না। শেষে পুঁটুলীটি টানিয়া লইয়া খুলিলে দেখা গেল, কিছু শুকনা চিঁড়া, কিছু ছাতু ও কিছু বাসি লুচি লুকানো আছে।

মৈত্র এবং বেলডাঙগানিবাসী মৈত্রর এক আত্মীয়র নিকটেই সুটকেশ খোলা হইয়াছিল। সুটকেশের মধ্যে খাদ্য দেখিয়া তাঁহারাও বিস্মিত হন এবং বলেন —'আমরা নিখাকী মা ও তাঁর গ্রামের কয়েকজনেয় কথা সরলভাবে বিশ্বাস করেই এতখানি মেতে ছিলাম। আর না, আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, এখনি আমরা একে শিয়ালদহে নিয়ে গিয়ে বেলডাঙগার টিকিট কিনে গাড়ীতে তুলে দিই গে।'

এখন নিখাকী মার এই লুচি প্রভৃতির সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। নিখাকী মা আমার এখানে আসিয়াই বলিতে লাগিলেন—'দেখ বাবা, আমার শিব ও তাঁর চারজন চেলাকে মাঝে মাঝে লুচি ও সন্দেশের ভোগ দিতে হয়। শিবের আর একজন চেলা আছে, তার নাম অবধূত, সে আবার লুচি খায় না। তাকে ছাতু আর কাঁচা লঙকার ভোগ দিতে হয়। মাঝে মাঝে এদের ভোগের ব্যবস্থা করো। না হলে এরা রেগে যাবে। আর দিনের বেলায় ঠাকুরদের ভোগের জন্য চিঁড়ে মুড়কী, বাতাসা ও কিছু ফল লাগে। আমি ঘর বন্ধ করে ঠাকুরদের ভোগ দেব, তখন কেউ দেখতে পাবে না। জানালা-কপাট দিয়ে কেউ যদি লুকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে তা হলে তার মুখ বেঁকে যাবে। একবার একজন লুকিয়ে ভোগ দেওয়া দেখতে গিয়ে তার মুখ বেঁকে যায়। শেষে হাসপাতালে গিয়ে অতিকষ্টে তবে তার মুখ সারে।'

নিখাকী মার এই কথাগুলি শুনিয়াই তাঁহার ভণ্ডামী আমি অতি সহজেই বুঝিতে পারিয়া ছিলাম। কিন্তু আমি অন্য কথা না বলিয়া শুধু বলিয়া ছিলাম —'ঘরের মধ্যে জানালা-কপাট বন্ধ করে শিবের চেলাদের ভোগ দেবার নাম করে আপনিও তো লুকিয়ে খেতে পারেন।'

নিখাকী মা এই কথার উত্তরে বলেন—'জানালা-কপাট বন্ধ করে ভোগ দিয়েই বেবিয়ে আসব। সঙ্গে সঙ্গে তুমি কপাট খুলে দেখবে, তারা এসে লুচি খেয়ে গেছে।'

বুঝিলাম ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই নিখাকী মা লুচি ইত্যাদি সরাইয়া রাখেন। ঠিক করিলাম নিখাকী মা যতই মুখ বাঁকিবার ভয় দেখান, একদিন লুচির ভোগ দিয়া জানালা দিয়া দেখিয়া ওঁর লুচি লুকানোর ব্যাপারটা হাতে

নাতেই ধরিব। তাই তখন আর কিছু না বলিয়া শুধু বলিয়াছিলাম—'আচ্ছা, যেদিন বলবেন সেদিনই শিবের চেলাদের ভোগ দোব।'

আমার বাড়িতে নিখাকী মার সুটকেশের মধ্যে যে বাসি লুচি ধরা পড়ে সেগুলি সম্বন্ধে মৈত্র বলেন যে, তাঁহার বাড়ী হইতে আমার এখানে আসার আগের দিন শিবের চেলাদের ঐ লুচিগুলো ভোগ দেওয়া হইয়াছিল।

সেদিন নিখাকী মা আমার বাড়ীতে ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তাঁহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হয় নাই। আমি নিখাকী মাকে এইরূপ লোক ঠকানো ভণ্ডামী আর না করার উপদেশ দিয়া সেদিন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া-দিলাম এবং মৈত্র প্রভৃতিকে যাচাই না করিয়া হুজুগে মাতিতে নিষেধ করিয়া-ছিলাম।

আমার কোন কোন বন্ধু এই সংবাদটি কাগজে প্রকাশ করিবার কথা বলিলেও আমি তখন ভাবিয়াছিলাম, নিখাকী মা-র ব্যাপারটি হয়ত অমনিই চাপা পড়িয়া যাইবে; তবে ভবিষ্যতে নিখাকী মা আবার দেখা দিলে তখন সত্য কথাটা সকলকে জানাইতেই হইবে। তাই নিখাকী মার কোন কথা আমি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করি নাই। কিন্তু গত ২১শে জুলাই যুগান্তর পত্রিকায় আবার অনাহারী মার সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় এই সব সুদীর্ঘ নিরম্বু উপবাসের কাহিনী সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা সংবাদপত্রে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম।

অনাহারী মা যে আদৌ অনাহারে নাই, একথা ঐদিনকার যুগান্তরের সংবাদ হইতেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। কেন না, সংবাদের এক জায়গায় বলা হইয়াছে তে, ১৫/২০ দিন পর তিনি সামান্য মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহা অতি সত্য যে, কিছু না খাইলে পেটে মল জমিবে কোথা হইতে। এ বিষয়ে নিখাকী মা কিন্তু আরও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, গত কুড়ি বৎসরই মলত্যাগ করেন নি। তবে নিখাকী মা আমার বাড়িতে মাত্র দুদিন থাকিলেও তাঁহাকে কিন্তু আমার এখানে লুকাইয়া পায়খানা যাইতে আমি একবার দেখি এবং আমার বাড়ির একটি ছোট মেয়ে নিখাকী মা-কে রাত্রে লুকাইয়া পায়খানা যাইতে আর একবার দেখে।

সুদীর্ঘ নিরম্বু উপবাসকারিণীরা যে সকলেই লুকাইয়া খাইয়া থাকেন, নিখাকী মার কাহিনী হইতে একথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

আর একটি কথা যে, নিখাকী মা প্রভৃতি তাহাদের এই আশ্চর্য ক্ষমতার দোহাই দিয়া অতি সহজেই বহু ভক্ত ও শিষ্য জোগাড় করিয়া ফেলেন এবং নানাভাবে ভক্তদের কাছ হইতে অর্থও উপার্জন করিয়া থাকেন। নিখাকী মা আমার এখানে দুদিন থাকিয়াই আমার পাড়ার প্রতিবেশিনী কয়েকজন মহিলাকে

বশ করিয়া ফেলেন এবং তাহাদের 'ওষুধ' দেবার নাম করিয়া গোপনে কিছু অর্থও উপার্জন করিয়া ছিলেন। নিখাকী মা ইঁহাদের বলিয়া ছিলেন, "শিবের ভোগের জন্যে আগে কিছু করে পয়সা দাও, তারপর আমি ওষুধ দোব। তবে কথাটা কিন্তু গোপন রাখবে।' ইঁহারা সকলেই অর্থ দিয়া গোপনই রাখিয়া-ছিলেন। নিখাকী মা ধরা পড়িয়া আমার এখান হইতে চলিয়া যাইবার পর ইঁহারা ইঁহাদের গোপনতা ভঙ্গ করিয়া ছিলেন।'

আমার এই প্রবন্ধ পড়ে তখন সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী 'এক কলমী' ছদ্মনামে ২.৮.১৯৫৩ তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'ইতস্ততঃ'য় আমার নাম উল্লেখ করে ঐ রহস্য আবিষ্কারের কথা লিখেছিলেন।

'সত্যযুগে' আমার এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে একদিন পুরনো 'ভারতবর্ষ' ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ এই ধরণের একটা সংবাদ চোখে পড়ল। সে সংবাদটা প্রকাশিত হয়েছিল—১৩৪৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষের 'সাময়িকী'তে। আমি ভারতবর্ষে কাজে যোগদানের ১০ বছর আগে। যাই হোক্, এ সম্বন্ধে আর পৃথক কিছু মন্তব্য না করে, সেই সংবাদটিই এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

ছাপ্পান্ন বৎসর অনাহারে যাপন

বাঁকুড়া পাত্রসায়ার থানার বিউর গ্রাম নিবাসী উকীল শ্রীযুক্ত লম্বোদর দে মহাশয়ের বিধবা ভগ্নী শ্রীমতী গিরিবালা দেবী গত ৫৬ বৎসর কাল অনাহারে আছেন। তাঁহার বর্তমান বয়স ৬৮ বৎসর। তিনি প্রত্যহ মাত্র একটি তুলসী পত্র আহার করেন। জল পর্যন্ত তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় না। অনাহারে থাকার জন্য তাঁহার শরীরের কোনরূপ বিলক্ষণ দেখা যায় না। তিনি বেশ সুস্থ ও সবল এবং স্বহস্তে সাংসারিক বহু কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার এই অনাহারে অবস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন ব্যাপারটি প্রকৃত সত্য। ১২ বৎসর হইতে যৌগিক ক্রিয়া দ্বারা তিনি পানাহার ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ১২ বৎসর বয়সেই তিনি বিধবা হইয়া ছিলেন। এখন প্রত্যহ বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া থাকে।

বিদ্যাসাগরের একটি অজ্ঞাত রচনা

এখন কলকাতার ময়দানে বড় আকারের বইমেলা হয় দুটি—১. বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের ২. পশ্চিম বঙ্গ সরকারের।

লেখক হিসাবেই হয়ত কলকাতার এই দুটো বই মেলারই প্রতি বছর নিমন্ত্রণ পত্র পাই প্রতিদিন মেলায় যাবার জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম দিকে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার সঙ্গে এক যোগে বই মেলা করতেন।

একবার এঁদের এই যৌথ বই মেলার আগে এঁরা স্থির করেন—মেলায় বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে মেলার মধ্যে একটা জায়গায় বিখ্যাত সাহিত্যিকদের নিজেদের হাতের লেখা পাণ্ডুলিপির একটা প্রদর্শনী করা হবে।

এই স্থির করে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার হলে এঁদের যৌথ সভায় এঁরা আমাকে আমন্ত্রণ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে ২৪ পরগনা জেলার (২৪ পরগনা জেলা তখন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা হয়নি।) সমাজশিক্ষা আধিকারিক সুকুমার ভট্টাচার্য এবং বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার পক্ষ থেকে এঁদের কার্যালয় সচিব সুনীলময় ঘোষ ঐ প্রদর্শনীটি করে দেবার জন্য আমাকে বিশেষ করে বলেন।

তখন আমি প্রচুর পরিশ্রমে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর মশায় প্রভৃতি থেকে শুরু করে এ কালের বহু বিখ্যাত সাহিত্যিকের (জীবিত সাহিত্যিকরা বাদে) হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করে বেশ বড় আকারের একটা প্রদর্শনী করে দিয়েছিলাম।

ঐ সময় কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পুত্র আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধু গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের কাছ থেকে তাঁর পিতার সংগৃহীত বিদ্যাসাগর মশায়ের নিজের হাতে লেখা একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করি।

বিদ্যাসাগর মশায়ের লেখা এই গল্প বা কাহিনীটি সম্ভবতঃ তিনি তাঁর 'আখ্যান মঞ্জরী' বইএর জন্য লিখেছিলেন। কেন জানি না, তিনি তাঁর 'আখ্যান মঞ্জরী'তে তো নয়ই, এমন কি তাঁর কোন বইয়েই এ গল্পটি দেন নি।

বিদ্যাসাগর মশায়ের সেই অজ্ঞাত রচনাটি এখানে দিলাম—

ফ্রান্সের অধিপতি পঞ্চদশ লুইর পুত্র যৎ পরোনাস্তি দুরাচার ছিলেন। তিনি অতি দুর্বৃত্ত স্বীয় সহচরগণ সঙ্গে লইয়া রাজধানী পারী নগরীতে দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যা করিতেন। একদিন তিনি স্বহস্তে একজনের প্রাণ বধ

করিতেছেন, এমন সময়ে রাজপুরুষেরা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তিনি একজনের প্রাণবধ করিলেন, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

বিচারের দিন উপস্থিত হইল। রাজকুমার বিচারালয়ে নীত হইলেন। অনিবাধিত প্রমাণ পরম্পরা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল রাজকুমার স্বহস্তে নরহত্যা করিয়াছেন। দেশের প্রচলিত বিধি অনুসারে এরূপ অপরাধগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে। সুতরাং রাজকুমারের প্রাণদণ্ড হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু বিচারকর্তারা বিবেচনা করিলেন, যদিও রাজকুমারের প্রাণদণ্ড বিধি সিদ্ধ হইতেছে, তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। অপরাধীর প্রাণদণ্ড নিবারণ রাজার ইচ্ছাধীন। অর্থাৎ প্রচলিত বিধি অনুসারে অপরাধীর প্রাণদণ্ড স্থির হইলেও, রাজা ইচ্ছা করিলে তাহাকে অব্যাহতি দিতে পারেন।

রাজকুমারের অব্যাহতি বিষয়ে রাজকীয় সম্মতি লাভের অভিলাষে প্রধান বিচারকর্তা রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং সবিশেষ সমস্ত তাঁহার গোচর করিয়া রাজকুমারের অব্যাহতি প্রার্থনা করিলেন। রাজা নিতান্ত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। রাজকুমারের অব্যাহতি বিষয়ে সম্মত হইলেন না। তখন বিচারকর্তা বলিলেন—মহারাজ বিবেচনা করুন। তিনি আপনার পুত্র, তাঁহার শরীরে আপনার শোণিত বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন স্থলে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া সর্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক।

এই সকল কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন—ইহা যথার্থ বটে তাহার শরীরে আমার শোণিত বিদ্যমান আছে। কিন্তু আপনারা ইহাও অবগত আছেন, শোণিত দোষাক্রান্ত হইলে শরীর হইতে নিষ্কাশিত করিতে হয়। চির প্রচলিত বিধি অনুসারে যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে, সে হতভাগ্য দুরাচার যখন সেই অপরাধে দূষিত হইয়াছে, তখন তাহার প্রাণদণ্ড সর্বতোভাবে আবশ্যক। আমি আর সকলের প্রাণদণ্ড করিব, আর আমার পুত্র বলিয়া তাহাকে অব্যাহতি দিব, ইহা অপেক্ষা অবৈধ ও ন্যায় বিরুদ্ধ কার্য আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব আপনারা যথাবিধি কার্য করুন। এ বিষয়ে আর আমায় উত্যক্ত করিবেন না।

অনন্তর ১৭২৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের দ্বাদশ দিবসে রাজকুমারের প্রাণ দণ্ড হইল।

বিদ্যাসাগর মশায়ের গল্পের পাণ্ডুলিপির প্রথমাংশ

পাণ্ডুলিপির শেষাংশ

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনকে বলেছেন—'বঙ্গবাসীর প্রধান তীর্থ।' এই তীর্থে আজ স্থাপিত হয়েছে 'ঋষিবঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা।'

এই তীর্থ তথা এই প্রতিষ্ঠানের একটা পূর্ব ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস আজও লেখা হয়নি। হয়ত সে ইতিহাস কেউ কোনদিন লিখবেন না, বা লিখতেও পারবেন না। তাই এই প্রতিষ্ঠানের কিউরেটর বা অধ্যক্ষ হিসাবে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে যা জেনেছি ও পেয়েছি, তা-ই এখানে লিখে রেখে গেলাম—

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান ২৪ পরগনা জেলার (এই জেলা পরে উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা নামে দ্বিধা বিভক্ত হওয়ায়, বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার) কাঁটালপাড়া গ্রামে এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। সেদিনের কাঁটালপাড়া গ্রাম বর্তমানে নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির একটি পাড়া বা পল্লী। পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ শাখার মেন লাইনে শিয়ালদহ থেকে ৩৮ কিলোমিটার উত্তরে নৈহাটী রেল স্টেশনের একরূপ গায়েই এই ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা। এটি পশ্চিম বঙ্গ সরকার স্থাপিত ও পরিচালিত একটি সংস্থা। এর দায়িত্বে আছেন সরকারের শিক্ষা বিভাগ।

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের তৈরি করা তাঁর সখের এই একতলা বৈঠকখানা ভবন —এতে আছে একটা হল ঘর সহ ছোট বড় করে ৪টা ঘর, ১টা সিঁড়ি ঘর এবং সঙ্গে একটা ছোট ফুলের বাগান।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই বৈঠকখানা ভবনে বসে যেমন লেখাপড়া করতেন, তেমনি বন্ধু-বান্ধবরা এলে এইখানে বসেই তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক বন্ধু এই বৈঠকখানায় এসেছেন। এঁরা হলেন—দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশ মজুমদার, দামোদর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের স্নেহভাজন নৈহাটীর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও আসতেন। আর বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্র এবং ছোটভাই পূর্ণচন্দ্রও ঐ সব সাহিত্যিক মজলিসে প্রায়ই থাকতেন। সঞ্জীবচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্রও সেকালের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর এই বৈঠকখানা ভবন ও তাঁর সখের ফুলবাগানটি অটুটই ছিল। তিনি কাঁটালপাড়ায় না

থাকলে, তাঁর মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র এবং ছোটভাই পূর্ণচন্দ্রের পুত্র বিপিনচন্দ্র এই বৈঠকখানা ভবন ও বাগান দেখাশোনা করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী আরও ২৬ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর লেখাপড়া করার ঘর, তাঁদের ঐ বৈঠকখানা ভবনটি প্রয়োজন বোধে সংস্কার করাতেন। রাজলক্ষ্মী দেবী কর্তৃক এই বৈঠকখানা ভবন সংস্কার করানোর একটা কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৫ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'নারায়ণ' পত্রিকায় তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন। শাস্ত্রী মশায়ের ঐ প্রবন্ধ থেকে এই গৃহ-সংস্কার ছাড়া আরও অনেক কথা জানা যায়। তাই শাস্ত্রী মশায়ের সেই লেখাটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

'এই-যে গৃহ (বৈঠকখানা গৃহ) যেখানে বসিয়া তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) বঙ্গদর্শনের অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, যেখান হইতে বিষবৃক্ষ তাহার অমৃতময় ফল সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়াছে, যেখান হইতে শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত দেশকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে, যেখান হইতে কোকিলের কুহু-স্বর রোহিণীকে উন্মাদিনী করিয়া দেশসুদ্ধ উন্মাদ করিয়াছে, সেই সুরম্য স্মরণীয় গৃহে বঙ্কিমবাবুর স্মৃতির কোন চিহ্নই নাই। আমাদের পরম কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় পবিত্র দশহরার দিন গঙ্গাস্নান করিতে নৈহাটী আসিয়া বঙ্গবাসীর প্রধান তীর্থ বঙ্কিমের বৈঠকখানায় উপস্থিত হন এবং নিজ ব্যয়ে এই সুন্দর মার্বেল টেবলেট খানি লাগাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার নিকট সকলেই আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ।......

আর যিনি দেবতুল্য স্বামী পাইয়াও তাহাতে বঞ্চিত হইয়া এই চব্বিশ বৎসর ধরিয়া পরলোকে স্বামীর মঙ্গলের জন্য নানা ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া জীবন যাপন করিতেছেন; যিনি এই বৈঠকখানাটি উত্তমরূপে মেরামত করিয়া দিয়া স্বামীর এই চিহ্নটি বজায় রাখিলেন এবং যিনি এইখানে উপস্থিত থাকিয়া আপন সন্তানমণ্ডলীকে আশীর্বাদ করিতেছেন, আইস আমরা সকলে তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করি।'

শাস্ত্রী মশায় উল্লেখিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন শ্রীহট্ট মুরারী চাঁদ কলেজ ও গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক। তিনি কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থেরও রচয়িতা।

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনে পদ্মনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মার্বেল ফলক বসানোর অনুষ্ঠানে যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, সেকথাও আমরা জানতে পারি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আর একটি লেখা থেকে। ১৩২৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যা মাসিক বসুমতী পত্রিকায় শাস্ত্রী মশায় এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—'এই

মার্বেল ফলক প্রতিষ্ঠার সময় কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোক, অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী কাঁটালপাড়ায় উপস্থিত ছিলেন।'

দুঃখের বিষয় সেই মার্বেল ফলকটি আজ আর নেই।

এখন একটা কথা, এ কথাটা শাস্ত্রী মশায় জানতেন কিনা জানি না—আর জানলেও হয়ত এখানে বলতে ভুলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই বৈঠকখানা ভবনে বসেই সুবিখ্যাত বন্দেমাতরম্ সংগীতটি রচনা করেছিলেন। আর তখনকার প্রসিদ্ধ গায়ক যদু ভট্ট এই গৃহে বসেই বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশিত মল্লার রাগে প্রথম বন্দেমাতরম্ সংগীত গেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়ে ছিলেন।

যদু ভট্ট কাঁটালপাড়ায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে তখন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় কিছুদিন যদু ভট্টর কাছে এই গৃহে বসে গানও শিখে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যদু ভট্টর কাছে এই গান শেখার কথা অবশ্য শাস্ত্রী মশায় লিখে গেছেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় বাঙালী প্রথম বন্দেমাতরম্ সংগীতকে জাতীয় সংগীতরূপে এবং এই সংগীতের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে। পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ঠিক এই ভাবেই বন্দেমাতরম্ সংগীত ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনিকে ভারতের জাতীয় সংগীত ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে। পরাধীন ভারতে লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামী কিভাবে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিতে দিতে কারাগারে গেছেন এবং অগণিত বীর বিপ্লবী কিভাবে ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিয়েছেন, দেশের ইতিহাসে তার গৌরবোজ্জ্বল সাক্ষ্য রয়েছে।

বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময়, বাংলার মানুষ যখন প্রথম 'বন্দেমাতরম্' নিয়ে মেতে ওঠে, তখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা থেকে বহু লোক গঙ্গায় স্টীমারে করে এখানে এই বৈঠকখানা ভবনে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা নিয়ে যান।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার এই জন্মভূমিতে কোন দিন আসেন নি বটে, তবে ১৩৩০ সালের ৮ই ও ৯ই আষাঢ় কাঁটালপাড়ার সংলগ্ন নৈহাটীতে যে চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়, তাতে প্রথম দিনে এসে তাঁর ভাষণের প্রথমেই বলেছিলেন—'আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সভা-সমিতিতে যোগদান অসম্ভব। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমির আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। তাই আমাকে আসিতেই হইয়াছে।'—(নায়ক—১৩ই আষাঢ় ১৩৩০)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিচালিত এই চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের

স্থান নির্বাচন নিয়ে তখন কাঁটালপাড়া—নৈহাটী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে যে দলাদলির সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটু ইতিহাস বলা দরকার। এতে দেখা যাবে, সেই দলাদলির এক পক্ষের নেতাদের সঙ্গে এই সংগ্রহশালার একটা প্রাথমিক যোগও ছিল। দলাদলিটা হ'ল—

কাঁটালপাড়া ও এর সংলগ্ন ভাটপাড়ার মানুষ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও কোন কোন কর্মকর্তা চেয়েছিলেন, এই চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সারস্বত ভবন বা তাঁর বৈঠকখানা ভবনের সম্মুখে ফাঁকা জায়গায় যেখানে প্রতি বছর বঙ্কিমচন্দ্রদের রথের মেলা হয়, সেখানে হোক্। অপর পক্ষে নৈহাটীর প্রায় সকল মানুষই চেয়ে ছিলেন, সম্মিলন নৈহাটী শহরেই হোক্।

শেষ পর্যন্ত সম্মিলন শহর নৈহাটীর কোন কোন প্রভাবশালী ও ধনী ব্যক্তির আপ্রাণ চেষ্টায় নৈহাটীতেই হয়েছিল। তখন বিরোধীপক্ষ নৈহাটীতে ঐ চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন শুরু হওয়ার এক সপ্তাহ আগে সাড়ম্বরে কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনের সামনে যেখানে প্রতি বছর রথের মেলা হয়, সেই খানে 'বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী' নাম দিয়ে দু দিন (১লা ও ২রা আষাঢ়) সাহিত্য সম্মিলন করেছিলেন। সভায় মূল সভাপতি হয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।

'বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী' ঐ সময় স্থির করেন, তাঁরা প্রতি বৎসর এই বঙ্কিম ভবনের সম্মুখে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম দিন ১৩ই আষাঢ় তারিখে এবং সম্ভব হলে তাঁর মৃত্যু তারিখ ৩০শে চৈত্র তারিখেও বঙ্কিম-স্মরণ সভা তথা সাহিত্য সভা করবেন।

এঁরা শুধু সভাই করতেন না, 'বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী পাঠাগার' নামে একটি সুন্দর পাঠাগারও করেছিলেন। কাঁটালপাড়ায় গঙ্গার তীরে নিজস্ব একটি বেশ বড় একতলা পাকা বাড়িতে এই পাঠাগারটি স্থাপিত হয়েছিল। এই পাঠাগার আজও আছে। বর্তমানে এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত অন্যতম প্রাইমারি লাইব্রেরিতে পরিণত হয়েছে।

বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনটিতেও একটা কিছু করার চেষ্টা করেন। এজন্য তাঁদের বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনীর প্রথম বর্ষের সভায় যেমন মূল সভাপতি হয়েছিলেন—দেশনায়ক ও চিন্তাশীল লেখক বিপিনচন্দ্র পাল, তেমনি ১৩৩১ সালে এই বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হয়ে এসে ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক ও কবি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। দেশবন্ধু সেদিনের সভায় 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক তাঁর যে লিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, সেই প্রবন্ধ পরে প্রকাশিত হয়েছিল—১৩৩১ সালের ২৫শে আষাঢ় তারিখের সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকায়। দেশবন্ধু তাঁর ঐ

লিখিত অভিভাষণের সর্ব শেষ বাক্যে বলেছিলেন—'আসুন, আমরা একবার হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া দেশ মায়ের পায়ে মাথা নোয়াইয়া সমস্বরে বলি—বন্দেমাতরম্।'

সভার পর দেশবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের এই বৈঠকখানা ভবনে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করে ছিলেন।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও একবার এসেছিলেন এই বৈঠকখানা ভবনে। বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনীর সভায় বক্তৃতা দিতে এসে, প্রথমে তিনি এই গৃহে কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করেন, পরে এই গৃহের সম্মুখস্থ মাঠে বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনীর সভায় যোগ দান করেন।

১৩৩৭ সালে শরৎচন্দ্রের ৫৫তম জন্ম তিথিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের 'বঙ্কিম-শরৎ সমিতি' শরৎচন্দ্রকে যে অভিনন্দন জানায়, সেই অভিনন্দনের উত্তরে এক জায়গায় শরৎচন্দ্র নিজেই এ কথার উল্লেখ করে বলেছিলেন—'বছর কয়েক পূর্বে কাঁটালপাড়ার বঙ্কিম সাহিত্য সভায় একবার উপস্থিত হতে পেরে ছিলাম। দেখলাম, তাঁর মৃত্যুর দিন স্মরণ করে বহু মনীষী, বহু পণ্ডিত, বহু সাহিত্য-রসিক বহু স্থান থেকে সভায় সমাগত হয়েছেন।...'

বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের এই বঙ্কিম স্মরণ-সভা চালিয়ে ছিলেন। এই সময়েই এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনটি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন—'বঙ্গবাসীর প্রধান তীর্থ' সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে কিনে নেবার চেষ্টা করতে থাকেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁর দৌহিত্ররাই পরে মাতামহের অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় তাঁর এই বৈঠকখানা ভবনটিরও মালিক হয়েছিলেন।

বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী শুধু বঙ্কিম সাহিত্য সভা করা এবং বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী পাঠাগার করা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্রদের কাছ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বৈঠকখানা ভবনটি কিনে নিয়ে এখানে একটা বিশেষ কিছু করারও চেষ্টা করতে থাকেন।

এই ভবনের মালিক তখন বঙ্কিমচন্দ্রের চার দৌহিত্র—জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজেন্দু সুন্দর (ব্রজেন্দু সুন্দরের অপর তিন ভ্রাতা দিব্যেন্দু সুন্দর, পূরেন্দু সুন্দর ও শুভেন্দু সুন্দর তখন মৃত—ব্রজেন্দু সুন্দরই তাঁদের অংশের সম্পত্তি তখন দেখাশুনা করতেন) ও দ্বিতীয়া কন্যা নীলাব্জ কুমারীর তিনপুত্র—নীলাদ্রি শেখর, বিন্ধ্যাদ্রি শেখর ও হিমাদ্রি শেখর মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যার কোন সন্তান ছিল না।

বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনীর কর্মকর্তারা উত্তরপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যার বাড়িতে যাতায়াত করে বিন্ধ্যাদ্রি শেখর ও হিমাদ্রিশেখরকে ৮৫০ টাকা

করে দিয়ে এঁদের অংশ কিনে নেন। নীলাদ্রিশেখরের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল বলে, তাঁকে বলে কয়ে ২৫০ টাকা দিয়ে তাঁর অংশটা কেনেন। এই ভাবে বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনের চারের তিন অংশ কিনে নেন।

ব্রজেন্দ্রসুন্দরের অংশটিও এঁরা কেনার চেষ্টা করছেন এবং দর নিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তাও বলছেন। এই সময় দেখতে দেখতে ১৯৩৮ সালে বঙ্কিম জন্ম শতবার্ষিকী আসন্ন হয়ে আসে।

তখন কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদও বঙ্কিমচন্দ্রের বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনার এবং বিশেষ করে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত রচনার পীঠস্থান বঙ্কিমচন্দ্রের এই বৈঠকখানা ভবনটি নিজেদের অধিকারে আনার চেষ্টা করেন। এর কিছু দিন আগেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাঁদের পরিষদ ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্মর মূর্তি স্থাপন করেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্যার যদুনাথ সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি একদিন নৈহাটীতে বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ ভট্টাচার্যের কাছে আসেন। এঁরা শুনেছিলেন—বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনী এই ভবনের অনেকটা অংশ কিনেছেন।

স্যার যদুনাথ প্রভৃতি এলে শ্যামাচরণবাবু তখনই বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনীর সম্পাদক রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রী, সহ-সম্পাদক বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে ডাকান। এঁরা এসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধিদের জানান—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যদি বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবন নিয়ে ভালভাবে সংস্কার করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার মত সেখানে উপযুক্ত একটা কিছু করেন, তাহলে আমরা ঐ বাড়ির যে অংশ কিনেছি, তা অমনিই সাহিত্য পরিষদকে দান করে দেব।

সাহিত্য পরিষদ এঁদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে এঁদের কাছ থেকে ঐ অংশ নেন। বাকি চার আনা অংশ ব্রজেন্দ্রসুন্দর বেশী দাম চাইলেও—তাঁকেও ২৫০ টাকা দিয়ে ঐ অংশ সাহিত্য পরিষদ কিনে নেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবন কিনে নিয়ে উত্তমরূপে ভবনটির সংস্কার করেন। এঁরা নিয়েও এখানে তেমন কিছুই করতে পারলেন না। স্থানীয় যুবকরা এখানে একটি ছোট পাঠাগার ও একটি ব্যায়ামাগার করেন। এই ভাবেই কিছুদিন চলল্।

এরপর দেশ স্বাধীন হ'ল। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিম বঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্য মন্ত্রীত্ব কালে যখন তাঁর মন্ত্রীসভায় বিমলচন্দ্র সিংহ পূর্তমন্ত্রী এবং রায় হরেন্দ্রকুমার চৌধুরী শিক্ষামন্ত্রী তখনই

এই 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'টি গড়ে ওঠে। বিমলবাবু এবং হরেনবাবু এঁদের দুজনেরই বঙ্কিমের উপর লেখা বই আছে। বিমলবাবুর বই—'বঙ্কিম-কণিকা' ও 'বঙ্কিম-প্রতিভা', আর হরেনবাবুর বই শ্রীশিবানন্দ ছদ্মনামে 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' (সমালোচনা)। এঁরা দুজনেই ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভাইস্-প্রেসিডেন্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনটি নিয়ে সেখানে যাতে সরকার থেকে একটি স্থায়ী বঙ্কিম স্মৃতি মন্দির স্থাপিত হয়, সেজন্য বিমলবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে বললে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সরকারের পূর্ত বিভাগকে এই বৈঠক-খানা ভবনটি দান করেন।

বিমলবাবু ভবনটি তাঁর পূর্ত দপ্তরে এনে শিক্ষামন্ত্রী (তখন পশ্চিমবঙ্গে একজনই শিক্ষামন্ত্রী থাকতেন) হরেনবাবুকে বলেন—শিক্ষা বিভাগের অর্থে ও পরিচালনায় এখানে একটি স্থায়ী বঙ্কিম স্মৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক।

তারই ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনে এই 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'টি স্থাপিত হয়েছে। ১৯৫২ সালে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সজনীকান্ত দাস, আর উদ্বোধক ছিলেন স্বয়ং পূর্তমন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহ।

উদ্বোধনের আগে এই ভবন পূর্তবিভাগ দ্বারা আরও সুন্দর ভাবে সংস্কার করা হয় এবং সংগ্রহশালার জন্য বঙ্কিম সংক্রান্ত জিনিসপত্র সংগ্রহ হতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রের পৌত্র (জ্যোতিশচন্দ্রের পুত্র) শতঞ্জীব-চন্দ্র তাঁর কাছে রক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা একশ'র মত মূল চিঠি, এঁদের বংশের আরও অনেকের বহু চিঠি, কিছু বৈষয়িক দলিলপত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারবর্গের বড় বড় বাঁধানো আলোকচিত্র, কিছু বই ইত্যাদি ২ দফায় এই সংগ্রহশালায় দান করেন। প্রথম বারে দানের সময় সংগ্রহ করেন ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য নৈহাটী-নিবাসী অতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন। পরে দ্বিতীয় দফায় দানের সময় সংগ্রহ করি সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ হিসাবে আমি। এরও পরে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহৃত আরও কিছু সামগ্রী আমি সংগ্রহ করি অন্যান্য জায়গা থেকে।

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার পরিচালক সমিতির সভাপতি বারাকপুরের এস. ডি. ও. এবং সম্পাদক ২৪ পরগণা জেলার (বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার) ডিস্ট্রিক্ট সোসাল এডুকেশন অফিসার। এঁরা ছাড়া পরিচালক মণ্ডলীতে সংগ্রহশালার কিউরেটর, নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, নৈহাটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ প্রভৃতি আছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা ভবনের পাশেই তাঁর নিজস্ব বহু কক্ষ বিশিষ্ট বিরাট দ্বিতল বসতবাটী। বঙ্কিমচন্দ্রের এবং পরে তাঁর স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবীরও মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্ররা এই দ্বিতল বসতবাটী বঙ্কিমচন্দ্রের ছোটভাই পূর্ণচন্দ্রের পুত্র বিপিনচন্দ্রকে বিক্রি করে দেন।

বিপিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা কলিকাতাবাসী হওয়ায় এবং এই বাড়ির দিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় ঐ বিরাট বাড়ি একটু একটু করে ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

ইংলণ্ডে সেক্সপীয়ারের বাড়ি বা রাশিয়ায় গোর্কি'র বাড়ি পূর্ববৎ যথাযথ রাখা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান কাঁটালপাড়ায় তাঁর বাড়িটিও যাতে যথাযথ থাকে এজন্য ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার পরিচালক সমিতি দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে আসছেন।

এজন্য পরিচালক সমিতির সদস্যদের পক্ষ থেকে স্থানীয় এম. এল. এ. গোপাল বসু, নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু কুমার ভট্টাচার্য, পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক ডঃ সত্যজিৎ চৌধুরী এবং কিউরেটর হিসাবে আমি বহুদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে মন্ত্রী মশায়দের কাছে ধর্ণা দিয়েছি। 'এম. এল. এ. অজিত বসুও একবার আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। তবে মহাকরণে আমি একাই ঘুরেছি অনেক দিন।

বারাকপুরের এস. ডি. ও. থাকা কালে পরিচালক সমিতির সভাপতি হিসাবে কান্তপ্রসাদ সিংহ মশায়ও খেটেছেন।

স্থানীয় বঙ্কিম একাডেমির যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য এবং রণেন মুখোপাধ্যায়ও এজন্য চেষ্টা করেছেন।

দীর্ঘ দিনের এই চেষ্টায় অবশেষে ১৯৫০ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের ১৫০ তম জন্মদিনের উৎসবের সময় পশ্চিম বঙ্গ সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের বসতবাটীটি অধিগ্রহণ করেন।

অধিগ্রহণ করলেও যাতে এই বাড়ির সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের কাজ শীঘ্র আরম্ভ হয় সেজন্যও পরিচালক সমিতির পূর্বোক্ত সদস্যগণ সরকারের কাছে আবার ধর্ণা দিতে থাকেন। আবেদন পত্র নিয়ে আবার মন্ত্রীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরি। অবশেষে সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের বসতবাটী এবং এর সংলগ্ন—বর্তমানে নিশ্চিহ্ন,:বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গ দর্শনের প্রেস ও দপ্তরীখানা গৃহ, বঙ্কিমচন্দ্রদের দুর্গাদালান (যে দালানে একবারের দুর্গাপূজা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্ত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'আমার দুর্গোৎসব' রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন) প্রভৃতি সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের জন্য ১৯৫০ সালে পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা দিয়েছেন। সরকারের পূর্ত বিভাগ এখন পুরা দমে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আশা করছি শীঘ্রই কাজ সম্পূর্ণ হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—এই তিন বরেণ্য মহান্ সাহিত্যরথী সম্বন্ধে আমি সুদীর্ঘকাল ধরে যে চর্চা, গবেষণা ও সাধনা করেছি এবং আজও করে চলেছি, বইএর এই অংশে সে সবেরই কিছু কিছু কথা বলেছি।

এই বলতে গিয়ে, এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই তিনটি করে স্তরে আমার কথা বলেছি। যেমন—১. তথ্য সংগ্রহ অর্থাৎ পরিশ্রম করে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছি। ২. অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া তথ্য অর্থাৎ যা পাব বলে কোনদিন কল্পনাও করিনি, অথচ পেয়েছি। ৩. কয়েকটি বিষয়ে কিছু বক্তব্য—এর মধ্যে নানা জনের লেখার ভুল-ভ্রান্তির কথাও আছে।

তথ্য সংগ্রহ—

এ পর্যন্ত আমি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ১. বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প ২. আলাপ-আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ৩. বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ৪. বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র ৫. বঙ্কিমচন্দ্র—(জীবন ও সাহিত্য) ৬. অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র (চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র) ৭. শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম বইগুলি লিখেছি। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থ প্রকাশের শত-বার্ষিকীর সময় 'আনন্দমঠ-১ম সংস্করণ' সম্পাদনা করেছি। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র সমন্ধে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধও লিখেছি। এখনও লিখি।

আমার এই সব লেখার তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি একদিকে যেমন বঙ্কিম-বিষয়ক বহু বই ও নানাবিধ পত্র-পত্রিকা পড়েছি, অপর দিকে তেমনি তাঁকে দেখেছেন এমন ব্যক্তিদের কাছে, বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধর ও আত্মীয়দের কাছে, তাঁর স্মৃতি-জড়িত বহু স্থানেও ঘুরেছি। ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহ-শালায় রক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের লেখা পত্রাদি, পারিবারিক বিষয় সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ এবং অন্যান্য কাগজপত্র থেকেও প্রচুর উপকরণ পেয়েছি।

তথ্য সংগ্রহের জন্য কোথায় কোথায় কিভাবে ঘুরেছি, এখানে তার কয়েকটা কথা বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলায় শিয়াখালার কাছে দেশমুখো গ্রামে। সেখানে গেছি এবং দেশমুখোর প্রবীণ চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গে দেখা করেছি। তথ্য পেয়েছি সামান্যই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট জীবনের কর্মস্থল হুগলী, হাওড়া, বারাসত, বারুইপুর, বহরমপুর, আলিপুর প্রভৃতি স্থানেও গেছি। কোথাও কিছু কিছু তথ্য পেয়েছি, কোথাও ব্যর্থ হয়েছি। বারুইপুর কোর্টে বহুবার যাই। তার কারণ, ঐ কোর্টের এক বৃদ্ধ উকিল বলেছিলেন —আমার কাছে এই কোর্টের বঙ্কিমচন্দ্রের একটা মামলার রায়ের নকল আছে। সেটা কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি না।

ঐ উকিলবাবু শেষ পর্যন্ত সে নকল আর খুঁজেই পেলেন না।

বারাসত কোর্টের প্রবীণ ও খ্যাতনামা উকিল হেমচন্দ্র ঘোষ একজন বঙ্কিম-ভক্ত এবং একরূপ বঙ্কিম-গবেষক মানুষ ছিলেন। তিনি বহু পরিশ্রম করে

বঙ্কিমচন্দ্রের বারাসত জীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বারাসত কোর্টে গিয়ে এই হেমবাবুর সঙ্গে দেখা করলে, তিনি বারাসতে বঙ্কিমচন্দ্রের এক কাঁঠালচোর ধরার কাহিনী আমাকে বলেছিলেন। হেমবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ কাঁঠালচোর ধরার কাহিনীটি যাঁর কাছে শোনেন, তিনি নিজে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ চোর ধরার সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই রূপ কবি বিমলচন্দ্র ঘোষও তাঁর শোনা বঙ্কিমচন্দ্রের এক আখচোর ধরার গল্প আমায় বলে ছিলেন।

কাঁটালপাড়ার অদূরবর্তী মাদ্রাল গ্রামের ৯০ বৎসর বয়স্ক যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং প্রায় এঁরই বয়সী গোবিন্দচন্দ্র রায় এঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছিলেন এবং এঁরা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু তথ্যও সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। এঁদের সঙ্গে দেখা করেও এঁদের কাছ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করি। আর বঙ্কিমচন্দ্রের বংশধরদের কাছ থেকেও তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাই।

আমার 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প' গ্রন্থে এঁদের কাছ থেকে সংগৃহীত অনেক কাহিনী দিয়েছি। এখানে শুধু কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কাছে শোনা বঙ্কিমচন্দ্রের আখচোর ধরার কাহিনীটি বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারাসতের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই সময় একদিন সকালে তিনি সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠে বৈঠকখানার বাইরের দিককার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। এমন সময় একজন চাষী কেঁদে এসে তাঁর পায়ের উপর পড়ল।

বঙ্কিমচন্দ্র চাষীটিকে তুলে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে, চাষীটি কাঁদতে কাঁদতে বলল—হুজুর! আমার এক বিঘা ক্ষেতের সমস্ত আখ রাত্রের মধ্যে কারা কেটে নিয়ে গেছে। কাল সন্ধ্যার সময় আমি ক্ষেতভর্তি আখ দেখে গেছি, আজ সকালে এসে দেখি একগাছিও নেই।

শুনে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন—ক্ষেতের সমস্ত আখই কেটে নিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ হুজুর! একটি আখও পড়ে নেই।

—কারা কেটেছে কিছু জান?

—না হুজুর, তা দেখিনি। তবে…

—তবে কি?

—ক'দিন আগে হুজুর, আমার একটা জমির আল নিয়ে ক'জনের সঙ্গে একটু ঝগড়া হয়েছিল। তারা আমার জমির বাঁধা আলকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আমার সন্দেহ হচ্ছে, তারাই আমার এই সর্বনাশটা করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র এবার চাষীটিকে প্রশ্ন করলেন—যাদের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছিল, তারা কারা? তারা কি তোমার গ্রামের লোক?

চাষীটি বললে—তারা আমাদের একই গ্রামের লোক। তবে অন্য পাড়ার। তারাও আমারই মত চাষী।

—তোমার গ্রাম এখান থেকে কতদূর?

—কাছেই হুজুর, এক মাইলও হবে না।

—আর তোমার আখের জমি?

—বাড়ির কাছেই।

বঙ্কিমচন্দ্র সব শুনে, বারান্দায় যে বেঞ্চি পাতা ছিল, চাষীটিকে তাতে একটু বসতে বলে বাড়ির ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে চল, বলে চাষীটিকে সঙ্গে নিয়ে তার গ্রামের দিকে রওনা হলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চাষীটিকে সঙ্গে নিয়ে তার গ্রামে যাওয়ার সময় তার আখের ক্ষেতটিও একবার দেখে নিলেন। ক্ষেতে গিয়ে আখের গোড়া দেখে বুঝলেন, সত্যই টাটকা কাটা বটে। তারপর তাকে নিয়ে সিধা তার বাড়িতে গেলেন।

হুজুর এসেছেন শুনে গ্রামের চৌকিদার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে ছুটে এসে হুজুরকে সেলাম দিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চাষীটিকে সঙ্গে নিয়ে যখন তার বাড়িতে যান, গ্রামের অধিকাংশ লোকজনই তখনও যে যার ক্ষেতে-খামারে কাজে বেরিয়ে যায় নি। তারা কাজে বেরোবার জন্য সেই প্রস্তুত হচ্ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চাষীটিকে বললেন- আখ কেটেছে বলে যাদের উপর তোমার সন্দেহ হচ্ছে, তাদের নাম বল।

চাষীটি নাম বললে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই সব লোককে ডেকে আনবার জন্য চৌকিদারকে বললেন। তিনি চৌকিদারকে আরও বলে দিলেন, তাদের যে যার কাস্তে সহ তাদের নিয়ে আসবে।

চৌকিদার হুজুরের আদেশে তাদের ডাকতে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চৌকিদার যে যার কাস্তে সহ লোকগুলিকে এনে হাজির করল।

লোকগুলি এলে বঙ্কিমচন্দ্র কাস্তেগুলোকে একধারে রাখতে বলে তাদের অন্য একটা জায়গায় সকলকে বসতে বললেন।

তারা যথাযথ আদেশ পালন করল।

বঙ্কিমচন্দ্র এবার চৌকিদারকে বললেন—গ্রামের প্রধানদের অর্থাৎ মোড়লদের ডেকে নিয়ে এস।

চৌকিদার আবার প্রধানদের ডাকতে গেল।

রাত্রে আখ কেটেছে কিনা, বঙ্কিমচন্দ্র চৌকিদারের ডেকে আনা লোকগুলিকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা সকলেই একবাক্যে বল্‌ল—হুজুর, আমরা আখ কাটিনি। আমরা ওর আখের কথা কিছুই জানি নি।

বঙ্কিমচন্দ্র, লোকগুলি আগের দিনে কে কি কাজ করেছে, তারও খোঁজ নিলেন।

তারা প্রত্যেকেই তাদের আগের দিনের যে যার কাজের হিসাব দিল। তারা নিজ নিজ কাজের যে হিসাব দিল, তাতে কিন্তু আগের দিনে কেহ কোথাও আখ কেটেছে, এ কথা বল্‌লে না।

কিছুক্ষণ পরে গ্রামের প্রধানরাও এসে গেলেন।

প্রধানরা সকলে এলে চৌকিদার হাত জোড় করে বঙ্কিমচন্দ্রকে বল্‌লে—হুজুর প্রধানরা সকলেই এসে গেছেন, আর কেহ বাকি নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র এবার প্রধানদের বললেন—আপনাদের কেন ডেকেছি শুনুন। যে চাষীটির বাড়িতে আমি এসেছি, এর ক্ষেতের আখ কারা গত রাত্রে কেটে নিয়ে গেছে। আমি আসবার সময় এর ক্ষেতে কাটা আখের গোড়াগুলো দেখে এসেছি। সত্যই রাত্রেরই কাটা। আপনাদের গ্রামেরই কয়েক জনের উপর এই চাষীটির সন্দেহ হয়েছে। এই তাদেরও ডাকিয়ে এনেছি। এদের সকলকেই আপনারা নিশ্চয়ই চেনেন। আখ চুরি করেছে কিনা এদের জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে এরা বললে—আখের খবর এরা কিছুই জানে না।—তারপর এরা কাল কে কি কাজ করেছে, জিজ্ঞাসা করলাম। সকলেই যে যার কাজের ফিরিস্তি দিল, কিন্তু কেহ যে এদের নিজেদেরও আখ কেটেছে, তাও বললে না। এদের আমি যে যার কাস্তে সহ ডাকিয়ে আনাই। এরা এলে এদের কাস্তেগুলো ঐ একধারে রাখতে বলি। এরা তাই রাখে। এরা যতই বলুক, আখ চুরি করিনি। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এরাই আখ চুরি করেছে। এরা রাত্রে আখ কেটে, সেই কাস্তেই অমনি রেখে দিয়েছিল। সেই কাস্তেয় এখনও আজ কাজ করবার এরা সুযোগ পায় নি। তাই এই কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ দেখুন, কাস্তেগুলোয় পিঁপড়ে ধরেছে। এরা যদি রাত্রে আখ না কাটবে তো এদের কাস্তেয় পিঁপড়ে ধরবে কেন? আপনারা কি বলেন? আপনাদের মত কি?

প্রধানরা আর বলবে কি? কাস্তে আনিয়ে এই ভাবে হুজুরের চোর ধরবার কৌশল দেখে তারা তো প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। তারপর তারা সকলেই একবাক্যে হুজুরের সঙ্গে এক মত হ'ল।

পরে আখ চোরেরাও তাদের অপরাধ স্বীকার করল।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে সেই আখ চোরদের বারাসতে নিয়ে এলেন।

পরে বিচারে তাদের সকলেরই শাস্তি হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপাল কুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রথম দিকেই আছে—রসুলপুর নদীর মোহনার কাছে নবকুমার নৌকা থেকে নেমে বনে রান্নার জন্য কাট কাটতে গেলে, সেই সময় হঠাৎ নদীতে জোয়ার এসে যায়। প্রবল জোয়ারে মাঝিরা

নৌকা সামলাতে না পারায়, যাত্রীরা নবকুমারকে ফেলে চলে আসে।

বঙ্কিমচন্দ্র সেই জায়গার কথায় লিখেছেন—'যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়।'...

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা ক্ষেত্র এই দরিয়াপুরেও গেছি। এই দরিয়াপুর বা দারিয়াপুর মেদিনীপুরের কাঁথির ১৩/১৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এর পাশেই দৌলতপুর গ্রাম ও রসুলপুর নদীর মোহনা। দারিয়াপুরবাসীরা বলেন—বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে (পরবর্তীকালে নেগুয়ার মহকুমা অফিস সেখান থেকে ২৪/২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে কাঁথিতে উঠে আসে) একবার এক ডাকাতির তদন্ত করতে এখানে এসেছিলেন। এসে স্থানীয় ডাক বাংলোয় কয়েকদিন ছিলেন। তখনই তিনি এখানে বসে তাঁর কপালকুণ্ডলা রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। পরে তিনি বই লেখার সময় এখানকার নদী, সমুদ্রতীর ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা বইয়ে দেন।

দারিয়াপুরবাসীরা এই বঙ্কিম-স্মৃতি স্মরণে তাঁদের গ্রামে ১৩২৬ সালে একটা স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন করে তাতে প্রস্তর ফলকে দারিয়াপুরকে কপালকুণ্ডলার পরিকল্পনা ক্ষেত্র বলে লিখে রেখেছেন। এখানে প্রতি বছর ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু দিনে বঙ্কিম-স্মৃতি সভা হয়। ১৩৬৩ সালের সভায় প্রধান অতিথি হয়ে আমি গিয়েছিলাম। পরে ১৩৬৪ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণের যুগান্তর পত্রিকায় রবিবারের সাময়িকীতে এ নিয়ে একটা প্রবন্ধও লিখেছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বর্ণিত গড়মান্দারণেও গেছি এবং কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহেও সক্ষম হয়েছি। এখন এ সম্পর্কে এখানে একটু বিস্তৃত ভাবেই বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী লেখার কিছুদিন আগে, একবার জাহানাবাদে (বর্তমান নাম আরামবাগ) যান। তখন সেখানে তাঁর মেজদা সঞ্জীবচন্দ্র এসেসরের কাজ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র মেজদার কাছে বেড়াতে গিয়ে, ঐ অঞ্চলে প্রচলিত, মোগল-পাঠানের যুদ্ধে গড়মান্দারণের রাজারও যুদ্ধ করার কাহিনী শুনে, গড়মান্দারণ দেখতে গিয়েছিলেন। ঐ কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র অনেক আগে তাঁর মেজ-ঠাকুরদার মুখে প্রথম শুনেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে গড়মান্দারণ সম্বন্ধে লিখেছেন—'অদ্যাপি পর্যটক গড়মান্দারণ গ্রামে এই আয়াসলভ্য দুর্গের বিশাল স্তূপ দেখিতে পাইবেন। দুর্গের নিম্নভাগ মাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে। অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে।'

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার ৯।১০ বছর পরে বর্ধমান জেলার রায়না-নিবাসী রাজেন্দ্রনাথ দাস দত্ত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার ১২ই বৈশাখ ১২৮১, তারিখের সংখ্যায় এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'গড়ের পরিসর দুই-তিন ক্রোশের অধিক হইবে। গড়ের ভিতর একটি গির্জা আছে।...এটি এখনও অক্ষুণ্ণ ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। ইহা দেখিতে নূতনের ন্যায়। এই গির্জার উপরে উঠিয়া বোধ হয় শত্রুপক্ষীয় সৈন্য দর্শন হইত।'

গড়মান্দারণে গিয়ে দেখেছি—এখানকার নবাসন গ্রামের কাছে সেই উচ্চ মিনারটি এখনও আছে।

বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে লিখেছেন—মান্দারণের গড়ের আধ ক্রোশ দূরে শৈলেশ্বরের মন্দির।—বাস্তবেও মান্দারণ গড়ের আধ ক্রোশ দূরে কাঁটালী গ্রামে এই শৈলেশ্বরের মন্দির আজও রয়েছে। পুরাতন মন্দির আজ আর নেই, শৈলেশ্বর বা শিব বর্তমানে একটি মাটির ঘরে থাকেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে, গড়মান্দারণ দেখে এসে দুর্গেশনন্দিনী লিখেছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই গড়মান্দারণের ভগ্নাবশেষ আজও যা সেখানে রয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়, মান্দারণ গড় একেবারে নগণ্য ছিল না। এই গড়ের অধীশ্বর রীতিমতই একজন প্রভাবশালী শাসনকর্তা ছিলেন।

এই গড় মান্দারণ যে এক সময়ে বীরেন্দ্র সিংহ হউন বা না হউন কোন হিন্দু রাজার অধীন ছিল, তার প্রমাণ পেলাম, গড়মান্দারণে গিয়ে যখন একাধিক ব্যক্তির মুখে শুনলাম—কয়েক বছর আগে দুটি রাখাল বালক গড়ের মধ্যে গরু চরাবার সময় দুটি স্বর্ণমুদ্রা কুড়িয়ে পেয়েছিল। ঐ দুটি স্বর্ণমুদ্রার একটিতে ছিল শিশু কৃষ্ণের মূর্তি, অপরটিতে ছিল ধেনুসহ কৃষ্ণমূর্তি।

মান্দারণ গড়ের ভিতরে আমোদর নদের (বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনী-তে এই আমোদরের কথাও বলেছেন) একেবারে গায়েই খুব উঁচু এক ঢিবির উপরে একটা সমাধি বেদি আছে। এর একটু দূরে আমোদরের অপর পারে আর এক ঢিবির উপর আর একটা সমাধি আছে। এই সমাধি দুটো এখানে যথাক্রমে বড় পীর সাহেবের ও ছোট পীর সাহেবের সমাধি বা আস্তানা নামে খ্যাত। ছোট পীর সাহেবের কবরের তত্ত্বাবধায়ক জনাব ইব্রাহিম হোসেনের সঙ্গে ঐ সমাধি প্রাঙ্গণে বসে আলাপ হয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন—এই দুই পীর সাহেব বা দুই প্রধান মুসলমান বীরেন্দ্র সিংহের দ্বাররক্ষক ছিলেন। এক জন অর্থাৎ এই ছোট পীর সাহেব ছিলেন গড়ের বাইরের দ্বারের রক্ষক; আর বড় পীর সাহেব ছিলেন গড়ের ভিতরের দ্বার রক্ষক। এঁরা বীরেন্দ্র সিংহের খুব বিশ্বস্ত ছিলেন। উভয়েরই নাম ছিল—ইসমাইল গাজী।

হোসেন সাহেব বললেন—বীরেন্দ্র সিংহেরও সঙ্গে পাঠানদের যে যুদ্ধ হয়ে

ছিল, সেই যুদ্ধে ব্যবহৃত একটা বেশ বড় তরবারি আজও আমার এক পিসতুত ভাই-এর কাছে আছে। সে পুরুষানুক্রমে সেটা রক্ষা করে আসছে।

দেখলাম, ছোট পীর সাহেবের সমাধির কাছে ঢিপির নীচে উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রশস্ত জায়গাটা বর্তমানে স্থানীয় মুসলমানদের ব্যবহৃত কবরখানা। হোসেন সাহেব কবরখানার কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন—কতলু খাঁর সৈন্যদলের সঙ্গে রাজা বীরেন্দ্র সিংহের সৈন্যদলের যুদ্ধে যে সব সৈন্য নিহত হয়েছিল, তাদের মৃতদেহগুলো এনে এখানে দু জায়গায় দুটা বিরাট কুয়োর মত খুঁড়ে, তাতে সমস্ত মৃতদেহ ফেলে ঐ দুটা বিরাট বিরাট কুয়োয় সমাধিস্থ করা হয়েছিল। সমাধিস্থ করে উপরে বড় বড় চৌকা কাল পাথর দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয়। সেই কুয়োর উপরের কাল পাথর এখনও দেখা যাচ্ছে।—এই বলে তিনি ঐ বিরাট কুয়ো কবর ও তার উপরের কাল পাথর দেখালেন।

হোসেন সাহেব বর্ণিত ইসমাইল গাজী, এই একই নামধারী দুই ব্যক্তি বীরেন্দ্র সিংহের প্রহরী ছিলেন ইত্যাদি কথায় হয়ত কিছু অসত্য থাকতে পারে; কিন্তু তাঁর দেখানো কুয়ো কবর দুটি যে সত্যই বিরাট বিরাট কুয়ো কবর তাতে সন্দেহ নেই। তাই এই গড়মান্দারণে যে এক সময় একটা যুদ্ধ হয়েছিল, সে কথা সত্য বলেই ধরা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কে কবে প্রথম 'ঋষি' আখ্যা দেন, এ সম্বন্ধে জানবার জন্যও আমি ঘুরেছি। সেই কথাটা এখন বলছি—

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ১১ বছর পরে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী তাঁর আনন্দমঠ ও আনন্দমঠের অন্তর্গত বন্দেমাতরম্ গান নিয়ে মেতে ওঠে এবং এই বই ও গান থেকেই দেশাত্মবোধের প্রেরণা লাভ করে। এই সময়েই তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে বন্দেমাতরম্ গীত বা মন্ত্রের জন্য 'ঋষি' আখ্যাও লাভ করেন। অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি তখন 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রকে কে প্রথম 'ঋষি' আখ্যা দেন, এই নিয়ে একটা মত-বিরোধ আছে। চন্দননগরের প্রবর্তক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী মতিলাল রায় তাঁর 'প্রবর্তক' পত্রিকার ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় লিখেছেন—বঙ্গভঙ্গের সময়ে, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এক সভায় সর্বপ্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' বলে ঘোষণা করেন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণ' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে লিখেছেন—বঙ্গভঙ্গের সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'বঙ্কিম উৎসব' শুরু করেছিলেন। সেই সময় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' বলে ঘোষণা করেন। এরপর অরবিন্দ বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লেখেন—'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' নামে।

কে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম ঋষি বলেন, এ নিয়ে এই মতবিরোধ থাকায়, আমি মতিবাবু এবং হেমেন্দ্রবাবু উভয়ের সঙ্গেই দেখা করেছিলাম। মতিবাবু বলেছিলেন—'আজ আর কিছু মনে নেই।' হেমেন্দ্রবাবু বলেছিলেন—'আমার পরিষ্কার মনে আছে, সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অফ ইয়ং মেন (পরবর্তীকালের ইউনিভারসিটি ইনিস্টিটিউট) এর এক সভায় স্যার গুরুদাস প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' বলে ঘোষণা করেছিলেন।'

এ নিয়ে ১৩৬৮ সালের ৩রা বৈশাখের আনন্দবাজার পত্রিকায় আমি একটা প্রবন্ধও লিখে ছিলাম। হেমেন্দ্রবাবুর কথাটাই ঠিক বলে মনে হয়।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অরবিন্দের 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল। তিনি ঐ প্রবন্ধে বন্দেমাতরম্ সংগীত প্রসঙ্গে লেখেন—

It was thirty two years ago that Bankim wrote this great song. The Mantra had been given and in a single day a whole people had been changed to the religion of patriotism.

অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া তথ্য—

আমি যেমন নানা জায়গায় ঘুরে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছি, তেমনি কখনও আবার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই বঙ্কিম প্রসঙ্গে নানা সংবাদও পেয়েছি।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—যে খায় চিনি, তাকে চিনি জোগান চিন্তামণি।

এখানে চিন্তামণি হলেন ঈশ্বর।

দেখা যায়, আক্ষরিক অর্থে এই প্রবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় না। তবে আমার বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গবেষণা বা সাধনায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেখেছি, আমি যা পাব বলে কোনদিন কল্পনা পর্যন্তও করতে পারিনি, একেবারে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই কিন্তু এমন অনেক পেয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই কম বেশী এরূপ অনেক তথ্য পাই।

এই প্রাপ্তিগুলি ঠিক কাকতালীয় নয়, বরং ঐ প্রবাদ বাক্যই এ সব ক্ষেত্রে ফলেছে বলেই আমি মনে করি। সে যাই হোক্, এখন এই অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া কয়েকটা বঙ্কিম-তথ্যের কথা এখানে বলছি—

১. ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসের একটা বিকাল। সেদিন আমাদের 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা' তখন বন্ধ করার সময় হয়ে এসেছে। এমন সময় শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সংগ্রহশালায় এলেন। এসে

নানা প্রশ্ন করে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা আমার কাছ থেকে জেনে নিলেন।

সব শুনে শেষে তিনি আমাকে বললেন—এইবার আমি আপনাকে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কাহিনী শোনাব, সেটা আমার পিতামহ শিবশংকর দাশগুপ্তের আমলের একটা বিরাট মামলার কথা। সেই মামলার কথা এ পর্যন্ত কোথাও লেখা হয় নি।

এই বলে শান্তিরঞ্জনবাবু একটি চাঞ্চল্যকর কাহিনী শোনালেন।

তাঁর মুখে কাহিনীটি শুনে তাঁর উপস্থিতিতে তখনই আমি ঘটনাটা লিখে নিয়েছিলাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের সেই অজ্ঞাত কাহিনীটি পেয়ে আমি প্রথমে আমার 'বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প' বইয়ে দিই। পরে আবার আমার 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়েও দিয়েছি।

এখানে আমার এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য সেই কাহিনীটি শুধু সংক্ষেপে বলছি—

জমিদার শিবশংকর দাশগুপ্তের বাড়ি ছিল বরিশাল জেলায়, কিন্তু তাঁর জমিদারি ছিল খুলনা জেলায়। শিবশংকরবাবুর ভগ্নীপতি রামসাগর সেন তাঁর জমিদারি দেখাশোনা করতেন।

এঁদের জমিদারির কাছারি বাড়ির অদূরে খুলনা জেলায় বাগেরহাট মহকুমার চিতলমারিতে একটা খুব বড় হাট ছিল। চিতলমারি ছিল স্থানীয় এক মুসলমান জমিদারের জমিদারির মধ্যে।

শিবশংকরের বা রামসাগরের এক নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ প্রজা চিতলমারির হাটে তামাক ও চিটেগুড় বিক্রি করতে যায়। গেলে চিটেগুড়ের দর নিয়ে এক মুসলমান খরিদ্দারের সঙ্গে ঐ বিক্রেতা ব্রাহ্মণের খুব কথা কাটাকাটি হয়। তখন মুসলমান খরিদ্দার রাগে ব্রাহ্মণের চিটেগুড়ের কলসী পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেয়। এতে কলসীর সমস্ত চিটেগুড় মাটিতে পড়ে যায়।

বিক্রেতা ব্রাহ্মণ ক্ষতি ও অপমান সহ্য করে চলে এসে তাদের জমিদারের প্রতিভূ রামসাগর সেনকে জানায়।

রামসাগরের সঙ্গে চিতলমারির মুসলমান জমিদারের আদৌ সদ্ভাব ছিল না। অনেক দিন থেকেই দুজনের মধ্যে একটা বিবাদ চলে আসছিল।

এই ঘটনার সুযোগে রামসাগর স্থানীয় নমঃশূদ্রদের ডেকে তাদের সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের অপমানের কথা তাদের বললেন। এও বললেন—হাটে গেলে ওখানকার লোকে আমাদের প্রজাদের উপর প্রায়ই অত্যাচার করে। তাই ঠিক করেছি—ঐ হাট লুঠ করাব। হাট লুঠ করে তোমরা তোমাদের ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার ও অপমানের প্রতিশোধ নাও। ভয় নেই, আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি।

রামসাগরের নির্দিষ্ট করা দিনে হাট লুঠ হ'ল। লুঠের ব্যাপারটা গোপন ছিল, তাই হাটের জমিদার বা হাটের দোকানীরা হঠাৎ আক্রমণে বাধা দিতে পারল না। ঐ বিরাট হাট শুধু লুঠই নয়, পুড়িয়ে একেবারে ভস্মীভূত করে দিল।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর কাছে হাট লুঠের খবর গেল। তিনি শুনে প্রথমে গেলেন চিতলমারিতে। গিয়ে জানতে পারলেন—এই লুঠের নায়ক রামসাগর সেন।

এদিকে বঙ্কিমচন্দ্র এসেছেন শুনেই রামসাগর পলাতক হলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তিন শ'র মত লুণ্ঠনকারীকে ধরে হাজতে পাঠালেন। পলাতক রামসাগরকেও ধরতে রওনা হলেন।

রামসাগর জমিদারি থেকে পালিয়ে বরিশাল জেলার মাটিভাঙ্গা গ্রামে এক গোয়ালার বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে গিয়ে রামসাগরকে গ্রেপ্তার করেন।

এই হাটের লুঠের মামলা চলেছিল ৬।৭ মাস। হাজতে রামসাগরের মৃত্যু হয়। ধৃত আসামীদের সকলেরই কমবেশী শাস্তি হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের দু একটা উপন্যাস পড়ে কোন কোন মুসলমান বঙ্কিমকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলে থাকেন। এই বিতর্কে না গিয়েও আমরা এই হাট লুঠের মামলায় দেখছি, বঙ্কিম মুসলমান জমিদারের পক্ষ নিয়েই অসংখ্য হিন্দু অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে ছিলেন।

২. 'বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র' শিরোনামে সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৩১এর ৩১ শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৩১-এর ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত ১৬ সংখ্যায় প্রথম আমার একটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়।

আমার এই লেখা তখন সবেমাত্র 'দেশে' ২।৩ কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেই সময় একদিন 'দেশ' অফিসে গিয়ে শুনলাম—কলকাতার এল্গিন্ রোডের (বর্তমান নাম লালা লাজপত রায় সরণি) কুন্তল মজুমদার চিঠি লিখে জানিয়েছেন, তাঁর কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের হাতে লেখা একটি অপ্রকাশিত ইংরাজি চিঠি আছে। তিনি চিঠিটা দিতে যান।

এই শুনে কুন্তলবাবুর বাড়ির ঠিকানা নিয়ে তখনই তাঁর কাছে গেলাম। গিয়ে আমার একটু পরিচয় দিলে, তিনি খুশী হয়ে চিঠিটা দিলেন।

চিঠিটা কিভাবে কোথায় পেলেন, এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় কুন্তলবাবু বললেন—আমার বাবা উকিল ছিলেন, তিনি তাঁর এক উকিল বন্ধুর কাছ থেকে এই চিঠিটা সংগ্রহ করেছিলেন। বাবার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসাবে আমি এটা পেয়েছি। সম্ভবতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কোন কন্যার বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই চিঠিটা কোনও উকিলকে লিখেছিলেন।

চিঠিটি এনে এ সম্পর্কে আমার সংগৃহীত তথ্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম—কনিষ্ঠা কন্যা উৎপলা কুমারীর মৃত্যুর ব্যাপার নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

আমার সংগৃহীত তথ্যাদির কথাটা এখানে একটু বলি—

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় বঙ্কিম-পরিবারের অনেকের চিঠি-পত্রের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশকে লেখা তাঁর স্ত্রীর কিছু চিঠি আছে। চিঠিগুলি একান্তই তাঁদের ব্যক্তিগত।

সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ হিসাবে এখানকার সমস্ত চিঠিপত্র তন্নতন্ন করে পড়ে দেখতে গিযে জ্যোতিশের স্ত্রীর একটা চিঠি পড়ে জানতে পারি—বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ জামাতা নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে গলায় দড়ি বেঁধে টাঙিয়ে রেখে প্রচার করেছিল—গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

জ্যোতিশের স্ত্রীর এই চিঠি থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর রহস্যটা জানা যায়। জ্যোতিশের স্ত্রীর ঐ চিঠি, কুন্তলবাবুর কাছ থেকে সংগৃহীত চিঠি ইত্যাদি নিয়ে তখন এ সম্পর্কে 'দেশ'য়ে একটা প্রবন্ধ লিখে-ছিলাম। তাতে জ্যোতিশকে লেখা জ্যোতিশের স্ত্রীর ঐ চিঠিটিও উদ্ধৃত করেছিলাম।

জ্যোতিশের স্ত্রীর লেখা এই চিঠি আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমাদের সংগ্রহশালায় রক্ষিত ঐ চিঠিটি নিয়ে আমিই প্রথম 'দেশে' আমার ঐ লেখার মধ্যে প্রকাশ করি।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী' গ্রন্থের ৭৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় আমার ঐ প্রবন্ধ থেকে নিয়ে জ্যোতিশের স্ত্রীর ঐ চিঠিটি উদ্ধৃত করেছেন। অথচ আমার প্রবন্ধ বা আমার নামও উচ্চারণ করেন নি। অমিত্রবাবু আমাদের সংগ্রহশালায় কোনদিন আসেন নি। ঐ চিঠি কোনদিন তিনি চোখেও দেখেন নি।

৩. 'বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র' শিরোনামে 'দেশ' পত্রিকায় ১ম দফায় ৩১.১২.১৯৩১ থেকে ১৫.৫.১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত ১৬ সংখ্যায় যেমন আমার একটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়, তেমনি কদিন পরেই ২য় দফায় আবার কয়েক সংখ্যা 'দেশে' ধারাবাহিক ভাবে 'বঙ্কিমচন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্র' শিরোনামে আমার আর একটি লেখা প্রকাশিত হয়।

সেই সময় একদিন 'দেশ' অফিসে গিয়ে যেমন শুনে ছিলাম—এলগিন রোডের কুন্তল মজুমদারের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা অপ্রকাশিত ইংরাজি চিঠি আছে, তেমনি ঐ সময় আর একদিন 'দেশ' অফিসে গেলে সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমাকে বললেন—শুনেছি কবি যতীন বাগচির বাড়িতে বঙ্কিম-চন্দ্রের একটা চিঠি আছে, খোঁজ করে দেখুন তো কথাটা সত্য কিনা?

সাগরময়বাবুর মুখে এই কথা শুনেই পরদিন বালীগঞ্জে যতীন্দ্রমোহন বাগচির বাড়িতে গেলাম। গিয়ে আমার একটু পরিচয় দিয়ে যতীনবাবুর পুত্রবধূ (স্বর্গীয় ফণীন্দ্রমোহনের স্ত্রী) শচীরানী দেবীর কাছ থেকে একটি চিঠি সংগ্রহ করি।

চিঠিটি পড়ে বুঝলাম—বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিটি লিখেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বঙ্কিমচন্দ্র এই রাখালবাবুকে গৃহজামাতা (ঘর জামাই) করে বাড়িতে রেখেছিলেন। রাখালবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন ঝিনাইদহের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তখন সেখান থেকেই জামাতাকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় জামাতা রাখালচন্দ্রকে সম্পাদক করে 'প্রচার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চিঠিতে প্রধানতঃ ঐ প্রচার পত্রিকা সম্বন্ধে কয়েকটা কথা রাখালকে লিখেছিলেন। রাখাল তখন কলকাতায় মেডিকেল কলেজের পূর্ব দিকে ৫ নং প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে শ্বশুর মশায়ের বাড়িতে ছিলেন।

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি কিভাবে যতীন বাগচির বাড়িতে গেল, এ সম্বন্ধে শচীরানী দেবীদের বাড়িতে খোঁজ খবর নিয়ে যা জানলাম, তাতে জানা গেল—রাখালের জ্যেষ্ঠ পুত্র দিব্যেন্দুসুন্দর এবং যতীন বাগচি উভয়ে এক সঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়তেন। যতীনবাবু বন্ধু দিব্যেন্দুসুন্দরের সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে কিভাবে বন্ধুর পিতাকে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ চিঠিটি সংগ্রহ করেছিলেন।

যতীনবাবুদের তখন বাড়ি ছিল আরপুলি লেনে। প্রতাপ চ্যাটাজী লেনের দক্ষিণ দিকে পরের গলিই হ'ল আরপুলি লেন।

৪· চন্দননগরের বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ হরিহর শেঠকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি হরিহরবাবুর কাছে আছে শুনে একদিন চন্দননগরে হরিহরবাবুর বাড়িতে যাই। গেলে সেদিন তিনি কথায় কথায় আমাকে বলেছিলেন—

'বঙ্কিমচন্দ্রের একটা ছোট ইংরাজি চিঠি আমার সংগ্রহে আছে, আমি একজনের কাছ থেকে সেটা সংগ্রহ করেছি। চিঠিটা কোথায় রেখেছি খুঁজে দেখতে হবে। তাই আজ আপনাকে চিঠিটা দেখাতে পারবো না। শ্রীরামপুরের সাহিত্যিক অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় আমার কাছ থেকে ঐ চিঠিটা নিয়ে তার একটা ফটোকপি করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আপনি তাঁর কাছে গেলেও চিঠিটা দেখতে পাবেন।

কিছুদিন পরে একদিন অমিয়বাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে ঐ চিঠিটা এনে আমি আবার এর একটা ফটো কপি করিয়ে নিই। (তখন আমাদের এখানে জেরক্স করার প্রথা চালু হয় নি।)

চিঠিটি পেলাম বটে, কিন্তু এর পাঠোদ্ধার করা মুস্কিল। অমিয়বাবুও পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি। আর চিঠির প্রসঙ্গ-কথা তো দূরের কথা। তিনি কিছুই জানতেন না।

হরিহরবাবু তখন আর জীবিত ছিলেন না। তিনি এ চিঠির কথা কিছু জানতেন কি না জানি না। যাই হোক্, আমি রীতিমত কষ্ট করেই কোন রকমে চিঠিটির পাঠোদ্ধার করি এবং চিঠির প্রসঙ্গ কথাও কিছুটা আন্দাজ করি। সেকথা এখানে বলছি—

চিঠিটি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মে তারিখে কলকাতার ৯২ নং বৌবাজার স্ট্রীট (বর্তমান নাম বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) থেকে লেখা। বঙ্কিমচন্দ্র তখন এই বাড়িতে সপরিবারে থাকতেন এবং আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আলিপুরে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আসেন ১৮৮২র জানুয়ারিতে। এর আগে তিনি বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ছিলেন। হাওড়ায় আসার আগে তিনি হুগলীতে একটানা কয়েক বছর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। চিঠিটি বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী বেড়াতে যাওয়া নিয়েই, ওখানকার তাঁর পরিচিত কোন এক ভুবনবাবুকে লেখা। চিঠিটি এই—

92 Bow Bazar Street
May 31/82

My dear Bhuban Babu,

Excuse my not replying to you earlier. I do not know any thing about my going to Hooghly, though for aught I know the thing may happen.

Trusting you are all well.

I am yours loving
Bankim Ch. Chatterji

৫. ১৯৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস প্রকাশের শত-বার্ষিকীর সময় নৈহাটী বঙ্কিম একাডেমির যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য ও রণেন মুখোপাধ্যায় আমাকে বিশেষ করে বলেন—আনন্দমঠ-১ম সংস্করণ বইটা সম্পাদনা করে দিতে হবে।

এঁরা আরও বলেন—ঐ বইএর প্রথমেই আমার একটি সম্পদাকীয় প্রবন্ধ থাকবে। আর বইয়ে থাকবে 'বঙ্কিম একাডেমি'র সভাপতি অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মুখবন্ধ বা ভূমিকা প্রবন্ধ।

এই সময় দুষ্প্রাপ্য আনন্দমঠ-১ম সংস্করণ বইটা কোথায় পাব ক'দিন ধরেই যখন ভাবছি, সেই সময় আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু-স্থানীয় বোম্বাই-প্রবাসী

বোম্বাই-এর এশিয়ান বুক ট্রাস্টের অবৈতনিক সম্পাদক নন্দদুলাল মজুমদার একদিন আমার কলকাতার বাড়িতে আসেন। এসে নিজেই বলেন—আমাদের এশিয়ান বুক ট্রাস্ট থেকে আনন্দমঠ ১ম সংস্করণের একটা ইংরাজি অনুবাদ করাবার কথা ভাবছি। এজন্য অনেক কষ্টে আনন্দমঠ-১ম সংস্করণ—একটা বইও সংগ্রহ করেছি। সেই বইএর একটা জেরক্স কপি আপনাকে দিয়ে যাব।

এই বলে নন্দদুলালবাবু আনন্দমঠ ১ম সংস্করণ বইএর একটা জেরক্স কপি তখন আমাকে দিয়ে ছিলেন।

৬. নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযান দেখতে গেলে, সেখানে অধ্যাপক নির্মল বসুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি তখন সেখানে গান্ধীজীর সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করছিলেন।

এরপরেও কলকাতায় নির্মলবাবুর সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে এবং কথাবার্তাও হয়েছে।

কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মাঝে মাঝে যেমন পড়াশুনা করতে যাই, সেদিনও তেমনি গেছি। গেলে আমাকে দেখেই সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সম্পাদক নৃতত্ত্ববিদ্ ঐ অধ্যাপক নির্মল বসু বললেন—Caste in Lower Bengal নামে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা অপ্রকাশিত ইংরাজি রচনা পেয়েছি। ১৮৭২ সালে প্রথম আদম সুমারির সময় বঙ্কিমচন্দ্র এটা লিখেছিলেন। তিনি তখন মেদিনীপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। লেখাটা আমাদের Man in India পত্রিকার ১৯৬১র জুলাই—সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'Bankimchandra on Caste' শিরোনামে ছাপছি। আপনি এখান থেকে যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে যাব এবং আজই ঐ লেখার একটা ছাপা কপি আপনাকে দোব।

সাহিত্য পরিষদ থেকে ফেরার সময় সেদিনই নির্মলবাবুর সঙ্গে গিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে ঐ লেখাটা আনি।

পরে আমার 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে 'বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা' অধ্যায়ে এই লেখাটিও দিয়েছি।

কয়েকটি বিষয়ে কিছু বক্তব্য—

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখেছেন—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রথম ছাপা হয়েছিল। এবং প্রথমবারে দু হাজার কপি ছাপা হয়েছিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত তাঁদের সম্পাদিত 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বলেছেন, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এ বই প্রথম ছাপা হয়েছিল।

'কমলাকান্তের দপ্তর' ১ম সংস্করণ কোথাও পেলাম না।

ব্রজেনবাবুরা 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র প্রথম সংস্করণ দেখে যদি ঐ তারিখ লিখে থাকেন, তাহলে তাঁদের কথা ঠিক বলা যেতে পারে।

এবার 'কমলাকান্তের দপ্তর' নিয়ে একটা কথা—

'কমলাকান্তের দপ্তর'এর ১ম সংস্করণে মোট ১১টি প্রবন্ধ ছিল। সবগুলিই আগে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখে ছিলেন—

'কমলাকান্তের দপ্তর' বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। বঙ্গদর্শনে যে কয় সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'চন্দ্রালোকে', 'মশক' এবং 'স্ত্রীলোকের রূপ' এই তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে, এই জন্য ঐ তিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না।'

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কমলাকান্তের দপ্তর পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়। তখন এই বইয়ের নাম হয়—কমলাকান্ত।

'কমলাকান্ত' বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের পত্র' এবং 'কমলাকান্তের জোবান বন্দী' নামে দুটি নতুন অংশ যোজনা করেন। আর 'কমলাকান্তের দপ্তরে' আগের পরিত্যক্ত 'চন্দ্রালোকে' ও 'স্ত্রীলোকের রূপ' প্রবন্ধ দুটিও দিয়ে দেন। অবশ্য এ দুটি রচনা যে যথাক্রমে অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা সে কথা ভূমিকাতে উল্লেখ করেন।

এই 'কমলাকন্ত' বইয়ের ২য় সংস্করণ বেরোয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই অর্থাৎ ১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসে।

এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বা ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'ঢেঁকি' শীর্ষক প্রবন্ধটি ভুল ক্রমে পূর্ব সংস্করণ-ভুক্ত হয় নাই। উহাও বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল।'

কমলাকান্তের অন্তর্গত এই 'ঢেঁকি' এবং 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' সবই প্রকাশিত হয়েছিল, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত, তাঁদের সম্পাদিত 'কমলাকান্ত' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'কাকাতুয়া' নামে একটি প্রবন্ধ দিয়েছেন। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৯ সালের কার্তিক মাসের বঙ্গদর্শনে।

কমলাকান্তের 'পরিশিষ্টে' এই রচনাটি দিয়ে এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত তাঁদের বই এর ভূমিকায় লিখেছেন—

'কাকাতুয়া কাহার লেখা জোর করিয়া বলা যায় না। তথাপি যখন

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত বলিয়া বঙ্গদর্শনে উল্লেখ আছে এবং ঐ বৎসরেই প্রকাশিত 'শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত' 'ঢেঁকি' যখন 'কমলাকান্তে' স্থান পাইয়াছে এবং যখন 'চন্দ্রালোকে', 'স্ত্রী লোকের রূপ' ও 'মশকে'র মত অপর কোন লেখকের উপর ইহার রচনা দায়িত্ব অর্পণ করা যাইতেছে না, তখন কমলাকান্তের সর্বশেষ রচনা বলিয়া 'কাকাতুয়া'র সম্মান হওয়া উচিত। এই বিবেচনায় এই বিস্মৃত রচনাটি 'পাঠভেদে'র পর পরিশিষ্টে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।'

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তর এই লেখাটি সম্বন্ধে এখন আমার কিছু বলার আছে—

'কাকাতুয়া কার লেখা জোর করে বলা যায় না'—ব্রজেনবাবুরা একথা বলেও অহেতুক তাঁদের সম্পাদিত 'কমলাকান্তে'র পরিশিষ্টে ঐ রচনাটি দিয়ে গেলেন। 'কাকাতুয়া' কমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত শেষ রচনা এটা সত্য। কিন্তু তাই বলে এ রচনা কমলাকান্ত নামধারী 'মশক' প্রভৃতির লেখকের উপর বা বঙ্কিম ব্যতীত কমলাকান্ত নামধারী অপর কোন লেখকের উপর এর রচনা দায়িত্ব দেওয়া যাবে না কেন? কমলাকান্ত নাম নিয়ে অন্য লেখকেও লিখতেন যখন দেখা যাচ্ছে, তখন এ লেখা বঙ্কিম ছাড়া অন্য লেখকেরও তো হতে পারে?

'কাকাতুয়া' যে বঙ্কিমের লেখা নয় বা হতে পারে না, সে সম্বন্ধে আমার যুক্তিগুলি এই—

১। 'ঢেঁকি' প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে। আর 'কাকাতুয়া' প্রকাশিত হয় ঐ ১২৮৯ সালেরই কার্তিক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে।

ঢেঁকি ও কাকাতুয়া বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার অন্ততঃ বছর দুয়েক পরে 'কমলাকান্ত' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এরও ছ বছর পরে কমলাকান্তর যখন ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন পূর্ব সংস্করণে দিতে ভুল হয়েছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র এতে ঢেঁকি প্রবন্ধটি দেন।

কাকাতুয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হলে কমলাকান্তের ১ম সংস্করণে না হলেও, ২য় সংস্করণেও ঐ ঢেঁকি প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত করার মত কাকাতুয়াও অন্তর্ভুক্ত করতেন।

তাই কাকাতুয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয় বলেই আমি মনে করি।

২। 'কাকাতুয়া' প্রবন্ধের প্রথমেই আছে—কমলাকান্ত সকালে স্নানাদি সেরে গুড় ছোলা খেয়ে তামাক টানছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তে' কোথাও কমলাকান্তকে গুড় ছোলা খেতে দেখা যায় না। তার খাওয়া বা ঐরূপ হালকা খাওয়া সম্বন্ধে সারা বইয়ে যা আছে, সে কেবল প্রসন্নর দেওয়া দুধ, ছানা ইত্যাদির কথা। আর তাও স্নান সেরে সকালে খাওয়া নয়।

আরও বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তে' কমলাকান্তকে কোথাও তামাক খেতে দেখা যায় না। কেবল 'বিড়াল' প্রবন্ধে আছে—আহার প্রস্তুত না হওয়ার জন্যই কমলাকান্ত হুঁকা হাতে ঝিমুতে ঝিমুতে (নিশ্চয় আফিং খেয়েই) চোখ বুজে ভাবছিল, সে নেপোলিয়ন হলে ওয়াটালুর যুদ্ধে জিততে পারত কি না।

অতএব গুড় ছোলা খেয়ে তামাক টানা কমলাকান্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত নয় বলেই আমার দৃঢ় ধারণা।

কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামধারী বঙ্গদর্শনের অপর লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পৌত্রদের কাছে শুনেছি, অক্ষয়বাবু প্রত্যহ সকালে গুড় ছোলা খেতেন এবং তামাকও খেতেন,। তাই সন্দেহ হয় 'কাকাতুয়া' ঐ অক্ষয়বাবুর লেখা নয়তো ?

৩। কাকাতুয়ার লেখক কাকাতুয়ার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—আমি পাখি নই। বহু কাল পূর্বে কৃষ্ণসাগরের নিকট আমার বাস ছিল, তখন আমি শূকর ছিলাম। কৃষ্ণসাগরের নিকটের অধিবাসী মানুষরা পাঁক ঘাঁটিতাম বলে পাঁকাল মাছ ভেবে আমাদের ধরে ধরে খেত।

কৃষ্ণসাগরের লাগোয়া দক্ষিণে তুরস্ক দেশ। তুরস্কের অধিবাসীদের তুর্কী বলে। তুর্কী মহম্মদ ঘোরী কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে লুঠপাট ও নানা অত্যাচার করেছিলেন এবং পরে ভারতে মুসলমান রাজত্বও স্থাপন করেন। এর পরে আবার তুর্কী বখতিয়ার খিলজি গৌড় বঙ্গ আক্রমণ ও জয় করে এখানে মুসলমান শাসন প্রবর্তন করেন।

তুর্কীদের ঐ ভারত ও বাঙ্গলা আক্রমণ এবং অত্যাচারের কথা মনে করে কেউ তুরস্কবাসীদের সম্বন্ধে ঐ কথা লেখেননি তো ?

'কাকাতুয়া কার লেখা জোর করে বলা যায় না', বলেও ব্রজেনবাবুরা তাঁদের সম্পাদিত 'কমলাকান্তের' পরিশিষ্টে 'কাকাতুয়া' রচনাটি দিয়ে যাওয়ায় একটা বিপদ হয়েছে এই যে, বঙ্কিম-গবেষক ও বঙ্কিম-প্রসঙ্গের লেখকরা ব্রজেনবাবুদের ঐ কার লেখা বলা যায় না, কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে এটাকে বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা বলে চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আলোচনাও করে চলেছেন।

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত 'সাহিত্য সংসদ' থেকে প্রকাশিত 'বঙ্কিম রচনাবলী'তে দেখছি, কোনরূপ মন্তব্য ছাড়াই এটাকে বঙ্কিমেরই রচনা বলে কমলাকান্তের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু 'কাকাতুয়া'র মাথায় 'পরিশিষ্ট' কথাটা লিখে দেওয়া হয়েছে।

এই 'পরিশিষ্ট' যে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তর একটা মন্তব্যসহ 'পরিশিষ্ট', যোগেশ বাগলের বই থেকে তা আদৌ বোঝা যাবে না। এ বই পড়লে, পাঠক-পাঠিকারা ভাববেন—বঙ্কিম নিজেই তাঁর মূল বইয়ে ঐ রকম করে গেছেন ; এই কাকাতুয়া প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা।

এই 'কাকাতুয়া' প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা স্থির সিদ্ধান্ত করে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী' গ্রন্থের ৫৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—কাকাতুয়া শীর্ষক রচনাটির পিছনে বঙ্কিম-হেষ্টি বিরোধের কিছু প্রতিক্রিয়া কাজ করেছে বলে মনে হয়। রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্র পরে তাঁর গ্রন্থভুক্ত করেন নি। একালে বঙ্কিম-রচনাবলীতে এটি সংকলিত হয়েছে।

অমিত্রবাবুর এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—

কাকাতুয়া রচনার পিছনে বঙ্কিম-হেষ্টি বিরোধের প্রতিক্রিয়া থাকবে কেন? বঙ্কিম-হেষ্টি বিরোধ সে তো অন্য ব্যাপার!

১৮৮২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে ঐ বংশের মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পিতামহীর দানসাগর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাদ্ধের তিন দিন পরে ২০শে সেপ্টেম্বর ঐ শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ স্টেট্সম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত বিবরণের মধ্যে একথাও ছিল যে, রাজবাড়ির গৃহ-দেবতা গোপীনাথজীকে রূপার সিংহাসনে শ্রাদ্ধ সভায় রাখা হয়েছিল।

গোপীনাথজীকে শ্রাদ্ধ সভায় রাখার কথা পড়েই জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনিষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড হেষ্টি হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ইত্যাদি নিয়ে হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে ২২শে সেপ্টেম্বর স্টেট্সম্যান পত্রিকায় চিঠি-পত্রের কলমে এক চিটি প্রকাশ করেন। তখন ঐ পত্রিকা ছিল সাহেবদের এবং পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন সাহেব।

২৩শে সেপ্টেম্বর স্টেট্সম্যান পত্রিকায় হেষ্টির আবার একটা চিঠি প্রকাশিত হ'ল। তিন দিন পরে ২৬শে তারিখে আবার তাঁর একটা চিঠি প্রকাশিত হয়।

হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে চিঠি লেখায় তখন বঙ্কিমচন্দ্র স্টেট্সম্যান পত্রিকাতেই এর উত্তর দিয়েছিলেন। এই নিয়ে ঐ কাগজে তখন হেষ্টির সঙ্গে বঙ্কিমের কয়েকটি চিঠি লেখালিখি হয়েছিল।

এই হ'ল বঙ্কিম-হেষ্টি বিরোধের ঘটনা। এর সঙ্গে কাকাতুয়ার সম্পর্ক কোথায়?

অমিত্রবাবু লিখেছেন—কাকাতুয়া রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্র পরে আর গ্রন্থভুক্ত করেন নি। একালে বঙ্কিম-রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে।

বঙ্কিম কাকাতুয়াকে কেন তাঁর গ্রন্থভুক্ত করেন নি, সে কথা একটু আগেই বলেছি। এক তো এ তাঁর নিজের রচনা নয়, দ্বিতীয়তঃ বঙ্কিম কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামধারী অপরের দু'একটা লেখা তাঁর 'কমলাকান্ত' গ্রন্থে দিলেও এ রচনাটিও হয়ত দিতে পারতেন, যদি রচনাটির মধ্যে কিছু আপত্তিকর না থাকতো।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস 'কাকাতুয়া'কে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে নিশ্চিত হতে পারেন নি। তাঁরা তাঁদের এই অনিশ্চয়তার মন্তব্য সহ-ই শুধু কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামধারী কারও লেখা বলেই বই-এর শেষে 'পরিশিষ্টে' এই রচনাটা দিয়েছেন।

এ কালের বঙ্কিম-রচনাবলীর সংকলকরা ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তর অনিশ্চয়তার মন্তব্য উড়িয়ে দিয়ে, বঙ্কিমেরই লেখা বলে যাচ্ছেন। এক প্রকাশক তাঁদের বঙ্কিম-রচনাবলীতে আমাকে উপদেষ্টা করবার জন্য এলে, তাঁদের বইয়ে 'কাকাতুয়া' দিতে নিষেধ করেছিলেন।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী' গ্রন্থের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'হেমচন্দ্র-প্রণীত বৃত্রসংহার প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি (১২৮১ বঙ্গাব্দে); আর বঙ্গদর্শনে ওই কাব্যের সমালোচনা প্রকাশিত ১৮৭৫-এর জানুয়ারি সংখ্যাতেই ; গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই। স্পষ্ট অনুমান করা যায়, গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই কাব্যের প্রেস কপি অথবা ছাপা ফাইল দেখে বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের সমালোচনা লিখেছিলেন এবং বাজারে বই প্রকাশের পূর্বেই বঙ্গদর্শনের প্রেসে এই বইয়ের সমালোচনাটি মুদ্রণকার্য চলছিল।'

অমিত্রবাবু লিখেছেন—'বৃত্রসংহার প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি (১২৮১ বঙ্গাব্দ)।'

অমিত্রবাবু এখানে ইংরাজি সনের সঙ্গে যেমন মাস ও তারিখ দিয়েছেন, তেমনি তিনি শুধু ১২৮১ বঙ্গাব্দ না বলে, ঐ বঙ্গাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দের মাস ও মাসের তারিখ যদি বলতেন, তাহলে বোঝা যেত ১২৮১ বঙ্গাব্দের কোন্ মাসের কোন্ তারিখে বৃত্রসংহার প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তা বলেন নি।

এ বছর ১৯৭১-এর ১৪ই জানুয়ারি তো দেখছি ২৯শে পৌষ। ১৬ই জানুয়ারি হ'ল ১লা মাঘ।

অমিত্রবাবু লিখেছেন—বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বর্ষের দশম সংখ্যা (অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা) প্রকাশিত হয় ১২৮১ মাঘে (১৮৭৫ জানুয়ারি)।'

এখন আমার প্রশ্ন—অমিত্রবাবু যে বলেছেন, মাঘ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল —মাঘে ; তা মাঘ বলতে কি মাঘের একেবারে প্রথমেই ১, ২ তারিখেই, না মাঘের মাঝামাঝি, না মাঘের শেষ দিক করে ?

ঐ সময় প্রতি মাসের বঙ্গদর্শন যে একেবারে মাসের প্রথমেই ১, ২ তারিখে প্রকাশিত হ'ত তার কোন প্রমাণ নেই।

অমিত্রবাবু তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী' গ্রন্থের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—'চতুর্থ বৎসরের বঙ্গদর্শনের প্রকাশ যথেষ্ট অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল। পত্রিকার প্রতি সংখ্যা প্রকাশ দু আড়াই মাস পিছিয়ে পড়েছিল।'

৪র্থ বর্ষের বঙ্গদর্শনের প্রতি সংখ্যার প্রকাশ যখন দু মাস আড়াই মাস করে পিছিয়ে পড়েছিল, তখন ৩য় বর্ষের বঙ্গদর্শনের সংখ্যাগুলিও অন্ততঃ শেষ দিকের সংখ্যাগুলি হয়ত ঠিক সময়ে প্রকাশিত হত না। দু আড়াই মাস না হোক্‌ অন্ততঃ এক আধ মাস পিছিয়ে পড়েছিল।

পিছিয়ে নাই পড়ুক, ৩য় বর্ষের মাঘ সংখ্যা যদি মাঘের ১, ২ তারিখে প্রকাশিত না হয়ে মাঘের মাঝামাঝি অথবা মাঘের শেষ দিক করে প্রকাশিত হয় তাহলেও দাঁড়ায় ৩য় বর্ষের মাঘ সংখ্যা বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল—১৮৭৫এর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে অথবা মাঝামাঝি নাগাদ।

তাই যদি হয়, তাহলে ১৮৭৫এর জানুয়ারি বৃত্রসংহার বেরুলে সেই বই সঙ্গে সঙ্গে না হোক্‌ দু চার দিন পরেও বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রকে দিলে বঙ্কিমচন্দ্র বই পড়ে লিখে দিলে নিজেদের প্রেস থেকে প্রকাশিত বঙ্গদর্শনের মাঘ সংখ্যায় সে লেখা বেরোনো মোটেই অসম্ভব নয়। আর ঐ সময়কার বঙ্গদর্শনের প্রকাশ অন্ততঃ এক আধ মাস পিছিয়ে পড়লে তো কথাই নেই।

অতএব অমিত্রবাবু যে লিখেছেন—'স্পষ্ট অনুমান করা যায়, গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্বেই কাব্যের প্রেস কপি দেখে অথবা ছাপা ফাইল দেখে বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থের সমালোচনা লিখেছিলেন।' এ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বৃত্রসংহার থেকে এক সঙ্গে পাতার পর পাতা উদ্ধৃতি দিয়ে যেভাবে বৃত্রসংহারের সমালোচনা করা হয়েছে, তাতে সত্যই এ লেখা বঙ্কিমের কিনা সন্দেহ হয়।

এবার আর একটা কথা—অমিত্রবাবু লিখেছেন—চতুর্থ বৎসরের বঙ্গদর্শনের প্রকাশ যথেষ্ট অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল। পত্রিকার প্রতি সংখ্যার প্রকাশে দু-আড়াই মাস পিছিয়ে পড়েছিল।

অমিত্রবাবু একথা লিখেও তাঁর বইয়ে সমানে লিখে গেছেন—বঙ্গদর্শনের ৪র্থ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮২ শ্রাবণে (১৮৭৫ জুলাই)। ৪র্থ বর্ষের ৫ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮২ ভাদ্রে (১৮৭৫ আগস্ট)। ৬ষ্ট সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮২ আশ্বিনে (১৮৭৫ সেপ্টেম্বর)। ৭ম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮২ কার্তিকে (১৮৭৫ অক্টোবর) ইত্যাদি ইত্যাদি।

অমিত্রবাবু এইভাবে, কি বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনার সময়কার, আর কি সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনার সময়কার বঙ্গদর্শনের প্রতি মাসের প্রকাশকাল সেই সেই মাসই লিখে গেছেন। আর বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যার প্রকাশকাল ইংরাজি মাসের প্রথমার্ধে না হলে—সাধারণতঃ কবে প্রকাশিত হত যখন জানা যায় না তখন—একটা পুরা বাঙ্গলা মাসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য যে ইংরাজি পর পর দু মাসের উল্লেখ করা দরকার, তা করেন নি।

তাঁর বইয়ে একটা জায়গায় মাত্র চোখে পড়ল লিখেছেন—'বঙ্গ-দর্শনে ১৮৭৫-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর (১২৮২ আশ্বিন) সংখ্যায়'—পৃঃ ৩৮৩।

১২৯২ সালের ফাল্গুন-চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা 'প্রচারে' 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

'প্রচার' পত্রিকার ভিতরে এই প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের নাম না থাকলেও পত্রিকার মলাটে সূচীপত্রে এই প্রবন্ধের লেখক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম আছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস 'প্রচারে'র ঐ মলাট দেখতে পান নি বলেই হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ রচনাটি তাঁদের সম্পাদিত 'বঙ্কিম রচনা-বলী'র অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি।

যোগেশচন্দ্র বাগল ব্রজেনবাবুদের অনুকরণ করেছেন বলেই তিনিও সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্কিম রচনাবলী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ 'দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' প্রবন্ধটি দিতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কারও লেখায় বঙ্কিম সম্বন্ধে ভুল বা অসত্য দেখলে সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে অথবা আমার বইয়েও বিভিন্ন সময়ে সে সবের প্রতিবাদও করেছি। এখানে এইরূপ দু একটা প্রতিবাদের কথা বলছি —

২৬.৮.৭১ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'সাগর ও সম্রাট' নামে অর্থাৎ বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধের এক জায়গায় অমিত্রবাবু লিখেছেন 'আমার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র জীবন ব্যাপী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে গিয়ে ছিলেন।'

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ অব্দে প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেন— 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংলা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।'

বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের ভাষাকে অতি সুমধুর মনোহর ইত্যাদি বলে যে প্রশংসা করেছিলেন, বঙ্কিমের ঐ লিখিত বক্তব্যকে অস্বীকার করে অমিত্রবাবু লিখেছেন—'আমাদের প্রশ্ন বঙ্কিম সত্যই কি এখানে বিদ্যাসাগরের ভাষার মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন? আমার তা মনে হয় না।...বঙ্কিম যে বিদ্যাসাগরের ভাষাকে অতি মনোহর বলেছেন, তা নিতান্তই তাঁর মৌখিক উক্তি মাত্র। আসলে স্তুতির ছলে বিদ্যাসাগরের নিন্দাই করেছেন। বঙ্কিম সুদক্ষ লেখক ছিলেন।...তিনি কলম চালাতে জানতেন, আবার তিনি আদালতও চালাতেন।'

ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের প্রণেতা ও গীতার ব্যাখ্যাকার প্রবীণ বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ একটা সহজ সরল উক্তিকে, কপট উক্তি ইতিপূর্বে আর কেউই কোন দিনই বলেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় এই সময়েই তরুণ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ স্বভাব এবং বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র।'

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বঙ্কিমের এই কথাকেও কি মিথ্যা উক্তি বলতে হবে?

ঐ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দেই বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষার বাংলা সংকলন গ্রন্থটি করতে গিয়ে তাতে বিদ্যাসাগরের দুটি রচনা দিয়ে ভূমিকায় লিখেছিলেন—Pandit Iswar Chandra Vidyasagar's beautiful renderings from Kalidasa.

একেও কি বলতে হবে, বঙ্কিম এখানেও স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকদের কাছে কপট হয়ে বিদ্যাসাগরের স্তুতির ছলে নিন্দাই করেছিলেন?

বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা ঐ এনট্রান্সের বাংলা সংকলন গ্রন্থে দেন নি। তখনকার অন্য অনেক গদ্য লেখকের রচনা ঐ সংকলন গ্রন্থে না দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুটি রচনা দিয়েছিলেন এবং ভূমিকাতেও ঐ কথা বলেছিলেন।

এতেও কি প্রমাণ হয় না যে, বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি বা সাহিত্য প্রতিভাকে স্বীকার করতেন?

বঙ্কিম তাঁর 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধের উপসংহারে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'তিনি বিজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, দেশহিতৈষী এবং সুলেখক, ইহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অনেক ঋণে বদ্ধ। এ কথা যদি আমরা বিস্মৃত হই, তবে আমরা কৃতঘ্ন।'

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে বঙ্কিম তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন—'তাঁহার শোকে আমরা সকলেই কাতর।...সকলেই রোদন করিতেছি।'

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্রের বিয়ের সময়কার একটা কাহিনী মনে পড়ছে। কাহিনীটি শচীশবাবু নিজেই তাঁর পুত্রসম স্নেহভাজন নাট্য-গবেষক অমল মিত্রের কাছে একদিন বলেছিলেন। এ কাহিনী আমি অমলবাবুর কাছে এবং তাঁর ভাই নির্মলবাবুর কাছেও শুনেছি।

কাহিনীটি বলার আগে পাঠক-পাঠিকাদের শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শচীশবাবুর পিতা শ্যামাচরণবাবুও একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আর শচীশবাবুর বিয়ে হয়েছিল ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যার সঙ্গে। এবার কাহিনীটি বলছি—

শচীশবাবুর পিতা ও পিতৃব্যদের সঙ্গে কলকাতার পাইকপাড়ার রাজবাড়ির কর্তাদের বিশেষ পরিচয় ছিল। শ্যামাচরণবাবু এই সূত্রেই পুত্রের বিবাহের সময় পাইকপাড়ার রাজবাড়ির 'বর'দের জন্য তৈরি করানো মখমলের দামী পোষাক, জরির টুপি, মণিমুক্তার মালা প্রভৃতি, এমন কি সুন্দর ল্যাণ্ডো জুড়ি গাড়ীটিও আনিয়ে ছিলেন। এদিকে দামোদরবাবুও আর কোন পুত্রকন্যা না থাকায়, একমাত্র কন্যার বিবাহে মহা আড়ম্বর ও আয়োজন করেছিলেন। কন্যার বিবাহে তিনি তাঁর পরিচিত গণ্য-মান্য ব্যক্তি, বন্ধুবান্ধব ও বহু আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

বিয়ের রাত্রে বর শচীশচন্দ্র পাইকপাড়ার রাজাদের মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হয়ে রাজকীয় বেশে রাজাদের দামী গাড়িতে করে কলকাতাতেই পাত্রীর বাড়িতে গেলেন। বর গেলে বিছানার সাদা চাদরের ন্যায় ঐরূপ একটা সাধারণ চাদর গায়ে এক বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে গাড়ি থেকে বরকে নামাতে গেলেন।

শচীশ দেখলেন, বৃদ্ধের পোষাক যেমন অতি সাধারণ, চেহারাতেও তেমনি কোন জৌলুষ নেই। তাই পাছে রাজাদের দামী মখমলের পোষাকে বৃদ্ধের হাত লাগে, এই ভেবে তিনি বাঁ হাত দিয়ে বৃদ্ধের বাড়ানো হাতটা সরিয়ে দিলেন এবং নিজেই গাড়ি থেকে নামলেন।

শচীশ দেখেন নি যে, তাঁর সেজকাকা বঙ্কিমচন্দ্রও সেখানে অনেকের সঙ্গে পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। শচীশ গাড়ি থেকে নামলে, বঙ্কিমচন্দ্র গম্ভীর স্বরে ঐ বৃদ্ধকে দেখিয়ে বললেন—শচীশ প্রণাম কর। উনি বিদ্যাসাগর মশায়।

বিদ্যাসাগর মশায় নাম শুনেই শচীশ চমকে উঠলেন। লজ্জায় তাঁর মাথা হেঁট হয়ে গেল। তিনি তাঁর সেই হেঁট মাথা বিদ্যাসাগর মশায়ের পায়ের উপর রেখে মনে মনে ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর মশায় শচীশকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এই যে কাহিনীটি এখানে বললাম, এতে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি একদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন ইঙ্গিতে তিরস্কার, অপরদিকে তেমনি বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধারও পরিচয় পাওয়া গেল না কি?

বিদ্যাসাগর মশায়ের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। তখন তিনি সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগর মশায়ের পুত্রের কাছেই একটি শোকসূচক পত্রও লিখেছিলেন। এ সম্বন্ধে বিহারীলাল সরকার তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে লিখে গেছেন—'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর হইবার পর বঙ্কিমবাবু একখানি সমবেদনাসূচক পত্র লিখিয়া ছিলেন। সে পত্রও পাওয়া যায় নাই।'

অতএব অমিত্রবাবু যে বলেছেন—বঙ্কিম সারা জীবন বিদ্যাসাগরের উপর বিরূপ ছিলেন—এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এ অমিত্রবাবুর একটা ভুল উক্তি।

সঞ্জীবচন্দ্র

ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় অধ্যক্ষ হিসাবে এসে বঙ্কিম-গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধেও নানা সূত্র থেকে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখি। পরে ১৩৩৮ সালে 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য' নামে একটি বইও রচনা করি।

আমার এই বই সম্বন্ধে তখন 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর' ও 'সত্যযুগ'য়ে আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত (এঁদের আজও চিনি না) সমালোচকরা যা যা লিখেছিলেন, এখানে সেই লেখা ৩টির কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি। এঁদের এই আলোচনা থেকেই জানা যাবে সঞ্জীবচন্দ্র সম্বন্ধে আমি কতটা কি করেছি বা করতে পেরেছি।

১৩৩৮ সালের ১৬ই ভাদ্র তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকার পুস্তক বিভাগে 'উদাসীন প্রতিভাবন' শিরোনাম দিয়ে আমার এই 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য' বইয়ের সমালোচনা বেরিয়েছিল। সমালোচনা করেছিলেন অনিল গঙ্গোপাধ্যায়। তার কিছুটা এই—

'সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন ও রচনা বিষয়ক একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থের প্রয়োজন দীর্ঘদিনের। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অনুজ বঙ্কিমচন্দ্র 'সঞ্জীবনী সুধা' নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন, তাই তাঁর জীবন সংক্রান্ত একমাত্র আকর গ্রন্থ। অগ্রজ সম্পর্কে অধিক লেখার স্বাভাবিক সঙ্কোচের জন্য জীবন পরিচিতি অংশটি নিতান্তই ক্ষুদ্র।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় একজন প্রতিষ্ঠিত গবেষক। তিনি এই গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের অজ্ঞাত তথ্য ও অপ্রকাশিত রচনা সম্পর্কে রচনা করে একটি গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং গোপালবাবুর আলোচনায় মানুষ হিসেবে সঞ্জীবচন্দ্রের যে উদাসীন খেয়ালী প্রকৃতির পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতেও প্রতিবিম্বিত হয়েছে।...

বর্তমান গ্রন্থের লেখক কিছু রচনা নানা সূত্রে বহু কষ্টে হাতড়ে হাতড়ে আলোয় আনার চেষ্টা করেছেন।...রচনাগুলি দুষ্প্রাপ্য এবং তাই গ্রন্থটিতে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হওয়ার জন্য গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থটি মূলতঃ তথ্য ভিত্তিক। তথ্যানুসন্ধানে লেখকের উদ্যম ও আন্তরিকতা অভিনন্দন যোগ্য।'

১৩৮৭ সালের ১৯শে কার্তিক তারিখের যুগান্তর পত্রিকার 'গ্রন্থ বার্তা'য় সমালোচক ডঃ রমেন মজুমদার এই বই সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

'রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'তাঁহার (সঞ্জীবচন্দ্রের) প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না। ভালো গৃহিণীপনায় স্বল্পকে যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে···কিন্তু অনেক থাকিলেও উপযুক্ত গৃহিণীপনার অভাবে সে ঐশ্বর্য ব্যর্থ হইয়া যায়। তাঁহার (সঞ্জীবচন্দ্রের) অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণে সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন, তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই। তাহার কারণ সঞ্জীবের প্রতিভা ধনী, কিন্তু গৃহিণী নহে।'

সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে কিছু বেদনাময় অধ্যায় ছিল। গোপালবাবু এই গ্রন্থে সেই অধ্যায়গুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ হয়তো সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের এই দিকটার কথা জানতেন না, জানলে তিনি সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা স্বীকার করেই, তাঁর গৃহিণীপনার অভাবের বদলে নিশ্চয়ই অন্য কথা বলতেন।'

গোপালবাবু একনিষ্ঠ গবেষকের অধ্যবসায় নিয়ে বহু অজ্ঞাত অবলুপ্ত তথ্য উদ্ধার করে সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তাতে তাঁর কথা বোধ হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন কখনও স্বচ্ছন্দ ধারায় প্রবাহিত হয় নি। কর্মচ্যুতি, ঋণভার, মমলা প্রভৃতি বহু সঙ্কটাবর্তে বহুবার তাঁকে আবর্তিত হতে হয়েছে। এমন কি, স্বজন-পরিহার করে গৃহ থেকে পালিয়ে দূরে আত্মগোপন করেও তাঁকে বাঁচতে হয়েছে। কিন্তু তখনও, সেই নিদারুণ মানসিক অবস্থার মধ্যেও সাহিত্যরচনা স্তব্ধ থাকে নি। গোপালবাবু লিখেছেন, 'সচ্ছল অবস্থায়, শান্ত মনে ও নিরুপদ্রব পরিবেশে তিনি যদি দীর্ঘদিন লেখার সুযোগ পেতেন, তাহলে নিঃসন্দেহেই তিনি তাঁর প্রতিভার দানে বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন।'

গোপালবাবু আলোচ্য গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের সাহিত্যালোচনা বিশেষ করেন নি, সে দায়ও তিনি নেন নি। এখানে তাঁর উদ্দেশ্য, বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করে গেছেন, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত নানা সূত্র থেকে বহুবিচিত্র অজ্ঞাত ঘটনা আবিষ্কার করে তা পরিপূরণ করা, অন্ধকার গুহা-গহ্বর থেকে সঞ্জীবচন্দ্রের বহু মূল্যবান রচনা উদ্ধার করে জনসমক্ষে প্রকাশ করা, এবং সর্বোপরি সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে বহুদিনের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির বহু ভুল সংশোধন করা। গোপালবাবু তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের অবলুপ্ত কতকগুলি রচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীটিও এই গ্রন্থে সংযোজিত করে তিনি তাঁর গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্রের খণ্ড জীবনচিত্রের পূর্ণতাসাধন করতে গিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরও জীবনের কিছু কিছু অশ্রুত দিক অতি নিপুণভাবে, হয়তো অজান্তেই এঁকে ফেলেছেন। এখানেই তাঁর মুন্সিয়ানা।'

১৩৩৮ সালের ১০ চৈত্র 'সত্যযুগ' পত্রিকায় সমালোচক পরিতোষ পাল লেখেন—

'বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের কথা আজকের পাঠকরা খুব কমই জানেন। অথচ সঞ্জীবচন্দ্র ছিলেন এক অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেনঃ 'যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সে-লেখাগুলি কথা কহার অজস্র আনন্দ বেগেই লিখিত, ছাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া। এই ক্ষমতাটি অতি অল্প লোকেরই আছে, তাহার পরে সেই মুখে-বলার ক্ষমতাটিকে লেখার মধ্যেও তেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরও অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়।'

...নিঃসন্দেহে বহু নথিপত্র ঘেঁটে 'বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়' সঞ্জীবচন্দ্রকে আবিষ্কার করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক। এই বই পড়েই পাঠক জানতে পারবেন সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য কিভাবে প্রতি পদে বাধা পেয়েছে। গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখক শ্রীরায় সঞ্জীবচন্দ্রের নব পরিচয় দিয়েছেন। নানা তথ্যের মাধ্যমে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনাদরিত সঞ্জীবচন্দ্রকে পূর্ণরূপে আবিষ্কার করে তুলে ধরেছেন চিঠিপত্র এবং প্রাপ্ত নথিপত্র ইত্যাদির সাহায্যে লেখক। শ্রীরায় সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত অসত্য বা ভ্রান্ত ধারণাকে পালটে দিয়েছেন। সঞ্জীব-প্রতিভার বিভিন্ন দিকেরও পরিচয় দিয়েছেন লেখক। সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য এতে পরিবেশিত হয়েছে।

গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের কিছু কিছু লেখাও যুক্ত হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি মূল্যবান হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সঞ্জীবচন্দ্রকে যথার্থ স্থান দেবার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। লেখক শ্রীরায় এজন্য ধন্যবাদ পাবেন সকলেরই।'

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী' বইয়ের ৫১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

'বঙ্গদর্শনের ষষ্ঠ বর্ষের দ্বাদশ বা শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮৫ চৈত্রে (১৮৭৯ মার্চ)। ১২৮৫ চৈত্র সংখ্যার সূচী...পদোন্নতির পন্থা (প্রবন্ধ) ৫৬৮।

'পদোন্নতির পন্থা' শীর্ষক প্রবন্ধটির লেখক এ যাবৎ অজ্ঞাত বলেই উল্লেখ করা হয়ে এসেছে। কিন্তু এটি যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা সে কথা শুধু যে প্রবন্ধের ভাষাই প্রমাণ করেছে তাই নয়, প্রবন্ধের অন্তর্গত বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট স্বয়ং 'রামধন'ই সে কথা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে।'

আমার বক্তব্য—'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধের লেখক কে কোথায় অজ্ঞাত বলে উল্লেখ করেছেন জানি না। তবে ১৯৩৮র জানুয়ারিতে আমি আমার

'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য' বইয়ে 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধটিকে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা বলে উল্লেখ করেছি। শুধু উল্লেখই নয়, এ সম্বন্ধে বইয়ে বিস্তৃত লিখেছিও। এখানে তার কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় অতি জীর্ণ ও শতছিন্ন একটি পুরাতন খাতা আছে। এই খাতারই আবার প্রথম দিকের এবং শেষের দিকেরও কয়েকটা করে পাতা নেই। খাতাটি সঞ্জীবচন্দ্রের নিজের হাতের বাংলা ও ইংরাজি লেখায় ভরা। বাংলা লেখাটা খুব কাটাকুটি করা।

এই জীর্ণ খাতাটির লেখাগুলির মধ্যে প্রথম সওয়া দু পাতা এবং শেষের আঠার পাতা বাংলায়, বাকি মাঝের বাইশ পাতা ইংরাজিতে লেখা। ইংরাজি লেখাটার একটু পড়লেই বোঝা যায়, সঞ্জীবচন্দ্র যে দীর্ঘ বার বছর স্পেশাল সাব রেজিস্ট্রার ছিলেন, তাঁর সেই চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রেজেস্ট্রি বিভাগ সম্পর্কে কিছু লেখা। আর খাতার প্রথমের ও শেষের বাংলা লেখা দুটি পড়লে জানা যায়, এ দুটি কোন দুটি পৃথক প্রবন্ধের অংশ বিশেষ। লেখার সঙ্গে অবশ্য কোথাও কোন প্রবন্ধের নাম নেই।

ঐ ছিন্ন খাতার কাটাকুটি করা প্রথম বাংলা লেখাটি পড়ে, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের কোন্ প্রবন্ধের অংশ হতে পারে, এই ভেবে তাঁর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধগুলি পড়ে দেখি। পড়তে পড়তে দেখলাম, খাতার এই লেখাটি ১২৮৫ সালের চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'পদোন্নতির পন্থা' নামক একটি প্রবন্ধের শেষের দিকের একটা জায়গার অংশ। বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধের সঙ্গেও লেখক হিসাবে কারও নাম নেই। নাম না থাকলেও এখন এই ছিন্ন খাতার লেখাটা থেকেই আবিষ্কার করা গেল, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা। খাতার এই লেখাটা না পেলে কিছুতেই বলা যেত না যে, এটা সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা।

এখন এই লেখাটা নিয়ে দু একটা কথা বলছি। চাকরিতে পদোন্নতির পন্থা নিয়ে কিছু লেখা মানে একটা নিরস বিষয় নিয়ে লিখতে বসা। এরূপ একটা নিরস বিষয় নিয়ে লিখতে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র একাধিক গল্প বলে বলে কী সরস করে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, তা না পড়লে বোঝা যাবে না। তাছাড়া প্রবন্ধের প্রথমে যেমন গল্প আছে, শেষে তেমনি অনেক জানার মত কথাও আছে। যাঁরা চাকরি করেন এবং চাকরিতে পদোন্নতি চান, তাঁদের কাছে এ কথাগুলো আজও জানবার মত।

আমার ধারণা, সঞ্জীবচন্দ্রের এই প্রবন্ধের রামধন দাদার কাহিনী অবলম্বনেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' রচনা করেন।

সঞ্জীবচন্দ্রের এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১২৮৫ সালের চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে। আর বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম প্রকাশিত হয় ১২৮৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে। ১২৮৬ সালে বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যা বেরোয় নি।

সঞ্জীবচন্দ্রের এই 'পদোন্নতির পন্থা' একটি পরিচ্ছন্ন, অম্লমধুর অথচ বেশ

শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ। এর তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত অত্যন্ত তীব্র ও কঠোর ব্যঙ্গাত্মক রচনা।

সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধে গঙ্গাপ্রহরী ও রামধন দাদার কাহিনীতে কিছুটা ব্যঙ্গ থাকলেও, এমন সহজ, সরল ও সাধারণভাবে গল্প দুটি বলা হয়েছে যে, তাতে কারও রাগ করার বা জ্বালা অনুভব করার অবকাশ নেই। অথচ এর তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মুচিরামে একেবারে শুরু থেকেই অনেকের রাগের কারণ হয়েছেন। যেমন, প্রথমতঃ—মুচিরামকে যে সম্প্রদায়ের বা জাতির লোক বলে দেখানো হয়েছে, কাহিনীর গোড়াতেই সেই সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিছু কিছু অশ্রদ্ধার কথা থাকায় তাঁরা স্বভাবতই এজন্য বঙ্কিম-চন্দ্রের উপর ক্ষুব্ধ।

দ্বিতীয়তঃ—উকিল এবং ডেপুটিদের নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মুচিরামে বেশ কিছুটা বাড়াবাড়িই করেছেন। যেমন—উকিলদের কাছে গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়, লিখে উকিলদের প্রতি মন্তব্য করেছেন। আর 'মুচিরাম যে মূর্খ তাহাতে কিছু আসে যায় না। সেরূপ অনেক ডেপুটি আছে। ডেপুটিগিরিতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না।'—এই কথা লিখেও তিনি ডেপুটিদের রীতিমতই হেয় করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে অনেক অযোগ্য ব্যক্তি যে ডেপুটির পদে আসীন ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে তাঁরা কেউই মুচিরামের মত অত বড় মূর্খ ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত লেখেন, তার কিছু দিন আগেই তাঁর মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রকে পরীক্ষায় ফেল হওয়ার অজুহাতে ডেপুটির চাকরি থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও লিখেছেন—ডেপুটির চাকরিতে পাকা হতে হলে, তখন দুটো পরীক্ষায় পাস করতে হ'ত।—ডেপুটির পরীক্ষা একেবারে সহজ ছিল না। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরামকে ডেপুটি খাড়া করে, ডেপুটিগিরিতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না, বলে যাই লিখুন, অন্তত ডেপুটির পরীক্ষায় তখন যে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন ছিল, তা স্বীকার করতেই হবে। অথচ ঐ বিদ্যাবুদ্ধির কণামাত্রও মুচিরামের ছিল না।

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধে রামধন দাদার কাহিনীতে রামধনের হাকিম বা মুন্সেফ হওয়ার কথা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও আছে—'জজ সাহেব একবার মাত্র বলিলেন—বিচারের কার্য অতি কঠিন। রামধন মূর্খ, তাহা পারিবে না।—মেমসাহেব বলিলেন—বিচারে যাহা ত্রুটি হয়, আপীলে তাহা সংশোধন হইয়া যাইবে।'

শুধু এই নয়, আরও আছে—রামধন বিচারে যত হউক বা না হউক, রফা দ্বারা অনেক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মূর্খ মুচিরামকে ডেপুটি করে তার অক্ষমতার দিকটা নিয়ে এমনভাবে দেখাতে পারেন নি। আর সব চেয়ে বড় কথা, রামধনের কাহিনী পড়ে কারও ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন কারণ নেই। তাই আমার মনে হয়, সব দিক থেকে বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্রের মুচিরামের চেয়ে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধের এই রামধন অধিকতর সার্থক।

সঞ্জীবের 'পদোন্নতির পন্থা'য় রামধনের নাম আছে। বঙ্কিমের 'রামধন পোদ' নামে একটা ছোট লেখা আছে। এই দেখেই অমিত্রবাবু বলেছেন—বঙ্কিমের সৃষ্ট রামধনই প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে—'পদোন্নতির পন্থা' বঙ্কিমেরই রচনা।

'পদোন্নতির পন্থা' বঙ্কিমের রচনা হ'লে তিনি কখনই তাঁর দুটি পৃথক প্রবন্ধের প্রধান চরিত্রে একই 'রামধন' নাম ব্যবহার করতেন না।

তাছাড়া 'পদোন্নতির পন্থা' যে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা তার পাণ্ডুলিপিই তো পাওয়া গেছে।

অমিত্রবাবু 'বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী' গ্রন্থ লিখলেন, অথচ একটা দিনও তিনি কলকাতার নিকটেই অবস্থিত নৈহাটী-কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম সংগ্রহশালায় এলেন না। এলে এখানে রক্ষিত সঞ্জীবচন্দ্রের অজস্র চিঠিপত্র ও নানা রচনার পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই 'পদোন্নতির পন্থা' প্রবন্ধের খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিটিও দেখতে পেতেন।

অমিত্রবাবু লিখেছেন—'বঙ্গদর্শনের ষষ্ঠ বর্ষের দ্বাদশ বা শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৮৫ চৈত্রে (১৮৭৯ মার্চ)।

১২৮৬ সালের বঙ্গদর্শনের কোন সংখ্যা বেরোয়নি দেখে বলা যেতে পারে—১২৮৫র চৈত্র সংখ্যা বেরিয়ে ছিল, আরও অনেক পরে। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী 'সঞ্জীবনী সুধা'য় লিখে গেছেন—'বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে এবং কার্যাধ্যক্ষের কার্যের বিশৃংখলতায় বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।

অমিত্রসূদনবাবু সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা 'পদোন্নতির পন্থা'কে বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা বলে জোর যুক্তি দেখানোয় এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা কথা মনে পড়ছে। কথাটা হল—বঙ্কিমচন্দ্র একদিন সাহিত্যিক তারকনাথ বিশ্বাসকে বলেছিলেন—এবারে 'বঙ্গবাসী'তে বঙ্গদর্শনের সমালোচনাটা পড়েছো কি ? ওর সবটাই ভুল। যেগুলোকে দাদার (সঞ্জীবচন্দ্রের) লেখা ভেবে ভাল নয় বলেছে, সেগুলো আমার লেখা। আর যেগুলো আমার লেখা মনে করে ভাল বলেছে, সেগুলো দাদার লেখা।—তারকনাথবাবু তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর জীবন কথা' গ্রন্থে এই কথাগুলো লিখে রেখে গেছেন।

জ্যোতিশচন্দ্র

সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র কবি ও প্রবন্ধকার ছিলেন। জ্যোতিশচন্দ্রের লেখা 'ভারতভূমি' কবিতাটিকে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে লিখে আসছিলেন। ঐ কবিতা যে জ্যোতিশচন্দ্রেরই লেখা সেটা প্রমাণ করতে পেরেছি বলে মনে করি।

এ সম্বন্ধে আমার 'রবীন্দ্রনাথের ছাত্র-জীবন' গ্রন্থে 'ভারতভূমি' কবিতার রচয়িতা কে?' প্রবন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। উৎসাহী পাঠক-পাঠিকারা সে প্রবন্ধটা পড়ে দেখতে পারেন। এখানে শুধু সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দু একটা কথা বলছি—

১২৮০ সালের মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' 'ভারতভূমি' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয়। কবিতার সঙ্গে লেখক হিসাবে কারও নাম ছাপা ছিল না। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি কবিতাটি ছাপার সময় কবিতার মাথায় শুধু লিখে ছিলেন—

এই কবিতাটি এক চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের রচিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কোন কোন স্থানে অল্পমাত্র সংশোধন করিয়াছি এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়াছি।

বঃ সম্পাদক

কবিতাটির সঙ্গে লেখকের নাম না থাকলেও বহু বছর পরে ডঃ সুকুমার সেন এটিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে স্থির করেন। এই স্থির করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' বইয়ে লেখেন—

'ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে নতুন তথ্য আমার চোখে পড়িয়াছে। তাহা এইখানে সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা হইতেছে —'ভারতভূমি'।'

সুকুমারবাবুর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' বইটি পড়ে ঐ ১৩৪৯ সালেই ফাল্গুন মাসের প্রবাসী পত্রিকায় ডঃ কালিদাস নাগ তাঁর 'রবীন্দ্র সাহিত্যের আদি পর্ব'' প্রবন্ধে সুকুমারবাবুকে সমর্থন করেন।

প্রবাসীতে কালিদাসবাবুর ঐ প্রবন্ধ পড়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫০ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে এর একটা প্রতিবাদ করেন। ব্রজেনবাবু

বলেন—ঐ কবিতার লেখক রবীন্দ্রনাথ নন, কবিতার লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র।

ব্রজেনবাবু লেখেন—'জ্যোতিশচন্দ্রই যে ইহার লেখক তাহা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত ডায়রি পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছি।'

কালিদাসবাবু ব্রজেনবাবুর এই প্রতিবাদ পড়ে এর আর কোন উত্তর দেন নি।

ভারতভূমি সম্পর্কে ব্রজেনবাবুর কথায় কালিদাসবাবু কিছু না বললেও সুকুমারবাবু কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তাই তিনি পরে তাঁর 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস'—৩য় খণ্ডে ব্রজেনবাবুর দেখা ডায়রির কথা উড়িয়ে দিয়ে 'ভারতভূমি' রবীন্দ্রনাথেরই রচনা বলে লিখে যান।

সুশান্তকুমার মিত্র এই 'ভারতভূমি' কবিতাটি নিয়ে 'রবীন্দ্রনাথের সর্ব প্রথম মুদ্রিত রচনা' নামে একটি বইও লেখেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সুশান্তবাবুর বই পড়ে যে অভিমত দেন, তাতে তিনি সুশান্তবাবুর মতই সমর্থন করেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ইচ্ছামন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ভারতভূমিকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলেছেন। অধ্যাপিকা সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পি. এইচ্-ডি পাওয়ার বই 'রবীন্দ্রকাব্যের আদিপর্বে' ভারতভূমি রবীন্দ্রনাথেরই রচনা বলেছেন। প্রশান্তকুমার পাল তাঁর 'রবিজীবনী' গ্রন্থে এবং অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ : সাধনা ও সাহিত্য' গ্রন্থে লিখেছেন—ভারতভূমি রবীন্দ্রনাথের রচনা।

এই রকম আরও অনেকেই 'ভারতভূমি' কবিতা রবীন্দ্রনাথেরই রচনা বলেছেন।

ব্রজেনবাবু বলেছিলেন—তিনি জ্যোতিশের নিজের লেখা ডায়রিতে পড়েছিলেন—ভারতভূমি জ্যোতিশের লেখা।—সেই ডায়রি আজ আর পাওয়া যাচ্ছে না বলে, ব্রজেনবাবুর কথাকে এঁরা উড়িয়ে দিচ্ছেন বা ব্রজেনবাবুর কথায় গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

আমি আমার 'ভারতভূমি কবিতার রচয়িতা কে?' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে একটা প্রমাণ দিয়ে লিখি—

'বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুপুত্র (সার্বজজ দিগম্বর বিশ্বাসের পুত্র) ও বিশেষ স্নেহভাজন এবং জ্যোতিশেরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারকনাথ বিশ্বাস বহুকাল আগে জ্যোতিশের জীবিতকালেই তাঁর 'বঙ্কিমবাবুর জীবন কথা' গ্রন্থে লিখেছেন—তাঁহার (বঙ্কিমচন্দ্রের) ভ্রাতুষ্পুত্র আমার প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় বাল্যে বিশেষ মেধাবী ছাত্র ছিলেন, বঙ্গদর্শনে তাঁহার চতুর্দশ বর্ষকালে লিখিত একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে তাহার বড় আদর হইয়া ছিল।'

জ্যোতিশের ১৪/১৫ বছর বয়সের সময় বঙ্গদর্শনে যে ক'টি কবিতা প্রকাশিত হয়, সেগুলির মধ্যে বঙ্কিম একমাত্র এই ভারতভূমি কবিতার মাথাতেই চতুর্দশ বর্ষীয় বালকের রচনা বলে লিখে ছিলেন।

১২৮০ সালের মাঘ মাসে জ্যোতিশের বয়স ছিল ঠিক ১৪ (জন্ম ১২৬৬ সালের পৌষ মাসে), আর রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল ১২ বছর ৯ মাস।

জ্যোতিশের মৃত্যুর পর ২৯শে মে ১৯৩০ (মৃত্যু ২৫শে মে) তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় যে শোক সংবাদ প্রকাশিত হয় তাতেও লেখা হয়েছে—বাল্যকালে বঙ্গদর্শনেও তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছিল।

আমার 'রবীন্দ্রনাথের ছাত্র জীবন' গ্রন্থে 'ভারতভূমি কবিতার রচয়িতা কে ?' পড়ে প্রশান্তকুমার পাল একদিন আমাকে বলেন—ভারতভূমি জ্যোতিশ-চন্দ্রেরই রচনা। আমার বইএর ২য় সংস্করণে এই ভুলটা সংশোধন করে দোব।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—'তারক-নাথ বিশ্বাসের তারকনাথ গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডের ২৫৭ পৃষ্ঠায় 'ভারতভূমি' জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।'

তারকনাথের বইএর ২৫৭ পৃষ্ঠায় 'ভারতভূমি' জ্যোতিশচন্দ্রের রচনা বলে কোথাও উল্লেখ নেই। 'ভারতভূমি'র নামই নেই।

আমিই প্রথম তারকনাথের বইএর পৃষ্ঠাসহ ঐ উক্তিটি আবিষ্কার করি। সেই সময়কার বঙ্গদর্শন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এবং অন্যান্য যুক্তি সহ আমার 'রবীন্দ্রনাথের ছাত্র জীবন' গ্রন্থে প্রমাণ করি ঐ কবিতাটি জ্যোতিশ-চন্দ্রেরই রচনা।

১৩৯৩ সালের শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় অমিত্রবাবু 'ভারতভূমি কবিতা রবীন্দ্রনাথের নয়, জ্যোতিশচন্দ্রের' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি আমার 'রবীন্দ্রনাথের ছাত্র জীবন' বইটির উল্লেখ করে লিখে-ছিলেন—'এই তথ্য (ভারতভূমি জ্যোতিশচন্দ্রের রচনা) আমি সদ্য প্রকাশিত গোপালচন্দ্র রায়ের 'রবীন্দ্রনাথের ছাত্র জীবন' শীর্ষক মূল্যবান বইখানি থেকে পেয়েছি।'

এখন অমিত্রবাবু তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী' গ্রন্থে আমার নাম, আমার বইএর নাম আর আদৌ করেন নি। যেন তিনি নিজেই ঐ তথ্যের আবিষ্কারক।

তথ্য সংগ্রহ—

রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্ম বৎসরে দেশবাসী মহা আড়ম্বরে তাঁকে অভিনন্দন জানান। তখন দেশবাসীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়, সেই অভিনন্দন পত্র লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র। ঐ অভিনন্দন পত্রের প্রথমেই শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—কবিগুরু! তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই!

এই সীমাহীন বিস্ময়ের আধার রবীন্দ্রনাথ এক মহা সমুদ্র।

তাঁর সুবিশাল সাহিত্য, পত্র-সাহিত্য, অগণিত বাণী ও আশীর্বাণী, সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন ইত্যাদি বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ করা সে এক অসাধ্য ব্যাপার।

তবুও একদিকে যেমন নানা জনের রবীন্দ্র-বিষয়ক নানা লেখা পড়ে তথ্যসংগ্রহ করেছি ও করছি, অপর দিকে তেমনি তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, পুলিনবিহারী সেন, বাসব ঠাকুর, রানী চন্দ, মৈত্রেয়ী দেবী, অমিতা ঠাকুর, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই পুত্র কনক ও হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের বংশের রাজেন্দ্র চন্দ্র বসু মল্লিক প্রভৃতির কাছেও গিয়েছি। কম বেশী কিছু কিছু তথ্যও পেয়েছি।

আমার বিবিধ লেখার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য, পত্র-সাহিত্য, তাঁর প্রদত্ত বাণী ও আশীর্বাণী ইত্যাদি নিয়েও আমি দীর্ঘকাল ধরে তথ্য সংগ্রহ করে আসছি। এ পর্যন্ত আমি—রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস, ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী, রবীন্দ্রনাথের ছাত্র-জীবন, রবীন্দ্র-বিতর্ক নামে কয়েকটি বই এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধও লিখেছি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আজও বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করে এবং লিখেও চলেছি।

এ সব সম্পর্কেই কিছু কথা এখানে বলছি—

আমি নিজে যেমন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা সংবাদ সংগ্রহ করি, আবার অপরকে দিয়েও রবীন্দ্র-তথ্য সংগ্রহ করাই। যেমন—

বাংলা দেশের কুষ্ঠিয়ায় আমার পরিচিত রবীন্দ্র-অনুরাগী এক যুবক ছিল —নাম সুজিত দাস। সুজিতকে বলা ছিল—এজন্য তাকে কিছু অর্থও দেওয়া ছিল— বাংলা দেশে বিশেষ করে কুষ্ঠিয়া-শিলাইদহ অঞ্চলের কোন পত্র-পত্রিকায়

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রকাশিত হলে, সেই কাগজ আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

সুজিত কয়েকবার ঐরূপ কয়েকটা কাগজ পাঠিয়ে ছিল। কিন্তু একবারের পাঠানো একটা কাগজই আমার কাজে লেগেছে। সেই কাগজটা কুষ্ঠিয়ার 'সান্ধ্য সাহিত্য আসর' থেকে ১৩১৩র বৈশাখে প্রকাশিত 'মেঘমুক্তি' সাহিত্য পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা। ঐ সংখ্যায় মাহতাব উদ্দীন আহমদ-এর লেখা 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কিছু স্মৃতি' নামে একটা প্রবন্ধ আছে। আহমদ সাহেব শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কাছারি বাড়ির বাবুর্চি বাছের আলি মণ্ডলের মুখে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কয়েকটা কাহিনী শুনে, সেই কাহিনীগুলি তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন। বাছের আলি মণ্ডল বলে যাচ্ছেন, এমনি ভাবে তাঁর জবানীতেই কাহিনীগুলি আহমদ সাহেব লিখে গেছেন।

বৃদ্ধ বাছের আলি মণ্ডলের বলা কাহিনীগুলির দু একটায় একটু আধটু তথ্যগত ভুল এবং কিছুটা অতিরঞ্জন থাকলেও, তাঁর বলা যে কাহিনীটি এখানে উদ্ধৃত করছি, সেটা সম্পূর্ণ সত্য বলেই আমি বিশ্বাস করি। আহমদ সাহেবের লেখা থেকে বাছের আলি মণ্ডলের জবানীতেই সেই কাহিনীটি এখানে তুলে দিচ্ছি—

'আমি তাঁর বাবুর্চি নিয়োজিত ছিলাম।

একবার দীর্ঘদিন বাইরে কাটাবার পর তিনি আমাকে বোল্লেন 'বাছের, লাউ খেতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে—দেখিস তো কোথাও পাওয়া যায় কিনা।

বড় মুস্কিলে পড়া গেলো, লাউ কোথায় পাওয়া যাবে। আসলে সেটাতো লাউয়ের মৌসুম ছিলো না। তাই বিভিন্ন হাটে ও বাড়ী বাড়ী আমি লাউ খোঁজখুঁজি শুরু করলাম, যদি কোনোদিন একটা মিলেই বা। বেশ কিছু-দিন গত হয়, হয়তো খেয়ালী মানুষটি এতদিনে সে সব কথা ভুলেই গেছেন, কিন্তু আমার ভুল হয়নি। খোরসেদপুরের বাজারে একদিন একটা লাউ মিলে গেলো। কিছুই তখনো বাজার করা হয়নি, তাই ২ পয়সা দাম মিটিয়ে লাউ-ওয়ালার কাছেই লাউটি রেখে গেলাম। আর বোল্লাম, বাজার শেষে দাম দিয়ে লাউটা নিয়ে যাবো।

এদিকে তাড়াহুড়ো করে বাজারটা শেষ করে যখন ফিরে আসি, তখন দেখি নিতাই বাঁড়ুজ্যে লাউটি নিয়ে নাড়াচাড়া কোরছে এবং ৪ পয়সার বিনিময়ে লাউটা কিনবার জন্যে লাউওয়ালাকে পীড়াপিড়ি কোরছে। একটু আড়ালে থেকে এ সবই আমি খেয়াল কোরছিলাম। অগত্যা চড়াদাম পেয়ে লাউওয়ালা আমতা আমতা কোরতেই ৪টী পয়সা রেখে বাঁড়ুজ্যে মশাই লাউটী থলে জাত কোরতে উদ্যত হোলো। রাগে ও দুঃখে আমার ইচ্ছে হচ্ছিলো একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেই। কিন্তু তা না কোরে আমি ওর হাত থেকে লাউটী

নিয়ে লাউওয়ালার সামনে একটা সিকি ছুঁড়ে মারলাম। এতে বোধ করি লোকটার বিবেকে দারুণ লাগলো, তাই সে ও জিদ কোরে বোল্লো, 'আমি ওর দাম আট আনা দেবো।' ইতিমধ্যে বেশ কিছু লোক জমে গিয়েছে। সে সময় আমার বেতন বাবদ জমানো ৫টি টাকা লাউওয়ালার সামনে রেখে বল্লাম, 'তোর যা ইচ্ছে তাই নিস।' এরপর বাঁড়ুজ্যে মশাই অনেকটা লেজ গুটিয়ে সেখান থেকে ভিজে বেড়ালের মতো পায়ে পায়ে সরে পড়লো। লাউওয়ালা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। আমিও ঠাকুরের লাউ ভোজ ইচ্ছে পূরণ কোরতে পেরে তৃপ্ত হোলাম।

এর কয়েকদিন পর একদিন ঠাকুর আমাকে তলব কোরলেন। বোল্লেন, 'তুই পাঁচ টাকা দিয়ে লাউ কিনেছিস?'

আমি আমতা আমতা কোরছিলাম, দেখে তিনি বোল্লেন, 'অস্বীকার কোরবার জো নেই, দিব্যি কাগজে ছাপা হোয়েছে, এই দ্যাখ্।' বলে একটা কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। আমি তো লেখাপড়া জানিনে, শুধু বোল্লাম, 'আজ্ঞে ওটা আমার বেতনের টাকা।' তারপর সমস্ত ঘটনা আমি তাঁকে খুলে বোল্লাম। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তারপর মিষ্টি হেসে আমার হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে বোল্লেন—'এই তোর পুরস্কার।'

বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের অনেকেই হয়ত অশোক উপাধ্যায়কে চেনেন। ছুটির দিন এবং কোন দুর্ঘটনা-জনিত নিজের বিপদের দিন বাদে অশোক প্রতিদিনই সন্ধ্যার দিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে যায়। গিয়ে সেখানে বসে পাগলের মত কী এক নেশায় পরিষদে রক্ষিত দুষ্প্রাপ্য নানান্ পুরাতন পত্র-পত্রিকা ও পরাতন বই দেখে ও পড়ে। পরিষদের পুরাতন পত্র-পত্রিকার তালিকা ইত্যাদি করে দেবার জন্য কখন কখন অশোককে সানন্দে বেগার খাটতেও দেখেছি।

অশোক আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত এবং অত্যন্ত স্নেহভাজন। এই রকম একজন পুরাতনের নেশায় নেশাড়ুকে দিয়েও আমি কিছু রবীন্দ্র-তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। অশোককে আমার বলা আছে—পুরাতন পত্র-পত্রিকায় বা পুরাতন কোন দুষ্প্রাপ্য বইয়ে কোথাও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু নতুন বা অজ্ঞাত তথ্য দেখলে অবশ্যই আমাকে জানাবে।

আমার কথা মত অশোক যথারীতি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু নতুন তথ্য পেলেই আমাকে জানায়। অবশ্য এই সব তথ্য অশোকের চোখে নতুন হলেও এর অনেকই আমার কাছে পুরাতন, আমার পূর্ব-সংগৃহীত। কারণ, আমিও তো দীর্ঘদিন ধরে রবীন্দ্র-তথ্য সন্ধানে বিভিন্ন পুরাতন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদি দেখে আসছি।

অশোক কারও কারও মুখে শুনে আমাকে দু একবার এমন তথ্যও দিয়েছে

যা যাচাই করতে গিয়ে আমাকে বৃথাই বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং অর্থদণ্ডও দিতে হয়েছে।

তবুও অশোক আমাকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন দু'একটা তথ্য দিয়েছে যা আমি কেন, বোধ করি কোন রবীন্দ্র-গবেষকেরই সে কথা জানা ছিল না। যেমন—

১. 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'-র ১৩২৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় গোলাম মোস্তফার লেখা প্রবন্ধ 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ' পড়ে রবীন্দ্রনাথ তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদককে লিখেছিলেন—

'আপনাদের পত্রিকায় 'ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক লেখাটি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। মুসলমানদের প্রতি আমার মনে কিছুমাত্র বিরাগ বা অশ্রদ্ধা নাই বলিয়াই আমার লেখায় কোথাও তাহা প্রকাশ পায় নাই।'

পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটা নিয়ে পরে ১৩২৯ সালের কার্তিক সংখ্যা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়—সমিতি সংবাদ—কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের অভিমত'—নামে ছেপেছিলেন।

অশোকের দেওয়া গোলাম মোস্তফার প্রবন্ধ পড়ে রবীন্দ্রনাথের ঐ লেখা ইত্যাদির খবর ছাড়া গোলাম মোস্তফার কবিতার বই পড়ে রবীন্দ্রনাথের প্রদত্ত একটা কবিতায় উৎসাহবাণী আগে থেকেই আমার সংগ্রহে ছিল। তার ইতিহাসটা বলি—

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবুল ফজল সাহেব তাঁর 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' বইএর 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ' প্রবন্ধে লিখেছেন—'কবি গোলাম মোস্তফার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রক্তরাগ' যখন বের হয়, তখর রবীন্দ্রনাথ তাঁকেও উৎসাহিত করেছিলেন এই বলে—

তব নব প্রভাতের রক্তরাগ খানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।

আবুল ফজল সাহেব আজ আর নেই। তাই গোলাম মোস্তফার বই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঐ দু লাইন কবিতা ছাড়া, কবিতায় আরও লাইন ছিল কিনা জানবার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখনও এ সম্বন্ধে সঠিক জানতে পারি নি।

২. ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রজাপতি' পত্রিকায় ইউ. এন. কর এম. এ. বি. ই.-র সম্পর্কে একটি লেখার মধ্যে যশোহর-ঝিনাইদহ রেলওয়ে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি অভিমত ছিল। সেই অভিমতটি এই—

'কর কোম্পানি যশোহর-ঝিনাইদহ রেলওয়ে হাতে পাইয়া তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। অল্প সময়ের মধ্যে ইঁহারা যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার বিবরণ জানিয়া এই স্বদেশী কোম্পানির সিদ্ধিলাভে সর্বান্তকরণে

অভিনন্দন প্রকাশ করিতেছি। এইরূপ শক্তিসাধ্য কার্য সুদক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার পরিচয় আমাদের দেশের পক্ষে মূল্যবান সম্পদ। কার্য সাধনার অনভিজ্ঞতা ও আত্ম-প্রভাবের প্রতি অনাস্থা আমাদের সকল প্রকার কর্মপথের প্রধানতম বাধা। এই রেলপথের সুব্যবস্থা উপলক্ষে সেই বাধা অপসারণে যাঁহারা সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের জয় কামনা করি।'

ইতি ১লা ভাদ্র ১৩৩২
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি জানি অশোক বাংলা সাহিত্যের অনেক গবেষককেই তাঁদের প্রয়োজনে সাধ্যমত তথ্য দিয়ে থাকে। এ নিয়ে অশোক আমার কাছ থেকেই কয়েক বার জানতে চেয়েছে 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার' পত্রিকায় লেখার সঙ্গে যেসব লেখকের নাম নেই, তাঁদের কয়েক জনের নাম। অশোকের এ জানা অপরের জন্যই।

যাক্, আমি এখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই সব ছোট ছোট তথ্যগুলি সংগ্রহ করে রাখছি এইজন্য যে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যদি বড় বা বিস্তৃত কিছু লিখি, তখন এগুলি কাজে লাগাবো।

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী তাঁর 'নির্বাণ' গ্রন্থে লিখেছেন—'বাবা মশায় সকলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে খুব ভাল বাসতেন,...হাস্য-পরিহাসে তাঁর ছিল সহজ আনন্দ।'

শান্তিনিকেতনের দীর্ঘদিনের অধ্যাপক পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীও ১৩৫০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর 'রবীন্দ্র-সংলাপ কণিকা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই মৌখিক পরিহাস-রসিকতা সম্বন্ধে বলেছেন—'বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাষায় বলা যাইতে পারে, তিনি ছিলেন 'রসিকেন্দ্র চূড়ামণি।'

রবীন্দ্রনাথের এইরূপ মৌখিক পরিহাস রসিকতা সম্বন্ধে তাঁর পার্ষদ সুধাকান্ত রায় চৌধুরী প্রভৃতি আরও অনেকেই লিখে গেছেন।

বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা অনেকের লেখা রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাসগুলি সংগ্রহ করে এবং রবীন্দ্রনাথের বহু পরিচিত-পরিচিতাদের কাছে গিয়ে গিয়ে তাঁদের মুখে শুনে—সমস্ত একত্র করে 'রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস' নামে আমিই সর্বপ্রথম একটি বই করি।

এই সময় রবীন্দ্রনাথের পরিচিত-পরিচিতাদের মুখের সকল কথাকেই কিন্তু আমি অভ্রান্ত বলে মেনে নিই নি। যথাসম্ভব যাচাই করে তবেই গ্রহণ করেছি। এখানে এ রকম একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

আমার ঐ বইএর জন্য রবীন্দ্রনাথের মৌখিক পরিহাসগুলি তখনও সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছি। সেই সময় একদিন আমার বিশেষ পরিচিত কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান বন্ধু রোহিণীকান্ত নাথের সঙ্গে

দেখা করে, তাঁকে বলি—রোহিণীদা, আপনি তো শান্তিনিকেতনে অনেকদিন কাটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন, তাঁর কথাবার্তাও শুনেছেন। আমি রবীন্দ্রনাথের মৌখিক হাস্য-পরিহাসগুলো সংগ্রহ করছি। কবির ঐ রকম পরিহাস-রসিকতার কথা আপনার জানা থাকলে, আমাকে দু'একটা শোনান না!

আমার এই কথা শুনে রোহিণীদা বললেন—গুরুদেবের ঐ পরিহাসের কথা অনেক শুনেছি। এখনি একটা মনে পড়ছে, আপনাকে বলছি শুনুন—

ক্ষিতিমোহন সেন সেই সবে কিছুদিন হ'ল শান্তিনিকেতনে এসেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর অধ্যাপনা আর ভাল লাগছে না। তাই তিনি স্থির করলেন অধ্যাপনা ছেড়ে কবিরাজী করবেন। বৈদ্যর ছেলে, জাত ব্যবসা করাই ভাল।

ঐ সময় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন না; তিনি তখন ইউরোপে। ক্ষিতিমোহনবাবু ঠিক করলেন—কবির অনুপস্থিতিতে যাওয়াটা উচিত হবে না। কবি ফিরে এলেই যাবো।

যথা সময়ে কবি ইউরোপ থেকে ফিরে এলেন। তিনি এসেই ক্ষিতিমোহনবাবুর ঐ কবিরাজী কথার কথাটা শুনলেন। শুনে তিনি একদিন ক্ষিতিমোহনবাবুকে ডাকালেন। ডাকিয়ে বললেন—ক্ষিতিমোহনবাবু আপনি নাকি কবিরাজী করবেন বলে মনস্থ করেছেন? কিন্তু কবি যেখানে রাজী নয়, সেখানে আপনার কবিরাজী কি করে হয়?

রোহিণীদার মুখে এই কাহিনীটা শুনে আমি বললাম—কথাটা বেশ সুন্দর তো।

রোহিণীদা আমাকে যখন এই কাহিনীটা শোনান, তখন ক্ষিতিমোহনবাবু জীবিত এবং শান্তিনিকেতনেই রয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যই ক্ষিতিমোহনবাবুকে ঐ কথা বলেছিলেন কিনা, তা জানবার জন্য আমি একদিন শান্তিনিকেতনে ক্ষিতিমোহনবাবুর কাছে যাই।

গিয়ে আমি আমার একটু পরিচয় দিয়ে যখন তাঁকে ঐ 'কবিরাজী' পরিহাসটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন—কবি ওকথা আমাকে বলেন নি। আমিই কবিকে বলেছিলাম—কবি যখন রাজী নন, তখন আর কবিরাজী কি করে হয়?

ক্ষিতিমোহনবাবুর এই কথা শুনে বুঝলাম—রোহিণীদা ক্ষিতিমোহনবাবুর পরিহাসকে রবীন্দ্রনাথের পরিহাস বলে ভুল করেছেন।

'কবিরাজী' পরিহাসের সমস্যাটা মিটলে, আমি ক্ষিতিমোহনবাবুকে বললাম—আমি রবীন্দ্রনাথের মৌখিক পরিহাস রসিকতাগুলি সংগ্রহ করছি। কবির ঐ রকম পরিহাসের কথা আপনার জানা থাকলে দু একটা শোনান না!

ক্ষিতিমোহনবাবু বললেন—আচ্ছা দু একটা বলছি—

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে এবং জাপানীদের ভারত আক্রমণের কথাও শোনা যাচ্ছে।

ঐ সময় 'সৈনিক' নামে একটা পত্রিকা বেরোত। একদিন শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্র উত্তরায়ণে কবির সঙ্গে দেখা করতে যায়। ছাত্রটির হাতে তখন একখণ্ড সৈনিক পত্রিকা ছিল।

ছাত্রটি কৌতূহল বসে সৈনিক-এর সঙ্গে মিলিয়ে মুখে মুখে একটা কবিতা রচনা করে দেবার জন্য কবিকে অনুরোধ করল।

কবি শুনে সঙ্গে সঙ্গেই মুখে মুখে এই কবিতাটি রচনা করে দিলেন—

যদি পার দৈনিক
চা খাইও চৈনিক।
গায়ে যদি জোর পাও
হোয়ো তবে সৈনিক।
জাপানীরা আসে যদি
চিঁড়ে নিক্ দই নিক্
যত পারে আধুনিক কবিতার বই নিক্।

আর একটা বলি—একবার ইউরোপের কোন একটা জাতি নিজের শত্রুর প্রতি অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বোমা ফেলে। এতে ইংরাজরা তখন ঐ জাতির খুব নিন্দা করে।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, এই ইংরাজরাই সীমান্ত প্রদেশে প্রচুর বোমা ফেলে লোকের প্রভূত ক্ষতি সাধন করছে।

ঐ সময় একদিন বিকালে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও আমি কবির কাছে বসে ইংরাজদের এই বোমা ফেলার কথাই আলোচনা করছিলাম। শাস্ত্রী মশায় বললেন—সকলেই ঐরূপ অপকর্ম করেন, নামটা রটে বিশেষ কোন ব্যক্তির।

আমি বললাম—সর্বপক্ষী মৎস্যভক্ষী, মৎস্যরাঙ্গা কলঙ্কিনী।—সব পাখীই মাছ খায়, মাছ খাওয়ার কলঙ্কটা হয় কেবল মাছরাঙ্গার।

আমার কথা শুনে কবি বললেন—কি বললেন ক্ষিতিমোহনবাবু, মৎস্যরাঙ্গাই কলঙ্কিনী নয়? থামুন, থামুন আমি একটা সমস্যা পূরণ করি।

এরপর বললেন—সবাই কলম ধার করে নেয়
আমিই কেনে কলম কিনি?

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় কথা-প্রসঙ্গে মুখে মুখে এইরূপ ছড়ার আকারেও কবিতা বলতেন। একবার কয়েকজন ছাত্র রবীন্দ্রনাথকে সহজ করে লিখবার কথা বললে, তিনি তখনই মুখে মুখে ছাত্রদের বলেছিলেন—

সহজ ক'রে লিখতে বলো যে

সহজ করে যায় না লেখা সহজে।

দু লাইনের এই ছোট্ট কবিতাটি আমাকে বলেছিলেন, কলকাতার এক বিখ্যাত প্রবীণ আইনজীবী চৈতন্যদেব ভট্টাচার্য। তিনি এটি শুনেছিলেন এক অধ্যাপক সাহিত্যিকের কাছে।

রবীন্দ্রনাথ অসংখ্য বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী, এমনকি প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারও অটোগ্রাফের খাতায় বা স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতায় বাণী দিয়েছেন। অনেকের জন্মদিনে এবং অনেকের বিবাহেও আশীর্বাণী পাঠিয়েছেন। কারও কারও নবজাত পুত্র-কন্যার নামকরণ উপলক্ষেও তাঁকে নামকরণ করতে হয়েছে। তাঁর বিশেষ পরিচিত জনের মৃত্যুতে তিনি শোকবার্তা দিয়েছেন। আবার বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে, দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে বা বিশেষ বিশেষ দিবস উপলক্ষেও তাঁকে বাণী দিতে হয়েছে। কত গ্রন্থকারের গ্রন্থ পাঠ করে অভিমতও দিয়েছেন। নিজের প্রতি কারও শ্রদ্ধার্ঘ্য এলে, তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন। কেউ কিছু উপহার দিলে তাঁকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। আবার কেউ অমনিই একটা কবিতা চাইলে, তাঁকেও কবিতা লিখে দিয়েছেন। দীর্ঘ জীবনে এইভাবে নানা সময়ে কত ক্ষেত্রে যে তিনি বাণী, আশীর্বাণী, অভিনন্দনবাণী ইত্যাদি দিয়েছেন, তার হিসাব করা আজ এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এই সব বাণী, আশীর্বাণী প্রভৃতি তিনি যেমন গদ্যে লিখে দিয়েছেন, তেমনি কবিতায়ও লিখেছেন। তবে তিনি বহু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অটোগ্রাফের খাতায় বাণী দেবার সময় কবিতায়ই লিখেছেন বেশী। অনেক সময় তিনি বাংলা কবিতা লিখে, সেই কবিতার অনুবাদ হিসাবে ইংরাজিতেও কবিতা লিখে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ কখন কখন স্বেচ্ছায় তাঁর কোন কোন স্নেহভাজনকে আশীর্বাণী লিখে জানালেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু তাঁকে অনুরুদ্ধ হয়েই ঐ সব বাণী ইত্যাদি দিতে হয়েছে। আর এই অনুরোধ শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও অনেকেই করেছিলেন। তাঁর 'লেখন' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই তো বিদেশে অনুরুদ্ধ হয়ে প্রদত্ত বাণীরই সংকলন।

স্বদেশে এবং বিদেশেও লোকে তাঁকে সামনে পেয়ে, তখন যেমন তাঁর বাণী নিয়েছেন, তেমনি আবার দূর থেকে চিঠি লিখেও তাঁর কাছ থেকে বাণী আদায় করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিচিত জনদের—তা তিনি স্বল্প পরিচিতই হোন্ বা বিশেষ পরিচিতই হোন্—তাঁদের অনেকের অনুরোধে তাঁকে বাণী বা আশীর্বাণী ইত্যাদি দিতে হয়েছে বার বার। এখানে এই ধরণের বার বার বাণী দেওয়ার দুটি উদাহরণ দিচ্ছি—

১. 'জাতক' গ্রন্থের লেখক ঈশান চন্দ্র ঘোষের দুই পুত্র—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও প্রতুলচন্দ্র ঘোষ। প্রফুল্লবাবু ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, আর প্রতুলবাবু ছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রতুলবাবুর তেমন কোন ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল না। তবুও এই প্রতুলবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কতবার কী কী ভাবে বাণী আদায় করেছিলেন, তার একটা হিসাব দিচ্ছি—

প্রতুলবাবু রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে তাঁর পিতার 'জাতক' গ্রন্থ সম্বন্ধে একটা অভিমত লিখিয়ে নেন। প্রতুলবাবু তাঁর পিতার একটি ফটোতেও রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে একটি কবিতা লিখিয়ে নিয়েছিলেন।

প্রতুলবাবুর একটি পুত্র ছ মাস বয়সে মারা গেলে, সেজন্যও প্রতুলবাবুর অনুরোধে কবিতায় একটি শোকবার্তা রবীন্দ্রনাথকে লিখে দিতে হয়। সেই ছ মাসের শিশুর একটি বড় ফটোর নীচে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরেই ঐ কবিতাটি দিয়ে প্রতুলবাবু বাড়িতে বাঁধিয়ে রেখেছেন, দেখে এসেছি।

প্রতুলবাবুর ঐ সন্তানের মৃত্যুর পর তাঁর আর একটি পুত্র সন্তান জন্মালে, তখনও এই প্রতুলবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কবিতায় এক আনন্দ-বার্তাও লিখিয়ে নেন।

এছাড়া প্রতুলবাবু নিজের অটোগ্রাফের খাতায়, নিজের স্ত্রীর অটোগ্রাফের খাতায় এবং নিজের দুই কন্যার অটোগ্রাফের খাতায়ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বাণী আদায় করেন।

২. 'প্রবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচিত ছিলেন। এই চারুবাবু নিজের এক জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে একটা বড় কবিতা লেখান। এছাড়া নিজের তিনপুত্র ও এক কন্যার বিবাহে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কবিতায় চারটি আশীর্বাণী আদায় করেন। শুধুই কি আশীর্বাণী চাওয়া, সেই সঙ্গে আবার আবদার বা ফরমাসও কখন কখন থাকতো। যেমন—চারুবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল প্রেমোৎপল। প্রেমোৎপলবাবুর বিবাহের সময় যে পাত্রী স্থির হয় তাঁর নাম ছিল অমিয়া। এঁদের বিবাহের সময় চারুবাবু যখন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আশীর্বাণী আদায় করেন, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—আশীর্বাণীটি এমনভাবে লিখবেন, তাতে যেন আমার ঐ পুত্র ও পুত্রবধূরও নাম থাকে।

সব শেষে চারুবাবু যখন তাঁর কন্যার বিবাহের সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে আশীর্বাণী চান, তখন রবীন্দ্রনাথ চারুবাবুকে এক ছোট চিঠিতে লিখেছিলেন—চারু আর পারিনে।

রবীন্দ্রনাথ এই কথা বলেও কিন্তু তিনি তখন কবিতায় আশীর্বাণী লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রতুলবাবুর আদায় করা রবীন্দ্রনাথের বাণী ইত্যাদি প্রতুলবাবুর বাড়ি থেকে এবং কয়েকটার নকল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবন থেকে সংগ্রহ করেছি। চারুবাবুর আদায় করা রবীন্দ্র-বাণীগুলি চারুবাবুর পুত্র হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সংগ্রহ করি।

রবীন্দ্রনাথ নিজের শত অসুবিধা সত্ত্বেও পারত পক্ষে কারুরই অনুরোধ বা দাবী উপেক্ষা করতেন না। এই জন্যই তিনি এ প্রসঙ্গে কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে একবার এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

'প্রতিদিন অন্তবিহীন চিঠি লেখা-লেখি, আশীর্বাণীর দাবি, অভিমতের অনুরোধ, বাংলা দেশের নবজাতকদের নামকরণ, আসন্ন বিবাহের সরকারী রসুন চৌকিগিরি আমার শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের শান্তির পক্ষে অসহ্য হয়েছে। দাবি অসংগত হলেও আমি সহজে অস্বীকার করতে পারি নে বলেই আমার কাঁধ থেকে বোঝা নামল না।'

বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে ছোট ছোট কবিতায় লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের এই বাণী, আশীর্বাণী ইত্যাদি নিয়ে বিশ্বভারতীর প্রকাশিত বই আছে দুটি—লেখন ও স্ফুলিঙ্গ। লেখন প্রকাশিত হয় কবির জীবিতকালে ১৩৩৪ সালের কার্তিক মাসে। আর স্ফুলিঙ্গ প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর প্রায় চার বছর পরে ১৩৫২ সালের ২৫শে বৈশাখ।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত স্ফুলিঙ্গ বইয়ের ১ম সংস্করণে ছিল ১৯৮টি কবিতা। পরে ২য় সংস্করণে হয় ২৬০টি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত প্রথম বারের রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৪র্থ খণ্ডের অন্তর্গত স্ফুলিঙ্গ বইয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত ২য় বারেরও রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৩য় খণ্ডের অন্তর্গত স্ফুলিঙ্গ বইয়ে ঐ ২৬০টি কবিতাই আছে।

রবীন্দ্রনাথের এই যে টুকরো টুকরো কবিতা বা বাণী, আশীর্বাণী এগুলোর প্রত্যেকটারই ছোট বড় যাই হোক একটা করে ইতিহাস আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত দুবারেরই রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্গত স্ফুলিঙ্গ বইয়ে কিন্তু এই কবিতাগুলির আদৌ কোন পরিচয় নেই। বিশ্বভারতীর স্ফুলিঙ্গ বইয়ে দু একটা কবিতার সামান্য পরিচয় বাদে, অধিকাংশেরই কোন পরিচয়ই নেই।

বিশ্বভারতী প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ স্ফুলিঙ্গ বইয়ের কবিতাগুলি যাঁদের কাছ থেকে বা যাঁদের সহায়তায় পাওয়া গেছে, বইয়ের শেষে তাঁদের একটা নামের তালিকা আছে। সেখানে শুধু নামের আদ্যক্ষরের অ, আ, ক, খ, ধরে ক্রম অনুসারে নামগুলি বসান হয়েছে। এতে বইয়ের কোন্ কবিতা যে কার

কাছ থেকে বা কার সহায়তায় পাওয়া গেছে, তা কিছুতেই জানা যায় না। পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ স্ফুলিঙ্গে কবিতা আছে ২৬০টি, আর নামের তালিকায় নাম আছে ঐ ৫৮ জনেরই।

১৩৯৭ সালের শ্রাবণ মাসে বিশ্বভারতী থেকে 'স্ফুলিঙ্গ'র ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে আছে ৪১০টি কবিতা। যাদের কাছ থেকে বা যাদের সহায়তায় কবিতাগুলি পাওয়া গেছে এবার আগের ৫৮ জনের জায়গায় নাম আছে ৯০ জনের। কবিতার পরিচিতি প্রায় পূর্ববৎ এবং কয়েকটা ক্ষেত্রে আবার কবিতার প্রসঙ্গ-কথা এবারে মুছে দেওয়াও হয়েছে।

এই যে স্ফুলিঙ্গ বইয়ের কোন্ কবিতা কাকে লিখে দেওয়া বা কার সৌজন্যে প্রাপ্ত, তা ঐ ৫৮ জনের বা ৯০ জনের নাম ধরে বা খোঁজ করে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে। এটা আদৌ জিজ্ঞাসা করতে হত না, স্ফুলিঙ্গ-সম্পাদক যদি সামান্য একটু পরিশ্রম করতেন, তিনি বইয়ের শেষে ঐ নামের তালিকা দেবার আগে—বইয়ের যে সংখ্যক কবিতাটি যাঁর কাছ থেকে বা যাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত, তা ঐ নামের তালিকায় তাঁর নামের পাশে কবিতার সেই সংখ্যাটা বসিয়ে দিতেন।

ঐ ৫৮ জনের বা ৯০ জনের অনেকেই আজ মৃত। আর অনেকের পরিচয় সংগ্রহ করাও অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় অনেককে বাণী ইত্যাদি দিতে গিয়ে প্রথমে বাংলায়, পরে তার অনুবাদ হিসাবে ইংরাজিতেও কবিতা লিখে দিতেন। স্ফুলিঙ্গ বইয়ের কবিতাগুলির কোন্‌টা কাকে লেখা এবং কি প্রসঙ্গেই বা লেখা, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি জেনেছি, রবীন্দ্রনাথ স্ফুলিঙ্গ বইয়ের বেশ কয়েকটা কবিতা প্রথমে বাংলায় লিখে সঙ্গে সঙ্গেই অনুবাদ হিসাবে ইংরাজিতেও লিখে দিয়েছিলেন। স্ফুলিঙ্গ-সম্পাদক সেই বাংলা ও ইংরাজি কবিতা থেকে মাত্র বাংলা অংশটা নিয়ে স্ফুলিঙ্গে দিয়েছেন। ফলে ঐ ইংরাজি কবিতাগুলি আজ একেবারেই লোকচক্ষুর অন্তরালে যেতে বসেছে। অথচ স্ফুলিঙ্গ-সম্পাদক 'লেখন' বইয়ের মত বাংলার সঙ্গে ইংরাজি কবিতাগুলোও দিয়ে গেলে, লোকে সেগুলোর কথাও সহজে জানতে পারত।

স্ফুলিঙ্গ-র বাংলা কবিতার ইংরাজি অনুবাদ যে বাদ দেওয়া হয়েছে, এখানে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

রবীন্দ্রনাথের চিঠি এবং তাঁর সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি একদিন রবীন্দ্রনাথের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্রী (সুধীন্দ্রনাথের কন্যা) এণা রায়ের কলকাতার বাড়িতে গিয়েছিলাম। এণা দেবীর বয়স তখন আশিরও বেশী।

তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার সময় তিনি বললেন, তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ শোকবার্তা হিসাবে বাংলায় একটা কবিতা লিখে, সেই কবিতারই নীচে তার ইংরাজি অনুবাদ করে, তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এণা দেবীর বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় ঐ শোকবার্তার বাংলা ও ইংরাজি দুটো কবিতাই আমি নকল করে এনেছিলাম। বাড়িতে এসে দেখলাম, ঐ শোকবার্তার বাংলা অংশটুকু যার প্রথম লাইন—'মাটিতে মিশিল মাটি...' স্ফুলিঙ্গ বইয়ে আছে। কিন্তু ইংরাজি অংশটা দেওয়া হয়নি।

স্ফুলিঙ্গ-সম্পাদক এই 'মাটিতে মিশিল মাটি' কবিতাটি যে এণা রায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, ১ম সংস্করণের সম্পাদক বইয়ের শেষে যে ৫৮ জনের নামের তালিকা দিয়েছেন, তাতে এণা রায়ের নামও আছে।

এণা দেবীর বাড়িতে ঐ কবিতা না দেখলে এবং ঐ কবিতার ইতিহাস না শুনলে আমি স্ফুলিঙ্গে 'মাটিতে মিশিল মাটি' কবিতা পড়ে কিছুতেই জানতে পারতাম না যে, ঐ কবিতা কাকে এবং কি প্রসঙ্গে লেখা। আর এই বাংলা কবিতার সঙ্গে যে ইংরাজি অনুবাদও আছে তাও জানতে পারতাম না।

শুনেছি, এণা দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, কন্যা কৃষ্ণা—যিনি এক বিরাট ধনী ফরাসীকে বিয়ে করে বরাবরের জন্য ফ্রান্সের অধিবাসিনী—কলকাতায় এসে তাঁর মা'র মূল্যবান সামগ্রীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাও নিয়ে ফ্রান্সে চলে গেছেন। তাই যদি হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের ঐ বাংলা কবিতাটি পাওয়া গেলেও, ইংরাজি অনুবাদের কথা হয়ত একেবারে অজানাই থেকে যেত। আমি ইংরাজি অনুবাদটাও নকল করে এনেছিলাম বলে সেটা পাওয়া গেল। এখানে দুটো কবিতাই দিলাম—

মাটিতে মিশিল মাটি
যাহা চিরন্তন,
রহিল প্রেমের স্বর্গে
অন্তরের ধন।

Dust return to dust
which is imperishable.
Dwells in love's heaven
treasured by the Eternal.

রবীন্দ্রনাথের সেজদা হেমেন্দ্রনাথের পৌত্র (ঋতেন্দ্রনাথের পুত্র) বাসব ঠাকুর একদিন আমাকে বললেন, 'আমার এক পিসিমা প্রজ্ঞা দেবীর বিয়ে হয়েছিল, আসামের লক্ষ্মীকান্ত বেজবরুয়ার সঙ্গে। আমার ঐ পিসেমশায় ছিলেন, অসমীয়া ভাষার এক বিখ্যাত কবি। এঁদের এক মেয়ে দীপিকা আমার চেয়ে ৭/৮ বছরের বড়, এখন তাঁর বয়স ৭৫/৭৬ হবে।

দীপিকাদি পড়াশুনার পর বিয়ে না করে কেন জানি না খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ

করে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী বা নান হন। এখন তিনি তাঁর পরিচিত খ্রীষ্টান মহলে সিস্টার দীপিকা নামে পরিচিতা।

দীপিকাদিরা তিন বোন, ভাই নেই। পিতার অগাধ বিষয় সম্পত্তির অংশ ছেড়ে দিয়ে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনী হয়েছেন।

কিছুদিন আগে ভারত সরকার যখন আমার পিসেমশায় লক্ষ্মীকান্ত বেজবরুয়ার স্মরণে ডাক টিকিট বার করেন, সেই সময় দীপিকাদি একদিন আমার বাড়িতে এসেছিলেন। এসে সেই ডাক টিকিট আমাকে দেখিয়ে যান। ঐ সঙ্গে সেদিন তাঁকে সম্বোধন করেই লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের একটা ছোট কবিতাও আমাকে দেখান। রবিদাদু দীপিকাদিকে খুব স্নেহ করতেন।'

এই কথা শুনে আমি বাসববাবুকে বললাম—রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা কি নকল করে রেখেছেন?

—না। তবে কবিতাটা তখন পড়ে ছিলাম। ছোট হলেও সেটা একটা ভাল কবিতা, এটা আমার মনে আছে।

—আপনার দীপিকাদি এখন কোথায়? তাঁর ঠিকানা কি?

—তিনি ত তাঁদের খ্রীষ্টান মিশনারী সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন স্থানে, এমন কি কখন কখন ভারতের বাইরেও গিয়ে থাকেন। তবে এখন তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় চিকিৎসার জন্য ডায়মণ্ড হারবার রোডে ক্যালকাটা মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছেন। সেখানে গেলে দেখা হতে পারে। আমারও একসময় যাওয়া দরকার।

—চলুন, তাহলে আগামী কালই যাই।

—তাই চলুন। তবে তার আগে, দীপিকাদির নির্দেশে তাঁর পরিচিত পি. গাঙ্গুলী নামে এক খ্রীষ্টান ভদ্রলোক, আমাকে দীপিকাদির হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবরটা দিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর ঠিকানা দিচ্ছি, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করুন। তিনি কি বলেন, আমাকে জানিয়ে যাবেন।

পি. গাঙ্গুলী কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট। রবিবার ছুটির দিনে সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, তিনি গির্জায় গেছেন। বাড়ি ফিরতে দুপুর হবে।

যাই হোক্‌, কয়েকদিন পরে আবার দীপিকা দেবীর খোঁজ নিতে গেলাম। সেদিন দেখা হলে গাঙ্গুলী মশায় বললেন—সিস্টার দীপিকা এখনও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নি বটে, তবে মৃত্যুর সঙ্গে তিনি লড়াই করে চলেছেন। তাঁকে এখন ঠাকুরপুকুর ক্যানসার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন।

দীপিকা দেবীকে লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার জন্য যে আমি দীপিকা দেবীর খোঁজ করছি, এ কথা সেদিন গাঙ্গুলী মশায়কে বলেছিলাম।

খবরটা বাসববাবুকে দিতে এলাম। শুনে তিনি বললেন—তবে আর গিয়ে কোন লাভ নেই। শুধু শুধু মন খারাপ করতে যাওয়া।

আবার কিছু দিন পরে গাঙ্গুলী মশায়ের ভাড়াটে বাড়ির, দিনেও ঘুটঘুটে অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙ্গে আমার ছানিপড়া ক্ষীণদৃষ্টি নিয়ে তাঁর সেই তিন তলায় গেলাম। সেদিনও দেখা হওয়ায় বললেন—ক'দিন হ'ল সিস্টার দীপিকা মারা গেছেন।

এই শুনে একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললাম—হাসপাতালে যাবার আগে দীপিকা দেবী যেখানে থাকতেন, তাঁর সেই বাসস্থানে বা আস্তানায় খোঁজ করলে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটার পাত্তা পাওয়া যাবে কি ?

বললেন—আচ্ছা, খোঁজ করে দেখাবো, আপনি দিন পনের পরে আর একদিন আসুন।

আবার গেলাম, দেখাও হ'ল, বললেন—সিস্টার ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার আগেই এ কবিতা জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় দিয়ে গেছেন।

এরপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় গিয়ে খোঁজ করলাম। ওখানকার প্রদর্শশালার অধ্যক্ষ সমর ভৌমিক বললেন—দীপিকা দেবীর দেওয়া একটা কাগজ আছে বটে। তবে পেতে দেরি হবে।

সমরবাবু আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত, তা সত্ত্বেও প্রায় দু বছর ঘোরাঘুরির পর, তাঁর কাছ থেকে দীপিকা দেবীকে লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার একেবারে জেরক্স কপিটিই পেলাম।

পেয়ে দেখলাম, এই কবিতা আগেই 'স্ফুলিঙ্গ' বইয়ে ছাপা হয়েছে।

যাই হোক্, স্ফুলিঙ্গে ছাপা হলেও সেখানে তো আর এ কবিতার কোন ইতিহাস নেই। তাই এত ঘোরাঘুরি ও পরিশ্রমের পর এখন অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি কাকে কি প্রসঙ্গে লিখে দিয়ে ছিলেন, তা জানা গেল। এবং কবিতাটি কবে লিখে দিয়ে ছিলেন, তার তারিখও পাওয়া গেল। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

জ্বালো নবজীবনের নির্মল দীপিকা,
মর্তের চোখে ধরো স্বর্গের লিপিকা।
আঁধার গহনে রচো আলোকের বীথিকা,
কলকোলাহলে আনো অমৃতের গীতিকা।

২৫ ডিসেম্বর
১৯২৮

সমরবাবু তাঁদের রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রদর্শশালায় রক্ষিত আরও একটি কবিতার জেরক্স কপিও সেদিন আমাকে দিয়ে ছিলেন। এই

কবিতাটি কাকে লেখা সে সম্বন্ধে প্রদর্শশালার রেকর্ড বইয়ে কিছুই লেখা নেই। তবে কবিতাটি কোথায় বসে কোন্ তারিখে লেখা কবিতার মাথায় তার উল্লেখ আছে। এই কবিতাটিও 'স্ফুলিঙ্গ' বইয়ে রয়েছে। কিন্তু 'স্ফুলিঙ্গ'য় এ কবিতা পড়ে জানা যায় না, কবি কোথায় অবস্থান কালে কোন্ দিন এ কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। যাই হোক্ সে কবিতাটিও এখানে উদ্ধৃত করছি—

জীবন খাতার অনেক পাতাই
এমনি করো শূন্য থাকে।
আপন মনের খেয়ান দিয়ে
পূর্ণ করে লওনা তাকে।
সেথায় তোমার গোপন কবি
রচুক আপন স্বপন ছবি
পরশ করুক দৈববাণী
সেথায় তোমার কল্পনাকে।

শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণে থাকাকালে ৬.১২.৩৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখে দিয়ে ছিলেন।

পূর্বোক্ত বন্ধুবর বাসব ঠাকুর আর একদিন আমায় বললেন—এক ভদ্রলোক একদিন আমাকে বলেছিলেন—হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর অথবা শিবপুরের শ্মশানে আপনার এক আত্মীয়া যাঁকে সেখানে দাহ করা হয়েছিল, তাঁর সম্বন্ধে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা রয়েছে।—আছে কিনা জানি না। খোঁজ করে দেখবেন তো?

আমার বাড়ি হাওড়া জেলার এক গ্রামে হলেও আমি আগে কোনদিনই হাওড়া শহরের কোনও শ্মশানে যাই নি। বাসববাবুর মুখে এই কথা শুনে, একদিন খুঁজে খুঁজে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলের বাঁশতলা শ্মশান ঘাটে যাই। গিয়ে দেখলাম—সেখানে পাথরে ও সিমেন্টে কোন কোন মৃতব্যক্তির কথা লেখা থাকলেও, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কোথাও নেই।

এরপর ঐদিনই দুপুরে চড়া রোদে ওখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে লোককে জিজ্ঞাসা করে করে শিবপুর শ্মশানে গেলাম। সেখানে গিয়ে শ্মশানের দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা খুঁজতে খুঁজতে একটা স্মৃতিফলকে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা পেয়ে গেলাম। একেবারে শ্মশানের মাঝখানে পূর্ব থেকে পশ্চিমে পর পর যে পাঁচটি চিতা আছে, সেই চিতাগুলির পূর্ব দিকের ১ম চিতাটির পাশেই দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি আছে। শ্মশানে বসে কবিতাটি তখন সেখান থেকে নকল করে আনি। কবিতাটি হ'ল—

শোভনা

অস্তরবির কিরণে তব জীবন শতদল

মুদিল তার আঁখি,
মরমে যাহা ব্যাপ্ত ছিল স্নিগ্ধ পরিমল
মরণে দিল ঢাকি।
লয়ে গেল সে বিদায়কালে মোদের আঁখিজল
মাধুরী সুধা সাথে,
নূতনলোকে শোভনারূপ জাগিবে উজ্জ্বল
বিমল নবপ্রাতে।

রবীন্দ্রনাথের সেজদা হেমেন্দ্রনাথের কন্যা শোভনার মৃত্যু হলে, তখন রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখে শোভনার স্বামী ব্যারিষ্টার নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন।

বাসব ঠাকুর তাঁদের 'The Art world' নামক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরেই এই কাবিতাটি ছেপেছিলেন—

মাঠে আছে কাঁচা ধান, কাঁচা হাঁড়ি কুমোরের বাড়ি।

কাঁচা চুলো ভিজে কাঠ, পাত পাড়িয়ো না তাড়াতাড়ি॥

বাসববাবু রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থের লেখক টেকচাঁদ ঠাকুর বা প্যারিচাঁদ মিত্রের প্রপৌত্র বধূ (নির্মল মিত্রের স্ত্রী) প্রমিলা মিত্রের অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিয়েছিলেন।

শুধু এই বলাই নয়, বাসববাবু প্রমিলা দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয়ও করিয়ে দিয়ে ছিলেন। বাসববাবু তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ার বা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের ঠিক পূর্ব দিকে প্রমিলা দেবীদের বাড়ির এক ফ্ল্যাটে ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকতেন। প্রমিলা দেবীদের সেই বাড়ি, বাড়ির প্রশস্ত উঠান ইত্যাদি আজ আর নেই। সেখানে এখন অন্য লোকের নতুন বহুতল বাড়ি হয়েছে।

প্রমিলা দেবীর সঙ্গে আলাপ হলে, তিনি আমাকে বলেছিলেন—তাঁর দিদি অমিয়া বসু একবার তাঁর লেখা এক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি করে সেই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতা পেয়েই অমিয়া দেবীকে কবিতায় উত্তর দিয়েছিলেন।

প্রমিলা দেবী তাঁর দিদিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির একটা নকল আমাকে দেন। সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করছি—

কল্যাণীয়াসু,

সুন্দর ভক্তির ফুল অলক্ষ্যে নিভৃতে তব মনে
যদি ফুটে থাকে মোর কাব্যের দক্ষিণ সমীরণে,

হে শোভনে, আজি এই নির্মল কোমল গন্ধ তার
দিয়েচ দক্ষিণা মোরে, কবির গভীর পুরস্কার।

লহ আশীর্বাদ বৎসে, আপন গোপন অন্তঃপুরে
ছন্দের নন্দন বন সৃষ্টি কর সুধা স্নিগ্ধ সুরে,
বঙ্গের নন্দিনী তুমি, প্রিয় জনে কর আনন্দিত
প্রেমের অমৃত তব ঢেলে দিক গানের অমৃত।

শান্তিনিকেতন
২২ ভাদ্র ১৩৩০

'স্ফুলিঙ্গ' বইএর কবিতা জাতীয় রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমি দীর্ঘ দিন ধরে সংগ্রহ করে আসছি। 'স্ফুলিঙ্গ' ৩য় সংস্করণ বইয়েও নেই, এমন বহু কবিতা আমার সংগ্রহে আছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন ব্যক্তির অটোগ্রাফের খাতা ইত্যাদি থেকে আমি এগুলো সংগ্রহ করেছি। কোথা থেকে কিভাবে সংগ্রহ করেছি, এখানে তার দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

১. রবীন্দ্রনাথের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্রী (নয়নমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা) হলেন সুজাতা। রবীন্দ্রনাথ এঁর স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতায় এই কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন—

সংসারের খরতাপে রিক্ত যার প্রাণ
সুজাতা, অমৃত পাত্র কোরো তারে দান।
৪ অক্টোবর, ১৯২৯

২. কলকাতার বেঙ্গল অটোটাইপ নামক ব্লক প্রস্তুত কারক প্রতিষ্ঠানের মালিক ললিত গুপ্ত এক সময় স্থির করেছিলেন বাংলার প্রখ্যাত ব্যক্তিদের বাণী নিয়ে বাংলা নববর্ষের কার্ড করবেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম বারের কার্ডের জন্য রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন—

জীবনযাত্রা আগে চলে যায় ছুটে
কালে কালে তার খেলার পুতুল
পিছনে ধুলায় লুটে।

১ বৈশাখ
১৩৩৯

৩. ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস। কবি তখন চন্দননগরে গঙ্গার উপরে তাঁর হাউস বোট 'পদ্মা'য় বাস করছেন। সেই সময় চন্দননগর প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী মতিলাল রায় তাঁদের প্রবর্তক নারী মন্দির বালিকা

বিদ্যালয়ের নূতন গৃহের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাছে আশীর্বাণী চাইলে, তিনি প্রথমে বাংলায় এবং পরে ইংরাজিতে এই আশীর্বাণী দিয়েছিলেন—

নূতন দুয়ার নারী মন্দির
কবি দিনু উন্মোচন,
আলোকে আলোকে ভিতর বাহির
হোক্ শুভ সম্মিলন।

১ আষাঢ় ১৩৪২

Let a window be opened
in the temple of the woman,
for the inner and outer lights
to unite there.

June 16, 1935

৪. কলকাতার মেয়ো হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন ও বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেনবাবুর স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতায় এই কবিতাটি লিখে দেন—

লিখব তোমার রঙীন খাতায় কোন্ বারতা?
রঙীন তুলি পাব কোথা?
সে রঙ ত নেই চোখের জলে, আছে কেবল হৃদয়তলে,
প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা?
কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা?

বন্ধু তুমি বুঝিবে কি মোর সহজ বলা?
নাই যে আমার ছলাকলা।
সুর যা ছিল বাহির ত্যেজে অন্তরেতে উঠল বেজে
একলা কেবল জানে সে যে মোর দেবতা
কেমন করে করব বাহির মনের কথা?

১১ই আষাঢ়
১৩২১

এ সব কবিতা স্ফুলিঙ্গ বইয়ের ৩য় সংস্করণেও নেই। আমি এইরূপ প্রচুর কবিতা সংগ্রহ করেছি।

রবীন্দ্রনাথের এই বাণী, আশীর্বাণী, অভিনন্দনবাণী, জীবনের তথ্য

ইত্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারে, আমাকে যে কেউ বলেছেন—অমুকের কাছে যান বা অমুক জায়গায় যান, গেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পেতে পারেন, আমি তখনই তাই গেছি। তবে সব জায়গাতেই এক বা একাধিক বার গিয়েও যে সফল হয়েছি, তা মোটেই নয়। অনেক জায়গায় ব্যর্থও হয়েছি। এখানে এই ধরণের কবিতা সংগ্রহ করতে যাওয়ার ক'টা ঘটনা বলছি—

১. একদিন একজন আমাকে বললেন—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নির্মল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করুন। তিনি আপনাকে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা দিতে পারেন। তিনি একবার দেওঘরে বেড়াতে গিয়ে সেখানে একজনের বাড়ির দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটা ছোট কবিতা কাঁচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে, দেখে এসে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ কবিতাটা সেই বাড়ির মালিককে লিখে দিয়েছিলেন। নির্মলবাবু কবিতাটা নকল করে এনেও থাকতে পারেন।

এই কথা শুনে আমি একাধিক দিন বনহুগলীতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজে গিয়ে, শেষে একদিন নির্মলবাবুর দেখা পাই। দেখা হলে, তাঁকে রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতার কথা বললাম। তিনি বললেন—দেওঘরে তো নয়, মধুপুরে। আর কবিতাও তো নয়, রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি। চিঠিটা অবশ্য মূল্যবান। আমি নকল করে আনতে পারি নি। আমি সেবার সপরিবারে মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে ঐ বাড়িতে উঠেছিলাম। কলকাতার এক ধনী লোকের বাড়ি। তিনি মারা গেছেন, তাঁর ছেলেরা এখন মালিক। তাঁদের কেউ কখন-সখন মধুপুরে গেলে, ঐ বাড়িতে কিছুদিন করে কাটিয়ে আসেন। অন্য সময় ভ্রমণকারীদের ভাড়া দেন। বাড়িতে একজন কেয়ার-টেকার আছেন। ঐ বাড়ির ঠিকানাটা আপনাকে দিচ্ছি। বলে ঠিকানা দিলেন।

এরপর নির্মলবাবু বললেন—আমি ভূত-টূত মানিনে, সেদিক থেকে আমি এক কালাপাহাড়। কিন্তু ঐ বাড়িতে গিয়ে সেই রাত্রেই যে ভয়ংকর ভূতুড়ে কাণ্ড দেখলাম, তার ফলে পরদিন সকালেই ঐ বাড়ি ছেড়ে চলে আসি। চিঠিটা বাড়ির দেওয়ালে নিশ্চয়ই আজও আছে।

কবিতা পেলাম না বটে, তবে রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠির সন্ধান পেলাম। নির্মলবাবুর কাছে ঐ বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়েছি। এখন ভাবছি চিঠিটা সংগ্রহের জন্য একদিন মধুপুরের ঐ ভূতুড়ে বাড়িতে যাব।

২. বরাহনগরের নিবারণ চক্রবর্তী নামে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমায় বললেন—

কবি সুনির্মল বসুর ছোটভাই সুকোমল বসু একবার স্ব-রচিত এক দীর্ঘ কবিতায় রবীন্দ্র-প্রশস্তি করে, সেই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ কবিতা পড়ে সুকোমলবাবুকে কবিতায় একটি

উত্তর দিয়েছিলেন। সুকোমলবাবু রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা সযত্নে রেখে দিয়েছেন। আপনি তাঁর কাছে গেলে কবিতাটি পাবেন—এই বলে তিনি আমাকে সুকোমলবাবুর বাড়ির ঠিকানা দিলেন।

ঠিকানা পেয়ে, পরের রবিবার সকালেই আমি কলকাতায় মহীশূর রোডে সুকোমলবাবুর বাড়িতে গেলাম। গিয়ে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা বলায় তিনি বললেন—

আমি একবার ফুলস্কেপ সাইজের কাগজে পাঁচ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক সুদীর্ঘ ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ছড়াটা রবীন্দ্রনাথের কাছে ডাকে পাঠিয়ে দিই। ছাড়ার শেষে লেখক হিসাবে আমার নাম দিয়েছিলাম—নরমাতি রত্ন। আমার নাম সুকোমল অর্থাৎ অতি নরম বা নরমাতি আর বসু তো রত্ন। নবরত্নের এক রত্ন। এই ছদ্মনামে ছড়াটা লিখে, ছড়ার মধ্যেই এক জায়গায় বলেছিলাম—আমার আসল নামটা, ঐ ছদ্মনামের মধ্যেই ধাঁধাঁর আকারে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ আমার ঐ সুদীর্ঘ ছড়া পড়ে, কবিতায় নয়, গদ্যেই একটা চিঠি লিখেছিলেন।—এই বলে সুকোমলবাবু রবীন্দ্রনাথের চিঠিটা আমাকে দেখালেন।

চিঠিটা পড়ে একটু বিস্মিত হলাম। বিস্মিত এইজন্য যে, রবীন্দ্রনাথ অত বড় ছড়া পড়েছিলেন, ছড়ার লেখকের আসল নাম উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন এবং ছড়া লেখককে চিঠিও দিয়ে ছিলেন দেখে। চিঠিটা নকল করে এনেছি। তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু, শান্তিনিকেতন

তোমার ধাঁধাঁর বাধা ভেদ করে নামে পৌঁছতে পারি নি। নরমাতিবর্গের যে সামগ্রী মনে পড়ে সে মাখন নামে পরিচিত। রত্ন আছে হীরা, চুনি, পান্না। মাখনের সঙ্গে তাকে জড়িত করা সুসঙ্গত হয় না। ধাঁধাঁর গ্রন্থি-মোচন কাজে আমি পটু নই—সময়ও অতি অল্প। আমার রচনাকে যাঁরা ধাঁধাঁ জাতীয় বলে গণ্য করেন, তাঁদের দরবারে চেষ্টা করে দেখতে পারো।

তোমার দুলকি চালের ছড়ার দৌড় দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।...২৮শে শ্রাবণ ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখানেও রবীন্দ্রনাথের কবিতা পেলাম না বটে, তবে একটা চিঠি পেলাম!

৩. একদিন একজন আমাকে বললেন—'স্বদেশ' মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্র-নাথের ক'টা টুকরো কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল দেখেছি। তবে কোন্ বৎসরের কোন্ সংখ্যায় বেরিয়ে ছিল তা বলতে পারবো না।

এই শুনেই পরের দিন গেলাম 'স্বদেশ' সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ

ভৌমিকের কাছে। গিয়ে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের ঐ টুকরো কবিতার কথা বললে, তিনি বললেন—স্বদেশ পত্রিকার ২য় বর্ষের একটা সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা ছোট ছোট কবিতা ছাপা হয়েছিল মনে পড়ছে। ঐ ২য় বর্ষের 'স্বদেশ'-এর কোন সংখ্যাই কিন্তু আমার কাছে নেই।

এরপর খোঁজ করতে থাকি ২য় বর্ষের 'স্বদেশ' পত্রিকা কোথায় পাওয়া যায়। কয়েক জায়গায় ঘুরে ব্যর্থ হয়ে শেষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে গেলাম। গিয়ে শুনলাম—মাত্র কয়েক সংখ্যা 'স্বদেশ' পত্রিকা এখানে আছে। কোন্ বছরের সেগুলো বার করে দেখতে হবে। কিন্তু ঐ পত্রিকা ক'টা অগোছান অবস্থায় কোথায় কিভাবে আছে, কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হবে।

সাহিত্য-পরিষদে পত্রিকা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী স্নেহাস্পদ শংকরলাল ভট্টাচার্য অনেক কষ্ট করে খুঁজে একটা আলমারির মাথায় রাখা ছোট বাণ্ডিলের মধ্য থেকে 'স্বদেশ' পত্রিকাগুলো আমাকে দেয়।

ঐগুলো খুলে দেখতে দেখতে দেখলাম—'স্বদেশ' পত্রিকার ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ৫টি টুকরো কবিতা ছাপা হয়েছে।

হাতের লেখার খাতা / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই শিরোনাম দিয়ে প্রথম কবিতাটির মাথায় শ্রীমতী শোভা দেবী নাম লিখে লেখা হয়েছে—

আপন শোভার মূল্য পুষ্প নাহি বোঝে
সহজে পেয়েছে যাহা দেয় সে সহজে।

এর পরে শ্রীমতী উমা দেবী নাম দিয়ে তার নীচে পর পর এই চারটি কবিতা ছাপা হয়েছে—

১· খাতার পাতায় নামের বিষম ভীড়
সেথা কোথা পাবো নামের নিভৃত নীড়।

২. জন্ম দিনে রহিল নাম লেখা
মৃত্যুপটে রবে কি তার রেখা ?

৩· নিতেছ কুড়িয়ে যা'তা',
কথার আবর্জনায় কেবলি
ভরিয়ে তুলিছ খাতা।
এ কেমন খেলা হোলো
বুদ্‌বুদ্‌গুলো জড়ো করে করে
ফেনা উঁচু করে তোলো।

৪· জীবনের তপস্যায় এই লক্ষ্য মনে দিয়ো রেখে
স্বর্গেরে বাঁচাতে হবে দানবের আক্রমণ থেকে।

এই কবিতা ৪টির লেখার তারিখ হিসাবে প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে যথাক্রমে লেখা আছে—১০.১১.৩১, ১৪.১১.৩১, ৬.৭.৩২ এবং ৩০ ভাদ্র ১৩৩৯।

এই ৫টি কবিতার মধ্যে শ্রীমতী শোভা দেবীকে লিখে দেওয়া কবিতাটি স্ফুলিঙ্গ-র ১ম সংস্করণে না থাকলেও ২য় এবং ৩য় সংস্করণে ছাপা হয়েছে। তবে সেখানে শোভা দেবীর নাম নেই, আর লেখার তারিখও নেই।

'স্বদেশ' সম্পাদককে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এই শোভা দেবী কে? তিনি বলে ছিলেন—আজ আর মনে নেই।

পরের ৪টি কবিতার প্রাপিকা উমা দেবী কে? এ কথা জিজ্ঞাসা করায়ও 'স্বদেশ' সম্পাদক ঐ একই কথা বলেছিলেন—আজ আর কিছু মনে নেই।

উমা দেবীকে লিখে দেওয়া ৪টি কবিতার মধ্যে প্রথম ৩টি প্রভাতচন্দ্র গুপ্তর 'রবিচ্ছবি' বইয়ে আছে। আর শেষের কবিতাটি শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-চর্চা প্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন রবীন্দ্র-বীক্ষার চতুর্দশ সংখ্যায় আছে। প্রভাতবাবুর বইয়ে ঐ ৩টি কবিতা থাকলেও কবিতাগুলির লেখার তারিখ এবং কাকে লিখে দেওয়া তার কোন উল্লেখ নেই।

এখানে আলোচ্য শেষ কবিতাটির লেখার তারিখ সঠিকভাবেই 'রবীন্দ্র-বীক্ষা'য় দেওয়া হয়েছে। তবে কবিতাটি যাঁকে লিখে দেওয়া, তাঁর নামের জায়গায় আছে, উমা (রায়)। এঁরা উমা দেবী সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে না পেরে উমা নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'রায়' দিয়েছেন।

উমা রায়কে লেখা একটা কবিতা ১৩৫৩ সালের ২৩শে কার্তিক তারিখে প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। লেখার তারিখ ১৫ই পৌষ, ১৩৩৪। কবিতার নীচে লেখা ছিল 'রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা। শ্রীউমা রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।'

এই কবিতাটি স্ফুলিঙ্গ ৩য় সংস্করণে আছে. কিন্তু কবে লেখা বা কাকে লিখে দেওয়া সে সব কিছুই নেই।

এখানে আলোচ্য উমা দেবীকে লেখা ৪টি কবিতা উমা রায়কে লেখা নয় বলেই মনে হয়। কারণ তাঁকে লিখে দেওয়া হলে অপর এই অপ্রকাশিত কবিতা ৪টি তখনই একসঙ্গে বা তার পরে 'দেশে'ই প্রকাশ করতেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিচিতা মোহিত সেনের কন্যা উমা বা বুলা এই উমা দেবী নন। কারণ কবিতাগুলিতে লেখার তারিখ বুলার মৃত্যুর পর। বুলার মৃত্যু হয় ৪.২.৩১ তারিখে।

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র কন্যার নাম ছিল উমা। খোঁজ নিয়ে জেনেছি—ঐ উমা দেবী এই উমা মৈত্র নন।

উমা মিত্র নামে এক মহিলা রবীন্দ্রনাথের পরিচিতা ছিলেন। ১৩৪৫ সালের ২৮শে বৈশাখ তারিখে কালিম্পং থেকে রবীন্দ্রনাথ এই উমা মিত্রকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—তোমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম তা পালন করা কঠিন নয়—ইত্যাদি।

এখানে আলোচ্য উমা দেবী কি এই উমা মিত্র না অন্য কেউ। ইনি কে এখনও সঠিক জানতে পারি নি, জানার জন্য খ‍ুঁজে যাচ্ছি।

৪. রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া তাঁর বাণী, আশীর্বাণী ইত্যাদি সংগ্রহ করছি জেনে, আমার স্নেহভাজন ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বিনয় কুমার মাহাতো ২৪. ১২. ৮৬ তারিখে সন্ধ্যায় আসানসোলে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যাওয়ার পথে কলকাতায় আমার বাড়িতে এসে আমার হাতে একটা টুকরো কবিতা দেয়। দিয়ে বলে—দাদা, এই একটা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী কবিতা। কলকাতার ঢাকুরিয়ায় ৩৩ নম্বর রথীন ব্যানার্জী লেনের স্বর্গত ললিতকুমার সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা বুটুর বিবাহে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি আশীর্বাণী হিসাবে লিখে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন। এই কবিতাটি আমাকে দিয়েছেন, ভাগলপুর কোর্টের উকিল সুভাষচন্দ্র ঘোষ। আপনি তো জানেন, এই সুভাষবাবুই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছদ্মনামে কয়েকটা উপন্যাস লিখেছেন। সুভাষবাবু বললেন—বুটু তাঁর আপন পিসতুতো দিদি। তাঁর ঐ দিদির বিবাহেই রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন, ১৯৩৯ সালে—

জেনো মা এ সুখে দুখে আকুল সংসারে
মেটে না সকল তুচ্ছ আশ ;
তা বলিয়া তুমি অনন্ত তাঁহারে
কোরো না কোরো না অবিশ্বাস।

বিনয় কলকাতার ঢাকুরিয়ায় দাস পাড়ায় রথীন ব্যানার্জী লেনে যেতে হলে, সুভাষবাবুর কাছে শুনে লিখে আনা পথের একটা নির্দেশিকাও আমার হাতে দিল। এছাড়া বিনয় সুভাষবাবুর কাছ থেকে জেনে ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছে ললিতবাবুর এক পুত্রের একটি দোকানের ঠিকানাও দিল।

পরদিন সকালে অর্থাৎ ২৫ শে ডিসেম্বর বড়দিনের ছুটি থাকায় বিনয়ের দেওয়া এই কবিতাটির সত্যতা যাচাইএর জন্য ঢাকুরিয়া রওনা হলাম। খুঁজে খুঁজে ললিতবাবুর পুত্রের দোকানটা পেলাম। ললিতবাবুর পুত্রের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কবিতাটা তাঁকে দেখালাম। তিনি পড়লেন, কিন্তু বুটুর বিবাহে এটি আশীর্বাণী শুনেই তিনি বললেন—বুটু আমার দিদি। তাঁর বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন, কই তা তো কখনো শুনিনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার পিতার সঙ্গে কি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল? আপনার পিতা কি করতেন?

—পরিচয় ছিল বলেও কোন দিন শুনিনি। বাবা রেলওয়েতে চাকরি করতেন।

—আপনি নাও জানতে পারেন, এই কবিতার ব্যাপারে আপনার দিদি নিশ্চয়ই সব জানেন, তিনি কি জীবিতা আছেন ? তাঁর বাড়ি কোথায় ?

—এই ঢাকুরিয়াতেই। এখান থেকে একটু দূরে। তাঁর বাড়ির ঠিকানা দিচ্ছি, গিয়ে দেখতে পারেন। তবে আমার দিদির বিয়েতে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠালে সেটা কি আর আমি জানতাম না।

যাই হোক্, ঠিকানা নিয়ে আবার অনেক খুঁজে খুঁজে বুটু দেবীর বাড়িতে গেলাম, গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে যখন কবিতাটি দেখিয়ে বললাম, আপনার বিয়েতে কি রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখে পাঠিয়ে ছিলেন ?

আমার কথা শুনে বুটু দেবী বিস্মিত হয়ে বললেন—রবীন্দ্রনাথ কে ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ? তিনি কবিতা লিখে পাঠিয়ে ছিলেন, কই তো কখন শুনিনি !

—আপনার পিতা কি বেঁচে আছেন ?

—না, দু বছর হ'ল মারা গেছেন।

আর কোন কথা না বলে চলে এলাম। চলে আসার সময় পথে ভাবতে ভাবতে আসছি—রবীন্দ্রনাথ যাঁর বিবাহে আশীর্বাণী দিলেন, তিনি জানলেন না ? বুটু দেবীর নিশ্চয়ই একেবারে শৈশবকালে বিবাহ হয় নি। তাছাড়া এ বিষয়টা তাঁর ভাইরাও জানলেন না, বা কোনদিন শুনলেনও না, একি সম্ভব ? অথচ বিনয়ের কথা—রবীন্দ্রনাথের ঐ আশীর্বাণী বুটুর বিবাহের সময় ছাপাও হয়েছিল !

এই ভাবতে ভাবতে আসছি। কিছুটা পথ এসেছি, এমন সময় ঢাকুরিয়াতেই ঐ পথে আমাকে দেখে এক ভদ্রলোক বললেন—এদিকে কোথায় এসেছিলেন ? আপনি তো গোপালবাবু ?

—হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলাম না ভাই।

—আমার নাম প্রলয় সেন। আমি ব্যারাকপুরের একটা কলেজের অধ্যাপক। কলেজ স্ট্রীট এলাকায় দেবকুমার বসুর বইএর দোকানে একদিন আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল। তা কোথায় এসেছিলেন ?

আমার এখানে আসার কাহিনী এবং আমার সন্দেহেরও কথা প্রলয়বাবুকে শোনালাম।

শুনে তিনিও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। শেষে বললেন—এই অঞ্চলেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয়, তবে রবীন্দ্রনাথের কিছু চিঠি একজনের কাছে আছে আমি জানি।

—কার কাছে আছে ? তাঁর ঠিকানা কি ?

—রাস্তার নম্বরটা মনে নেই। তবে তাঁর বাড়ি সেলিমপুর রোডে পোষ্ট অফিসের কাছেই। সেখানে গিয়ে উৎপল সেনের বাড়ি বলে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন। উৎপল সেনের কাছেই রবীন্দ্রনাথের চিঠি আছে। উৎপলবাবুর

বাবা সরলানন্দ সেন যখন ঢাকার দৈনিক আজাদ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ঐ চিঠি লিখেছিলেন।

এই শুনে সেই দুপুরে তখনই সেলিমপুর রোডে গেলাম। উৎপলবাবুর বাড়িও খুঁজে বার করলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি, বাড়িতে কেউ নেই, বাড়ি তালাবন্ধ।

পাশের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে জানলাম—আজ ছুটির দিন বলে বাড়ির সকলেই কোথায় গেছেন। সন্ধ্যার পর বাড়িতে ফিরবেন।

অগত্যা ফিরে এলাম। পরে আর একদিন যাই। সেদিনও উৎপলবাবুর সঙ্গে দেখা হল না। এরপর আর একদিন গেলে সেদিন দেখা হল। তখন তাঁকে রবীন্দ্রনাথের চিঠির কথা বললে, তিনি বললেন—বাবাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একখানা মাত্র চিঠি আছে। বাংলা বানান সংস্কার নিয়ে যখন এক সময় আলোচনা চলছিল, সেই সময়েই বাবার একটা চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বাবাকে ঐ চিঠিটা লিখেছিলেন। চিঠিটা আপনাকে দেখাচ্ছি।

এই বলে উৎপলবাবু চিঠিটা এনে আমার হাতে দিলেন। আমি চিঠি পড়ে পরে নকল করে নিয়ে এলাম। চিঠিটা হ'ল—

ওঁ

বিনয় নমস্কার নিবেদন,

নিয়ম পরিবর্ত্তন সহজ, অভ্যাস পরিবর্তন সহজ নয়। এখনি তার প্রমাণ হোল পরিবর্তন শব্দের দ্বিত্ব পরিবর্তন করতে ভুলেছি। নূতন বিধি অনুসারে নির্ভুল বানান আমার কাছে প্রত্যাশা করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই যারা বানান শিক্ষা করবে, তারা পুরো মার্কা পাবে। ইতি—১০.১.৩৭

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা চিঠিপত্র নিয়ে আমার একটা বই আছে, নাম 'অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র' বা চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের চিঠি নিয়েও আমার বই আছে —শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি নিয়ে কোন পৃথক বই প্রকাশ করিনি বটে, তবে ৪৯ বর্ষ (১৯৮১-৮২) 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় প্রসঙ্গ-কথা সহ রবীন্দ্র-নাথের অনেক অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করেছি। এমনি একবার 'মহানগর' পত্রিকার পুজো সংখ্যায় এবং মহানগরের সাধারণ সংখ্যায়ও রবীন্দ্রনাথের কিছু অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করি। আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' এবং 'শরৎচন্দ্র' বইয়েও রবীন্দ্রনাথের কিছু চিঠি দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী' নিয়ে একটা বইও লিখে প্রকাশ করেছি।

আমি দীর্ঘদিন ধরেই নানা জায়গা থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখা চিঠি সংগ্রহ

করে আসছি, এবং অনেকেরই অজানা রবীন্দ্রনাথের বহু চিঠিও সংগ্রহ করেছি।

একবার দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় চিঠিপত্রের কলমে আমি একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের চিঠি সংগ্রহ নিয়ে আমার একটা আবেদনও প্রকাশ করেছিলাম। তাতে বলেছিলাম—

কারও কাছে রবীন্দ্রনাথের কোন অপ্রকাশিত বা সাধারণের অজ্ঞাত কোন চিঠি থাকলে, আমাকে যদি অনুগ্রহ করে জানান তো বাধিত হব। ঐ চিঠি বা চিঠির নকল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনে বা দাবী থাকলে আমি যথাযোগ্য অর্থমূল্য দিতেও প্রস্তুত আছি।

যুগান্তরে আমার এই চিঠি প্রকাশিত হলে, তখন হাজরা পাড়া, ডাকঘর ও জেলা—কোচবিহার থেকে নৃপেন্দ্রনাথ পাল এই চিঠিটি লিখে এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নৃপেনবাবু চিঠিতে লিখে ছিলেন—

মান্যবরেষু,

কিছুদিন পূর্বে 'যুগান্তর' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠির সন্ধান বিষয়ে আপনি যে চিঠি লিখেছেন, তাতে আপনার প্রচেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি একটি চিঠি পাঠালাম। পুরোনো সংবাদ সংগ্রহে আপনি পথিকৃৎ। কবিগুরু কোচবিহার মহারাজার এ. ডি. সি. শ্রীপূর্ণানন্দ রায়ের স্ত্রী ইন্দিরা দেবীকে চিঠিখানি লিখেছিলেন। শ্রীমতী রায় কোচ-বিহারের মহারাজকুমারী ইলা দেবী ও গায়ত্রী দেবীর অভিভাবিকা হিসাবে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন সময়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করেন। এই চিঠিতে তাঁদের মধ্যে মধুর সম্পর্কের ছোঁয়া আছে।

চিঠির প্রতিলিপি স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কপি পাঠালাম, প্রাপ্তি সংবাদে আনন্দিত করবেন।

প্রতাপপুর, ডাকঘর ও জেলা হুগলী—এই ঠিকানা থেকে প্রকাশিত 'সংকেত' ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ—১ম ও ২য় যুগ্ম-সংখ্যায় এই ইন্দিরা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৩টি অপ্রকাশিত চিঠি ছাপা হয়েছিল। পরে এই চিঠিগুলিও ঐ 'সংকেত' পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করি।

'সংকেত' পত্রিকায় এই চিঠিগুলি ছাপার সময় ইন্দিরা দেবীর পরিচয় প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—ইন্দিরা দেবী (রায়) কুচবিহার রাজবাড়ির মহারাণীর ব্যক্তিগত সচিব এবং সহচরী ছিলেন।

এই ৩টি চিঠির মধ্যে ২৪.১০.৩৭ তারিখের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখে ছিলেন—

…মৃত্যুর আক্রমণ কোন মতে কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু এখনো চিকিৎসা চলছে। তাই কলকাতায় থাকতে হয়েছে। বোধ হয় নভেম্বরের মাঝামাঝি ছুটি পাব, তখন শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব।…

রবীন্দ্রনাথের এই অসুখের কথা এই বইয়ে আগে 'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে বলেছি।

অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া তথ্য—

১. আমার 'রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৩৬২ সালের ভাদ্র মাসে (আগষ্ট ১৯৫৫)। এই বই রবীন্দ্রনাথের বহু মৌখিক পরিহাস-রসিকতার সংকলন। বইটি প্রকাশিত হওয়ার আগে বইএর কিছু পরিহাস-রসিকতা নিয়ে একটা প্রবন্ধ করে যুগান্তর পত্রিকার রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগে দিতে যাই। ঐ বিভাগের সম্পাদক তখন সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামী। তাঁর হাতে লেখাটা দিলে তিনি পড়ে বললেন—ভাই, তোমার এই লেখাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। তাই এটা যুগান্তরের রবিবারের পাতায় ছাপবো না, সামনের পূজা সংখ্যায় ছাপবো। এখন লেখাটা রেখে দিই।

আমি বললাম—দাদা, আমার একটা বইএর পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু নিয়ে এই প্রবন্ধটা করেছি। পূজার আগেই আমার ঐ বই ছাপা হয়ে বেরিয়ে যাবে, তাই পূজা সংখ্যার জন্য রাখা যাবে না। লেখাটা এখনই ছাপুন।

পরিমলদার সঙ্গে যখন আমার এই কথা হয়, তখন সেখানে উপস্থিত এক ভদ্রলোক পরিমলদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি লেখা ?

পরিমলদা ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন —ইনি চিত্র-পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। বনফুল অর্থাৎ বলাইএর ছোট ভাই।

পরিমলদা পরে আমার পরিচয় দিয়ে অরবিন্দবাবুকে বললেন—গোপাল, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলো মৌখিক পরিহাস-রসিকতা নিয়ে এই প্রবন্ধটা করেছে।

এই শুনেই অরবিন্দবাবু বললেন—আমাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা পরিহাস আছে। সেটা বোধ হয়, আপনারা জানেন না। বলছি শুনুন—

ম্যাট্রিক পাস করে বিশ্বভারতীতে আই. এ. পড়বার জন্য শান্তিনিকেতনে যাই। যাবার সময় দাদা অর্থাৎ বলাইদা আমার হাতে একটা পরিচয় পত্র দেন রবীন্দ্রনাথকে দেবার জন্য।

আমি দাদার চিঠি নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের তখনকার সেক্রেটারি অনিলকুমার চন্দর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যান। যাবার সময় তিনি আমাকে বললেন—গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু জোরে কথা বোলো। উনি আজকাল কানে কম শোনেন।

সাক্ষাৎপ্রার্থী সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ভাই, অনিলবাবু কবিকে এই কথা বলায়—কবি শুনেই বললেন—কি হে, তুমি কি বলাইএর ভাই কানাই নাকি ?

আমি অনিলবাবুর নির্দেশ মত জোরেই চেঁচিয়ে বললাম—না, আমি অরবিন্দ।

কবি শুনে হেসে বললেন—না কানাই নয়, এযে একেবারে সানাই।

২. কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে চক্ষু বিভাগের প্রধান তখন ডাঃ রণবীর মুখোপাধ্যায়। ঐ কলেজের হাসপাতালেই রণবীরবাবু সাফল্যের সহিত আমার একটা চোখের ছানি তুলেছিলেন।

এই ছানি কাটানোর আগে দু একবার চোখ দেখাতে গেলে, রণবীরবাবুর সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হয়। আমি যে একজন লেখক, এটাও তিনি আমার কাছ থেকেই জেনে ছিলেন।

এইরূপ একদিন গেছি। গেলে—রণবীরবাবু আপ্যায়ন করে তাঁর ঘরে বসিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। এরপর কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কি লিখছেন ?

আমি বললাম—রবীন্দ্রনাথ নারী, পুরুষ, যুবা, বৃদ্ধ বহু জনকেই কবিতার বাণী আশীর্বাণী ইত্যাদি দিয়েছেন। এখন রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের টুকরো কবিতায় বাণী আশীর্বাণী সংগ্রহ করছি, অনেক সংগ্রহ করেছি।

আমার এই কথা শুনেই রণবীরবাবু বললেন—আমার সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথের এইরূপ একটা বাণী আছে। এটা ঢাকার 'ঢাকা বান্ধব' কাগজে বেরিয়েছিল। আমি সেখান থেকে সংগ্রহ করি।

—কবিতাটা মনে আছে ?

—হ্যাঁ পরিষ্কার মনে আছে।

—তবে লিখে দিন।

তখন রণবীরবাবু তাঁর প্যাডের কাগজে তাঁর স্মৃতি থেকে এই কবিতাটা লিখে দিলেন—

বাহিরে পাখীর মুক্তি
আকাশের পানে,
অন্তরের মুক্তি তার
আপনার গানে।

৩. শরৎ-জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ত্রিপুরা রাজ্যের তেলিয়ামুড়া শহরে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। সভা হয়েছিল—পর পর দুদিন সকালে এবং বিকালে। ঐ চারটা সভাতেই বক্তৃতা দিতে হয়েছিল।

প্রথম দিন সকালের সভার পর তেলিয়ামুড়ার এক বিশিষ্ট অধিবাসী আমার কাছে এসে আমাকে বললেন—এখানকার ফরেস্ট অফিসার মণিময় দেববর্মণের কাছে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি আছে। শুনেছি, এই মণিবাবুর সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের নাকি দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে।

শুনে আমি বললাম—একটা ভাল খবর শোনালেন। তা চলুন, এখনই মণিবাবুর কাছে যাই।—এই বলে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে মণিবাবুর বাড়িতে গেলাম।

সামান্য আলাপ-পরিচয়ের পর মণিবাবু বললেন—আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের ১৩ খানা চিঠি আছে। এর মধ্যে কয়েকটা আগে কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, কয়েকটা আছে অপ্রকাশিত। চিঠিগুলো এখন আমার কাছে নেই, আগরতলার বাড়িতে আছে।

আমি বললাম—এগুলো আপনার কাছে না রেখে ভাল জায়গায়, শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্র ভবনে' দান করে দিন না।

—ভাবছি, এগুলো শান্তিনিকেতনেই দোব।

তেলিয়ামুড়া থেকে চলে এসে, আমি শান্তিনিকেতন যাই। গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঐ চিঠিগুলোর কথা বলি। এবং আমিই মণিবাবুর সঙ্গে এ নিয়ে পত্রালাপ করতে থাকি। শেষে তিনি কলকাতায় তাঁর এক আত্মীয়ার কাছে চিঠিগুলি পাঠিয়ে দেন। তখন মণিবাবুর আত্মীয়াকে আমি শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাই, তিনি সেখানে গিয়ে চিঠিগুলি দিয়ে আসেন।

ভদ্রমহিলা চিঠিগুলি শান্তিনিকেতনে দেওয়ার আগে আমি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে অপ্রকাশিত চিঠি ক'টি নকল করে নিই।

৪. শরৎ জন্ম-শত বার্ষিকীর সময় তেলিয়ামুড়া শহরের শরৎ-সভায় বক্তৃতা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আগরতলা শহরে এলে, আগরতলার বীর বিক্রম কলেজের দিবা ও নৈশ বিভাগের অধ্যাপকদের অনুরোধে দিনে এবং সন্ধ্যায় দুটি শরৎ-সভায়ও বক্তৃতা দিতে হয়।

রাত্রে বীর বিক্রম কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের হোস্টেলে থেকে সকালে যখন আগরতলার এরোড্রামে এলাম, তখন দেখি আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যই শুধু এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। তিনি ত্রিপুরার বিখ্যাত গবেষক ও লেখক দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় আগরতলা থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত 'ত্রিপুরা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক (আসলে কার্যকরী সম্পাদক) ছিলেন।

পরিচয় হলে দ্বিজেনবাবু আমাকে বললেন—আপনার কত লেখা পড়েছি। কাল রাত্রেই কলেজের এক ছাত্রর মুখে আপনার কথা শুনলাম। আপনি আজই চলে যাবেন শুনে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

এরোড্রামে দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে অল্পক্ষণই কথা হ'ল। পরে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করে আগরতলার রাজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিই। এবং আমিই উপকৃত হই।

একবার দ্বিজেনবাবুকে কয়েকটা প্রশ্ন করে চিঠি দিলে, তখন তিনি আমার প্রশ্ন সমূহের উত্তরে যে চিঠি দিয়ে ছিলেন, সেই চিঠির কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গোপালবাবু, আপনার পত্র পেয়েই উত্তর লিখছি। প্রথমেই আপনার প্রশ্নগুলোর জবাব লিখছি একটি একটি করে।

১. প্রশ্ন—'ত্রিপুরার রাজাদের বংশগত পদবী দেববর্ম্মণ বা দেববর্মা। কেউ কেউ পদবীর বদলে ঠাকুরও লেখেন ও বলেন।'

উত্তর— সে যুগে সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী এবং মহারাজের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণই 'ঠাকুর' উপাধি প্রাপ্ত হতেন।

পরবর্তীকালে বিজয়ার দরবার উপলক্ষে প্রজাদের কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে মহারাজ কর্তৃক সম্মানসূচক 'ঠাকুর' উপাধি প্রদান করা হত। 'ঠাকুর' শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ এ রাজ্যের সম্ভ্রান্ত শ্রেণী বুঝালেও 'ঠাকুর' উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ নিজ নামের সহিত জাতীয় সম্মানসূচক এই 'ঠাকুর' উপাধি ব্যবহার করবার অধিকারী হতেন না। মূলতঃ কথা হ'ল যে official কাগজ পত্রে তাঁদের নামের সঙ্গে 'ঠাকুর' ব্যবহার হত না। ইহা প্রাচীন সমর বিদ্যায় পারদর্শী রাজ্যবাসীর বীরোচিত সম্মান সূচক 'নারায়ণ' উপাধির পরবর্তী সময়ের শান্তিপ্রিয়তা ও সামাজিক সম্মানসূচক রূপান্তরিত উপাধি মাত্র। যদি 'নারায়ণ' ও 'ঠাকুর' এই উভয়বিধ উপাধির মধ্যে সমতা খুঁজতে হয় তবে 'আইন-ই-আকবরীর' আমীর ওমরাহ বাক্যটির সাধারণ জাতিবাচক অর্থে না ধরে শুধু রাজদরবারের সভ্য শ্রেণী ভুক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু 'রাজমালা' অনুসরণে বলতে হয় যে, পূর্বে সাধারণতঃ রাজকুমারগণই 'ঠাকুর' বলে পরিচিত হতেন, পরবর্তী আধুনিক যুগে 'ঠাকুর' উপাধিটি এভাবে সৃষ্টি হয়েছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। 'বড় ঠাকুর' বলতে প্রধান রাজকুমারকে বুঝায়, তার স্থান ছিল যুবরাজের পরেই। কিন্তু পদবী 'দেববর্ম্মণ' কোন অবস্থাতেই লোপ পায় না। ব্যবহার করাটা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।...

৫. হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটা ছোট্ট খবরে পড়ি—রবীন্দ্রনাথ এক সময় লেখিকা হাসিরাশি দেবীকে কবিতায় একটি আশীর্বাণী দিয়েছিলেন। ঐ খবরে এও ছিল—হাসিরাশি দেবী থাকেন ২৪ পরগণা জেলার খাটোরা গ্রামে।

পরে খোঁজ করে জানলাম, খাটোরা গোবরডাঙ্গা রেল স্টেশনের অদূরে। এই জেনে তখনই একদিন খাটোরায় গেলাম। গিয়ে গোবরডাঙ্গার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ আমার বিশেষ পরিচিত হেমেন্দ্রকুমার বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে হাসিরাশি দেবীর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীটি নকল করে আনি। হাসিরাশি দেবী হেমেন্দ্রবাবুর পরিচিতা ছিলেন। পরে হাসিরাশি দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্রী করবী বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কবিতার একটি জেরক্স কপিও পাঠিয়ে দেন।

যেদিন খাটোরায় হাসিরাশি দেবীকে লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী কবিতাটি সংগ্রহ করতে যাই, সেদিন হাসিরাশি দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এই কবিতায় আশীর্বাণী ছাড়া রবীন্দ্রনাথ কোন দিন আপনাকে কোন চিঠি দেন নি ?

—একবার একটা চিঠি দিয়েছিলেন, সে চিঠিটা বহুকাল আমার কাছেই ছিল। আমার মাসতুতো দাদা হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়ে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালার জন্য আমার কাছ থেকে তিনি ঐ চিঠিটি নিয়ে যান। চিঠিটি এখন সেইখানেই আছে।

এই কথা শুনে, খাটোরা থেকে ফিরে আসার দু এক পরেই রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শশালায় ঐ চিঠির খোঁজ করতে যাই। সেদিন প্রদর্শশালার কিউরেটর সমর ভৌমিক তখন তাঁর অফিসে ছিলেন না। প্রদর্শশালার অ্যাসিস্টান্ট কিউরেটর শিশির মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে চিঠিটির খোঁজ করলাম। শিশিরবাবুও আমার বহু দিনের পরিচিত। তিনি সাগ্রহে প্রদর্শশালার এক্সেশন রেজিস্টার বা রেকর্ড খাতা বার করে পাতা উল্টে উল্টে খুঁজে দেখে বললেন—প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কন্যা হাসিরাশি দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি আছে দেখছি। আর প্রভাবতী দেবী সরস্বতীকেও লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি এসেছে। তবে চিঠি দুটা কে এনে জমা দিয়েছেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা লেখা নেই। শুধু জমা পড়ার তারিখটা আছে।

আমি বললাম—হাসিরাশি দেবী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কন্যা নন, বোন। খাতায় ঐ ভুলটা সংশোধন করে দেবেন। এঁদের দুজনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি দুটো একবার দেখাতে পারবেন কি ?

—চিঠি এসেছে, দেখছি। কিন্তু ঐ চিঠি কোথায় কিভাবে আজ রয়েছে, তা বলতে পারবো না। কারণ, আমি এখানে আসার আগে ঐ চিঠি এসেছে। তাই এখনি ঐ চিঠি দেখতে চাইলে, দেখাতে পারবো না।

—আচ্ছা, তাহলে পরে একদিন আসবো, খুঁজে রাখবেন।—এই বলে সেদিন চলে আসি।

এরপরে ঐ দুটি চিঠি দেখার জন্য সমরবাবু এবং শিশিরবাবু দুজনের কাছেই মাঝে মাঝে তাগাদা দিয়েই যাচ্ছি, আজও পাইনি।

৬. ১৯৬৮ সালের কথা। আজকের স্বাধীন 'বাংলা দেশ' তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটা অংশ—পূর্ব পাকিস্তান। সেই সময় দিল্লীতে আমাদের পার্লামেণ্টে একবার আলোচনা হয়—পূর্ব পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-বিজড়িত সাজাদপুরের কুঠি বাড়ি সুসংরক্ষণের ব্যবস্থা করছেন না। ফলে সেখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পাল্কী, গড়গড়া ইত্যাদিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হলে, আমি তখন পার্লামেণ্টের আলোচনাকে সমর্থন করে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তবে আমার চিঠিতে একথাও লিখেছিলাম যে, সাজাদপুরের কুঠি বাড়ি বা কাছারি বাড়িতে যদি গড়গড়া থেকেও থাকে, সে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত গড়গড়া নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ধূমপান করতেন না।

আনন্দবাজারে আমার ঐ চিঠি প্রকাশিত হলে তখন আলিপুরদুয়ার থেকে নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোক আমার সমর্থনে আনন্দবাজারেই একটা চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি একথাও লিখেছিলেন যে, তিনি সাজাদ-পুরের মানুষ, দেশ বিভাগের পর শেষ বয়সে পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছেন।

নরেশবাবু সাজাদপুরের মানুষ জেনে সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের জীবন সম্বন্ধে দু একটা কথা জানতে চেয়ে তাঁকে তখন একটা চিঠি লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে লিখেছিলেন—সাজাদপুরে জমিদারি কাছারি বাড়িতে একটা অর্ডার বুক ছিল, আমি এক সময় ঐ অর্ডার বুক থেকে প্রজাদের প্রতি এমন কি কর্মচারীদের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া কয়েকটা অর্ডার বা নির্দেশ টুকে রেখে ছিলাম। আমি যখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখবো, তখন ঐগুলো আমার সেই লেখায় দোব। কি রকম অর্ডার এই চিঠির সঙ্গে দু একটা লিখে দিলাম।

এই বলে নরেশবাবু তাঁর চিঠিতে, অন্ধ প্রজার খাজনা মাপ ইত্যাদি ধরণের রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা অর্ডার লিখে আমাকে পাঠিয়ে ছিলেন।

নরেশবাবুর সঙ্গে তখন ঐ যা একটা চিঠিতেই আলাপ।

এরপর দীর্ঘ ১২টা বছর, একটা যুগ কেটে গেল। নরেশবাবুর আর কোন খোঁজ রাখিনি, তিনিও আমার কোন খোঁজ নেন নি। এই বার বছরে আমি আমার 'শরৎচন্দ্র' 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রভৃতি বিষয়ে অনেকগুলি বই লিখি। ১২ বছর পরে ১৯৬৮ সালে যখন আমার 'রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী' বইটি লিখতে শুরু

করি তখন সাজাদপুর কাছারি বাড়ির অর্ডার বুক থেকে সংগৃহীত নরেশবাবুর সেই সংগ্রহগুলির কথা মনে পড়ল এবং ঐগুলির প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম।

নরেশবাবুর সঙ্গে যখন চিঠিতে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখনই তিনি ছিলেন বেশ প্রবীণ। তারপর ১২ বছর কেটে গেছে। এখনও কি তিনি জীবিত আছেন? তাছাড়া আমাকে লেখা তাঁর চিঠিটাও কিভাবে হারিয়ে যায়। আনন্দবাজারে কোন্ সময়ে আমার এবং নরেশবাবুরও চিঠি প্রকাশিত তাও স্মরণে ছিল না। নরেশবাবুর পল্লী বা পল্লীর নম্বরও কিছুই মনে ছিল না, শুধু মনে ছিল, ডাকঘর—আলিপুর দুয়ার, জেলা—জলপাইগুড়ি।

এখন নরেশবাবুকে প্রয়োজন হওয়ায় কেবলই ভাবতে থাকি—তিনি কি আছেন? থাকলেও কিভাবে তাঁর সন্ধান পাই।

এই সময় একদিন ঠিক করলাম—আলিপুরদুয়ারের পোষ্ট মাষ্টার মশায়কে একটা চিঠি দোব, তাতে লিখবো—আপনার ডাকঘরের এলাকায় নরেশ চক্রবর্তী নামে যদি কোন লোক থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে যদি আমার এই চিঠিটা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন তো বিশেষ বাধিত হব। নরেশবাবুর পুরা ঠিকানাটা আমার জানা নেই। তাই আপনাকে এই অনুরোধ।

কদিন ধরেই এই রকম একটা চিঠি লিখবো লিখবো ভাবছি। আবার এও ভাবছি—লিখেই বা কি হবে? তিনি কি আজ জীবিত আছেন?

যখন এই সব ভাবছি, তখন একদিন নৈহাটীতে আমার 'ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'য় গিয়ে দেখি আমার টেবিলের উপর দুখানা বই—'গ্রহ নক্ষত্রের মিছিলে,' লেখক নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। সঙ্গে খামে আঁটা একটা চিঠি।

চিঠি পড়ে এবং বই পেয়ে, সেই বিখ্যাত ইউরেকা, ইউরেকা উক্তির মত আমারও মনে হ'ল বলি—এই তো পেয়েছি, এই তো পেয়েছি!

নরেশবাবু আমাদের সংগ্রহশালার অদূরে বসবাসকারী তাঁর এক আত্মীয়র হাত দিয়ে ঐ বই ও চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি আমার দেখা না পেয়ে আমাদের অফিসের এক কর্মীর হাতে ঐগুলো দিয়ে যান।

বুঝলাম নরেশবাবু আজও আমাকে স্মরণে রেখেছেন। এরপর নরেশবাবুকে চিঠি লিখে তাঁর কাছ থেকে অর্ডার বুকে রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলি সংগ্রহ করি। পরে আমার 'রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থে সেগুলি দিই।

৭. ১৯৬৮ সালের পূজা সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় 'রবীন্দ্রনাথের টুকরো কবিতা' নামে আমার একটা লেখা প্রকাশিত হয়। ঐ লেখায় আমি বিভিন্ন

সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের বহু টুকরো কবিতা দিয়ে ছিলাম।

ঐ 'দেশ' পূজা সংখ্যা তখন সবে বেরিয়েছে। সেই সময় একদিন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক আমার বন্ধুস্থানীয় সুখময় মুখোপাধ্যায় কলকাতায় আমার বাড়িতে আসেন। এসে প্রথমেই 'দেশ'য়ে প্রকাশিত আমার 'রবীন্দ্রনাথের টুকরো কবিতা' লেখাটার প্রসঙ্গ তুলে বললেন—রবীন্দ্রনাথের ঐরূপ একটা টুকরো কবিতার কথা আমি জানি। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অশোকবিজয় রাহার অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ঐ কবিতাটা লিখে দিয়ে ছিলেন। কবিতাটা আমার মুখস্থ আছে। একটা কাগজ দিন লিখে দিচ্ছি।

আমি কাগজ দিলে সুখময়বাবু তাতে কবিতাটি লিখলেন—

আকাশে চেয়ে আলোক বর
মাগিল যবে তরুণ চাঁদ
রবির কর শীতল হয়ে
করিল তারে আশীর্বাদ।

কবিতাটা পড়ে আমি সুখময়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—রবীন্দ্রনাথ কবে কবিতাটা লিখে দিয়েছিলেন? তারিখটা মনে আছে?

—তারিখটা মনে নেই। আপনি এবার যেদিন শান্তিনিকেতনে যাবেন, সেদিন আপনাকে সঙ্গে নিয়ে অশোকবিজয়বাবুর বাড়িতে যাব। গিয়ে কবিতাটা দেখে আপনাকে তারিখটা দোব।

কিছুদিন পরেই শান্তিনিকেতনে যাই। গিয়ে সেবার সুখময়বাবুর বাড়িতেই উঠি। সুখময়বাবু এবং আমি দুজনে অশোকবিজয়বাবুর বাড়ি যাব বলে রওনা হলাম। পথে বেরিয়ে সুখময়বাবু বললেন—আমাদের পাড়ায় এন্ডরুজ পল্লীতে এই কাছেই কণিকাদি অর্থাৎ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একবার দেখা করেই অশোকবিজয়বাবুর বাড়ি যাব।

দুজনেই গেলাম কণিকা দেবীদের বাড়িতে। গেলে প্রথমে কণিকা দেবীর স্বামী বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি আমার পূর্ব-পরিচিত। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন—কবে এলেন ইত্যাদি।

এই সময় সুখময়বাবু বললেন—গোপালবাবুকে নিয়ে অশোকবিজয় রাহার বাড়িতে যাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে কবিতাটা লিখে দিয়েছিলেন, সেই কবিতা লেখার তারিখটা জানতে।

এই কথা শুনেই বীরেনবাবু বললেন—অতদূর যেতে হবে না। অশোক-বাবুর একটা কবিতার বইয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরেই সেই কবিতাটা

ছেপেছেন, তাতে তারিখ রয়েছে। সে বই আমার কাছে আছে দিচ্ছি।

এই বলে বইটা এনে দিলেন। দেখি কবিতার নীচে ডান পাশে সই আছে—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর বাঁ পাশে তারিখ আছে—২২ ফাল্গুন, ১৩৩৮

আমাদের এই কথাবার্তার সময় কণিকা দেবী এলে সুখময়বাবু কণিকা দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাঁর সঙ্গে দু একটা কথা হ'ল। সুখময়বাবুও কথা বললেন।

এই সময় আমি কণিকা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার অটোগ্রাফের খাতায় গুরুদেব কখন কিছু লিখে দেন নি ?

—একবার একটা ছোট্ট কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই বীরেনবাবু বললেন—সে খাতা আমার কাছেই আছে, আমি এনে দিচ্ছি।

বীরেনবাবু খাতা দিলে কবিতাটা লিখে নিলাম—

আমার নামের আখরে জড়ায়ে
আশীর্বচন খানি
তোমার খাতার পাতায় দিলাম আনি।

১৫ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯৩৫

৮. ১৩ই আষাঢ় সাহিত্য-সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিন। প্রতি বছর ঐ দিন তাঁর জন্মস্থান কাঁটালপাড়ায় ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় পক্ষ থেকে আমরা বঙ্কিম-স্মরণ উৎসব করে থাকি।

এক বছর কাঁটালপাড়ায় ১৩ই আষাঢ় তারিখে আমাদের বঙ্কিম-স্মরণ সভায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বেহালা শাখার সম্পাদিকা মীরা রায় কয়েকজন মহিলা সহ বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন।

সভার পর এঁরা খুবই আগ্রহ সহকারে আমার কাছ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে নেন।

শেষে চলে যাবার সময় মীরা দেবী তাঁদের নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বেহালা শাখার মুখপত্র বার্ষিক সংকলন 'সম্মিলনী বেহালা' এক খণ্ড আমাকে উপহার দিয়ে যান।

উপহার পেয়ে ঐ 'সম্মিলনী বেহালা' পত্রিকাটি খুলে দেখি, পত্রিকার প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে তাঁর একটি অপ্রকাশিত চিঠি ছাপা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন মাসে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথকে চিঠিটি লিখেছিলেন।

মীরা দেবী এই পত্রিকায় সম্পাদকীয়র শেষে 'কৃতজ্ঞতা স্বীকার'-য়ে চিঠিটি প্রসঙ্গে লিখেছেন—'৺অজিতকুমার রায়ের সংকলন থেকে গৃহীত'।

৯· একদিন বঙ্গবাসী কলেজে গেলে ঐ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মিলন দত্ত-র সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

এই পরিচয়ের কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন মিলনবাবুর একটা চিঠি পাই। চিঠিতে তিনি লেখেন—

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গোপালদা, রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি পত্র আমার চোখে পড়ায় আমি তার বিবরণ ও অনুলিপি আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। এ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করতে পারলে উপকৃত হবো।

পত্রটি পুরোনো কালের কাগজে কালো কালিতে লেখা। কাগজ ঈষৎ বিবর্ণ ও জীর্ণ ; কালিও অনুজ্জ্বল। তথাপি পত্রখানি যথেষ্ট পাঠ যোগ্য। পত্রের নীচে তারিখ ৯ই কার্তিক, ১৩১৬।

পত্রটির কোন 'কভার' বা খাম পাওয়া যায় নি, তাই কাকে লেখা, তা জানা যায় না।

আপনার কাছে সেই পত্রের অনুলিপি পাঠালাম। আশা করি, এ সম্পর্কে আপনি আলোকপাত করতে পারবেন। প্রীতি ও নমস্কার নেবেন।

বিনীত—
মিলন দত্ত

রবীন্দ্রনাথের পত্রের মূল অনুলিপি

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

যেভাবে লেখাপড়া হইবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহাতে ইনকম ট্যাক্সের দৌরাত্ম্য এড়ানো যাইবে না শুনিয়া শ্বিপু permanent lease দেওয়াই পছন্দ করিতেছেন। পুনরায় কোনকালে দেউলিয়া অবস্থায় সম্পত্তি তাঁহাদের হাতে যাহাতে ফিরিয়া না আসে, ঐরূপ ব্যবস্থা রাখিতে চান। সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেলে ক্রেতা এই চিরন্তন দায় সমেত কিনিতে বাধ্য হইলে তাহাদের চিন্তার কারণ কি কিছু আছে ? স্ট্যাম্প খরচা নিদারুণ হইয়া না উঠে, সেদিকেও করুণ দৃষ্টি রক্ষা করিও। লেখাপড়া সমাধা হইলে নানা অসুবিধার কারণ জাগিয়া উঠিতে পারে, একথাও চিন্তা করিয়া দেখিয়ো।

শ্বিপুর ইচ্ছা তাহাদের অংশের দেনা ব্যাঙ্কের দেনা একেবারে শোধ দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন। এই জন্য ত্রিশ হাজার টাকা তাঁহারা ৬/৭ পার্সেণ্ট সুদে ঋণ পাইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের বাড়ীর অংশ বন্ধক রাখিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে তুমি তাঁহাদিগকে এই পরিমাণ টাকা জোটাইয়া দিতে পার কি ?

সংকলনে মন দিতে পারিয়াছ কি ?

ছুটির সময়ে যদি নির্জন শান্তি প্রয়োজন বলিয়া বোধ কর, তবে শান্তিনিকেতনের মত এমন জায়গা আর পাইবে না—আমার কথা যদি বিশ্বাস না কর তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। লুপ মেলের উচ্চৈঃ শ্রবায় যদি সমারোহণ কর তবে তিন ঘণ্টার মধ্যে আমার কথা সপ্রমাণ হইবে। ইতি ৯ই কার্তিক ১৩১৬

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলনবাবু পরে একদিন আমাকে বলেছিলেন, তিনি এই চিঠিটি কয়েকজন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে ছিলেন, তাঁরা কেউ সঠিক কিছু বলতে পারেন নি।

আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিটি লিখে ছিলেন, তাঁর পরিচিত প্রবাসী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে। চিঠিতে যে সংকলনের কথা আছে, সেটা বোধ করি এক সময় প্রবাসী পত্রিকায় দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা থেকে উল্লেখ যোগ্য সংবাদ সংগ্রহ করে যে সংকলন ছাপা হ'ত তারই কথা।

১০. একদিন এক জায়গায় বসে আমার বিশেষ পরিচিত নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তর সঙ্গে কথা বলছিলাম। কথায় কথায় আমি রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র সংগ্রহ করছি—আমার মুখে এই কথা শুনেই দেবনারায়ণবাবু বললেন—আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের একটা সুন্দর চিঠির নকল আছে। সে চিঠির কথা অনেকেই জানেন না। ১৩২৬ সালের ফাল্গুন মাসে ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতিত্ব করবার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসতে পারবেন না বলে, তখন নগেনবাবুকে এই চিঠিটি লিখে ছিলেন। আমি ঐ চিঠির অর্থাৎ আমার কাছে থাকা চিঠির নকলের একটা জেরক্স কপি আপনাকে দোব।

দেবনারায়ণবাবুর বাড়ি ফুলিয়ার নিকট রানাঘাটে। তিনি এক সময় দীর্ঘ দিন ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস বার্ষিক উৎসবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একবারের উৎসবে দেবনারায়ণবাবুর আমন্ত্রণে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত প্রভৃতির সঙ্গে ফুলিয়ায় গিয়েছিলাম। দেবনারায়ণবাবুর বাড়িতে দুপুরে সকলে মধ্যাহ্ন ভোজন করে বিকালে কৃত্তিবাস সভায় যাই।

দেবনারায়ণবাবুর কাছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি আছে শুনে, পরে তাঁর কাছ থেকে চিঠিটি আনি। সেই চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—

ওঁ শ্রীনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন— বোলপুর

আমার অবস্থাটা একটু বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিবেন। আমি যে কাজে অক্ষম হইয়াছি তাহা নহে। কিছু না কিছু কাজ চলিতেছেই—এমন কি সভায় বক্তৃতাও করিতে হয় ও হইবে। কিন্তু দিনে বারো ঘন্টার মধ্যে নাওয়া খাওয়া বাদে অন্তত আট ঘন্টা আমাকে নিভৃতে মেরুদন্ডটাকে তাকিয়ার পরে সটান করিয়া দিয়া পড়িয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হয়; পড়িয়া পড়িয়া যাহা করা যায় সে রকম কাজের ত্রুটি নাই। সুতরাং কলম ও রসনা কিছু কিছু চলিতেছে—অবশ্য পুরা দমে নয়। আপনাদের উৎসবে যোগ দিতে হইলে কলিকাতায় ভোরের বেলায় আয়োজন সুরু করিতে হয়। তারপর সমস্ত দিনই কতক পথে—কতক সভায়—নড়াচড়া করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরা ছাড়া উপায় নাই। কাজ অল্প কিন্তু তার ঝাঁকানি অত্যন্ত বেশি। এইরূপ বারো ঘন্টার নিরন্তর ধাক্কা সামলাইবার মত শক্তি আমার মজ্জায় নাই। এক সময়ে যুবা ছিলাম—তখন যদি আপনাদের নিমন্ত্রণ পাইতাম তবে ডাক্তার বৈদ্য কারো শাসন মানিতাম না—কিন্তু এখন কিছু বিলম্ব হইয়া গেছে। এখন আমার মেরুদন্ড আমার অধীন নয়, আমিই তার অধীন। যদি দক্ষিণ হাওয়ায় পাল তুলিয়া আপনাদের চূর্ণী নদী বাহিয়া বাংলার মহাকবির ভিটায় এই ক্ষুদ্র গীতিকবির নৌকা ভিড়িতে পারিত তবে সেখানে আমি দুই তিন ঘন্টা রসনা চালনা করিলেও কাবু হইতাম না—কিন্তু সমস্ত দিন পথের মার খাইয়া পনেরো মিনিট কালও আমার পক্ষে এক যুগের সমান হইবে। অতীত কালের মহাকবি এখন চির-বিশ্রামে আছেন। ক্লান্ত মেরুদণ্ডের জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হয় না, বর্তমান কালের গীতিকবির সেই মস্ত আরামের শয্যাটা এখনো জোটে নাই, অথচ আরামের প্রয়োজন একান্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই বিপদে পড়িয়াই কবির স্মৃতিকে দূর হইতেই প্রণাম করিতে হইল—একদিন যখন দুই কবির মোকাবিলা হইবে তখন নিকট হইতেই তাঁহাকে প্রণাম করিতে পারিব—ইতিমধ্যে আপনারা যুবক-কবি ও কর্মীর দলে মিলিয়া তাঁর স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করিয়া তুলুন। ইতি—১৪ই ফাল্গুন।

জরাজীর্ণ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১· ১৯৪৬ সালে কলকাতার বহুবাজার (চলতি কথায় বৌবাজার) এলাকায় ২৬ নং মদন বড়াল লেনের বাড়িটি ভাড়া নিয়ে এখানে আসি। বাড়িটি বিদ্যাসাগর মশায়ের বিশিষ্ট বন্ধু সেকালের বিখ্যাত শ্রীনাথ দাস মশায়ের কনিষ্ঠ পুত্রের অংশের। এই বাড়ির একটা অংশ পরে আমি কিনে নিই। আমার এই বাড়ি আজকের শ্রীনাথ দাস লেনে শ্রীনাথবাবুর মূল বিশাল বাড়ির সংলগ্ন দক্ষিণে।

এখানে এসে কয়েক দিনের মধ্যেই পাড়ার তিনজন শিক্ষিত, সমাজসেবী ও সাহিত্য-রসিক যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এঁরা হলেন শ্রীনাথবাবুর এক বংশধর রবীন দাস, অখিল ঘোষাল ও অদ্বৈত মল্লিক। এঁদের সঙ্গে সেই পরিচয় আজও অটুট রয়েছে।

অদ্বৈতবাবু পরে একদিন আমাদের পাড়ার অশোক ঘোষ নামক এক তরুণের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। অশোকবাবু সেকালের বিখ্যাত এমপ্রেসারিও (বড় বড় পেশাদার নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক) স্বর্গীয় হরেন ঘোষ মশায়ের পুত্র।

সেই পরিচয়ের সূত্রেই অশোকবাবু কিছুদিন পরে একদিন অযাচিত ভাবেই তাঁর পিতাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি ও তাঁর পিতার কাজের জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি প্রশংসা পত্রের জেরক্স কপি এবং ঐ সঙ্গে তাঁর পিতার তোলা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খানের একটি দুষ্প্রাপ্য ফটো আমাকে দিয়ে যান।

দেখলাম একটি দামী সুন্দর বড় খামের ভিতর সব ক'টি একত্রিত করে অশোকবাবু খামের উপরে লিখেছেন—'শ্রদ্ধেয় গোপালদাকে আমার আন্তরিক উপহার।'

কয়েকটি বিষয়ে কিছু বক্তব্য—

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মস্ত বড় গর্ব। সেই রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে কোন লেখায় ভুল থাক, এটা কেউই চান না। সকলেই চান সুষ্ঠু, সুন্দর ও নির্ভুল আলোচনা হোক।

আমার রবীন্দ্র-চর্চায় কারও লেখায় কিছু ভুল ভ্রান্তি আছে মনে করে, সেগুলো নিয়ে আমার বিদ্যা বুদ্ধি অনুযায়ী আমার রবীন্দ্র-বিষয়ক বইয়ে আলোচনা করেছি।

আমার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' বইয়ে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থে কয়েকটা ভুলের কথা বলেছিলাম।

আমি প্রভাতবাবুর সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তখন কিভাবে আমার ঐ বই একটা সংগ্রহ করে পড়ে আমাকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

ভুবন নগর, বোলপুর

সবিনয় নিবেদন, ২০।৪।৭৪

আপনার 'ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ' পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি। কী তথ্য সংগ্রহ করেছেন, দেখে অবাক হলাম। আমার রবীন্দ্র-জীবনী ৩য় খণ্ড ৪র্থ সংস্করণের জন্য প্রস্তুত করছি; আপনার বইটি পেয়ে ঢাকা পর্বটিকে নূতন করে লিখতে হচ্ছে। আপনি আমার যে সব ভুল ত্রুটি দেখিয়েছেন,

তার জন্যও আমি কৃতজ্ঞ। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করার সৌভাগ্য আমার দিক হতে অসম্ভব। কারণ আমার বয়স ৮২ পারের মুখে। কোথাও বের হতে পারিনে। যদি কখনো শান্তিনিকেতনে বেড়াতে আসেন দয়া করে দেখা করলে খুশী হবো।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রভাতবাবুর এই চিঠি পেয়ে আমিও সেদিন মুগ্ধ এবং অবাক্ হয়েছিলাম। কারও লেখার ভুল দেখিয়ে দিলে, তিনি এভাবে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। এই চিঠি পাওয়ার কয়েকদিন পরেই শান্তি-নিকেতনে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসি। তারপর তাঁর বাড়িতে বসে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেকবার অনেক আলোচনা করেছি।

এবার অপর কয়েকজনের রবীন্দ্র-বিষয়ক লেখায় আমার বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী যেগুলোকে ভুল বলে মনে করেছি, সে সব নিয়ে কিছু আলোচনা করছি—

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র 'শিক্ষারম্ভ' অধ্যায়ে লিখেছেন—তিনি পাঠশালায় তাঁর প্রথম পাঠ্য বইয়ে কর খল প্রভৃতি বানানের তুফান কাটিয়ে জল পড়ে, পাতা নড়ে পড়েছিলেন।

অনেকেই জানেন, বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ বইয়েই ঐ কর খল ও জল পড়া, পাতা নড়ার কথা আছে।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর ঐ কর খল পড়া বইটির নাম না করলেও 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বৈরাগ্য' প্রবন্ধে পরিষ্কার বলেছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় বইয়ে ঐ কর খল ও জল পড়ে, পাতা নড়ে পড়ে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ এইভাবে বার বার এ কথা লিখে গেলেও প্রবোধচন্দ্র সেন কিন্তু দীর্ঘ কাল ধরে তাঁর নানা প্রবন্ধে ও বইয়ে সমানে লেখেন—রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বর্ণপরিচয়-১ম ভাগ পড়েন নি, পড়ে ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশু-শিক্ষা-১ম ভাগ।

প্রশান্তকুমার পাল ১০. ৫. ৫০ তারিখের 'দেশ'য়ে প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে এবং পরে তাঁর 'রবি-জীবনী' গ্রন্থেও লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ বর্ণপরিচয়-১ম ভাগ দিয়ে হয়নি, হয়েছিল মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশু-শিক্ষা-১ম ভাগ দিয়েই।

ডঃ ভবতোষ দত্ত-ও ১০.২.৫২ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় এক চিঠিতে লেখেন, রবীন্দ্রনাথ প্রথমে বর্ণপরিচয় নয়, শিশুশিক্ষাই পড়েছিলেন।

আর এঁরা সকলেই এও বলেছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবে দ্বিতীয়

পড়ার বই হিসাবে বর্ণপরিচয় পড়লেও, তাতে জল পড়ে, পাতা নড়ে পড়েন নি।

রবীন্দ্রনাথের নিজের বলা, তাঁর বর্ণপরিচয়-১ম ভাগ পড়া ও জল পড়ে পাতা নড়ে পড়ার বিরুদ্ধে, এই হ'ল এঁদের কথা।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, তাঁর চেয়ে দু বছরের বড় তাঁর দাদা সোমেন্দ্রনাথ এবং ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ যখন প্রথম স্কুলে ভর্তি হলেন, তখন তিনি বয়সের দিক দিয়ে স্কুলে যাওয়ার অনুপযুক্ত বলে, তাঁর অভিভাবকরা তাঁকে স্কুলে দিলেন না। শেষে তিনি কান্নার জোরে অকালে নিতান্ত শিশু বয়সে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে ভর্তি হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গেই তিনি আরও অনেক কথা 'জীবস্মৃতি'তে লিখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির নামটা না করলেও, সোমেন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রসাদের স্কুল যাওয়া দেখে তাঁরও স্কুল যাওয়ার জন্য কান্না, এজন্য গুরুমশায়ের তিরস্কার প্রভৃতি যা 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, সে সবই ঐ প্রবন্ধেও বলেছেন।

'সখা ও সাথী' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতেও এই কথারই পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায়।

চিত্তরঞ্জন দেব তাঁর দুটি প্রবন্ধে (একটি 'পক্ষিরাজ' পত্রিকায় ও অপরটি 'দেশ' পত্রিকায়), পূর্বোক্ত প্রশান্তকুমার পাল 'দেশ'য়ে প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে ও তাঁর 'রবি-জীবনী' গ্রন্থে এবং প্রবোধচন্দ্র সেনও 'দেশ'য়ে প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে লেখেন—রবীন্দ্রনাথ কোন দিনই ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়েন নি। তিনি পাঠশালা থেকে একেবারে 'ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমি'তে গিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। আর সোমেন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ—আগে পরে করেও নয়, তিনজনে একসঙ্গে একই দিনে প্রথম স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন।

এই হ'ল রবীন্দ্রনাথ কথিত তাঁর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়ার বিরুদ্ধে চিত্তবাবু, প্রশান্তবাবু ও প্রবোধবাবুর অভিমত।

২৭.৬.৫১ তারিখের 'দেশ'য়ে প্রকাশিত প্রবোধবাবুর 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষারম্ভ' প্রবন্ধের প্রতিবাদে এবং ১০.৫.৫০ তারিখের 'দেশ'য়ে প্রকাশিত প্রশান্তবাবুর 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের অজ্ঞাত তথ্য' প্রবন্ধেরও প্রতিবাদে আমি যথাক্রমে 'রবীন্দ্রনাথ কি পাঠশালায় বর্ণপরিচয় পড়েন নি ?' ও 'রবীন্দ্রনাথ কি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়েন নি ?' নামে দুটি প্রবন্ধ লিখে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দিয়ে ছিলাম। আমার প্রথম প্রবন্ধটি চিঠির আকারে ১২.১২.৫১ তারিখের 'দেশ'য়ে এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রবন্ধ আকারেই ৯.১.৫২ তারিখের 'দেশ'য়ে প্রকাশিত হয়।

এই নিয়ে তখন 'দেশ'য়ে প্রবোধবাবু, ভবতোষবাবু ও প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আমার কিছু বাদ-প্রতিবাদও হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ নানা জায়গায় তাঁর বাল্যকালের বেশভূষা সম্বন্ধে যে সব কথা লিখে গেছেন, প্রশান্তকুমার পাল, দেবেন্দ্রনাথের কোন এক কর্মচারির হিসাবের খাতার নজির দেখিয়ে তাঁর রবি-জীবনী গ্রন্থে, রবীন্দ্রনাথের ঐ সব কথা ঠিক নয় বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন বা দেখিয়েওছেন।

প্রশান্তবাবু তাঁর ঐ বইয়ে লিখেছেন—সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে হাজিরা খাতায় রবীন্দ্রনাথের নাম ছিল নবীন্দ্রনাথ। এইরূপ আরও কিছু কিছু কথা।

প্রশান্তবাবুর ঐ সব কথাকে আমি ভুল বলে মনে করি।

'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত, লেখকের নামহীন 'প্রলাপ সাগর' নামক একটি গদ্য রচনাকে ডঃ সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গদ্য রচনা বলে তাঁর একাধিক গ্রন্থে সমানে লেখেন। আমার বিবেচনায় এই অশালীন রচনাটি আদৌ বালক রবীন্দ্রনাথের রচনাই নয়।

আমি আমার 'রবীন্দ্রনাথের ছাত্র জীবন' গ্রন্থে—রবীন্দ্রনাথ কি পাঠশালায় বর্ণ পরিচয় পড়েন নি? রবীন্দ্রনাথ কি বর্ণপরিচয়ের প্রথমে কর খল পড়েন নি? রবীন্দ্রনাথ কি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়েন নি? প্রলাপ সাগর কি রবীন্দ্রনাথের লেখা? রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত তাঁর বাল্যকালের বেশভূষার কথা কি সত্য নয়? ইত্যাদি প্রবন্ধে এ সব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

কি রকম আলোচনা করেছি, তার নমুনা হিসাবে আমার 'রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত তাঁর বাল্যকালের বেশভূষার কথা কি সত্য নয়?' প্রবন্ধ থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে 'ঘর ও বাহির' অধ্যায়ে লিখেছেন—'বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোন দিন কোন কারণেই মোজা পরি নাই।'

রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা' গ্রন্থেও লিখেছেন—'অনেক সময় লেগে ছিল পায়ে মোজা উঠতে।'

প্রশান্তকুমার পাল ১৯৫০র ১০ই মে তারিখের 'দেশ'য়ে প্রকাশিত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের বাল্য-জীবনের অজ্ঞাত তথ্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ঐ মোজা পরার কথা উল্লেখ করে বলেন—রবীন্দ্রনাথের এই কথার বিরোধিতা করে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পুরাতন ক্যাশবই গুলি। প্রশান্তবাবু লেখেন, ক্যাশবইয়ে '২৪ পৌষ ১২৭১ তারিখের হিসাবে স্পষ্ট লেখা আছে—মোজা খরিদ/ রবিন্দ্রনাথবাবুর/ ১ডজন'…রবীন্দ্রনাথের বয়স এই সময়ে তিন বৎসর সাত মাস।'

এরপর প্রশান্তবাবু ক্যাশবই থেকে লেখা উদ্ধৃত করে দেখান—১২৭৪ সালের ৬ই আশ্বিন, ১২৭৫ সালের ২৪শে পৌষ, ১২৭৬ সালের ১১ই ভাদ্র, ঐ

বছরেই ১৫ই ফাল্গুনে, ১২৭৭ সালের ২০ শে পৌষ (এক এক বারে এক এক ডজন করে, একবার মাত্র আধ ডজন) রবীন্দ্রনাথের জন্য প্রচুর মোজা কেনা হয়েছিল।

প্রশান্তবাবু বলছেন—'এই তারিখগুলির কোনটিতেই রবীন্দ্রনাথ দশের কোঠা পার হন নি।'

আমার বক্তব্য—তাঁর জন্য মোজা কেনা হলেও তিনি সত্যই মোজা পরে-ছিলেন কি ?

মোজা কেনা হয়েছিল বলেই সে মোজা যে রবীন্দ্রনাথ পরে ছিলেন, তারই বা প্রমাণ কি ? রবীন্দ্রনাথের নামে কেনা হলেও সে সব অন্যত্রও তো চালান হয়ে যেতে পারত ?

কারণ, রবীন্দ্রনাথের 'শাসনকর্তা' ভৃত্যরা, যারা তাঁর বরাদ্দ দুধ নিজেরা খেত, রবীন্দ্রনাথকে পেট ভরে লুচি খেতে না দিয়ে সেই লুচিও নিজেরা খেত, তাঁর বিকালের জলখাবারের পয়সা চুরি করত, শীতকালে রবীন্দ্রনাথের গায়ে একটা চাদর দেওয়া বা গরম জামা পরানোর কথা কখনও চিন্তা করত না, যাদের অনেকেই কেবল কিল চড় মারত, তারা যত্ন করে ও আদর করে রবীন্দ্রনাথকে অত অত মোজা পরিয়ে বাবু সাজিয়ে রাখত, এ বিশ্বাস হয় না।

প্রশান্তবাবু তাঁর 'রবিজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন—

'রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা দুটা যেখানে থাকিত সেখানে নহে। প্রতি পদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম—তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতা চালনা এত বাহুল্য পরিমাণে হইত যে পাদুকাসৃষ্টির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।' কিন্তু এক জোড়া মাত্র চটিজুতা নয়, হাপচটী, চটীবিনামা, ও বিনামা প্রভৃতি আখ্যায় যে পরিমাণ জুতো রবীন্দ্রনাথদের জন্য কেনা হয়েছে, তার হিসেব নিলে প্রশ্ন জাগতে পারে, যাঁদের বাইরের জগতে যাতায়াত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁরা এত জুতো নিয়ে কি করতেন—যার মধ্যে 'ইংরাজের দোকান হতে কেনা জুতোও ছিল।'

এই বলে প্রশান্তবাবু ক্যাশ বই থেকে যে যে তারিখে রবীন্দ্রনাথের জন্য জুতো কেনা হয়েছিল, সেই সেই তারিখগুলো উল্লেখ করে গেছেন। এখানে প্রশান্তবাবুর লেখার কিছুটা উদ্ধৃত করছি—

'৪ ফাল্গুন ১২৭৪…২৮ চৈত্র ১২৭৪, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ এবং একই বছরে ২০ আষাঢ় (ইংরাজের দোকান হইতে ক্রয় হয়), ৪ শ্রাবণ (১৫ আষাঢ় আনা হয়) ৯ শ্রাবণ (বিনামা ক্রয় মায় বগলস) ৬ আশ্বিন, ৩ পৌষ (মায় বগলস) অন্যান্য বালকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জন্যেও জুতো কেনা হয়েছে।'

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর চটিজুতো পরার যে বর্ণনা দিয়েছেন,

তাতে বোঝা যাচ্ছে, তাঁর পায়ের তুলনায় জুতোটা বড় ছিল। পায়ের ঠিক মাপ মত কেনা হয় নি।

'আমাদের চটিজুতা একজোড়া থাকিত'—এই বলায় কি স্পষ্ট' বোঝায় যে, মাত্র এক জোড়াই জুতো ছিল? এমনো তো হতে পারে, স্কুল যাওয়ার জন্য বা আত্মীয় বাড়ি প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার জন্য অন্য জুতো ছিল; তবে বাড়িতে বা বাড়ির আশে পাশে যাতায়াতের জন্য বা সর্বক্ষণের ব্যবহারের জন্য ঐ এক জোড়া চটি ছিল।

যাই হোক, প্রশান্তবাবু ক্যাশ বই থেকে রবীন্দ্রনাথের জন্য জুতো কেনার যে হিসাব দিয়েছেন, তাতে বাইরের জগতে যাতায়াত সীমাবদ্ধ কেন, হামেশাই যাতায়াত করলেও অত জুতো কারও জন্যই কখনই লাগতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের কথামত শুধু একজোড়া চটি জুতোই নয়, তাঁর জন্য প্রচুর জুতো কেনা হয়েছিল, এই হিসাব দেখিয়ে প্রশান্তবাবু প্রশ্ন তুলেছেন—তাঁরা এত জুতো নিয়ে কী করতেন? প্রশান্তবাবু শুধু প্রশ্নই তুলেছেন, কিন্তু প্রশ্নের সমাধানের কোন ইঙ্গিতই দেন নি।

একজন অত্যন্ত ডানপিটে বালকের জন্যও কখনই অত ঘন ঘন জুতোর প্রয়োজন হয় না। আর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তো নয়ই।

খাতায় জুতো কেনার হিসাবকে আমি ভুল বলছি না। জুতো কেনাই হয়েছিল ধরলাম। কিন্তু সে জুতো কি সবই রবীন্দ্রনাথ পরতেন? না ঐ মোজার প্রসঙ্গে যা বলেছি, এক্ষেত্রেও তাই হত? অর্থাৎ অন্যত্র চালান হয়ে যেত।

আমার 'রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন' বই পড়ে তখন প্রবীণ অধ্যাপক, বহু গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ স্বপন বসু আমাকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন—

শ্রদ্ধাস্পদেষু

'রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন' পড়লাম। যে নিষ্ঠা নিয়ে আপনি সত্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হয়েছেন, আজকের দিনে তা বিরল। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথার গুরুত্ব না দিয়ে অন্য মত প্রতিষ্ঠা করাটা যখন একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় এই ধরণের একটি বইএর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আপনি স্বেচ্ছায় যে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে বাঙালী সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন হলেন। রবীন্দ্রনাথ বর্ণপরিচয় পড়ে ছিলেন কিনা এই বিষয়ে আপনার মতামত অত্যন্ত জোরালো এবং কোনো যুক্তি দিয়েই সেগুলি খণ্ডন করা সম্ভব নয়। প্রলাপ সাগরের মতো অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ রচনা রবীন্দ্রনাথের কলম দিয়ে বেরোনোর কথা চিন্তা করাও অপরাধ। কিন্তু নামীদামী ব্যক্তিরা তাও যেখানে করছেন, সেখানে আপনার মতো নিষ্ঠাবান গবেষকের প্রতিবাদী কণ্ঠের প্রয়োজন ছিল। সে দায়িত্ব পালনে আপনি কুণ্ঠিত হন নি।

আমার প্রণাম গ্রহণ করবেন।

স্বপন বসু

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী' একটি অতি বিখ্যাত বই। এ বই মূলতঃ পত্রসমষ্টি হলেও, এর অধিকাংশ পত্রই রীতিমত সাহিত্য-পর্যায় ভুক্ত। তাছাড়া এই বইয়ের চিঠিগুলি যে সময়ের মধ্যে লেখা, সেই ক' বছরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই বই থেকে নানা বিষয়ের এত বেশী খবর পাওয়া যায় যে, অন্য কোন বইয়ে তা আদৌ সম্ভব নয়।

ছিন্নপত্রাবলী এরূপ প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলেও এর সম্পাদকের কিছুটা অবহেলা ও শ্রমবিমুখতার ফলে ঐ সময়কার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জানা গেল না। কারণ ২৫২টি চিঠির এত বড় একটা মূল্যবান বইয়ে সম্পাদক একটা চিঠিরও মধ্যেকার বিষয়, স্থান বা ব্যক্তি সম্বন্ধে কোথাও একটি প্রসঙ্গ-কথা দেন নি। অথচ চিঠিগুলি ভালভাবে বোঝার জন্য বহু ক্ষেত্রেই টীকা বা প্রসঙ্গ-কথার একান্তই প্রয়োজন। আজ সে সব কথা জানা একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এমনি শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসর—জমিদারির এই তিন জায়গায় রবীন্দ্রনাথ কোন্ কোন্ জলপথ ধরে যাতায়াত করতেন, ছিন্নপত্রাবলীর সম্পাদক বইয়ে সেই জলপথের একটা মানচিত্র দিলেও ভাল করতেন।

প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এবং শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে একটা করে ম্যাপ দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁদের উভয়েরই ঐ দেওয়া ম্যাপ বেশ ত্রুটিপূর্ণ। যেমন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি—অনেকেই জানেন, এমন কি রবীন্দ্রনাথ নিজেও ছিন্নপত্রাবলীর চিঠিতে পরিষ্কার বলে গেছেন—নাগর নদীর তীরে পতিসর। অথচ প্রমথবাবু ও শচীনবাবু তাঁদের বইয়ের ম্যাপে পতিসরের আসল অবস্থানের জায়গা থেকে বহু দূরে আত্রাই নদীর তীরে পতিসর অবস্থিত বলে দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ জলপথে কিভাবে যাতায়াত করতেন, প্রমথবাবু তাঁর ঐ বইয়ে সে সম্বন্ধে একটু বলতে গিয়ে যা বলেছেন, তাও ভুল।

তিনি লিখেছেন—'শিলাইদহ থেকে সাজাদপুর যাতায়াতের উপায় বর্ষাকালে নৌকা, শুকনোর সময়ে পালকী, ঘোড়া কিংবা হাতী, পদব্রজ তো অবশ্যই আছে। পতিসরেও যাতায়াতের ঐ উপায়।' (পৃঃ ১৭)।

বিশাল পদ্মার একপারে নদীয়া (বর্তমানে কুষ্ঠিয়া) জেলায় হ'ল শিলাইদহ, আর অপর পারে পদ্মা থেকে বহু দূরে পাবনা জেলায় সাজাদপুর। পদ্মা কোনদিনই কখনও শুকোয় নি, আর হয়ত কখনো শুকোবেও না। তাই শুকনোর দিনেও শিলাইদহ থেকে সাজাদপুর যাতায়াতে পদ্মা পার হতে নৌকা লাগবেই।

তাছাড়া পদ্মা পার হয়েও কেউই প্রমথবাবুর এই বর্ণনা অনুযায়ী ঘোড়া বা হাতীতে করে সাজাদপুর যায় না। নদী-নালা বহুল পাবনায় লোকে হাঁটা ছাড়া নদী-নালার পথেই সাজাদপুর যাতায়াত করে বেশী। এ ছাড়া সাজাদপুর থেকে ন' মাইল দূরে উল্লাপাড়া রেল স্টেশনে নেমেও লোকে সাজাদপুর যায়।

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে সাজাদপুরে যাওয়ার সময় নিজেদের পদ্মা বোটে করে দুটি জলপথে যেতেন। এর একটি হ'ল—শিলাইদহ থেকে পদ্মা পার হয়ে পাবনা শহরের কাছে ইছামতী নদী ধরতেন এবং ইছামতী ধরে যেতেন। ইছামতী যেখানে হুড়া সাগরে পড়েছে, সেখানে গিয়ে তিনি হুড়া সাগর ধরে বড়ল নদীতে যেতেন। কিছুটা গিয়ে বড়লের শাখা সোনাই নদী দিয়ে রাউতাড়া পর্যন্ত যেতেন। সেখান থেকে পালকীতে সাজাদপুরে কাছারির কুঠি বাড়িতে যেতেন।

সোনাই বড়ল থেকে বেরিয়ে, সাজাদপুরের পূর্ব পাশ দিয়ে বয়ে আসা হুড়া সাগরে গিয়ে পড়েছে রাউতাড়ায়। এইখানে সাজাদপুরের ভিতর দিয়ে আসা কুঠি খালটাও এসে মিশেছে। কুঠি খাল সাজাদপুরের সিকি মাইল উত্তর-পূর্বে হুড়া সাগর থেকে বেরিয়ে সাজাদপুরের ভিতরে ঠাকুরবাবুদের কাছারির কুঠি বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে কিছু দূরে গিয়ে আবার হুড়া সাগরে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকালে বোটে কুঠিখাল দিয়ে সিধা কুঠিবাড়িতে যেতেন।

রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ থেকে সাজাদপুর যাওয়ায় অপর পথটা ছিল—শিলাইদহ থেকে পদ্মা ধরে গোয়ালন্দে যেতেন। তারপর তিনি যমুনা ধরে হুড়া সাগরে গিয়ে পড়তেন। হড়া সাগর দিয়ে গিয়ে সাজাদপুরে গোপাল সাহার ঘাটে নামতেন। সেখান থেকে পালকীতে কুঠিবাড়িতে যেতেন। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে এই পথেই যাতায়াত করতেন। বর্ষাকালেও কবি কখন কখন ইছামতী এবং হুড়া সাগর ধরেও গোপাল সাহার ঘাটে যেতেন।

বড়ল হুড়া সাগরে গিয়ে পড়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর থেকে পতিসর যেতে হলে হুড়া সাগর দিয়ে অথবা সোনাই দিয়ে এসে বড়ল ধরতেন। চলন বিলের কাছে আত্রাই এসে বড়লের সঙ্গে মিশেছে। কবি এখান থেকে আত্রাই নদী ধরে নাগর নদীতে যেতেন। এই নাগরের তীরেই হ'ল পতিসর।

আমার এই বইয়ে অনেক অনুসন্ধান করে ছিন্নপত্রাবলীতে উল্লেখিত কিছু ব্যক্তি ও ঘটনার কথা যেমন বলেছি, তেমনি বহু পরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথের শিলাই-দহ, সাজাদপুর ও পতিসর ভ্রমণের একটা মানচিত্রও যতটা পেরেছি তৈরি করে দিয়েছি। এই মানচিত্র তৈরির ব্যাপারে সাজাদপুরের প্রবীণ সাহিত্যিক

নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং সাজাদপুর কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল জনাব নুরুল ইসলামের কাছে কিছু কিছু সাহায্য পেয়েছি।

দেশ বিভাগের পর নরেশবাবু সাজাদপুর ছেড়ে জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ারে এসে বাস করেন।

সাজাদপুর কাছারি বাড়িতে রক্ষিত রবীন্দ্রনাথের জমিদারি সংক্রান্ত একটি অর্ডার বুক বা হুকুমনামা বইয়ের কিছু নকল নরেশবাবু আমাকে দিয়েছেন। সেগুলো পড়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী গ্রন্থের এবং ছিন্নপত্রাবলীর সম্পাদকেরও কয়েক জায়গায় ভুল আছে বলে মনে করেছি এবং সে নিয়ে আলোচনা করেছি। এ ছাড়া ছিন্নপত্রাবলী পড়ে অনেক দিন আগেই যেগুলোকে সম্পাদকের ভুল বলে মনে করেছিলাম, সেগুলো নিয়েও এখন ঐ বইয়ে আলোচনা করেছি। আমার এই আলোচনাকে কেউ ভুল বলে প্রমাণ করতে পারলে, আমি নিশ্চয়ই তা সংশোধন করে নেব। কারণ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সত্য প্রচারিত হোক, এইটাই আমি চাই।

আমার 'রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী' বই পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খ্যাতনামা প্রবীণ অধ্যাপক, বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা ডঃ আহমদ শরীফ এক চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন—

'…এ বইয়ের পাতায় পাতায় আপনার কৌতূহল, সূক্ষ্মদৃষ্টি, অধ্যবসায়, তথ্য ও সত্য নিরূপণের যুক্তি বুদ্ধি আমাকে মুগ্ধ ও তৃপ্ত করেছে। আপনার শ্রমসাধ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে ছিন্নপত্রাবলীর স্থান, কাল ও প্রসঙ্গগত প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা সুষ্ঠু হবে।'

১৩৯১ সালের পূজা সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় আমার 'রবীন্দ্রনাথের টুকরো কবিতা' নামে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এতে 'স্ফুলিঙ্গ'র কবিতার জাতীয় বহু কবিতা দিই এবং স্ফুলিঙ্গর কয়েকটি কবিতা নিয়েও আলোচনা করি। আমার ঐ লেখা পড়ে হাওড়ার বোটানিক্যাল গার্ডেন অঞ্চলের কলেজ ঘাট রোড থেকে কবি অন্নদাভূষণ পাল এক চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন—

'স্ফুলিঙ্গ আমার খুব প্রিয় বই। রবীন্দ্রনাথের দু-পাতা ইংরেজি-বাংলা হাতের লেখার জন্যই নয়, হালকা চালে ডায়রিতে, খাতায় অটোগ্রাফের সঙ্গে ফাউ হিসেবে দু-এক লাইন লিখতে গিয়েও হঠাৎ হঠাৎ কত গভীরে ডুব দিয়ে অরূপ রতন তুলে এনেছেন। আপনি আবার তার মধ্যে ডুব দিয়ে কত অজানা অচেনা ঐশ্বর্য আবিষ্কার করলেন। আপনার গবেষণাদি বিশেষ ভাল লাগার আর একটা কারণ হলো, এতে পাণ্ডিত্যের ভাবটা মালুম হয় না। সবই যেন প্রাণের আনন্দে বলে চলেছেন পাঠকদের মুখোমুখি বসে।'

স্ফুলিঙ্গ গ্রন্থ গভীরে ডুব দিয়ে কত অরূপ রতন তুলে আমার জন্যই নয়,

রবীন্দ্রনাথের জীবনী রচনা ইত্যাদির জন্যও এ গ্রন্থের মূল্য অসীম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি বাণী আশীর্বাণী প্রভৃতিতে স্থান কাল অর্থাৎ কোথায় বসে কোন্ তারিখে লিখেছিলেন, সে সব দিয়ে ছিলেন। এতে পরিষ্কার বোঝা যায় কবি কবে কোথায় ছিলেন। কেউ কোন দিন যদি এই বিশ্বকবির জীবনের দিনপঞ্জী লিখতে যান, তখন তো তাঁর কাছে এই সব তারিখ একান্তই প্রয়োজন।

কিন্তু বিশ্বভারতীর প্রকাশিত স্ফুলিঙ্গ বইয়ে মাত্র দু একটা বাদে সমস্ত কবিতা থেকেই তারিখ তুলে দেওয়া হয়েছে, আর স্থানের নাম তো কোনটাতেই নেই।

স্ফুলিঙ্গের বহু মূল কবিতায় প্রথমেই লেখা ছিল কল্যাণীয়েষু অথবা কল্যাণীয়াসু। এখন বইয়ে ঐগুলো তুলে দেওয়ায় কোন কবিতা পুরুষকে, আর কোন কবিতা নারীকে লিখে দেওয়া তা বোঝা যায় না।

আবার কোন কোন কবিতায় এসব না দিয়ে যাঁকে লিখে দিচ্ছেন, বা যাঁর প্রসঙ্গে লিখছেন প্রথমেই তাঁর নাম দিয়ে, পরে কবিতাটা লিখেছেন। যেমন—

গগনেন্দ্র

রেখার রঙের তীর হতে তীরে
ফিরেছিল তব মন
রূপের গভীরে হয়েছিল নিগমন।
গেল চলি তব জীবনের তরী
রেখার সীমার পার
অরূপ ছবির রহস্য মাঝে
অমল শুভ্রতার।

এই কবিতাটি স্ফুলিঙ্গ ৩য় সংস্করণে ৩৪৬ সংখ্যক কবিতা। কিন্তু প্রথম পংক্তি সম্বোধনের 'গগনেন্দ্র' তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন এই কবিতা যে কাকে নিয়ে লেখা 'স্ফুলিঙ্গ' বই পড়ে তা আর বোঝা যাবে না।

'স্ফুলিঙ্গ' ৩য় সংস্করণ বইটি শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়-এর সংকলন সহযোগিতায় সম্পাদনা করেছেন—কানাই সামন্ত। স্ফুলিঙ্গ ১ম ও ২য় সংস্করণে এক তো অল্প কয়েকটা বাদে কবিতাগুলির পরিচিতি দেওয়া ছিলই না। এখন ৩য় সংস্করণে দেখছি, আগের সংস্করণে দেওয়া কয়েকটা পরিচিতি অহেতুক তুলে দেওয়া হয়েছে। যেমন—দুটো নজীর দেখাচ্ছি—

১. আকাশে ছড়ায়ে বাণী
অজানার বাঁশি বাজে বুঝি,
শুনিতে না পায় জন্তু,
মানুষ চলেছে সুর খুঁজি।

কবিতাটি সম্বন্ধে ১ম সংস্করণ স্ফুলিঙ্গে লেখা হয়েছিল—কবিতাটি কবির অঙ্কিত একখানি চিত্রের পরিচয়।

২. প্রেমের আনন্দ থাকে
শুধু স্বল্পক্ষণ
প্রেমের বেদনা থাকে
সমস্ত জীবন।

১ম সংস্করণ স্ফুলিঙ্গে এই কবিতার পরিচিতি হিসাবে লেখা হয়েছিল—'একটি ফরাসী কবিতার অনুবাদ।'

ফরাসী কবিতার এই অনুবাদটি নিয়ে 'রবিচ্ছবি' গ্রন্থের লেখক প্রভাতচন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে একদিন আমার কথা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন—

১৯০৬ সাল হবে। আমি তখন শান্তিনিকেতনে কলেজ বিভাগে অধ্যাপনা করছি।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথদের একটা পারিবারিক খাতা আছে। তাতে রবীন্দ্রনাথের, রবীন্দ্রনাথের দাদাদের এবং আরও কারও কারও নানা রকমের ছোট বড় লেখা আছে। একদিন ঐ খাতাখানা দেখছিলাম। দেখি, এক জায়গায় কার যেন লেখা একটা ফরাসী কবিতা, আর তার সঙ্গে ঐ কবিতার ইংরাজি অনুবাদ—

Love's pleasure lasts only a moment
Love's sorrow lasts as long as life.

ঐটা দেখে আমি গুরুদেবকে (রবীন্দ্রনাথকে) বলি, ঐটার একটা বাংলা অনুবাদ করে দিতে। আমার কথায় গুরুদেব ইংরাজিটা দেখে তখন সঙ্গে সঙ্গেই কবিতায় বাংলায় অনুবাদ করে কাগজটা আমার হাতে দিলেন। ১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে আমার যে 'রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত লেখন' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাতে ঐ ফরাসী কবিতার বাংলা অনুবাদটি দিয়ে ছিলাম।

স্ফুলিঙ্গ-র কবিতার যদি পরিচিতি দেওয়া হ'ত, তাহলে কবিতাগুলো বোঝার খুব সুবিধা হ'ত। যেমন—একটা উদাহরণ দিই। স্ফুলিঙ্গ বইয়ে একটা কবিতা আছে—

আমি অতি পুরাতন
এ খাতা হালের
হিসাব রাখিতে চাহে
নূতন কালের।

এই কবিতায় এরপর আরও ৮পংক্তি আছে।

এই কবিতার ইতিহাস যা জেনেছি, তা হ'ল—

রমাপ্রসাদ দত্ত নামে সাহিত্য-রসিক এক ব্যক্তি বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনা নিয়ে একবার ১লা বৈশাখ তারিখে একটা বৈশাখী-সংকলন পত্রিকা বার করেছিলেন। তিনি পত্রিকার নাম দিয়ে ছিলেন 'হালখাতা'। হালখাতা বেরোবার কিছুদিন আগে রমাপ্রসাদবাবু তাঁর 'হালখাতা'র জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি কবিতা চাইতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ তখন এই কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন।

এই ইতিহাসটা জানায় কবিতার মধ্যেকার 'এ খাতা হালের' কথাটার অর্থ পরিষ্কার বোঝা গেল।

রবীন্দ্রনাথের মূল হস্তাক্ষরে লেখা কবিতা কিভাবে একটু আধটু বিকৃত হয়ে স্ফুলিঙ্গ বইয়ে ছাপা হয়েছে, এখানে তার দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

১৩৫৪ সালের ২৬শে বৈশাখ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে ছাপা হয়েছিল--

১. তরঙ্গের বাণী সিন্ধু চাহে বুঝাবারে
ফেনায় কেবলি লেখে মুছে বারে বারে।

কবিতাটি কাকে লিখে দেওয়া, বা কার সৌজন্যে প্রাপ্ত এ সম্বন্ধে কোন কথাই 'দেশ'য়ে লেখা নেই।

এই কবিতাটি বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্গত 'স্ফুলিঙ্গ' বইয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত দুবারেরই রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্তর্গত 'স্ফুলিঙ্গ'তে আর মূল স্ফুলিঙ্গ বইয়েও ছাপা হয়েছে এইভাবে—

তরঙ্গের বাণী সিন্ধু
চাহে বুঝাবারে।
ফেনায়ে কেবলি লেখে
মুছে বারে বারে।

দেখা যাচ্ছে, 'দেশ'য়ে কবির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিতে রয়েছে 'ফেনায়' কিন্তু স্ফুলিঙ্গ বইয়ে ছাপা হয়েছে—'ফেনায়ে'! আমার মনে হয়, এখানে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতের লেখা 'ফেনায়' কথাটাই ঠিক। 'ফেনায়ে' কথাটা ঠিক নয়। ভুল করে 'য়'তে একটা 'ে' বসানো হয়েছে।

২. আসা-যাওয়ার পথ চলেছে
উদয় হতে অস্তাচলে.
কেঁদে হেসে নানান্ বেশে
পথিক চলে দলে দলে।
নামের চিহ্ন রাখিতে চায়
এই ধরণীর ধূলা জুড়ে,

দিন না যেতেই রেখা তাহার
ধূলার সাথেই যায় যে উড়ে।

এই কবিতাটি ১৩৫০ সালের শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের নিজের হস্তাক্ষরেই মুদ্রিত হয়েছিল। দেশ-সম্পাদক কবিতাটি ছেপে শেষে লিখে ছিলেন—'শ্রীঅশোকা রায়ের অটোগ্রাফ খাতা হইতে উদ্ধৃত।'

এই কবিতাটি দেখছি, স্ফুলিঙ্গ বইয়েও আছে। স্ফুলিঙ্গ বইয়ের শেষে, যাঁদের কাছ থেকে বইয়ের কবিতা পাওয়া গেছে বলে যে ক'জনের নাম আছে, সেই নামের তালিকায় অশোকা রায়ের নামও আছে। অতএব এখন বলা যেতে পারে, স্ফুলিঙ্গ-সম্পাদক এই কবিতাটি অশোকা রায়ের অটোগ্রাফ খাতা থেকেই নিয়েছেন।

কিন্তু ঐ অটোগ্রাফের খাতার কবিতাই স্ফুলিঙ্গ বইয়ে ছাপা হয়েছে একটু অন্যভাবে। যেমন—কবিতার ৫ম লাইনের চিহ্ন শব্দটা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন হ-য়ে 'ণ' দিয়ে, ছাপা হয়েছে হ-য়ে 'ন' দিয়ে। ৬ষ্ঠ ও ৮ম লাইনে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'ধূলো' বানানকে বইয়ে করা হয়েছে ধুলা। এগুলো তেমন কিছুই নয়। কিন্তু কবিতার শেষ লাইনের 'সাথেই' শব্দটাকে বইয়ে করা হয়েছে 'সাথে'। আমার মনে হয়, এখানে 'সাথেই' কথাটা ঠিক। ভুল করে এই শব্দের শেষের 'ই'টা তুলে দেওয়া হয়েছে।

এই দুটা কবিতা নিয়েও আমি ১৩৫০ সালের 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত আমার 'রবীন্দ্রনাথের টুকরো কবিতা' প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।

'স্ফুলিঙ্গ' ৩য় সংস্করণ গ্রন্থের ১৬১ সংখ্যক কবিতাটি ২০ লাইনের একটি কবিতা। এর প্রথম ৪ লাইন হ'ল—

তোমার আমার মাঝে ঘন হল কাঁটার বেড়া এ
কখন্ সহসা রাতারাতি—
স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিবে বাড়ায়ে
ওরে মূঢ়, ওরে আত্মঘাতী!

রবীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ তাঁর এই জাতীয় কবিতায় যেমন লেখার তারিখ, যেখানে অবস্থান কালে লিখছেন সেখানকার উল্লেখ করে, কবিতার শেষে নিজের নাম সই করতেন, এই কবিতার ক্ষেত্রেও তাই করেছিলেন।

স্ফুলিঙ্গ ৩য় সংস্করণ গ্রন্থে এই কবিতাটি ছেপে শেষে লেখা হয়েছে—
শান্তিনিকেতন
১৩ফাল্গুন ১৩৪৩

এই স্ফুলিঙ্গ বইয়ের শেষে বইয়ের খুবই অল্প যে কয়েকটা মাত্র কবিতার

প্রসঙ্গ-কথা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে এই ১৬১ সংখ্যক কবিতাটিরও প্রসঙ্গ-কথা আছে। তাতে লেখা হয়েছে—

'মুসলিম স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন'-এর ভ্রাম্যমান দল ২১ ফাল্গুন ১৩৪৩ তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আসিলে রবীন্দ্রনাথ সাদরে তাহাদের গ্রহণ করেন। আর এই কবিতায় আপনার অকৃত্রিম উদ্বেগ ও মনোবেদনা আর হিতৈষণা প্রকাশ করেন। দ্রষ্টব্য ১৩৪৩ চৈত্রের বুলবুল পত্রিকা।'

ঐ সংখ্যা 'বুলবুল' পত্রিকা কোথাও পেলাম না। তবে এ সম্পর্কে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবুল ফজল সাহেবের একটা লেখা পেলাম। তিনি তাঁর 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' বইয়ে 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'১৯৩৭ সালের ৬ই মার্চ মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশনের একটি ভ্রাম্যমান দল শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন খুবই অসুস্থ। তা সত্ত্বেও ছাত্রেরা যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল, তিনি তাদের যে কবিতাটি তখন লিখে উপহার দিয়েছিলেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হ'ল—

আমার আত্মার মাঝে ঘন হলো কাঁটার বেড়া এ
কখন সহসা রাতারাতি
স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিব বাড়ায়ে
ওরে মূঢ়, ওরে আত্মঘাতী!
ওই সর্বনাশটাকে ধর্মের দামেতে করো দামী
ঈশ্বরের কর অপমান
আঙিনা করিয়া ভাগ দুই পাশে তুমি আর আমি
পূজা করি কোন্ শয়তান!
ও কাঁটা দলিতে গেলে দুই দিকে ধর্ম-ধ্বজীদলে
ধিক্কারিবে। তাহে ভয় নাই,
এ পাপ আড়ালখানা উপাড়ি ফেলিব ধূলিতলে
মানিব আমরা দোঁহে ভাই।...'

আবুল ফজল সাহেবের উদ্ধৃতিতে দেখছি এই কবিতার প্রথম পংক্তি— 'আমার আত্মার মাঝে ঘন হলো কাঁটার বেড়া এ'। কিন্তু স্ফুলিঙ্গ বইয়ে এই কবিতার প্রথম পংক্তি 'তোমার আমার মাঝে ঘন হ'ল কাঁটার বেড়া এ'। আবুল ফজল সাহেবের উদ্ধৃত কবিতার ৩য় পংক্তি—'স্বদেশের অশ্রুজলে তারেই কি তুলিব বাড়ায়ে' স্ফুলিঙ্গ বইয়ে 'তুলিব বাড়ায়ে'র জায়গায় আছে 'তুলিবে বাড়ায়ে'।

আর দশম পংক্তি—'ধিক্কারিবে। তাহে ভয় নাই' স্ফুলিঙ্গ বইয়ে ধিক্কারিবে-এর পর দাঁড়ি নেই।

এখানে আমার মনে হয়, আবুল ফজল সাহেব মুসলমান ছাত্রদের লিখে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা উদ্ধৃত করেছেন, সেইটাই ঠিক।

স্ফুলিঙ্গের এই কবিতা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কখন কখন যেমন কবিতা লিখে দিয়ে নকল রাখার সময় একটু আধটু বদলে লিখতেন, এখানেও হয়ত তেমনি প্রথম পংক্তিতে 'আমার আত্মার মাঝে'কে করেছিলেন 'তোমার আমার মাঝে'। আর ৩য় পংক্তির 'তারেই কি তুলিব' কে করেছিলেন 'তারেই কি তুলিবে'।

স্ফুলিঙ্গ বইয়ে এই কবিতার দশম পংক্তিতে 'ধিক্কারিবে'র পর দাঁড়ি নেই। দাঁড়ি থাকা স্বাভাবিক।

এবার আর একটা কথা—স্ফুলিঙ্গ-সম্পাদক কবিতা ছেপে কবিতা লেখার তারিখ দিয়েছেন ১৩ ফাল্গুন ১৩৪৩। আর তিনি এই কবিতার প্রসঙ্গ-কথায় লিখেছেন—২১ ফাল্গুন ১৩৪৩ তারিখে মুসলিম ছাত্রদল শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন।

ছাত্রদল এলে তাদের সাদরে গ্রহণ করে এই কবিতায় যদি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোবেদনা ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে কবিতা লেখার তারিখ কখনই ১৩ই ফাল্গুন হতে পারে না।

এ সম্পর্কে আবুল ফজল সাহেবের লেখার তারিখটাই ঠিক বলে মনে করি। তিনি লিখেছেন—১৯৩৭ সালের ৬ই মার্চ ছাত্রদল শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল।

১৯৩৭ সালের ৬ই মার্চ ছিল ১৩৪৩ সালের ২২শে ফাল্গুন। ১৩ই ফাল্গুন ছিল ২৫শে ফেব্রুয়ারি।

৬ই মার্চ বা ২২শে ফাল্গুন যদি ছাত্রদল যান, তাহলে পরদিন ৭ই মার্চ বা ২৩শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি লিখে দিতে পারেন। মনে হয় স্ফুলিঙ্গ বইয়ে যে ১৩ ফাল্গুন আছে, ওটা ছাপার ভুলে ২৩এর জায়গায় ১৩ হয়েছে। ১৩ রবীন্দ্রনাথের লেখা তারিখ নয়।

রবীন্দ্র ভবনের 'রবীন্দ্রবীক্ষা' চতুর্দশ সংকলন গ্রন্থে ৫৯ সংখ্যক কবিতাটি পরিচিতি সহ ছাপা হয়েছে এইভাবে—

ভোরের বেলায় যে জন পাঠালে রঙিন মেঘের পাঁতি
আজ সে কি সাড়া দিয়েছে তোমায় শুভ্র আলোর সাথী।

শান্তিনিকেতন, অগস্ট ১৯৩৮
ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের মেয়ে বাবলিকে।

দ্বিজেনবাবুর কন্যা বাবলি দেবীকে আমি ভাল ভাবেই চিনি। বিবাহিত

জীবনের পদবী সহ তাঁর ভাল নাম মীরা চৌধুরী। আমি জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অন্য কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। সে কবিতা বিশ্বভারতীর 'স্ফুলিঙ্গ' ৩য় সংস্করণ গ্রন্থেও নেই।

আমি একদিন 'রবীন্দ্রবীক্ষা'র এই কবিতাটির কথা মীরা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ও কবিতা রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখে দেন নি।

আমি বললাম—আপনি এ কথা একটা কাগজে লিখে দিন।—তিনি আমার কথায় লিখেও দিলেন।

মীরা দেবীর কাছ থেকে চলে আসার ২/৩ পরেই তাঁর একটা চিঠি পাই। তাতে তিনি লেখেন— প্রশান্ত মহলানবীশের এক বোনের নাম বাবুলি। তিনি ঐতিহাসিক সুশোভন সরকারের স্ত্রী। তাঁর ভাল নাম রেবা সরকার।

রবীন্দ্রবীক্ষা ১৪শ সংকলনের ৫৮ সংখ্যক কবিতাটি এইভাবে ছাপা হয়েছে—

ভুবন হবে নিত্য মধুর
জীবন হবে ভালো
মনের মধ্যে জ্বালাই যদি
ভালোবাসার আলো।

১৬ আশ্বিন ১৩২৮

বাবলি। রেখা সরকার

আমি জানি রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি সুশোভনবাবুর স্ত্রী ঐ বাবুলি বা রেবা সরকারকে লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু সংকলন গ্রন্থে ভুল করে রেবার জায়গায় ছাপা হয়েছে রেখা।

খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হ'ক বি.টি-র লেখা একটি বই 'প্রবন্ধ মালা - ১ম ভাগ'। এই বইটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে।

এই বই প্রকাশিত হ'লে তখন ১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ (ইংরাজি ১৯৩৫ সালে) মাসের প্রবাসী পত্রিকায় শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইয়ের ভাষা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখেন। রমেশবাবু তাঁর প্রবন্ধের নাম দেন—'ঢাকা প্রবেশিকা পরীক্ষার একখানি বাংলা পাঠ্য পুস্তক'।

এই নাম দিয়েও রমেশবাবু 'পাঠ্যপুস্তক' এর গায়ে * তারকা চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় লেখেন—পুস্তকখানি যে প্রবেশিকার পাঠ্য তাহা উহাতে লেখা নাই, আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি মাত্র। যদি আমার সংবাদ সত্য নাও হয়, তথাপি প্রবন্ধের বক্তব্য অসঙ্গত হইবে না।

প্রবন্ধে রমেশবাবুর বক্তব্য ছিল—ঐ বই যখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রই পড়বে, তখন খান বাহাদুর প্রচলিত ভাষার বদলে ইচ্ছা করেই বেশ কিছু আরবি, ফারসি অর্থাৎ মুসলমানি শব্দ তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। রমেশবাবু দেখিয়েছেন—খান বাহাদুর পিতা-র জায়গায়

বাবজান, মৃত্যু-র জায়গায় এন্তেকাল, আতিথেয়তা-র জায়গায় মেহমানি, স্বপ্ন-র জায়গায় খোয়াব ইত্যাদি লিখেছেন।

রমেশবাবুর ঐ প্রবন্ধ পড়ে তখন রবীন্দ্রনাথ দুজন শিক্ষিত মুসলমানকে তাঁর আগের লেখা দুটি চিঠি প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি পৌষ (১৩৪২) মাসের প্রবাসীতে এই ভাবে ছাপা হয়েছিল—

'ভাষা শিক্ষার সাম্প্রদায়িকতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে (১৩৪২) ভাষা শিক্ষার সাম্প্রদায়িকতা-মূলক একটি প্রবন্ধ পড়ে মনে হ'ল নিম্ন লিখিত পত্র দুখানি সময়োপযোগী। তাই প্রবাসীতে পাঠানো গেল।

এম. এ. আজানকে লিখিত।

সবিনয় নিবেদন,

সর্ব প্রথমে বলে রাখি আমার স্বভাবে ও ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্ব নেই।…

ভবদীয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ ভুঁইয়া ইকবালের 'রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র' নামে একটা বই আছে। এই বইয়ে ডঃ ইকবাল কেবল মুসলমানদিগকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলিই দিয়েছেন। ডঃ ইকবাল তাঁর বইয়ে প্রবাসীতে প্রকাশিত এম. এ. আজানকে লেখা চিঠিটি উদ্ধৃত করে লিখেছেন—এম. এ. আজানের কোন পরিচয় জানতে পারি নি। ১১ চৈত্র ১৩৪০ তারিখে লেখা এই চিঠির 'সবিনয় নিবেদন' সম্বোধন দেখে অনুমান করা যায়, পত্র প্রাপকের সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল না। সম্ভবতঃ বাংলায় আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে এম. এ. আজান কবিকে কোন চিঠি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার জবাবে এই চিঠি লিখে ছিলেন বলে অনুমান করি। এই চিঠি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র-জন্ম শত বার্ষিক সংস্করণেও পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে।'

এম. এ. আজম নামে এক ভদ্রলোকের কিছুটা পরিচয় আমি জানি। ইনি ১৯৩৩ সালে যখন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন আলিগড়ের প্রবাসী বাঙালীরা 'ঘরের মায়া' নামে একটা পত্রিকা বার করবেন স্থির করেছিলেন। ইনি তখন এঁদের ঐ পত্রিকার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে একটা লেখা চেয়ে ছিলেন।

পরে আবার এই এম. এ. আজম যখন বি. এস. সি (ক্যাল) এম. এস-সি (আলিগড়) সাহিত্য-বিশারদ তখন তাঁর বিবাহের পূর্বে তিনি এবং তাঁর

ভাবী স্ত্রী রওশন আরা রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী চেয়ে একটা চিঠি লিখেছিলেন।

এম. এ. আজমের দুটা চিঠিই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবনে আছে।

প্রবাসীতে এবং ভুঁইয়া ইকবালের বইয়ে এম. এ. আজান দেখে আমার মনে হয়েছিল, এই এম. এ. আজম-কে ভুল করে এম. এ. আজান লেখা হয় নি তো?

পরে আবুল ফজল সাহেবের 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' বইয়ের অন্তর্গত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ' প্রবন্ধে দেখলাম তিনি লিখেছেন—

'১৩৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রের জবাবে জনাব এম. এ. আজমকে লিখেছিলেন: সর্ব প্রথমে বলে রাখি, আমার স্বভাবে ও ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্ব নেই।...'

আবুল ফজল সাহেবের এই 'রবীন্দ্রনাথ ও মুসলিম সমাজ' খুব খেটে লেখা একটি তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে তিনি কবে কোথায় কোন্ নামজাদা মুসলমানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ইত্যাদি হয়েছিল, তার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

প্রবাসী ও ভুঁইয়া ইকবালের বইয়ে 'আজান' দেখে যে সন্দেহ হয়েছিল, 'আজম' আজান হয়নি তো? এখন আবুল ফজল সাহেবের লেখাটা পড়ে সন্দেহ অনেকটা দূর হ'ল। এবং মনে হচ্ছে, প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি পাঠাবার সময় চিঠির নকল-কারক ভুল করে আজমকে আজান লিখে ছিলেন।

এম. এ. আজম আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস-সি পড়ার সময় তাঁদের 'ঘরের মায়া' কাগজের জন্য লেখা চেয়ে রবীন্দ্রনাথকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

কবিগুরু,

এখানে আমরা প্রবাসী বাঙালী হিন্দু-মুসলমান একটা দুঃসাহসের সংকল্প করেছি। একটা ছোটখাটো রকমের ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করব। 'ঘরের মায়া' নাম ঠিক করেছি। তুমি তোমার আশীষ পাঠিও।

ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎ বলে হেলা করলে তোমায় অভিশাপ দেব কিন্তু। ইতি—

মুগ্ধমূঢ়

এম. এ. আজম

এখন একটা প্রশ্ন—

এই আজম সাহেবই যদি কিছুদিন পরে আবার ভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন (কি লিখে ছিলেন জানি না), তারই উত্তরে কি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'সবিনয় নিবেদন' সম্বোধনে লিখেছিলেন?

এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েও তবুও এম. এ. আজমের সপক্ষে আবুল ফজল সাহেবের কথা একেবারে অস্বীকার করা যাবে কি?

আজম সাহেব লেখক ছিলেন জানি, মাসিক মোহম্মদীতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হ'ত।

তথ্য সংগ্রহ —

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কেন লিখতে আরম্ভ করি, সে কথা আগে আমার এই বইএর প্রথম দিকে 'শরৎচন্দ্র' প্রবন্ধে বলেছি।

এ পর্যন্ত আমি শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প, শরৎচন্দ্রের হাস্য-পরিহাস, শরৎচন্দ্রের প্রণয় কাহিনী, বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড (জীবনী ইত্যাদি, প্রত্যেকটি খণ্ডই প্রায় ৬।৭ শ' পাতার বই), শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা, নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের জীবনী ও বাণী প্রভৃতি বইগুলি লিখে প্রকাশ করেছি। এ সব বইয়ের অনেকগুলিরই কয়েকটা করে সংস্করণও হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছি। শরৎ-রচনাবলীও সম্পাদনা করেছি। এখনও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখে চলেছি।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে প্রথম দিকে আমার মস্ত বড় একটা সুবিধা হয়েছিল এই যে, তখন শরৎচন্দ্রের বহু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও স্নেহভাজন প্রভৃতির কাছ থেকে আমি শরৎচন্দ্র বিষয়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তখন শরৎচন্দ্র জীবিত না থাকলেও তাঁর স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবী, মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বন্ধু বিভূতি-ভূষণ ভট্ট, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জীবিত ছিলেন। এঁদের কাছ থেকে তো বটেই, তাছাড়া স্নেহাস্পদ রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কুমুদ রায় চৌধুরী, শিল্পী সতীশ সিংহ, মণীন্দ্র রায়, কবি কালিদাস রায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, চরণ দাস ঘোষ, যামিনী কান্ত সোম, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী প্রভৃতির কাছ থেকেও শরৎচন্দ্রের অনেক খবর পেয়েছি।

শরৎচন্দ্রের বাজে শিবপুরের প্রতিবেশী এবং তাঁর পুত্রতুল্য স্নেহের অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার, এই বাজে শিবপুরেরই বন্ধু অধ্যাপক অক্ষয় কুমার সরকার, শিবপুরের অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রভৃতির কাছ থেকেও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি।

শরৎচন্দ্রের দিদির বাড়ি হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে তাঁর যেসব স্নেহের ভাগ্নে, ভাগ্নী ছিলেন এবং ভাগলপুরে মামার বাড়িতেও ঐরূপ যাঁরা আত্মীয় ছিলেন, আর ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রকে দেখেছেন ও তাঁর সঙ্গে বিশেষ

ভাবে মিশেছেন, এমন সব যাঁরা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই যে যার স্মৃতি অনুযায়ী অনেক কথা আমাকে বলেছেন। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এই সব তথ্য আমার অনেক কাজে লেগেছে।

শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরন্ময়ী দেবীর মুখে তাঁর বাপের বাড়ি মেদিনীপুর জেলায় শালবনীর কাছে শ্যামচাঁদপুর গ্রামে শুনে তাঁর শৈশবের কথা ও তাঁর পিতার কথা জানবার জন্য শ্যামচাঁদপুরেও গেছি। এবং ঐসব কথা জেনেও এসেছি।

শরৎচন্দ্রের জন্মস্থান হুগলী জেলায় ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশনের অদূরে দেবানন্দপুর গ্রামে। শরৎচন্দ্র তাঁর গ্রন্থগুলিতে কোথাও তাঁর জন্মস্থান দেবানন্দপুরের নাম উল্লেখ করেন নি, কিন্তু তিনি তাঁর বহু গ্রন্থে দেবানন্দ-পুরের আশপাশের গ্রাম, নদী, মন্দির, পথ ঘাট প্রভৃতির প্রচুর উল্লেখ করেছেন। দেবানন্দপুরের শরৎ-স্মৃতি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক আমার স্নেহভাজন দীনবন্ধু ঘোষকে কখন সঙ্গে নিয়ে, কখন বা আমি একাই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের আশায় ঐ সব অঞ্চলে অনেক দিন ঘুরেছি। অনেক তথ্যও পেয়েছি।

শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছিল ভাগলপুরে। তাঁর শ্রীকান্ত-১ম পর্ব প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থে প্রচ্ছন্নভাবে ভাগলপুরের অনেক কথা ও কাহিনী আছে। শরৎচন্দ্রের জীবনের এবং তাঁর ঐ সব গ্রন্থেরও উপাদান খুঁজতে আমি বেশ কয়েকবার ভাগলপুরেও গেছি। প্রচুর তথ্যও সংগ্রহ করে এনেছি।

শরৎচন্দ্রের কর্মস্থল ব্রহ্মদেশে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে সেখানে যেতে পারি নি। ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় এবং ঐ সরকারের নির্দেশে সেখান থেকে ভারতীয়দের চলে আসতে বাধ্য হওয়ায়, গিয়েও হয়ত কিছু তথ্য পেতামই না। তবে রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রের বন্ধু-পুত্রদের কাছ থেকে —যাঁরা রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রকে তাঁদের বাড়িতে দেখেছেন, এমন কয়েকজনের নিকট কিছু কিছু শরৎ-তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হই।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে হাওড়া শহরের বাজে শিবপুরে ও শিবপুরে ১০ বছর ছিলেন। তারপর ১৯২৬ সালে হাওড়া জেলায় রূপনারায়ণ নদের তীবে দিদির বাড়ি গোবিন্দপুরের পাশে সামতাবেড়েয় বাড়ি করে চলে যান। সামতাবেড়েয় থাকাকালে জীবনের শেষ দিকে কলকাতায় বালিগঞ্জে বাড়ি করেছিলেন। তখন কখন সামতাবেড়েয়, কখন কলকাতায় থাকতেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে বাজে শিবপুর, শিবপুর, সামতাবেড় অঞ্চল, কলকাতায় অনেক ঘুরেছি এবং তথ্যও পেয়েছি।

যে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্প উপন্যাস প্রকাশিত হয়, এবং যে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ

গ্রন্থেরই প্রকাশক, সেই উভয় প্রতিষ্ঠানের মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মশায় শরৎচন্দ্র বিষয়ে অনেক কথা আমাকে বলেছেন ও জানিয়েছেন।

অনেকের শরৎ-স্মৃতি মূলক লেখা থেকে, বা কারও শরৎচন্দ্র সংক্রান্ত লেখা থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। তবে সর্বত্রই আমি যাচাই করেই তবে ঐ সব তথ্য গ্রহণ করেছি। এজন্য কি রকম যাচাই করেছি বা খেটেছি, এখানে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন—'...তাঁহার (শরৎচন্দ্রের) সহপাঠী হুগলী নিবাসী শ্রীহৃষিকেশ মজুমদার জানাইয়াছেন, শরৎচন্দ্র ১৮৯৩ ও ১৮৯৪ সনের প্রথমাংশে ব্রাঞ্চ স্কুলের দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া ছিলেন। এই সময় তাঁহাকে পুনরায় ভাগলপুরে মাতুলালয়ে যাইতে হইয়াছিল। ভাগলপুরে পেঁাছিয়া শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ সনেই পুনরায় টি, এন, জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে যোগদান করেন এবং পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে প্রবেশিকা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

ব্রজেনবাবু বলেছেন, শরৎচন্দ্র হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ার আগেও ভাগলপুরের টি, এন, জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে পড়তেন। এ কথা ঠিক নয়। তিনি পড়তেন ভাগলপুরের জেলা স্কুলে।

শরৎচন্দ্রের হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ার ব্যাপারে ব্রজেনবাবু হৃষিকেশবাবুকে শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ভেবে তাঁর কথাকে অভ্রান্ত বলেই মেনে নিয়েছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সময়কার ক্যালেণ্ডারে ছাপা আছে—শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করেছিলেন। তাই একদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারের প্রকাশিত খবর, অপরদিকে হৃষিকেশবাবুর কথা—এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে ব্রজেনবাবু লিখেছেন—শরৎচন্দ্র ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসেই পরীক্ষা দিয়েছিলেন।—কিন্তু ব্রজেনবাবুর এ কথা আদৌ সত্য নয়। কারণ, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারেই পরিষ্কার ছাপা আছে ১৮৯৪ সালে এনট্রান্স পরীক্ষা হয়েছিল ফেব্রুয়ারী মাসে। তাছাড়া তখন ডিসেম্বর মাসে কখনই এনট্রান্স পরীক্ষা হ'ত না।

এখন ব্রজেনবাবুকে জানানো হৃষিকেশবাবুর (ইনি হুগলী কোর্টের উকিল ছিলেন) ঐ বিবৃতিটির মধ্যে একটা মজার ব্যাপার আছে। সেটা এই— হৃষিকেশবাবুর সঙ্গে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে সত্যই একজন পড়তেন। তবে তিনি আমাদের এই ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র নন। সেই শরৎচন্দ্র ছিলেন হুগলীর লোক, তিনি ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সেকালের সেভেনথ ক্লাসে অর্থাৎ বর্তমানের ক্লাস ফোর বা চতুর্থ শ্রেণীতে। ইনিই প্রতি বছর পাস করে ১৮৯৪ এ ফার্স্ট ক্লাসে

উঠেছিলেন। হৃষিকেশবাবু সমস্ত না জেনে ভুল করে তাঁর সহপাঠী এই শরৎচন্দ্রকেই সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ভেবে ব্রজেনবাবুকে জানিয়ে ছিলেন।

আমি একদিন হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে শরৎচন্দ্রের ছাত্র-জীবনের হদিস্ করতে গেলে, সেদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অমলেন্দু ভট্টাচার্য মশায় আমাকে স্কুলের পুরাতন অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টার খানা দেখান। ঐ খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখি, একটা পাতার এক জায়গায় একটা টুকরো কাগজ পিনে আঁটা এবং সেই কাগজে লেখা ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যেখানে এই টুকরো কাগজটা পিনবিদ্ধ, ঠিক সেইখানেই অ্যাড্‌মিশন রেজিস্টারের খাতায় লেখা আছে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই শরৎচন্দ্রের অভিভাবক, অভিভাবকের পেশা, বাড়ি, যে ক্লাসে ভর্তি হন সেই ক্লাস, ভর্তির তারিখ—এই গুলির ঘরে যথাক্রমে লেখা আছে—উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষকতা, হুগলী, সেভন্‌থ ক্লাস ও ২২শে জুন ১৮৮৮।

পিনে আঁটা কাগজে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখা থাকলেও, এই শরৎচন্দ্রের অভিভাবক, অভিভাবকের পেশা ইত্যাদি দেখে আমার সন্দেহ হ'ল, এ শরৎচন্দ্র কখনই আমাদের ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র নন। তাই সেই জীর্ণ খাতাখানি নিয়ে অতি সাবধানে আবার তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম, এক জায়গায় ছাত্রের নাম, বয়স, পিতার নাম, পিতার পেশা, বাড়ি, ছাত্রের ভর্তির তারিখ, ভর্তির ক্লাস এবং ভর্তি ফি—এইসব ঘর গুলিতে যথাক্রমে লেখা আছে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১১, মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, চাকরি, দেবানন্দপুর, ১১ই জুলাই ১৮৮৯, ফোর্থ ক্লাস ও এক টাকা আট আনা। এই দেখে নিঃসন্দেহ হলাম যে, এই শরৎচন্দ্রই আমাদের শরৎচন্দ্র।

এবার শরৎচন্দ্র কতদিন এই স্কুলে পড়েছিলেন, সেটা জানবার জন্য স্কুলের পুরাতন রেজাল্ট বুকটা দেখতে চাইলাম। কিন্তু পেলাম না। এই সময় পরেশনাথ দাস নামে এক উৎসাহী যুবক শিক্ষক একটা আধপোড়া রেজাল্ট বুক আমাকে দিলেন। দিয়ে বললেন—উই লাগার জন্য আমাদের আগের প্রধান শিক্ষক মশায় একদিন অনেক পুরাতন কাগজ পত্র অনাবশ্যক ভেবে পোড়াতে দিয়েছিলেন। সেই আগুনলাগা কাগজের স্তূপ থেকে আমি তখন এই খাতাটা উদ্ধার করে ছিলাম।

ঐ অর্ধদগ্ধ খাতাটিতে দেখলাম ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের এনট্রান্স দেওয়ার পরের বছর থেকে রেজাল্ট আছে। অতএব ঐখান থেকে আর জানা গেল না যে, শরৎচন্দ্র এই স্কুলে কতদিন পড়েছিলেন এবং পরীক্ষায় কি রকম নম্বর পেয়ে প্রমোশন পেতেন।

দেবানন্দপুর নিবাসী দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তমুন্সী তাঁর একাধিক প্রবন্ধে

লিখেছেন—শরৎচন্দ্র ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে অর্থাৎ বর্তমানের ক্লাস সেভেনে ভর্তি হয়েছিলেন।

আমার মনে হয়, তিনি হৃষিকেশবাবুর সহপাঠী ঐ শরৎচন্দ্রেরই ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ভর্তি হওয়ার তারিখটা এই অ্যাডমিশন রেজিস্টার বইয়ে দেখেছিলেন। এবং সেভেন্‌থ ক্লাস বা বর্তমানের চতুর্থ শ্রেণী—এইটাকে ভুল করে উল্টে চতুর্থ শ্রেণী বা বর্তমানের ক্লাস সেভেন লিখে গেছেন। আমার এও ধারণা, অ্যাডমিশন রেজিস্টারে ঐ যে অন্য শরৎচন্দ্রের নামের জায়গায় পিনে আঁটা আলাদা কাগজে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র লেখা, এও তিনিই করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩৪৪ ও ১৩৪৫ সালে তিনি ভারতবর্ষ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুরের জীবন নিয়ে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মনে হয়, ঐ সময়েই তিনি এই স্কুলে খোঁজ করতে এসে ঐ ভুল আবিষ্কারটা করেছিলেন। খাতায় এইরূপ আবিষ্কার করে পিন এঁটে কাগজে লেখা হৃষিকেশবাবু করেন নি, তিনি নিজের স্মৃতি থেকেই সহপাঠী শরৎচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র বলে ভুল করে ব্রজেনবাবুকে জানিয়ে ছিলেন।

উইলাগা ও পোড়ান ঐ রেজাল্ট বইগুলোর মত এই পুরাতন ও জীর্ণ অ্যাডমিশন রেজিস্টারও যদি কোনরূপে নষ্ট হয়ে যেত, তাহলে আর কোনদিনই জানা যেত না শরৎচন্দ্র কবে এই স্কুলের কোন্ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। আরও একটা কথা, আমিও সেদিন ঐভাবে তন্ন তন্ন করে না খুঁজলে (পরে কেউ কোনদিন খুঁজতেন কিনা সন্দেহ) এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সঠিক খবরটাও জানা যেত না। ব্রজেনবাবু অথবা দ্বিজেনবাবুর ঐ ভুল তথ্যই শরৎচন্দ্রের জীবনীতে প্রকাশিত হতে থাকত। অনেকের বইয়ে বর্তমানে হচ্ছেও তাই।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমি বহু ক্ষেত্রে যেমন সমাদর লাভ করেছি, তেমনি আবার কোথাও কোথাও অনাদর, অবহেলা এবং অপমানও সহ্য করেছি। অনেক জায়গায় তথ্যের আশায় শুধু শুধু বৃথাই ঘুরেছি। এক এক জায়গায় ঘোর বিপদে, এমন কি মৃত্যুর মুখে পড়তে পড়তেও বেঁচেছি। এখন এ সব সম্বন্ধে কয়েকটা ঘটনার কথা বলছি—

১. রাধারাণী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিগুলি নরেন্দ্র দেব নিজে নকল করে আমাকে দিয়েছিলেন। ১৩৬০ সালে ঐ চিঠিগুলি দেবার সময় রাধারাণী দেবী তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠির নকল আমাকে দেখিয়েও দেন নি। বলেছিলেন, পরে দেবেন।

চিঠিটি মূল্যবান ভেবে আমি রাধারাণী দেবীর কাছে ঐ চিঠিটি চাইতে থাকি। এইভাবে দীর্ঘ ১৫/১৬ বছর ধরে চিঠিটি চেয়েছি। এতে তিনি অনেক বার আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন। আমিও নিজেকে অপমানিত বোধ করেছি।

এই চিঠিটির প্রসঙ্গেই রাধারাণী দেবী পরে তাঁর 'শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য' বইয়ে লিখেছেন—'গোপালচন্দ্র রায় কোনও সূত্রে খবর পেয়ে এই চিঠিখানি নেবার জন্য অনেক আনাগোনা করেছেন।...এ চিঠি যে অন্যের মারফতে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ছিলুম, এখন হয়ত তিনি বুঝে এই দিতে না চাওয়ার অপরাধ মার্জনা করতে পারবেন।'

এখন রাধারাণী দেবীর বই পড়ে দেখছি, ঐ চিঠিতে প্রচ্ছন্নভাবে বিধবা নিরুপমা দেবীর প্রতি শরৎচন্দ্রের কিছুটা দুর্বলতার ইঙ্গিত ছিল বলেই নাকি, রাধারাণী দেবী তখন চিঠিটি আমাকে দিতে চান নি!

এ কথা তখন রাধারাণী দেবীর মনে থাকলেও তিনি মুখে কিন্তু কোনদিনই আমাকে কিছু বলেন নি। তিনি চিঠিটি দেবেন বলেছিলেন বলেই অত যাতায়াত করেছিলাম।

যাই হোক্, বহু বছর ধরে বহু ঘোরাঘুরির পর শেষ পর্যন্ত চিঠিটি পেয়েছিলাম। সেদিন রাধাণী দেবী একটি পত্রিকায় ঐ চিঠিটি যখন দেন, তখন এরই একটি নকল রাধারাণী দেবীর স্বামী নরেন্দ্র দেব আমার হাতে দিয়েছিলেন। সেই চিঠিটি এনে আমার শরৎচন্দ্র-৩য় খণ্ড বা পত্রাবলী খণ্ডে দিই।

২. শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীর সময় ১৭-১১-১৯৬৬ তারিখের দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়—'কোচবিহারে শরৎ জন্মশতবার্ষিকী পালন।/ নিজস্ব সংবাদদাতা/কোচবিহার/শরৎ শতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্প্রতি কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন জেলা শাসক এন. এস. খারোলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গঠিত জেলার শত-বার্ষিকী কমিটির এই প্রদর্শনী। শরৎচন্দ্রের বহু গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ, কিছু পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র এবং তার লেখার প্রচুর কোটেশান ও বৈচিত্র্যময় জীবনের ঘটনাপঞ্জী প্রদর্শনীতে স্থান পায়।' ইত্যাদি

দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত এই সংবাদ পড়ে আমি শরৎচন্দ্রের পাণ্ডুলিপি, বিশেষ করে তাঁর চিঠিপত্রের সন্ধানে কোচবিহারে যাই। গিয়ে, প্রদর্শনী তখন শেষ হয়ে যাওয়ায়, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থগারের গ্রন্থাগারিকের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁকে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র ও পাণ্ডুলিপির কথা জিজ্ঞাসা করি।

উত্তরে তিনি বললেন—শরৎচন্দ্রের কোন চিঠি বা পাণ্ডুলিপি প্রদর্শনীতে দেখানো হয়নি। নিজস্ব সংবাদদাতা সংবাদপত্রে ভুল খবর পাঠিয়ে ছিল।

৩. শরৎচন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে একবার সভাপতি হয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ছিলাম। বহু বারই সেখানে বক্তৃতা দিতে গেছি।

সেদিন সভার শেষে, সভার প্রধান উদ্যোক্তা দেবানন্দপুর শরৎ-স্মৃতি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক দীনবন্ধু ঘোষের এক বন্ধু আমার কাছে এসে তাঁর নিজের নাম বলে (নামটা মনে আছে—জ্যোতিপ্রকাশ) বললেন—আমার বাড়ি চন্দননগরে। আমার সংগ্রহে শরৎচন্দ্রের একটা চিঠি আছে। আমার কাকা একবার পুরী বেড়াতে গিয়ে সেখানে যে হোটেলে উঠেছিলেন, সেই হোটেলেই শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের এক বন্ধুও গিয়ে উঠেছিলেন। সেখানে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কাকার আলাপ হয় এবং পরে বন্ধুত্বও হয়। তিনি তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটা চিঠি এক সময় কাকাকে দিয়েছিলেন। সেই চিঠি বর্তমানে আমার কাছে আছে।

এই শুনেই আমি জ্যোতিবাবুর ঠিকানা নিয়ে, পরের রবিবারেই তাঁর বাড়িতে শরৎচন্দ্রের ঐ চিঠির নকল নিতে যাব বললাম। জ্যোতিবাবু রাজী হলেন।

পরের রবিবার সকালেই স্নান আহার করে আমার কলকাতার বাড়ি থেকে রওনা হয়ে বেলা ১২টা নাগাদ চন্দননগরে জ্যোতিবাবুর বাড়িতে গিয়ে পেঁীছেছিলাম। আমি যখন যাই জ্যোতিবাবু তখন তেল মেখে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। তিনি বাহিরে এসে আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন। দেখলাম—বনেদী বড়লোকের বিরাট দু মহলা বাড়ি। বার মহলে বেশ বড় ঠাকুর দালান। ঠাকুর দালানটি সামনের উঠান থেকে অনেকটা উঁচু। ঐ ঠাকুর দালানে পাতা কয়েকটা চেয়ারের মধ্যে একটায় আমাকে বসিয়ে জ্যোতিবাবু বাড়ির ভিতরে স্নান করতে গেলেন।

ঠাকুর দালানে নির্জ্জন মহলে একা বসে আছি। কেউ কোথাও নেই। লোকজনের অল্প যা সাড়া পাচ্ছি, সে ঐ ভিতর মহলের। এমন সময় হঠাৎ দেখি—বিরাট এক অ্যালসেসিয়ান কুকুর বাড়ির ভিতর থেকে এসে আমার সামনেই ঠাকুর দালানের উঠানে ঘুরে ঘুরে কি যেন শুঁকে শুঁকে বেড়াতে লাগল।

আমার তখন কী ভয়াবহ অবস্থা! ভাবলাম, এখুনি বুঝি ঐ ভীষণ কুকুরের কামড়ে জীবনটা যায়। ভয়ে কাঁটা হয়ে গেলাম। তবুও স্থির হয়েই ভাবছি, কি করে আত্মরক্ষা করবো।

আমার সৌভাগ্যবশতঃই হয়ত কুকুরটা উপরের দিকে ঠাকুর দালানে না তাকিয়ে উঠানের আশে পাশেই শুধু কিছুক্ষণ ধরে শুঁকে শুঁকে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

বুঝলাম, কুকুরটা অচেনা মানুষের গন্ধ পেয়েই শুঁকে বেড়াচ্ছিল। ভয়ে ভয়েই ভাবছি, কুকুরটা হয়ত আবার এখনই ফিরে আসবে। এবার এসে উপরে ঠাকুর দালানের দিকে তাকিয়ে হয়ত আমাকে দেখতে পাবে। ঠাকুর দালানের থামের পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ার দিয়ে আটকে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবো, তখনও সমানে ভাবছি।

এইভাবে ভয়ে ভয়ে আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। যখন কেবলই ভাবছি, কুকুরটা হয়ত এখনই আসবে। তখন দেখি কুকুরের বদলে কুকুরের মনিব জ্যোতিবাবু স্নান সেরে এসে দেখা দিলেন।

আমি অনেকটা আশ্বস্ত হয়েই জ্যোতিবাবুকে বললাম—কি মশায়! আমাকে একেবারে মৃত্যুর মুখে বসিয়ে রেখে গেসলেন। আপনি চলে যাবার পরেই আপনার কুকুর এসে উপস্থিত। ভাগ্য ভাল যে দেখতে পায় নি।

আমার কথা শুনে সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তেই জ্যোতিবাবু শুধু বললেন—ও: কুকুরটা ছাড়া ছিল বুঝি!

এই কথায় কি আর বলবো। চুপ করেই রইলাম।

এরপর জ্যোতিবাবু আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমার সামনেই চিঠি খোঁজার জন্য একটা আলমারি খুললেন। আলমারির নীচের থাকে একটু খুঁজে বললেন—এইখানেই তো ছিল! দেখছি নেই। চিঠিটা তাহলে গেছে। সে আর পাওয়া যাবে না। আপনাকে কষ্ট দিয়ে শুধু শুধু আনলাম।

বললাম—এ রকম কষ্টের অনেক অভিজ্ঞতা আমার আছে। তবে আপনার কুকুরের কামড়ের মুখ থেকে যে রক্ষা পেয়েছি, সেটাই আমার আজকের বড় ঘটনা।

শরৎচন্দ্রের এই চিঠি সংগ্রহের সময়, যে কেউ বলেছেন—অমুকের কাছে যান, গেলে চিঠি পেলেও পেতে পারেন। তাঁর সেই কথা শুনে অমনি সেখানে গেছি। যেমন—

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনাথবন্ধু দত্ত একদিন বললেন—কলকাতা করপোরেশনের লাইসেন্স ডিপার্টমেন্টে এন, আর, দাস নামে একজন কাজ করতেন। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। করপোরেশন অফিসে গিয়ে তাঁর ঠিকানাটা জেনে নিন। তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম ঠিকানাটা জানুন। জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। কারণ তাঁর সঙ্গে শরৎ-চন্দ্রের খুব পরিচয় ছিল, তাঁর কাছে শরৎচন্দ্রের চিঠি থাকা স্বাভাবিক।

এই শুনে খোঁজ করে করে লোকটির সন্ধান করা গেল বটে, কিন্তু গিয়ে শুনলাম, তিনি কয়েক বছর আগেই মারা গেছেন। চিঠিপত্র থাকলেও কেউ আজ আর হদিস দিতে পারবেন না।

২. আলিপুর কোর্টের উকিল বিজয় চট্টোপাধ্যায় একদিন বললেন—স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন কোর্ট থেকে প্রাচীন দলিল পত্র এনে আমাদের আলিপুর কোর্টে একবার একটা প্রদর্শনী হয়েছিল। তাতে শরৎ-চন্দ্রের একটা ইংরাজি চিঠি ছিল। চিঠিটি হাওড়া কোর্ট থেকে আনা। 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হলে সেই প্রসঙ্গ নিয়েই হাওড়ার জেলা শাসককে লেখা।

কোন্ বছরে প্রদর্শনী হয়েছিল, বিজয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি তা বলতে পারলেন না। আরও কয়েকজন উকিলকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরাও বলতে পারলেন না।

যাই হোক, এই শুনে একদিন হাওড়ার জেলা শাসকের কাছে গেলাম। গিয়ে তাঁকে সমস্ত বললাম এবং এও বললাম যে 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত হয়েছিল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে।

হাওড়ার জেলা শাসক দুর্গেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার কথা শুনে অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে তৎক্ষণাৎ রেকর্ড কীপারকে ডাকিয়ে চিঠিটি খুঁজে বার করতে নির্দেশ দিলেন।

রেকর্ড কীপার জেলা শাসকের নির্দেশে কয়েকজন সহকর্মীসহ চিঠিটি খুঁজতে আরম্ভ করলেন। প্রায় ১০/১৫ দিন ধরেই কিছু সময় করে তাঁরা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। আমিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখি। জেলা শাসক দুর্গেশবাবু নিজেও এ বিষয়ে খোঁজ নিতে একদিন রেকর্ড রুমে এলেন। কিন্তু চিঠিটি কিছুতেই পাওয়া গেল না।

৩. 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত একদিন বললেন—শুনেছি চিত্রাভিনেত্রী চন্দ্রাবতী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের কয়েকটা চিঠি চন্দ্রাবতী দেবীর কাছে আছে।

এই শুনে একদিন চন্দ্রাবতী দেবীর কাছে গেলাম। গিয়ে শুনলাম, চন্দ্রাবতী দেবী প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত ও অভিনীত শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' গ্রন্থের চিত্রাভিনয়ে চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। 'বিজয়া'য় বিজয়ার ভূমিকায়ও অভিনয় করেছিলেন। তাঁর ঐ সব অভিনয় শরৎচন্দ্রের খুবই ভাল লেগেছিল। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের মজঃফরপুরের বন্ধু মহাদেব সাহু (যাঁর বাড়িতে শরৎচন্দ্র প্রথম যৌবনে এক সময় কিছুদিন থেকে গান বাজনা করেছিলেন) ছিলেন চন্দ্রাবতী দেবীর জ্যাঠতুতো ভাই। এই সব কারণে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে চন্দ্রাবতী দেবীর বেশ পরিচয় ছিল, এবং শরৎচন্দ্র তাঁকে কয়েকটা চিঠিও লিখেছিলেন সত্য। কিন্তু চন্দ্রাবতী দেবী সে সব চিঠি হারিয়ে ফেলেন।

শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজ' গ্রন্থে কুঁয়াপুরের বাঁড়ুয্যে মশায় গ্রামের মুদি মধু পালকে কলকাতার প্রসঙ্গে যেখানে বলছে—'সেখানে কে থাকতে পারে বল্! যেমনি ধোঁয়া, তেমনি কাদা। বাইরে বেরিয়ে গাড়ী ঘোড়া চাপা না পড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস তো জানবি তোর বাপের পুন্যি।'—শরৎচন্দ্র সেইখানে লিখেছেন —মধু কখনও কলকাতায় যায় নাই। মেদিনীপুর শহরে একবার সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিল মাত্র।

শরৎচন্দ্রের এই লেখাটা পড়ে বুঝেছিলাম—কুঁয়াপুর মেদিনীপুর শহরের কাছাকাছি কোথাও হবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শরৎ জন্ম-শত বার্ষিকী সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে সভার উদ্যোক্তদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আশে পাশে কোথাও কুঁয়াপুর গ্রাম আছে ? থাকলে কত দূরে ?

তাঁরা বলেছিলেন—কুয়াপুর আছে, ঘাটাল মহকুমায়। এখান থেকে ২৩ মাইল দূরে। কুঁয়াপুরের তিন মাইল দূরে চন্দ্রকোণা শহর।

সাহিত্য পরিষদের সভার পরের দিন মেদিনীপুর শহর থেকে কুঁয়াপুরে গিয়ে ছিলাম। সেখানে গিয়ে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য পাই। সে সব কথা আমার 'নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের 'শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ' অধ্যায়ে বিস্তৃত বলেছি।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বহু জায়গা থেকে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে অনেক তথ্যও সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। এখানে একটা উদাহরণ দিই—

আসামের হাইলাকান্দি শহরে বক্তৃতা দিতে যাবার পথে শিলচরে গেলে, সেখানেও বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। সেদিন শিলচরের যে অধ্যাপক ভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে ছিলাম, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—শরৎচন্দ্র ১৯২৬ সালে যখন শিলচরে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে কথা বলে ছিলেন, এমন কেউ এখনও শিলচরে আছেন কি ?

ভক্তিমাধববাবু বললেন—প্রিয়নাথ দেব নামে এখানকার কোর্টের একজন বিখ্যাত প্রবীণ উকিল আছেন। কিছুদিন আগে তিনি শিলচর বেতার কেন্দ্রে 'শরৎচন্দ্র শিলচরে এসেছিলেন' নামে একটা কথিকা পড়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই প্রিয়নাথবাবুর আলাপ হয়েছিল।

প্রিয়নাথবাবু কোর্ট থেকে ফিরলে সন্ধ্যার সময় ভক্তিমাধববাবুকে সঙ্গে নিয়ে প্রিয়নাথবাবুর বাড়িতে যাই। গেলে তিনি তাঁর বেতার ভাষণ 'শিলচরে শরৎচন্দ্র এসেছিলেন' যা স্থানীয় বরাক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, সেই পত্রিকাটি দিলেন। মুখেও শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে অনেক কথা বললেন।

প্রিয়নাথবাবুর মুখের কথা এবং তাঁর দেওয়া ঐ পত্রিকা থেকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারলাম।

প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি থেকে চলে আসার সময় তিনি বলেছিলেন—শরৎচন্দ্র শিলচরে এসে এখান থেকে গোহাটী গিয়েছিলেন। আমাদের কোর্টের এক উকিল চন্দ্রেশ্বর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করুন। শরৎচন্দ্রের গোহাটীতে অবস্থানের কথা তিনি আপনাকে কিছু বলতে পারেন।

প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি থেকে এলাম চন্দ্রেশ্বরবাবুর বাড়িতে। তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে শরৎচন্দ্রের গোহাটীতে অবস্থানের কথা অনেক শোনালেন।

এইভাবে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের ও তথ্য আবিষ্কারের দুটো কাহিনী এখানে বলছি—

শরৎ-শতবার্ষিকীর সময় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে রক্ষিত শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত বড় গল্প 'কোরেল' উমাপ্রসাদবাবু কর্তৃক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছিলাম। এখানে সে ইতিহাসটা একটু বলি—

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর নিরুপমা দেবী তাঁর 'আমাদের শরৎদাদা' নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—'...আমরা শরৎদাদার আরও কয়েকখানি খাতা পড়িতে পাই। ইহাতে বোঝা, কোরেল গ্রাম, কাশীনাথ প্রভৃতি অনেকগুলি গল্প ছিল।—ভারতবর্ষ', চৈত্র ১৩৪৪।

ঐ সময় ১৩৪৪ সালের ৪ঠা মাঘের আনন্দবাজার পত্রিকায় অনুরূপা দেবীও তাঁর শরৎচন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধে লেখেন—'আমরা তখন ভাগলপুরে থাকি। আমার এক জ্ঞাতি খুড়ো আমাদেরই সমবয়সী, নাম ছিল অরুণ দেব। একদিন তাঁর পড়িবার ঘরে বইপত্রের সঙ্গে একখানা কাল মলাটের খাতা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া বসিলাম। পাতা খুলিতেই দেখা গেল, সেটা গল্পের খাতা। তাতে মনে হয় যেন চারটি ছোট গল্প ছিল। তাদের নাম—বোঝা, অনুপমার প্রেম, বামুন ঠাকুর, আর একটি কি তা মনে নেই।...শরৎবাবুর লেখা দ্বিতীয় খাতা পাই ঐ অরুণ কাকারই দৌলতে। সে খানির সব লেখার কথা কেন জানি না, ভালরূপ মনে পড়ে না। 'কোরেল' নাম দেওয়া একটি গল্প ও একটি ইংরাজি নাম ধামওয়ালা (সম্ভবতঃ অনুবাদই) মারী কোরেলির 'মাইটি অ্যাটমের' অনুবাদ বা অনুসরণে লেখা একটি মাঝারি উপন্যাস। এই দুইটির কথাই মনে আছে। তার মধ্যে শেষোক্ত রচনাটি খুব ভালই লাগিয়া ছিল।'

গল্পের নাম 'কোরেল' না 'কোরেল গ্রাম' এবং শরৎচন্দ্রের কোন্ খাতায় এই গল্পটি ছিল—এই নিয়ে নিরুপমা দেবী এবং অনুরূপা দেবী দুই বান্ধবীর বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও, তবে এটা ঠিক যে, এঁরা উভয়েই তখন শরৎচন্দ্রের ঐ বাল্য-রচনাটি পড়েছিলেন।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এফ-এ পড়ার সময় ভাগলপুরে তাঁর মেসোমশায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের (অনুরূপা দেবীর পিতা) বাড়িতে ছিলেন। সৌরীন্দ্রবাবু সেই সময় শরৎচন্দ্রের ঐ গল্পটি পড়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন—'...মনে পড়ে কোরেল গল্প লিখছিলেন। সে গল্পটি জন্মের মত হারিয়ে গিয়েছে। ছাপা দেখি নি। লেখবার সময় বলতেন—বিলাতী পাত্র-পাত্রী নিয়ে গল্প লিখছি। বড় গল্প। ট্রানস্লেশন নয়—অরিজিন্যাল।

সে গল্পটির কিছু কিছু আজও মনে আছে। ডার্বি খেলাকে কেন্দ্র করে তরুণ জকি, কিশোরী নায়িকা—ভালোবাসার গল্প—বড় সাসপেন্স বিজড়িত

অপূর্ব গল্প। মনস্তত্ত্বের কি সহজ সুন্দর বিশ্লেষণ। আধুনিক কোন ইংরেজ লেখকের লেখনীতে আজ পর্যন্ত তেমন গল্প বেরুতে দেখি নি।'

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স তাঁর বাল্য-রচনা 'শুভদা' উপন্যাসটি প্রকাশ করেন। এই বইটি বার করার সময় প্রকাশক এর মুখবন্ধে লিখেছিলেন—শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে 'পাষাণ', 'অভিমান', 'কোরেল' প্রভৃতির পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই।

রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিগুলি প্রকাশিত হলে দেখা যায়—শরৎচন্দ্র ৯/৮/১৩ তারিখে প্রমথবাবুকে লিখেছেন—'শুনেছি 'অয়ন' পত্রিকা আমার কোরেল গল্পটা সুরেনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে। তবে বেনামি ছাপবে এ সর্ত বুঝি তার সঙ্গে হয়েছে। ভাল গল্প। কি জানি আমার ভাল মনেও নেই!

এখানে চিঠিতে উল্লেখিত সুরেন হলেন—শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যাওয়ার সময় তাঁর বাল্য-রচনা সমূহ এঁর কাছে রেখে গিয়েছিলেন।

'কোরেল' গল্প হারিয়ে গেছে—একথা সৌরীনবাবু এবং 'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' বললেও 'অয়ন'-এ প্রকাশিত হয়ে থাকলে 'অয়ন' থেকে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, এই ভেবে আমি 'অয়ন' পত্রিকার খোঁজ করতে থাকি! বহু জায়গায় খোঁজ করেও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সময়কার 'অয়ন' নামে কোন পত্রিকা পেলাম না।

জাতীয় গ্রন্থাগারে দু সংখ্যা মাত্র 'অয়ন' আছে বটে, কিন্তু সে ১৩৩০ সালের। আর সে কাগজও 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্ ওরিয়েন্টাল আর্ট''-এর।

আমার মনে হয়, 'অয়ন' নামে কোন পত্রিকা ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বেরোবে স্থির হয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত আর বেরোয় নি। অথবা 'অয়ন' প্রকাশিত হলেও অল্পায়ুর জন্য এবং হয়তো অল্প সংখ্যক ছাপানোর জন্য আজ তার আর কোন হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি যখন চারিদিকে 'অয়ন' পত্রিকার খোঁজ করছিলাম, সেই সময় হঠাৎ একদিন ১৩৫৮ সালের 'শরৎ-স্মরণিকা' পত্রিকাটি আমার হাতে আসে। তাতে দেখলাম, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' (প্রথম পর্ব) প্রবন্ধটিতে লিখেছেন—'কোরেল গ্রাম (পরে পরিবর্তিত আকারে ছবি)···ইহার আরম্ভ কাল—২৯ শে আগষ্ট ১৮৯৩; সমাপ্তিকাল ৩রা আগষ্ট ১৯০০, পাণ্ডুলিপিতে এই তারিখ দেখিয়াছি। শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহা সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। ব্রজেনবাবুর এই লেখা পড়ে পরদিনই আমি উমাপ্রসাদবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র (রমাপ্রসাদবাবুর পুত্র) কলকাতা হাইকোর্টের জজ বন্ধুবর চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে উমাপ্রসাদবাবু কোথায় আছেন, জেনে নিয়ে তখনই তাঁকে চিঠি

দিই। চিঠিতে লিখি—কোরেল সত্যই তাঁর কাছে আছে কিনা? ঐটাই পরিবর্তিত আকারে 'ছবি' গল্প হয়েছে কিনা? এবং কিভাবে তিনি ঐ পাণ্ডুলিপি পেলেন ইত্যাদি।

উমাপ্রসাদবাবু ঐ সময় তাঁদের মধুপুরের বাড়িতে ছিলেন। তিনি সেখান থেকে ২৮/১১/৭৪ তারিখে আমাকে উত্তরে লেখেন—কোরেল সম্পর্কে তোমার প্রশ্নর যথাযথ উত্তর কলকাতায় পৌঁছে পাণ্ডুলিপিটি আবার বার করে দেখলেই পাওয়া যাবে। প্রথমে কাহিনীর পটভূমি ছিল—ইংলণ্ডে। পাণ্ডুলিপিতে প্রথম রচনার তারিখগুলিও সেই অনুযায়ী। পরে রচনার প্রথম খানিক অংশে স্থান ও পাত্রপাত্রীর বিলাতী নাম কেটে বর্মামূলক ও বর্মী নামকরণ করা হয়। 'ছবি' কাহিনীর সঙ্গে কোরেলের কতখানি মিল-অমিল—দুটি পাশাপাশি পড়লেই ধরা পড়বে। 'কোরেল' কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমার জানা নেই। তবে এরই ছায়া অবলম্বনে ছবি লেখা হয়ে থাকলে, কোরেল আগে কখনো প্রকাশ না হওয়ারই কথা। এই পাণ্ডুলিপিটি শরৎবাবুর শিবপুরের বাসার সেই রোলড্ টপ্ টেবিলের মধ্যে থেকে অন্যান্য কাগজের সঙ্গে আনা হয়।'

শিবপুরের বাসার সেই রোলড্ টপ্ টেবিলের মধ্যে থেকে অন্যান্য কাগজের সঙ্গে আনা—উমাপ্রসাদবাবুর এই কথা থেকে মনে হয়, শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন যাওয়ার আগে মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে এই যে গল্পটি রেখে গেছুলেন, সুরেনবাবু এটি সম্ভবতঃ কোন কাগজে না ছাপিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন এবং শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এলে তাঁকে গল্পটি দিয়ে এসেছিলেন।

উমাপ্রসাদবাবু তাঁর চিঠিতে কবে কলকাতায় ফিরবেন তাও আমাকে জানিয়েছিলেন। কয়েক মাস পরে তিনি কলকাতায় এলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন আমাকে 'কোরেলে'র পাণ্ডুলিপিটি দেখান এবং বলেন—ছবির সঙ্গে এটা মিলিয়ে পড়ে দেখি।

পাণ্ডুলিপিতে 'আরম্ভ কাল' বলে কিছু লেখা না থাকায় আমি উমাপ্রসাদবাবুকে বলেছিলাম—২৯/৮/৯৩ তারিখটা আরম্ভ কাল হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে, ঐ তারিখটা হয়ত তাঁর জীবনের একটা স্মরণীয় দিন ছিল, তাই তিনি ঐ একই তারিখ পাণ্ডুলিপির মাথায় দু-জায়গায় লিখেছেন। তবে পাণ্ডুলিপিতে সমাপ্তিকাল বলে কিছু লেখা না থাকলেও ৩/৮/১৯০০ তারিখটা রচনার শেষ তারিখই।

যাই হোক্, কয়েকদিন পরে আবার উমাপ্রসাদবাবুর কাছে গেলে, তিনি বললেন, কোরেলের পাণ্ডুলিপটা 'ছবি' গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে পড়ে দেখেছি।

'কোরেলে'র ইংরাজ নায়ক সাহিত্যসেবী। ছবির ব্রহ্মদেশীয় নায়ক চিত্রকর।

কোরেলের ঘটনাবলী ও বর্ণনা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত, ছবিতে বর্ণনা সংযত সংক্ষিপ্ত।'

আমি উমাপ্রসাদবাবুকে বললাম—আপনি তাহলে এটা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখুন এবং ঐ সঙ্গে 'কোরেল' গল্পটা ছাপাবার ব্যবস্থা করুন।

উমাপ্রসাদবাবু বললেন—আমিও তাই ঠিক করেছি। তবে কোরেল ও ছবি দুটোকে কোন কাগজে পাশাপাশি ছাপতে পারলে ভালো হ'ত। তফাৎটা পরিষ্কার বোঝা যেত।

বললাম—'কোরেলে'র সঙ্গে 'ছবি' কেউ ছাপবে না। অত জায়গা কোন পত্রিকা দেবে না। তা কোন্ কাগজে এটা ছাপাবেন ঠিক করেছেন?

উমাপ্রসাদবাবু একটা পত্রিকার নাম করলেন। সে পত্রিকা তেমন নামকরা নয়। তাই তাঁকে বললাম—পূজা সংখ্যা 'আনন্দবাজার,' নয় তো 'দেশ'-এ ছাপান। তাহলে লেখাটার প্রচুর প্রচার হবে।

উমাপ্রসাদবাবু বললেন—তুমি তাহলে আমার সঙ্গে ওঁদের কাউকে একদিন দেখা করতে ব'লো।

'আচ্ছা'—বলে সেদিন চলে এলাম।

কয়েকদিন পরে একদিন 'দেশ' পত্রিকা অফিসে যাই। গেলে 'দেশ'-এর তখনকার সহযোগী সম্পাদক সাগরময় ঘোষ আমাকে বললেন—'কি খবর গোপালবাবু?'

আমি বললাম—'আজ একটা ভাল খবর আছে। এই বলে 'কোরেলে'র কাহিনীটি তাঁকে শোনালাম।'

শুনে সাগরময়বাবু বললেন—'এটা আমাদের কাগজের জন্য আপনাকে করে দিতেই হবে।'—বললাম—আপনাদের কাগজের জন্যই উমাপ্রসাদবাবুকে বলেছি। আপনি একদিন দেখা করুন কিংবা ফোনেও কথাবার্তা বলতে পারেন। আমি এখন আপনার এখান থেকে উমাপ্রসাদবাবুর কাছেই যাচ্ছি। তিনি একটা প্রবন্ধ লিখবেন বলে, শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত বুলেটিন-গুলো সংগ্রহ করে দেবার জন্য আমাকে বলেছিলেন। সেইগুলো দিতে যাচ্ছি।

এই শুনে সাগরময়বাবু আমার সঙ্গে আলোচনা করে আমার হাতে একটা খোলা চিঠি লিখে দিলেন।

এতে তিনি 'দেশ'য়ে কোরেল ছাপার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে সাগরময়বাবু উমাপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আরও যোগাযোগ করে কোরেল গল্প এনে 'দেশ'য়ে প্রকাশ করেছিলেন।

সাধারণের কাছে 'কোরেল' প্রকাশিত হওয়ার এই হ'ল ইতিহাস।

এ সম্পর্কে 'দেশ'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষও দ্বিজেন ঘোষ সম্পাদিত 'মুখর' সাহিত্য পত্রিকার উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংখ্যায় তাঁর 'যেমন মানুষ বিরল হয়ে যাচ্ছে' প্রবন্ধে লিখেছেন—

'তখন শরৎ জন্মশতবর্ষে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে গোপালচন্দ্র রায় নানা বিষয়ে লিখছেন। নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান দিচ্ছেন। একদিন 'দেশ'-এ আমার দপ্তরে এসে বললেন, শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত বড় গল্প 'কোরেল' উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আছে। আরও জানালেন, তিনি এখন কলকাতায়।

এমন সন্ধান পেয়ে কি আর দেরি করা যায়। আমি সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করি।

সঙ্গে সঙ্গেই বললেন—আপনি আসবেন সে তো আনন্দের, সৌভাগ্যের কথা। চলে আসুন সুযোগ মত। দেখাও হবে, কথাও হবে।

তাই হ'ল।…'

বর্ধমান জেলার ইস্পাত নগরী বার্ণপুরে (নিউ টাউনে) ইন্ডিয়ান আয়রণ এন্ড ষ্টীল কোম্পানী বা সংক্ষেপে ইস্কোর কর্মীরা ১৩, ১৪ ও ১৫ই জুন (১৯৭৬) শরৎ-জন্ম শতবার্ষিকী পালন করেন। ঐ সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। এই উপলক্ষে বার্ণপুরে গিয়ে বার্ণপুরের সংলগ্ন আসানসোল থেকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এই তথ্য সংগ্রহ করি—

শরৎচন্দ্রের ছোট বোন সুশীলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল, আসানসোলের কয়লাখনির মালিক রামকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিয়ে দিয়েছিলেন, শরৎচন্দ্রের ছোট মামা বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে। কোন কারণে, একটা ঝগড়াঝাটির জন্য রামকিংকরবাবু স্ত্রী সুশীলা দেবীকে কোনদিনই শরৎচন্দ্রের বাড়িতে পাঠান নি।—শুধু এইটুকু মাত্রই অনেক চেষ্টায় জানতে পেরেছিলাম। রামকিংকরবাবুর কে আছে, তাঁর বাড়িটাই বা আসানসোলের কোন্ জায়গায়, তার কিছুই আগে জানতাম না।

শরৎচন্দ্র কোনদিন ছোট বোনের বাড়িতে গিয়েছিলেন কিনা, আর কেনই বা সুশীলা দাদার বাড়িতে কোনদিন আসেন নি, এ সব জানবার জন্য বার্ণপুরে গিয়ে চেষ্টা করেছিলাম। বার্ণপুরে যাওয়ার কিছুদিন আগে, আমার বিশিষ্ট বন্ধু প্রখ্যাত সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু একদিন শরৎচন্দ্রের কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—আমার ভাই শ্যামাপদ বিবাহ সূত্রে শরৎচন্দ্রের ছোট বোন সুশীলা দেবীদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সে সুশীলা দেবীদের বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি সবই জানে। আপনি শ্যামাপদকে একটা চিঠি দিয়ে, সুশীলা দেবী বা তাঁর স্বামী তো বেঁচে নেই, তবে সুশীলা দেবীর ছেলের ঠিকানাটা জেনে নিন্। আমার ভাই আসানসোলের কাছেই কুলটিতে থাকে।—এই বলে শক্তিবাবু শ্যামাপদবাবুর ঠিকানাটা দেন।

সুশীলা দেবীদের সংবাদ জানতে চেয়ে আমি শ্যামাপদবাবুকে চিঠি দিলে, তার উত্তরে তিনি আমাকে লেখেন—

'শ্রদ্ধেয় দাদা, আপনার পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হলাম ও আনন্দিত হলাম। সুশীলা

দেবীর এক পুত্র—নাম সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুই কন্যা। বড় মেয়ের নাম উমারাণী—তিনি আমার খুড়শাশুড়ী। ছোট মেয়ের নাম বীণাপাণি। সুশীলা দেবীর স্বামীর নাম ৺রামকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁরা গ্রাম আসানসোলের বাসিন্দা ও প্রাচীন বাঁড়ুজ্যে বাড়ির বংশধর। ওঁদের পাড়ার নাম উগ্রক্ষত্রিয় পাড়া। ঐটিই আদি আসানসোল গ্রাম ছিল। নিকটেই ৺নীলকণ্ঠেশ্বর শিবের মন্দির। ওঁদের বাড়িতে শরৎবাবুর অনেক পত্রাদি আছে। আপনি বার্ণপুরে এলে ওঁদের বাড়ি যেতে পারেন। সুধাংশুবাবু কুলটিতে (ইসকোতে) চাকরি করেন ও খুব নিরীহ ভদ্রলোক। যদি ওঁদের বাড়ি যান, বলবেন, কুলটির শ্যামাপদ রাজগুরুর কাছে সমস্ত জানতে পেরে আসছি। আশা করি সমস্ত জানতে পারবেন। আমি থাকছি না হরিদ্বার যাচ্ছি! না হলে নিজে গিয়ে ব্যবস্থা করতে পারতাম। সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন।'

আমি বার্ণপুরে গিয়ে আসানসোলে সুধাংশুবাবুর বাড়িতে যাই। গিয়ে শ্যামাপদবাবুর কথা বলি। তিনি আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানান। তাঁর বাড়িতে উপরি উপরি দুদিন গিয়েছিলাম। সে সময়, ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, বলে তিনি যে সব কথা বলেছিলেন, তার মধ্যকার আসল কথাগুলো লিখে নিই। লিখে আবার তাঁকে পড়ে শোনাই। শুনিয়ে তাতে একটা সই করে দিতে বলি। আমার কথায় তিনি তাতে একটা স্বাক্ষর করে দেন। সেই সময় বার্ণপুরের বিশিষ্ট নাগরিক, ইসকোর এক অফিসার শিবকুমার ঘোষও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি বার্ণপুরে গিয়ে শিববাবুর বাড়িতে উঠেছিলাম। আমার সঙ্গে তিনিও সুধাংশুবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সুধাংশুবাবুর বলা এবং স্বাক্ষরিত সেই কথাগুলো এই—

'বড়মামা (শরৎচন্দ্র) আমাদের বাড়িতে অনেকবার এসেছেন। অনেক বছর পুজোর সময় প্রতিবারই আমাদের জামাকাপড় কিনে দিতেন। তিনি আমাদের বাড়ি এসে যে গড়গড়ায় তামাক খেতেন, সেই গড়গড়ার নলচেটা আজও আমাদের বাড়িতে আছে। তিনি এসে যে খাটে শুতেন, সেই খাটটিও আছে। আমার দিদি উমারাণীর অন্নপ্রাশনের সময় বড়মামা ৫ টাকা আশীর্বাদী পাঠিয়েছিলেন। তার মণি অর্ডারের কুপনটা আজও আমার কাছে আছে।

বড়মামা রেঙ্গুন থেকে আসার পর তিনি একবার মা'কে বড়মামার বাজে শিবপুরের বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য ছোটমামাকে পাঠান। ছোটমামা এলে, বাবা বলেন—আপনি যান, আপার ভগ্নীকে নিয়ে আমি একদিন যাব।

এই কথায় ছোটমামা রাত্রে থেকে, সকালে হাওড়ায় চলে যান। তিনি যাওয়ার পরই মা দেখেন, তাঁর হাতের তাগা জোড়াটি পাওয়া যাচ্ছে না। মা

তখন ব্যাপারটা বাবাকে জানান। এই শুনে বাবা বড়মামাকে একটা চিঠি দেন। চিঠিতে লেখেন—দাদা, বাড়িতে আপনার ভগ্নীর তাগা জোড়াটি পাওয়া যাচ্ছে না। ছোট্‌দা যে খাটে শুয়েছিলেন, সেই খাটে বিছানার নীচে তাগা জোড়াটি ছিল। যদি ছোট্‌দা নিয়ে গিয়ে থাকেন, দয়া করে পাঠিয়ে দেবেন।

ওদিকে ছোটমামা তাঁদের বাড়িতে বাবার চিঠি যাওয়ার কথা শুনে, বড় মামীকে বলেন—বৌদি, সুশীলা এই তাগা জোড়া তোমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে।

বড় মামা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, তাগা জোড়াটি তখনই ফেরৎ পাঠিয়ে দেন।

এই নিয়ে মা-ও একদিন শ্বশুর বাড়িতে তাঁর সম্মান নষ্ট হওয়ায় দুঃখে বড় মামাকে কয়েকটা কথা লিখে ছিলেন। এই সব নিয়েই বড় মামার সঙ্গে আমাদের বাড়ির সম্পর্ক একরূপ ছিন্ন হয়। তবে মেজমামা (প্রভাসবাবু) আমাদের বাড়িতে বারবর আসতেন। তিনি একবার আমাদের ভাই বোন সকলকে ও মাকে নিয়ে কাশীতে কিছুদিন রেখেছিলেন। মাসীমা অনিলা দেবীকেও তখন তিনি সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার এগার বছর বয়সে যখন পৈতা হয়, তখনও মেজমামা আমাদের বাড়িতে পৈতায় এসে ছিলেন।

আর মায়ের মামাদের সঙ্গে (ভাগলপুরের গাঙ্গুলীদের) আমাদের বরাবরই যোগ ছিল। মা ভাগলপুরে মাঝে মাঝে যেতেন।'

সুধাংশুবাবুর দিদি উমারাণীর অন্নপ্রাশনের সময় শরৎচন্দ্র সুধাংশুবাবুর পিতা রামকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায়কে মণি অর্ডার করে যে পাঁচ টাকা পাঠিয়ে ছিলেন, সেই মণি অর্ডারের কুপনে তখন যা লিখেছিলেন, সেই লেখাসহ ঐ কুপনটা সুধাংশুবাবু সযত্নে রেখে ছিলেন। উমারাণীর অন্নপ্রাশনের সময় শরৎচন্দ্রের বড় ভগ্নীপতি (অনিলা দেবীর স্বামী) মণি অর্ডারে ২ টাকা আশীর্বাদী পাঠিয়ে মণি অর্ডারের কুপনে যা লিখেছিলেন, সেই লেখাসহ ঐ কুপনটাও সুধাংশুবাবুর কাছে আছে। এ দুটি ছাড়া সুধাংশুবাবুর বাবাকে লেখা প্রকাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠি এবং অনিলা দেবীর চারখানি চিঠি সুধাংশুবাবুর কাছে আছে। তিনি যত্ন করে সেগুলি রেখে দিয়েছেন। আমি ঐগুলি সবই তাঁর কাছ থেকে নকল করে এনেছি।

আমি এগুলো নিয়ে নকল করার আগে পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে পর পর সাজিয়ে অন্য কাগজে আটা দিয়ে এঁটে নিয়েছি। খামগুলোও ছিন্ন, এগুলোও আলাদা কাগজে আটা দিয়ে এঁটেছি। খামগুলোর প্রত্যেকটাতেই অনিলা দেবীদের গ্রাম গোবিন্দপুরের পোষ্ট অফিস পানিত্রাসের ছাপ আছে। ঐ ছাপ দেখে জানা যাচ্ছে, চিঠি ৫ খানি লেখা হয়েছিল যথাক্রমে—

১৫/১০/১৯০৯, ১৯/১২/১৯০৯, ২৯/৩/১৯১০, ২০/৭/১৯১০ ও ৫/১/১৯১১

এই সব চিঠি প্রভৃতি থেকে দেখা যাচ্ছে, রামকিংকরবাবু ও সুশীলা দেবীর সঙ্গে শরৎচন্দ্র ও তাঁর ভাইদের এবং দিদিদেরও রীতিমতই বেশ গভীর স্নেহের ও ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার কথা এই যে, সুধাংশুবাবুর শোনা বলে বর্ণিত প্রকাশচন্দ্রের ঐ তাগা নেওয়ার ব্যাপার থেকেই এত নিবিড় সম্পর্ক একেবারে চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায়।

প্রকাশবাবুর কন্যা মুকুল দেবীকে (বয়স প্রায় ৫০) এই তাগার ব্যাপার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি তাঁর ছোট পিসিমাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণটা ঠিক বলতে না পারলেও তাগার কথাটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।

প্রকাশ তাগা নিতে পারে না—অনিলা দেবী, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি হয়তো একথা বলে ছিলেন। কিন্তু রামকিংকরবাবু নিজের বুদ্ধিতেই হোক্ বা পাঁচজনের কথাতেই হোক্ সন্দেহমুক্ত হতে পারেন নি। তবুও যে-ই নিক্, বোনের গহনা খোয়া যাওয়ায় শরৎচন্দ্র আবার সেই গহনা বোনকে কিনে দিয়েছিলেন।

মনে হয়, রামকিংকরবাবু, অনিলা দেবী ও শরৎচন্দ্রের কথা বিশ্বাস করতে না পারায় এঁরা তখন রামকিংকরবাবুর উপর কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছিলেন। অপর পক্ষে রামকিংকরবাবু স্ত্রী সুশীলা দেবীকে আর শরৎচন্দ্রের বাড়িতে পাঠান নি। না পাঠানোর আরও কারণ, প্রকাশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের বাড়িতে দাদার কাছেই থাকতেন।

এমনি একটা ভুল বোঝাবুঝির কারণেই হোক্, বা কারও একটা দোষের জন্যই হোক্, এত নিকট আত্মীয়তা ও এত হৃদ্যতা সমস্তই চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হয়ে গেল। এটা সত্যিই এক বেদনার ব্যাপার। আর এই বেদনাটা সব চেয়ে বেশী সুশীলা দেবী ও তাঁর পুত্র কন্যাদের কাছেই। সুশীলা দেবীর মৃত্যু হয় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর ছ বছর পরে। তিনি বেঁচে থেকেও অত বড় দেশ বিখ্যাত দাদার কাছে যেতে পেলেন না বা দাদাকে নিয়ে গর্বও করতে পেলেন না। ঠিক এমনি অবস্থা হ'ল তাঁর পুত্র কন্যাদেরও। এঁরা মামাকে নিয়ে গর্ব করা তো দূরের কথা, মামাকে চোখেও দেখলেনই না। অথচ শরৎচন্দ্র যখন মারা যান, তখন এঁদের বয়স যথাক্রমে—২৮, ২২ ও ২০।

শরৎ-জন্ম শতবার্ষিকীতে সমগ্র দেশজুড়ে, এমন কি বিশ্ব জুড়েও যখন মহাউৎসব চলেছে, তখন শরৎচন্দ্রের এই আপন ভাগ্নে-ভাগ্নীরা ঐ উৎসব ও কোলাহল থেকে বঞ্চিত হয়ে দূরে পড়ে ছিলেন। শুধু এখনই নয়, এতকাল এঁদের কোন খোঁজ পর্যন্তও ছিল না। আমিই তো বহু বছর ধরে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কত তথ্যই না সংগ্রহ করলাম, অথচ শরৎচন্দ্রের বাড়ির লোকদের কাছে বা নিকট আত্মীয়দের কাছে সুশীলা দেবীর ঠিকানাটাও জানতে পারি নি।

এখন খোঁজ পেয়ে—সুশীলা দেবীর একমাত্র পুত্র ৬২ বৎসর বয়স্ক

সুধাংশবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, তিনি নিজের বাড়িতে মামা শরৎচন্দ্রের একটা বড় ফটো বাঁধিয়ে ঘরে রেখেছেন এবং শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত খাট ও ভাঙ্গা গড়গড়াটা ও তাঁর বাবাকে লেখা কয়েকটা চিঠি ইত্যাদি সযত্নে রক্ষা করছেন। এজন্য সুধাংশুবাবুর চোখে মুখে কোন আনন্দ বা গর্বের উচ্ছ্বাস নেই, বরং একটা গভীর বেদনারই ভাব লক্ষ্য করলাম। দেখে বেশ কষ্ট হ'ল।

এ অবস্থা শুধু সুধাংশুবাবুর ক্ষেত্রেই নয়, তাঁর বোনের বাড়িতেও তাই। এ সম্পর্কে আমাকে লেখা সুশীলা দেবীর এক দৌহিত্রের একটা চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি—

গ্রাম ও ডাকঘর—রতিবাটী
জেলা—বর্ধমান

শ্রদ্ধেয় গোপালবাবু,

পত্রে আমার নমস্কার জানিবেন। কয়েকদিন আগে আপনি আসানসোল গ্রামে শ্রীসুধাংশু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। আমার পরিচয় আমি সুধাংশুবাবুর ছোট ভগ্নী শ্রীমতি বীণাপাণি দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র।

আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, আমার মামাবাবু, মা ও মাসীমা অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতি সুশীলা দেবীর (বন্দ্যোপাধ্যায়ের) পুত্র ও কন্যাদ্বয়।

আমরা এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। তাই সুযোগের অভাবে আমরা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলাম। আপনি আমাদের বহুদিনের আশা পূরণ করিতে চলিয়াছেন। সেজন্য আপনাকে আমরা আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও অশেষ ধন্যবাদ জানাই। ইতি—১৬.১১.১৯৬৬

শ্রীসুজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

সুশীলা দেবীদের কথা আমি শুধু নিজে জানাই নয়, সুজিৎবাবুর বক্তব্য অনুযায়ী অপরকে জানাবার জন্যও এই সময়েই আমি 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় সুশীলা দেবীর কথা নিয়ে একটা দীর্ঘ প্রবন্ধও লিখে ছিলাম। পরে আবার আমার 'নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র' বইয়ে 'সুশীলা দেবী' নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধও লিখি।

অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া তথ্য—

১. কলকাতার বিখ্যাত অর্থপেডিক সার্জন ডাঃ সমীর কুমার গুপ্ত এম. সি-এইচ. অরথ (লিভারপুল) এফ. আর. সি. এস (ইংলন্ড)-এর সঙ্গে তাঁর চেম্বারে যে দিন আমার প্রথম পরিচয় হয়, সেদিন তিনি কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি কি করেন?

আমি বলেছিলাম—একটা চাকরি করি। আর কিছু কিছু লিখি।

—কি লেখেন?

—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—এঁদের সম্বন্ধে কয়েকটা করে বই লিখেছি।

—'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' নামে আমি একটা বই পড়ে ছিলাম। বইটা কার লেখা বলতে পারেন?

—আমারই লেখা।

সমীরবাবুর সঙ্গে যখন আমার এই কথা হচ্ছিল, তখন তিনি তাঁর টেবিলের একপাশে বসে ছিলেন। আর আমি বসেছিলাম টেবিলের অপর পাশে। 'শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প' বইটা আমার লেখা শুনেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে, টেবিলের অপর পাশে বসা আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

এরপর তিনি বললেন—'আমি ছেলেবেলায় রেঙ্গুনে আমার মামার বাড়িতে কাটিয়েছি। আমার মাতামহ আর শরৎচন্দ্র দুজনে রেঙ্গুনে একই সরকারী অফিসে চাকরি করতেন। দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব ছিল।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে আমার মাতামহের বাড়িতে এলে তখন আমার মামারাও শরৎচন্দ্রকে দেখেছেন। আমার মামারা বর্তমানে রেঙ্গুন থেকে চলে এসে বৈদ্যবাটীতে বাড়ি করে বাস করছেন। আপনাকে আমার মামাদের বৈদ্যবাটীর ঠিকানা দিচ্ছি, আপনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করলে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে পারবেন।'

এই বলে সমীরবাবু রেঙ্গুন থেকে চলে আসা তাঁর মামাদের ঠিকানা আমাকে দিলেন। আমিও পরে তাঁর মামাদের সঙ্গে দেখা করে, তাঁদের কাছ থেকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে আনি।

১. সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি তাঁর কাছে আছে শুনে, সৌরীনবাবুর কাছে কয়েক দিন যাই। কিন্তু পাই নি।

সৌরীনবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছেও ঐ চিঠির আশায় বছর তিনেক ঘুরি। সৌম্যেনবাবু তাঁর পিতাকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি প্রকাশে বরাবরই ইতস্ততঃ করতেন। শেষে একদিন তিনি তাঁর পিতার চিঠিপত্রের বাণ্ডিল দেখালেন বটে, কিন্তু তাতে সৌরীনবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের কোন চিঠি পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল—কবি গিরিজা কুমার বসুকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটা চিঠি, আর শরৎচন্দ্রকে লেখা শরৎচন্দ্রের বন্ধু প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের একটা চিঠি।

গিরিজাকুমার বসুকে লেখা চিঠিটি নকল করে এনে পরে আমার শরৎচন্দ্র ৩য় খণ্ড বা শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী গ্রন্থে দিয়েছি।

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য (শরৎচন্দ্রের কথায় ইনি ছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার মোড়ল) ১৯. ৭. ১৯১৩ তারিখে তাঁর কর্মস্থল পোর্ট হেল্‌থ অফিস ১৫/১ স্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা, থেকে রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন।

১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পরের মাসে অর্থাৎ ১৩২০র শ্রাবণ মাসে প্রবাসী মাসিক পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কানাকড়ি' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রথম সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত ছবি সমূহের (মায় মলাটের ছবিসহ) তীব্র সমালোচনা করে ছিলেন।

'কানাকড়ি' প্রবন্ধের সঙ্গে লেখক হিসাবে নাম ছিল 'শ্রীনগদ ক্রেতা'। শ্রাবণ মাসে লেখার সূচীপত্রে এই লেখার লেখক হিসাবে কি নাম ছিল জানি না। (মনে হয়, শ্রীনগদ ক্রেতাই ছিল) তবে আশ্বিন মাসে ষাণ্মাসিক সূচীর সময় এই লেখার লেখক হিসাবে অবনীবাবুরই নাম ছাপা হয়।

'নগদ ক্রেতা' যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা প্রমথবাবুরা ঐ শ্রাবণ মাসেই সঠিক জানতে পেরেছিলেন।

রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র ছবি আঁকতেন। তাই বন্ধু প্রমথনাথ তাঁর এই চিঠিতে 'কানাকড়ি'র একটা প্রতিবাদ ভারতবর্ষে লিখবার জন্য শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন। প্রমথনাথের এই চিঠিতে 'কানাকড়ি'র প্রসঙ্গ ছাড়া শরৎচন্দ্রের রচনা ইত্যাদিরও অনেক কথা আছে।

আমার শরৎচন্দ্র ৩য় খণ্ড বা শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী গ্রন্থে শরৎচন্দ্রকে লেখা প্রমথনাথের এই চিঠি এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'কানাকড়ি' প্রবন্ধ দুই-ই দিয়েছি।

সেদিন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠি খুঁজতে গিয়ে আশ্চর্যভাবে রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্রকে লেখা প্রমথনাথের এই চিঠিটি কলকাতায় সৌরীনবাবুর বাক্সের মধ্যে পাই। এই চিঠি না পেলে 'কানাকড়ি' ইত্যাদির প্রসঙ্গ জানাই যেত না।

৩. শরৎ জন্মশত বার্ষিকীর সময় কলকাতার শরৎ সমিতি প্রকাশিত শরৎ রচনাবলী তখন সম্পাদনা করছি। এই শরৎ রচনাবলী ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম খণ্ডে শ্রীকান্ত ৪ পর্ব এবং শরৎচন্দ্রের অন্য কিছু কিছু রচনা ছিল।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শ্রীকান্ত উপন্যাসের কয়েক পাতা পাণ্ডুলিপি আছে জেনে, একদিন তাঁর কাছে যাই। উদ্দেশ্য আমাদের শরৎ রচনাবলীর শ্রীকান্ত উপন্যাসের মধ্যে যেখানেই হোক্ শ্রীকান্তর পাণ্ডুলিপির এক পাতার প্রতিলিপি দোব।

উমাপ্রসাদবাবুর কাছে গেলে তিনি প্রতিবারের মত এবারেও সমাদর করে তাঁর শরৎ সংক্রান্ত ভাণ্ডার খুলে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, বইএর পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি দেখাতে লাগলেন।

এই সময় ঐ ভাণ্ডারে একটা নাটকের কয়েক পাতার মত পাণ্ডুলিপি দেখে উমাপ্রসাদবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—এটা একটা নাটকের কিছুটা পাণ্ডুলিপি নয়?

—হ্যাঁ, পল্লীসমাজের যে নাট্যরূপ রমা, এ তারই পাণ্ডুলিপি বলে মনে হয়।

একটা পাণ্ডুলিপির পাতায় একটু চোখ বুলিয়ে বললাম—না, রমার নয়। মনে হচ্ছে অন্য কোন বইয়ের। আচ্ছা পরে দেখবো। আপনি এখন একটা কাজ করুন—এই ক' পাতা এখনই আমাকে দিন। আমি পাশেই ফটোগ্রাফারের দোকানে গিয়ে এই গুলোর ফটো কপি নেব। (তখন কলকাতায় জেরক্স প্রথা চালু হয় নি।) পরে ভাল করে পড়ে দেখবো কোন বইএর নাট্যরূপ কিনা। তিনি আমাকে ঐ ক'পাতা দিলে আমি তখনই ঐ ক'পাতার ফটো তুলিয়ে তাঁকে পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিই।

ফটো কপিগুলো পড়ে দেখি এটা শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসের নাট্যরূপের কয়েক পাতা। তবে পাত্র-পাত্রীর নামে এবং বক্তব্যেও অনেক তফাৎ হয়েছে।

আগেই জানতাম শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাস প্রকাশিত হ'লে, তখন দেশের ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র তখন 'বামুনের মেয়ে'র বক্তব্যের বিপরীত অন্য কথা দিয়েই মনে হয় এই নাটকটি লিখতে শুরু করেছিলেন। কিছুটা লিখে আর লেখেন নি। উমাপ্রসাদবাবুর কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের এই অপ্রকাশিত 'বামুনের মেয়ে'র নাট্য-রূপটি এনে শরৎ জন্মশতবার্ষিকীর সময় 'অমৃত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ করে ছিলাম।

খুঁজতে গেলাম উমাপ্রসাদবাবুর কাছে শ্রীকান্ত-র পাণ্ডুলিপি, অপ্রত্যাশিত ভাবে পেলাম বামুনের মেয়ের নাট্যরূপের কয়েক পাতা।

উমাপ্রসদেবাবুও এটা 'রমা'র পাণ্ডুলিপি ভেবেই ভাল করে পড়ে দেখেন নি।

৪. শরৎচন্দ্রের চিঠি সংগ্রহের সময় অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরেও যেমন কোন চিঠি পাইনি, তেমনি কিছু চিঠি আবার সম্পূর্ণ অভাবিত ও অপ্রত্যাশিত-ভাবেও পেয়ে গেছি। যেমন—

ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় আমি তখন একটানা বছর দুই ধরে শরৎ-চন্দ্র সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ লিখছি এবং শরৎচন্দ্রের চিঠি ও তাঁর সম্বন্ধে তথ্য

খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই সময় ১৩৬০ সালের প্রথম দিকে হঠাৎ একদিন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় নিজেই রবীন্দ্রনাথকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি দীর্ঘ চিঠি ('ষোড়শী' সংক্রান্ত) আমাকে দেন। চিঠিটি দিয়ে তিনি বললেন—

'শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি কবির কাছে পেঁছিবার কিছুদিন পরেই কবির সেক্রেটারীর পরিচিত এক ব্যক্তি সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে তাঁকে না জানিয়েই কিভাবে চিঠিটি নিয়ে চলে যান এবং নিজের কাছে রেখে দেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ঐ ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের এই চিঠিটি কোন একটি পত্রিকায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি লুকিয়ে আনা এই চিঠিটি ছাপাতে সাহস পান নি। চিঠিটি দেখে সাংবাদিক নন্দদুলাল চৌধুরী নকল করে নেন। তিনি একদিন আমাকে ঐ চিঠিটি দেখালে আমি তা থেকে আমার এইটি নকল করে নিয়েছি।'

সাবিত্রীবাবুর কাছে চিঠিটি পেয়ে আমি তখন টীকা-টীপ্পনী সমেত ১৩৬০ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' এটি প্রকাশ করে ছিলাম। তাতেই সাধারণে সর্ব প্রথম এই চিঠিটির কথা জানতে পারেন।

৫. বিভূতিভূষণ ভট্টকে, কি তাঁর ভগ্নী নিরুপমা দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের কোন চিঠি বিভূতিবাবুর কাছে আছে কি না জানবার জন্য ১৩৫৯ সালে একদিন আমি বহরমপুরে বিভূতিবাবুর কাছে যাই। চিঠির কথায় সেদিন তিনি বলেছিলেন—শরৎদার কোন চিঠিই আজ আর আমার কাছে নেই। দু-একখানা যা ছিল কবে কিভাবে তা হারিয়ে গেছে।

বহরমপুর থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরে একদিন 'পরিক্রমা' নামে বহরমপুরের একটা ছোট্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা দৈবাক্রমে আমার হাতে আসে। তাতে দেখি—বহরমপুরের এক শরৎ-স্মৃতি সভায় বিভূতিভূষণ ভট্টকে লেখা একটি চিঠি এবং নিরুপমা দেবীকে লেখা আর একটি চিঠি পড়া হয়েছে। দেখলাম, ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুন থেকে বিভূতিবাবুকে লেখা শরৎচন্দ্রের দীর্ঘ চিঠিটি ঐ পরিক্রমায় ছাপাও হয়েছে। বিভূতিবাবুর এক ভ্রাতুষ্পুত্র অশোককুমার ভট্ট চিঠি দুটি ঐ শরৎ-স্মৃতি সভায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

এই সন্ধান পেয়ে পরে আবার বহরমপুর গিয়ে অশোকবাবুর কাছ থেকে নিরুপমা দেবীকে লেখা চিঠিটি সংগ্রহ করি।

৬. ১৩৭১ সালে একদিন আলিপুরে এণ্ডারসন হাউসে ২৪ পরগণার অ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেকটর অফ স্কুলস (২৪ পরগণার স্কুল সমূহের অতিরিক্ত পরিদর্শক)-এর ঘরে বসে আছি, এমন সময় কাঠের পার্টিশন করা পাশের অ্যাসিষ্টাণ্ট ইনস্পেকটরদের ঘর থেকে হঠাৎ কানে এল—শচীনবাবু তাঁর বাবাকে লেখা শরৎচন্দ্রের কয়েকটা চিঠি এনে আমাকে দেখান।

তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরে গিয়ে কে ঐ শচীনবাবু জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বললেন—ব্যারাকপুরের ডেপুটি অ্যাসিস্টান্ট ইন্‌সপেক্‌টর অফ্‌ স্কুলস, শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

পরে ব্যারাকপুরে গিয়ে শচীনবাবুর সঙ্গে এবং তারপরে তাঁর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বাগনানে গিয়ে তাঁর পিতা ডাঃ গোপীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গেও দেখা করি। এরপর আবার একাধিক দিন গিয়ে শচীনবাবুর কাছ থেকে চিঠিগুলি নকল করে আনি।

৭. একবার শরৎচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত কোন এক সম্ভ্রান্ত বড় লোকের বাড়িতে শরৎচন্দ্রের চিঠি আছে কিনা খোঁজ নিতে যাই। গিয়ে খোঁজ নিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছি, এমন সময় সিঁড়ির পাশে ফেলে দেওয়া স্তূপাকার ছেঁড়া কাগজ পত্র ও জঞ্জালের দিকে তাকাতেই একটা কাগজে লেখার কিছু অংশ আমার চোখে পড়ল। লেখাটা দেখেই মনে হ'ল যেন শরৎচন্দ্রের লেখা। কাগজটা তুলে দেখি শরৎচন্দ্রের একটা গোটা চিঠি। জঞ্জাল ঘেঁটে আরও একটা চিঠি পেলাম। দুটা চিঠিই দামী চিঠি।

৮. ১৩৭৫ সালে ৩১শে ভাদ্র তারিখে পানিত্রাস শরৎ-স্মৃতি পাঠাগারের শরৎ-জন্মোৎসবে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলাম। আমার সময়ের বড় অভাব এবং আজকাল আমি আর সভাসমিতিতে যাই না ইত্যাদি বলা সত্ত্বেও পানিত্রাস নিবাসী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম, এ, ক্লাসের ছাত্র বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে আমার একান্ত অনিচ্ছাতেই পানিত্রাস যেতে হয়েছিল। ইতিপূর্বে ঐ অঞ্চলে অর্থাৎ পানিত্রাস, সামতাবেড়, গোবিন্দপুর প্রভৃতি গ্রামে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য ও চিঠি সংগ্রহের আশায় আমি বহুবার গেছি এবং সংগ্রহ করেও এনেছি। যাই হোক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এবারে গিয়ে কিন্তু অলাভ হ'ল না। কারণ পাঠাগারে রক্ষিত শরৎচন্দ্র বিষয়ক কাগজ-পত্র দেখতে দেখতে শরৎচন্দ্রের না-পাঠানো অসমাপ্ত একটা দামী চিঠি হঠাৎ পেয়ে গেলাম। চিঠিটি আত্মশক্তি-সম্পাদককে লেখা!

৯. শরৎচন্দ্রের মামাদের এবং বন্ধু বান্ধবদের লেখা থেকে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের অনেক উপাদান সংগ্রহ করেছি। অন্যান্য জায়গা থেকেও অজানা তথ্য পেয়েছি। যেমন, কিভাবে শরৎচন্দ্রের রচিত একটি গান সংগ্রহ করি, সেই কথাটা বলি —

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সভার সভ্যা নিরুপমা দেবী শরৎচন্দ্রের কবিতা রচনা সম্বন্ধে লিখেছেন—'শরৎদাদা কবিতা লিখিতে পারেন শুনিয়া ছিলাম। কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ছোট্ট একটি গাথা ছাড়া আর কিছু কখনো দেখি

নাই। সেটির নাম মনে আছে। প্রথম লাইনটি 'ফুলবনে লেগেছে আগুন'। সুপ্রভা আর ইন্দিরা নামে দুইটি নায়িকার (নায়কের নাম মনে নাই) মনোভাব বিশ্লেষণ। পরে যথারীতি একজনের মৃত্যু এবং সেই পরাজয়েই তাহার জয়ের পতাকা উড্ডীন—ইহাই গাথার বিষয় হইলেও বর্ণনায় অনেকখানি ক্ষমতারই প্রকাশ ছিল।' আমাদের শরৎদাদা—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৪।

এই কবিতাটি সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও লিখেছেন—তিনি তখন বাংলাতেও পদ্য লিখিতেন, অবশ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে, ফুলবনে লেগেছে আগুন ইত্যাদি।

সুরেনবাবু লিখেছেন, তিনি তখন বাংলাতেও পদ্য লিখতেন। এখানে বাংলাতেও বলার হেতু এই যে, শরৎচন্দ্র ঐ সময় ইংরাজিতেও কবিতা লিখতেন। সুরেনবাবু তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের একটি ইংরাজি কবিতার উল্লেখ করেছেন।

শরৎচন্দ্রের বালককালের রচিত আর কোন কবিতা পাওয়া যায় না। তবে তাঁর পরিণত বয়সের রচনা একটি গান পাওয়া গেছে। গানটি একটি বাউল গান। গানটির রচনার তারিখ ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪৪। শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি সংগ্রহ করে ১৩৫১ সালে শারদীয়া বার্ষিকী 'সম্প্রতি'তে প্রথম প্রকাশ করে ছিলেন। ঐ পত্রিকা থেকেই গানটি সংগ্রহ করি। শরৎচন্দ্রের রচিত সেই গানটি হ'ল—

তোর যাবার সময় ছিল যখন
ওরে অবোধ মন,
মরণ-খেলার নেশার ঘোরে
রইলি অচেতন।
তখন ছিল মণি, ছিল মানিক
পথের ধারে ধারে,
এখন ডুবলো তারা দিনের শেষে
বিষম অন্ধকারে।
আজ মিথ্যেরে তোর খোঁজা খুঁজি
মিথ্যে চোখের জল
তারে কোথায় পাবি বল?
তোর অতল তলে তলিয়ে গেল
শেষ সাধনার ধন।

শরৎচন্দ্র এই গানে সুর দিয়ে মাঝে মাঝে গাইতেন। শরৎচন্দ্রের স্বহস্ত লিখিত এই গানের পাণ্ডুলিপিটি আমি অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছেও দেখেছি।

শরৎচন্দ্রের এই গান ইত্যাদি নিয়ে 'শরৎচন্দ্রের কবিতা' নাম দিয়ে আনন্দ-বাজার পত্রিকায় পরে একটা প্রবন্ধও লিখে ছিলাম।

১০. ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে কলকাতার টাউন হলে তখনকার ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে এক বিশাল সভা হয়েছিল। সেই সভায় সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর সভার উদ্বোধক ছিলেন শরৎচন্দ্র।

এই সভায় উপস্থিত থেকে আমি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে এবং শরৎচন্দ্রকে দেখি এবং তাঁদের বক্তৃতা শুনি।—এ কথা আগে বলেছি।

আমি যখন বিভিন্ন সভা-সমিতিতে শরৎচন্দ্রের উপস্থিতির ছবি সংগ্রহ করছিলাম, সেই সময় ঐ ১৫ই তারিখের সভার মঞ্চোপরি রবীন্দ্রনাথ সহ শরৎচন্দ্রের ছবিটি পাওয়ার আশায় ১৬ই তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রগুলি দেখি। কিন্তু কোথাও সভামঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ছবিটি পেলাম না। অমৃত বাজার ও আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখলাম—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বক্তৃতার সঙ্গে তাঁদের অন্য সময়ের পুরনো ফটো ছাপা হয়েছে।

যেদিন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে অমৃতবাজার পত্রিকায় এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ সভার সভামঞ্চের ছবিটি আছে কিনা খুঁজছিলাম, সেদিন ঐ ছবি না পেয়ে, জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মাসের কাগজে বাঁধানো ফাইলটার পরের দিকের কাগজগুলো একরূপ আনমনেই অমনি উল্টে উল্টে দেখছিলাম। এই সময় হঠাৎ চোখে পড়ল—একদিনের কাগজে একটা বেশ বড় গ্রুপ ফটো, তাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাঝখানে বসে আছেন শরৎচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি. লিট্ উপাধি নিতে গিয়েছিলেন।

পরে অমৃত বাজার পত্রিকা অফিসে গিয়ে তারাপদ দাস নামে একজন দক্ষ ফটোগ্রাফারের দ্বারা কাগজ থেকে ঐ ছবিটা তুলিয়ে আনি। এজন্য অবশ্য আমাকে কয়েকদিন ঘোরাঘুরিও করতে হয়েছে। যাই হোক্, আমার সম্পূর্ণ অজানা একটা ছবি তো পেয়ে গেলাম।

১১. আর একবার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই আমার অজানা শরৎচন্দ্রের আর একটি মূল্যবান গ্রুপ ফটো পেয়ে যাই। কিভাবে পাই, সে কাহিনীটা বলছি—

পূর্বোক্ত প্রসিদ্ধ অর্থপেডিক সার্জন বা অস্থিবিশেষজ্ঞ ও শল্য-চিকিৎসক ডাঃ সমীরকুমার গুপ্তর কথামত বৈদ্যবাটীতে তাঁর মামার বাড়িতে একদিন শরৎ-সংবাদ সংগ্রহে যাই। গেলে সেখানে সমীরবাবুর মামাদের প্রতিবেশী বীরেন্দ্রনাথ গুপ্তর সঙ্গে পরিচয় হয়।

আমি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে গেছি শুনে বীরেনবাবু বললেন—শরৎচন্দ্র একবার আমাদের বৈদ্যবাটী পাবলিক লাইব্রেরিতে এসেছিলেন। সেবার জলধর সেন, প্রমথ চৌধুরী, গিরিজা কুমার বসু, তমাললতা বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি অনেকেই এসেছিলেন। সভা শেষে সকলকে নিয়ে একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল।

আমাদের বৈদ্যবাটী ইয়ং মেন্স অ্যাসোসিয়েশনের ঐ পাবলিক লাইব্রেরির 'সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণী' বইয়ে সেই ফটোটা ছেপেছিলাম। আমি তখন ঐ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলাম। সেই বই আপনাকে একটা এনে দিচ্ছি।

এই ব'লে তিনি তাঁর বাড়ি থেকে ঐ বই একটা এনে আমাকে দিলেন।

কয়েকটি বিষয়ে কিছু বক্তব্য--

শরৎ-বক্তৃতা মালা—

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল—এঁদের অনেক স্মরণ-সভায় আমন্ত্রিত হয়ে গেছি, বক্তৃতা দিয়ে এসেছি। এমন কি চুঁচুড়ায় সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্মৃতি সভায় এবং চট্টগ্রাম থেকে আগত পশ্চিম বঙ্গের উদ্বাস্তুদের দ্বারা গড়ে ওঠা কবি নবীনচন্দ্র সেন কলোনীতে গিয়েও নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছি।

অনেক ক্ষেত্রে দূরের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারি নি।

ইংলণ্ডের বাঙালীরা সেখানে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নামে তিনটি পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান করেছেন। একবার ওখানকার বঙ্কিম সোসাইটির প্রধান লণ্ডনের বাসিন্দা ডাঃ অশোক রক্ষিত কলকাতায় এসে তাঁদের বঙ্কিম সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে যাবার জন্য আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। এজন্য তিনি আমার কলকাতার বাড়িতে এসেছেন, নৈহাটীতে আমার বঙ্কিম সংগ্রহশালায়ও এসেছেন (অবশ্য বঙ্কিমতীর্থে আসা এবং সংগ্রহশালা দেখাও তাঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল)। কিন্তু যেতে পারি নি।

ডাঃ রক্ষিত নৈহাটীতে বঙ্কিম সংগ্রহশালায় এলে তাঁকে বলি—এখানকার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সুবক্তা। চলুন, তাঁকে বলে দেখি তিনি যদি যেতে রাজী হন।

ডাঃ রক্ষিতকে নিয়ে সরোজবাবুর বাড়িতে গেলাম। সরোজবাবু শুনে, বাইরে কোথাও যাই না বলে, সবিনয়ে যেতে সম্মত হলেন না।

সাধারণ সাহিত্য সভায়, গান্ধী-স্মৃতি সভায় এবং নেতাজী জন্মোৎসব সভায়ও বক্তৃতা দিয়েছি। কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ করার শুরু থেকেই এবং পরে বিশেষ করে শরৎ জন্মশত-বার্ষিকীর সময় যে ভাবে আমাকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হয়েছে, তা আমার কল্পনারও অতীত ছিল। এখানে সেই সব শরৎ-বক্তৃতা মালার কিছু কথা বলছি—

১৩৫৯ বঙ্গাব্দ বা ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে শুরু করি। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দু সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধ 'রাজনীতিক শরৎচন্দ্র' প্রকাশিত হয়। তারপর ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে 'প্রবন্ধকার শরৎচন্দ্র', আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় 'দরদী মানুষ শরৎচন্দ্র', অগ্রহায়ণের ভারতবর্ষে 'মজলিসী মানুষ শরৎচন্দ্র' লিখি। এইভাবে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রায় একটানা তিন বছর ধরে আমি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লিখেছি। ঐ সময় আনন্দবাজার এবং যুগান্তর পত্রিকার রবিবারের সাহিত্য বিভাগেও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচুর প্রবন্ধ লিখে ছিলাম।

এরপর আমার শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প প্রভৃতি গ্রন্থগুলি একে একে প্রকাশিত হতে থাকে।

১৩৫৯ সাল থেকেই আমি লোকের আগ্রহে ও অনুরোধে শরৎচন্দ্রের জন্মদিন ৩১শে ভাদ্র তারিখে নানা স্থানে তাঁর স্মরণ সভায় বক্তৃতা দিয়ে আসছি। ঐ ১৩৫৯ সালে আমি প্রথম শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসবে বক্তৃতা দিতে যাই তাঁর জন্মস্থান হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। সেই সভায় আমি ছিলাম সভাপতি, প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সভার উদ্বোধন করে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়।

১৩৬১ সালে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব সভায় আবার যাই বক্তৃতা দিতে। সেবার গিয়ে ছিলাম প্রধান অতিথি হয়ে। সভাপতি ছিলেন ঔপন্যাসিক রামপদ মুখোপাধ্যায়। এ বারের সভায় সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সভাপতি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি যেতে না পারায় তাঁর লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন।

দেবানন্দপুরে এবার শরৎ-সভা হয়েছিল ৩১শে ভাদ্র শুক্রবারের পরিবর্তে ২রা আশ্বিন রবিবারে। এই সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ৪ঠা আশ্বিনের যুগান্তর পত্রিকায়।

দেবানন্দপুরে পরে আরও বহুবার বক্তৃতা দিতে গেছি। এখানে সপ্তাহব্যাপী শরৎ জন্মশতবার্ষিকীর সময় দুদিন বক্তৃতা দিয়েছি।

১৩৬১ সালে ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল কলকাতায় বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরির প্রশস্ত হলে। বাগবাজারের সেদিনের সভা সম্বন্ধে তখনকার দৈনিক বসুমতীতে লেখা হয়েছিল—

'বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরির উদ্যোগে গত ৩১শে ভাদ্র সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডক্টর সুকুমার সেন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক রথীন রায় ও শ্রী গোপালচন্দ্র রায়।'

তখন বছরের পর বছর নানা জায়গায় আমি শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছি। ঐ সময় কখনও এমনও হয়েছে ৩১শে ভাদ্র একই দিনে দু জায়গায়ও বক্তৃতা দিতে হয়েছে। যেমন—একবার কলকাতায় গার্ডেন রীচে রেলওয়ে ইনিস্টিটিউটে গিয়ে বক্তৃতা শেষ করতেই তো রাত হয়ে গেল। সেদিন হাওড়ার শিবপুরেও একটা ঘরোয়া সভায় আমার বক্তৃতা দেওয়ার কথা। গার্ডেন রীচ থেকে লঞ্চে গঙ্গা পার হয়ে শিবপুরে ঐ সভায় এসে দেখি আমার জন্যই সকলে অপেক্ষা করে বসে আছেন। শিবপুরের সভা সেরে সেদিন কলকাতায় বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল।

এইভাবেই বিভিন্ন শরৎ-সভায় বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে প্রায় ২২/২৩ বছর কাটে। তারপর ১৯৭৬ সালে এসে গেল শরৎ জন্মশতবর্ষ। এই শরৎ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র ছাড়াও, ভারতের পূর্ব প্রান্তে আসাম থেকে শুরু করে পশ্চিমে বোম্বাই শহর পর্যন্ত বহু জায়গায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

এই সময়ও অনেক দিন এমনও হয়েছে যে, একই দিনে একাধিক জায়গায় বক্তৃতা দিতে হয়েছে। যেমন—২১. ৩. ১৯৬৬ তারিখে বিকাল ৪টায় বক্তৃতা দিতে যাই হুগলি শহরে ব্যাণ্ডেল চার্চের সেণ্ট জনস্ স্কুলে এবং ঐ দিনই সন্ধ্যায় যাই বৈদ্যবাটী পাবলিক লাইব্রেরিতে। এর আগের দিন ২০. ৩.১৯৬৬ তারিখে বিকালে গিয়েছিলাম হাওড়ায় বাজে শিবপুরে বি. কে. পাল স্কুলে, সেখান থেকে ঐদিনই সন্ধ্যায় যাই কলকাতার নিমতলায় ইউনাইটেড্ পাবলিক লাইব্রেরিতে। মনে আছে সেদিনের বি. কে. পাল স্কুলের সভায় বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল, আর নিমতলার লাইব্রেরির সভায় ছিলেন বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা লেখিকা ডঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী।

এইভাবে যেদিন বিকালে কলকাতায় মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজে বক্তৃতা দিই, সেইদিনই রাত্রে সূর্য সেন স্ট্রীটে (আগেকার মির্জাপুর স্ট্রীটে) অবস্থিত উমেশচন্দ্র কলেজেও বক্তৃতা দিতে হয়েছিল।

ঐ সময় কলকাতার টাটা সেণ্টারের ধনীদের আমন্ত্রণে তাঁদের আকাশচুম্বী অফিস ভবনের ১৮ তলায় বিলাস-বহুল সুসজ্জিত স্থায়ী মঞ্চে গিয়ে যেমন বক্তৃতা দিয়ে এসেছি, তেমনি কলকাতা থেকে বহুদূরে মেদিনীপুরের বালিচক রেল স্টেশনে নেমে ১৬ মাইল দূরে মাটির স্কুল মদনমোহন চক চৌধুরী বিদ্যাপীঠের খোলা মাঠে গিয়েও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছি। এই স্কুলের ১৯৬৬ এর ম্যাগাজিনে স্কুলটি সম্বন্ধে লেখা আছে দেখলাম—'আমাদের এই চৌধুরী বিদ্যাপীঠ শহর ও পাকা রাস্তা থেকে অনেক দূরে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের বহু অধিবাসী তপশীলী, আদিবাসী ও উপজাতি শ্রেণীর।'

ঐ টাটা সেণ্টার এবং চৌধুরী বিদ্যাপীঠের মত সর্বত্রই দেখেছি—ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত, এমন কি বহু অশিক্ষিতও সকলেরই শরৎচন্দ্রের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা! লক্ষ্য করেছি, উদ্যোক্তারা যেমন হুজুগে মেতে বা লোক দেখানো নয়, অন্তরের সহিতই সভার আয়োজন করেছেন, তেমনি সভার অগণিত শ্রোতাও শ্রদ্ধাবনত চিত্তেই শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের কথা শুনেছেন। সভার পরেও আরও শুনতে চেয়েছেন। এ সম্বন্ধে এখানে মাত্র একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

১২।৩।৭৬ তারিখে মেদিনীপুর শহরে ওখানকার সাহিত্য পরিষদের শরৎ শতবার্ষিকী সভায় বিদ্যাসাগর হলে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। সভার শেষে স্থানীয় মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা তাঁর কলেজের কয়েকজন অধ্যাপিকা ও ছাত্রীসহ আমার কাছে এসে বললেন—অনুগ্রহ করে আমাদের কলেজে কাল যদি একটা বক্তৃতা দেন তো ছাত্রীরা এবং আমরাও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আরও কিছু শুনি।

বললাম—কাল সকালে উঠেই অনেকটা দূরে কুঁয়াপুর গ্রামে একবার যাব। দুপুরে যদি ফিরতে পারি তাহলে আপনাদের কলেজে যাব।

সকালেই বাসে করে কুঁয়াপুর যাত্রা করলাম। সেখানে গেলে সেখানকার লোকেরা আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে বললেন—দাদা, আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না। আজ এখানে থেকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু শোনাতে হবে। শরৎচন্দ্র তাঁর 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসে আমাদের গ্রামের কথা লিখে গেছেন।

কুঁয়াপুরে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহকালে স্থানীয় একজন বললেন—এখান থেকে তিন মাইল দূরে চন্দ্রকোণা শহরে আপনাকে নিয়ে যাই চলুন। সেখানে কেউ কেউ হয়ত আপনাকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন। এই বলে দুজন আমাকে চন্দ্রকোণার প্রখ্যাত সমাজসেবী সত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। সত্যগোপালবাবু শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তেমন কিছু বলতে পারলেন না। শেষে তিনি বললেন—এই কাছেই আমি একটা গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করেছি, সেটা একবার দয়া করে আপনাকে দেখতে যেতেই হবে। এই বলে স্কুলে নিয়ে গেলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার কাছে আমার পরিচয় দিয়ে তাঁকে বললেন—এখনি ক্লাসে ক্লাসে নোটীশ পাঠিয়ে দিয়ে সমস্ত ক্লাস বন্ধ করে দিন এবং ক্লাসের শিক্ষিকা ও মেয়েদের স্কুলের হলে আসতে বলে দিন। ওখানে এখনই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে সভা হবে। দাদা যখন দয়া করে এসেছেন, তখন আর এ সুযোগ ছাড়ছি না। এঁর মুখে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু শুনব।

সত্যগোপালবাবু কেন যে অত করে বলে স্কুল দেখাতে আনলেন, তার হেতুটা এতক্ষণে বুঝলাম।

দেখলাম, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই স্কুলের হল ঘরে ছাত্রী ও শিক্ষিকারা মিলে বেশ একটা বড় সভারই আয়োজন করে ফেললেন। স্কুলের বাগান থেকে রাশি রাশি ফুল এল। ধূপ জ্বালা হ'ল। স্কুলের হারমোনিয়াম এল। গানের শিক্ষিকা উদ্বোধন সংগীত গাইলেন। এরপর সত্যগোপালবাবু সকলের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে একটু বক্তৃতা দেওয়ার পর আমাকে বক্তৃতা দিতে হ'ল। ঘণ্টা খানেক বললাম। সকলেই মুগ্ধ হয়ে চুপ করে শুনলেন।

সত্যগোপালবাবু ও স্কুলের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার দুজন সঙ্গীসহ আবার কুঁয়াপুরে ফিরে এলাম। এসে এখানে একজনের বাড়িতে স্নানাহার করলাম। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। অতএব মেদিনীপুরে মহিলা কলেজে আর যাওয়া হ'ল না।

মধ্যাহ্ন আহারের পরও যতক্ষণ কুঁয়াপুরে ছিলাম, ততক্ষণ কুঁয়াপুরের লোকদের অনুরোধে তাঁদের শরৎ-কথা শোনাতে হয়েছে।

এই সময় কুঁয়াপুরের একজন বললেন—মুসলমান গ্রাম পীরপুর, যেখানে রমেশ মুসলমান প্রজাদের মধ্যে স্কুল করে দিয়েছিলেন, সেই গ্রামটা একবার দেখতে যাবেন না? মাঠের ওপারে হাঁটাপথে মাইল চার দূরে সেই গ্রাম।

বললাম—মহিলা কলেজে সভা যখন আর হলো না, তখন পীরপুর কোথায় তবে দেখেই আসি। একজন সঙ্গী দিন হেঁটেই যাব।

একজন সঙ্গী দিলে তখনই পীরপুরের উদ্দেশে রওনা হলাম। মাঠের উপর দিয়ে মাইল দুই গেলে পথে পড়ে টুকুরিয়া পীটু হাই স্কুল। স্কুলে গিয়ে, এখানে পীরপুর কোথায়, হেড মাষ্টার মশায়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—পীরপুর আছে বলে কই শুনি নি তো! তবে কিছুটা দূরে মাঠের ওপারে একটা মুসলমান গ্রাম আছে সত্য।

এই সময় আকাশের পশ্চিম কোণে ঘন কালো মেঘ জমে ওঠায় হেড মাষ্টার মশায় বললেন—এখনি কাল বৈশাখীর ঝড় উঠবে, আর যাবেন না।

এরপর আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে বললেন—অনুগ্রহ করে আমাদের স্কুলে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলুন না, ছাত্ররা সহ আমরাও শুনি!

বললাম—ভাই, আজ আর থাক্। অন্য কোন সময় যদি আবার কুঁয়াপুরে আসি, তখন আপনাদের স্কুলে এসে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে যাব।

হেড মাষ্টার মশায় অবশেষে তাতেই রাজী হলেন।

মেঘ আকাশময় ছড়িয়ে পড়েছে দেখে, কাল বৈশাখীর ঝড় উঠতে পারে ভেবে, আর পীরপুরের সন্ধানে গেলাম না। একটু বসে কুঁয়াপুরেই ফিরে এলাম। এই সময় ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ঘণ্টা খানেক ঝড় বৃষ্টি চলল। ঐ সময়টা কুঁয়াপুরের বাস রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে বসে কাটাই। সেখানে গ্রামের হাই স্কুলের হেড মাষ্টার শশাংকশেখর দিগার এবং পূর্ব

পরিচিতদের মধ্যে নলিনাক্ষ ভূঁইয়া ও আরও কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা বললেন—ততক্ষণ শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলুন শুনি।

চুপচাপ বসে না থেকে, তাঁদের অনুরোধে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বললাম। মেদিনীপুরে কাজ থাকায় সন্ধ্যার পর বাসে কুঁয়াপুর থেকে মেদিনীপুর শহরে ফিরে এলাম।

১৯৬৬ এর জুন মাসের প্রথম দিকে বর্ধমান জেলায় ইস্পাত নগরী বার্ণপুরে (নিউ টাউনে) ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর বা সংক্ষেপে ইস্‌কোর কর্মীরা শরৎ জন্মশতবার্ষিকী পালন করেন। টাটা সেণ্টারের মত এখানেও ধনীদেরই ব্যাপার। ঐ সভায় আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। গিয়ে উঠেছিলাম, আমার সঙ্গে যোগাযোগকারী সভার অন্যতম উদ্যোক্তা শিবকুমার ঘোষের বাড়িতে। ইনি ইস্‌কোর একজন ছোটখাট অফিসার। এঁর বাড়িতে বসেই শুনলাম, ইস্‌কোর দুজন প্রথম শ্রেণীর উচ্চপদস্থ অফিসার প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপকুমার দত্ত তাঁদের বাড়িতে আমাকে অতিথি করার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ, প্রণববাবু নিজে একজন ভাল সাহিত্য-রসিক (প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক 'বনফুল' তাঁর আত্মীয়), আর দিলীপবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী মীরা দত্ত নিজে লেখিকা।

শুনলাম, এঁরা যে আমাকে অতিথি হিসাবে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তার হেতু—সভায় আমার দু এক ঘণ্টা বক্তৃতা শোনা ছাড়াও বাকি সময়টা এঁদের বাড়িতে থাকাকালে এঁরা আমার কাছ থেকে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনতে পেতেন।

শরৎচন্দ্র আজও যে সকলের কাছে কত প্রিয় লেখক, তা তাঁর এই জন্ম শত-বার্ষিকীতে যেন আরও ভাল করে জানা গেল।

এবার পশ্চিম বঙ্গের বাইরে যে সব জায়গায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম, এখন সেসব স্থানের কয়েকটার কথা এখানে বলছি—

১৯৬৬ সালের ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারি আসামের কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি শহরে 'হাইলাকান্দি মহকুমা শরৎ জন্মশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি'র অনুরোধে সেখানে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম।

হাইলাকান্দি যেতে হ'লে বিমানে কাছাড় জেলার শিলচর শহরে গিয়ে নামতে হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারি শিলচরে গিয়ে পেঁছিলে সেখানে শিলচরের দুই অধ্যাপক ভক্তিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও শক্তিপদ ব্রহ্মচারী এবং এক অধ্যাপিকা ডঃ সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ আগ্রহে ঐ ৬ তারিখেই আমাকে শিলচরে এক ঘরোয়া সভায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হয় এবং ভক্তিবাবুর বাড়িতে থাকতে হয়।

শিলচর থেকে হাইলাকান্দি প্রায় ৩২ মাইল। ৭ই সকালে ভক্তিবাবুর বাড়িতে আহারাদির পর মোটরে হাইলাকান্দি রওনা হলাম। ঘণ্টা দুয়ের মধ্যেই আমরা হাইলাকান্দি পেঁাছে গেলাম।

আমার থাকার স্থান হয়েছিল, স্থানীয় সারকিট্ হাউসে। শুনলাম, ওখানকার শরৎসভার অন্যতম উদ্যোক্তা স্থানীয় এস. ডি, ও নিজেই এই ব্যবস্থা করেছেন।

হাইলাকান্দিতে সভা ছিল তিন দিন ব্যাপী। তার মধ্যে দুদিন ছিল প্রধানতঃ আমারই বক্তৃতা। তৃতীয় দিনে কোন সভা ছিল না। রাত্রে শুধু একটি নাটকের অভিনয় ছিল। অবশ্য প্রথম দুদিনও যথাক্রমে শরৎচন্দ্রের ষোড়শী এবং মহেশ গল্পের নাট্যাভিনয় হয়।

দ্বিতীয় দিনে আসামের সাহিত্যিকদের নিয়ে আলোচনা-চক্র (শরৎ-সাহিত্য নিয়েই) বসে প্রথমে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। আবার আহারেব পর আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত। ঐ দুটা সভাতেও সভাপতিত্ব করতে হয় আমাকে। আর সন্ধ্যার সভায় মূল বক্তা তো ছিলামই।

এই হাইলাকান্দি মহকুমা শরৎ জন্মশতবার্ষিকী সভা সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলছি যে—হাইলাকান্দি তথা সমগ্র কাছাড় জেলার শরৎ-সাহিত্য অনুরাগী কয়েক সহস্র শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান নরনারীর ঐ বিরাট জনসভায় দুদিনে (শরৎ-সাহিত্য আলোচনা সভা সহ) প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছি। লক্ষ্য করেছি, ঐ বিশাল জনতা নীরবে মন্ত্রমুগ্ধের মতই আমার মুখে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের কথা শুনেছেন। তাঁরা যে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কথা শুনে খুশী হয়েছিলেন, তা শুধু সভায় তাঁদের নীরবতা ও আগ্রহ দেখেই নয়, সভা শেষে শরৎ-জন্ম শতবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক বিজিৎ ভট্টাচার্যের সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ দেওয়ার সময় আমার প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ উক্তিগুলি থেকেও। পরে আরও জেনেছি, আমার কাছে ওঁদের প্রেরিত স্থানীয় পত্রিকাগুলি পড়েও।

আমার 'নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে 'আসামে সংগৃহীত তথ্য' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বলেছি।

ত্রিপুরা রাজ্যের তেলিয়ামুড়া শহরে শরৎজন্মশত বার্ষিকী সভায় এবং তেলিয়ামুড়া থেকে ফেরার পথে আগরতলার বীর বিক্রম কলেজে যে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল, সেকথা আগে অন্যত্র বলেছি।

১৯৬৬ সালের ২৭-২৯ ডিসেম্বর নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪৮ তম বার্ষিক অধিবেশন হয় বিহারের ভাগলপুর শহরে। এই অধিবেশন হয়েছিল শরৎজন্মশত বর্ষের আরম্ভ হিসাবে। এই উৎসব অনুষ্ঠানে প্রথম

দিনের সভায় 'শরৎচন্দ্র ও ভাগলপুর' শাখায় সভাপতি হিসাবে সেখানে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম।

১৯৬৬ এর ১৬ই এপ্রিল গুড্ ফ্রাইডের দিন আবার ভাগলপুরে বক্তৃতা দিতে যেতে হয়েছিল ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ জন্মশতবার্ষিকী সভায়। ঐ সভায় আমি ছিলাম প্রধান অতিথি, আর বিখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক হংসকুমার তেওয়ারি ছিলেন সভাপতি।

ভাগলপুর থেকে যাই পুরুলিয়ার জে. কে. কলেজে বক্তৃতা দিতে।

ভাগলপুর থেকে আমাকে পুরুলিয়ায় আনবার জন্য ঐ কলেজের এক অধ্যাপক আগেই ভাগলপুরে গিয়েছিলেন। পুরুলিয়ায় এসে ১৮.৪.১৯৬৬ তারিখে ঐ কলেজে বক্তৃতা দিই।

২০.৯.১৯৬৬ তারিখে বিহারের টাটা নগরে সেখানকার রবীন্দ্র-সংসদের আমন্ত্রণে তাঁদের শরৎ-জন্মশত বর্ষ সভায় বক্তৃতা দিতে যাই।

মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী শরৎ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে ১৩ই আগস্ট ১৯৬৬ তারিখের সভায় সভাপতি হয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে অন্য দুদিনের সভাতেও বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল।

এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করছি, ঐ সময় ক'দিন নাগপুরে থাকাকালে একদিন ওখান থেকে ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে আশ্রমবাসী কয়েকজন পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে আলাপ হ'লে আমি কথায় কথায় তাঁদের বলে ছিলাম—নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় এবং কলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর শান্তি অভিযানের সময় আমি কিছুদিন তাঁর অন্যতম ভ্রমণ সঙ্গী ছিলাম।

আমার এই কথা শুনে তাঁরা আমার প্রতি যেন বেশ শ্রদ্ধান্বিত হলেন এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমের সমস্ত দেখালেন।

১৯৬৬ সালের ২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৪৯ তম বার্ষিক অধিবেশন হয় মহারাষ্ট্রের বোম্বাই শহরে। শরৎ জন্মশতবর্ষ পূর্তি হিসাবে এই অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হয়ে ওখানে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। দুদিন সভায় বক্তৃতা দিতে হয়েছিল।

দিল্লী, বারাণসী, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানেও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে যাবার কথা হয়, কিন্তু যেতে পারিনি। দিল্লীর কালীবাড়ি থেকে চিঠি, টেলিগ্রাম, এমনকি লোক মারফৎও যাওয়ার জন্য অনুরোধ এসেছিল। দিল্লীর সভার ঠিক পরের দিনই আমার পুত্রের বি. এস-সি অনার্স পরীক্ষা আরম্ভের কথা, তাই যাওয়া সম্ভব হয়নি।

বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে আমি অনেক জায়গা থেকেই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্যও সংগ্রহ করে আনি।

শিলচরে গিয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করি। ত্রিপুরায় গিয়ে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাই। আসানসোলে বক্তৃতা দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের ছোট বোনের কথা জানি।

বর্ধমান শহরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সেখানে সভায় শরৎচন্দ্রের পরিচিত এক বক্তার মুখে শরৎচন্দ্রের দুটি পরিহাস-রসিকতার কাহিনী শুনি, কোন্নগরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সেখানে সন্ধান পেয়ে একজনের কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি সংগ্রহ করি, বোম্বাই শহরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সেখানে সভায় শরৎচন্দ্রের পরিচিত এক বক্তার মুখে শরৎচন্দ্রের বলা একটি বৈঠকী গল্প শুনি। নাগপুরে বক্তৃতা দিতে গিয়ে সেখানে সভার অন্যতম বক্তা ত্রিদিব চৌধুরী এম. পি.র কাছ থেকে শরৎচন্দ্রের বহরমপুর যাওয়ার বিস্তৃত কাহিনী শুনি। আর ভাগলপুরে দুবার বক্তৃতা দিতে গিয়ে তো অনেক তথ্যই সংগ্রহ করি।

আমার এই সব সংগ্রহ করা কাহিনী, চিঠি প্রভৃতি বিস্তৃত প্রসঙ্গ-কথা সহ আমার 'নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে দিয়েছি।

কলকাতা বেতারে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে দুদিন বক্তৃতা দিয়েছি। আরও দিতে বলেছিলেন, যাই নি। কলকাতা দূরদর্শনে ঠিক ভাষণ নয়, তবে শরৎচন্দ্রের রচিত গান এবং তাঁর প্রিয় অপরের গান নিয়ে একটা অনুষ্ঠান করেছি। ঐ অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম সূত্রধর বা বক্তা, আর গায়ক ও গায়িকা ছিলেন যথাক্রমে সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রসিদ্ধ গায়িকা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দূরদর্শনে কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত বন্দেমাতরম্ ইত্যাদি গান নিয়ে একটি বঙ্কিম অনুষ্ঠানও করে ছিলাম। তাতেও ঐ ছবি দেবীই ছিলেন প্রধান গায়িকা।

এখানে আর একটা উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতার মেডিকেল কলেজের পূর্ব-দিকে ৫নং প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে বাড়ি করে বাস করেছিলেন। এই অঞ্চলের মানুষ 'বঙ্কিম সংস্কৃতি পরিষদ' গঠন করে এখানে প্রতি বৎসর বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনে বঙ্কিম উৎসব করে থাকেন। এঁদের বঙ্কিম উৎসবে অনেকবার বক্তৃতা দিয়েছি। এঁরা কলকাতায় স্টুডেণ্টস হলে একবার বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মদিনে আমাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে ছিলেন। অনিচ্ছা-সত্ত্বেও নিরুপায় হয়ে ঐ সভায় যেতে হয়েছিল।

কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শরৎচন্দ্রের জন্মদিনে ৩১শে ভাদ্র তারিখে শরৎ-গবেষক বলে আমাকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য অনেক বার বলেছেন, এখনও বলেন—কিন্তু সম্মতি দিই নি।

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শরৎ-শতবার্ষিকী উৎসব—

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেন, তাঁরা পূজার পর কলকাতার ময়দানে প্রদর্শনী, সিনেমা, থিয়েটার, বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ দিন ধরে মহা আড়ম্বরে শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করবেন।

এই ঘোষণার পরই সরকার কয়েকজন বিখ্যাত সাহিত্যিক, বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার, সংবাদপত্রের সম্পাদক, কয়েকটি সিনেমা ও থিয়েটার প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার, কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক প্রভৃতিকে নিয়ে একটি শরৎ-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটিও গঠন করেন। ৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও থাকেন। মুখ্যমন্ত্রী হন কমিটির সভাপতি। সরকারের তথ্য ও জন সংযোগ বিভাগ এই উৎসবের উদ্যোক্তা ছিলেন বলে ঐ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উৎসব কমিটির সম্পাদক ও আহ্বায়ক হয়েছিলেন।

কমিটির প্রথম বৈঠক বসে ১১.৬.১৯৭৬ তারিখে রাইটার্স বিল্ডিংসের রোটাণ্ডা ক্লাবে। সরকার আমাকেও ঐ কমিটির একজন সদস্য করায় আমিও সেদিন সভায় গিয়েছিলাম।

এই সভার আগের দিন তথ্য ও জন সংযোগ বিভাগের সেক্রেটারী দিলীপ-বাবু, দুই ডেপুটি ডাইরেকটর প্রশান্ত সেন ও শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরও কয়েকজন অফিসার—অরুণ মিত্র, ডঃ প্রমোদ কুমার মুখোপাধ্যায়, মানিক সরকার, অংশু শূর প্রভৃতি—অর্থাৎ উৎসব সম্পর্কের আসল ওয়ার্কিং গ্রুপের কর্মীরা, কমিটির বেসরকারী সদস্যদের মধ্য থেকে একমাত্র আমাকেই ডেকে রাইটার্স বিল্ডিংসে দিলীপবাবুর ঘরে এক সভা করেন। তাতে সকলে মিলে আলোচনা করে ঠিক করা হয়—কিভাবে শরৎ শতবার্ষিকী উৎসব পালন করা হবে।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত তথ্যমন্ত্রী সুব্রতবাবুকে দেখিয়ে সাইক্লোস্টাইল করে পরদিন শতবার্ষিকী কমিটির সভায় সদস্যদের হাতে হাতে বিলি করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবু, সুব্রতবাবু সভায় মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই বসে ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণের পর কমিটির অন্যতম সদস্যা কবি রাধারাণী দেবী একটি লেখা কাগজ হাতে নিয়ে সেটি পড়েন। ঐ লেখায় তিনি বলেন—শরৎদা হিরন্ময়ী দেবীকে মোটেই বিয়ে করেন নি। তিনি হিরণ্ময়ী দেবীকে কলকাতার একটা বস্তী থেকে নিয়ে গিয়ে ছিলেন। আমরা একথা গোপালবাবুকে বার বার বলা সত্ত্বে, তিনি তাঁর বইয়ে হিরণ্ময়ী দেবীকে শরৎ-চন্দ্রের স্ত্রী বলে লিখেছেন। এইভাবে লিখে শরৎদাকে কবরে পাঠান হচ্ছে।

রাধারাণী দেবীর এই কথা শুনে সভার অনেকেই বলে উঠলেন—ও সব কথা এখানে কেন ? আপনার কথার উত্তর তো গোপালবাবু তাঁর লেখার মধ্যেই দিয়েছেন।

রাধারাণী দেবী না থেমে তাঁর ঐ কথাই আবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে থাকায় শেষে মুখ্যমন্ত্রী নিজে—আচ্ছা পরে এ সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখা যাবে, বলে তাঁকে থামান।

রাধারাণী দেবীর পর সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল বললেন—শরৎচন্দ্রের একটা প্রামাণ্য জীবনী লেখা হোক্ !

প্রবোধবাবু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তথ্যমন্ত্রী সুব্রতবাবু বললেন—গোপালবাবু তো তিন ভলিউমে শরৎচন্দ্রের জীবনী লিখেছেন, আবার কেন ?

এরপর প্রবোধবাবু আবার বললেন— শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে যেখানে জন্মে-ছিলেন, বিহার সরকারকে ধরে সেখানে একটা কিছু করা উচিত। যেখানে জন্মে ছিলেন, সেই জায়গাটা শরৎচন্দ্রের এক মামা গিরীন গাঙ্গুলী আমাকে দেখিয়ে ছিলেন।

প্রবোধবাবুর কথা শুনে একজন বললেন—শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে জন্মেছিলেন, ও কথা কে বললে ? ও ভুল কথা।

প্রবোধবাবু বললেন—মোটেই ভুল নয়। গিরীনবাবু আমাকে দেখিয়েছেন ও বলেছেন।

এই সময় কমিটির অন্যতম সদস্য দেবানন্দপুরের এম. এল. এ. ভবানী প্রসাদ সিংহরায় বললেন—গোপালবাবু তো এ বিষয়ে অথরিটি, তিনিই বলুন না, শরৎচন্দ্র কোথায় জন্মেছিলেন ?

ভবানীবাবুর কথায় সিদ্ধার্থবাবু আমাকে বললেন—গোপালবাবু কি বলেন ?

আমি বললাম—দেবানন্দপুরে। ভাগলপুরে নয়।

এইভাবে কিছু ঠিক ও বেঠিক আলোচনার পর সেদিনের সভা শেষ হ'ল।

সভার পর পূর্বোক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের দু একজন আমাকে বললেন—আর এ সভা নয়। যদি হয় তো বড় জোর একবার ডাকা হবে, না হ'লে আর ডাকাই হবে না। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যা করার আমরাই করবো। এবং সে সব যথা সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রীকে জানাবো।

এই দিনের এই সভার পর এঁদের নিয়ে আর একদিনও সভা হয়নি। ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যদের কথা মত আমাকে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন করে রাইটার্স বিল্ডিংসে ওঁদের কাছে যেতে হ'ত।

ডেপুটি ডাইরেক্টর শচীনবাবু নিজে একজন সাহিত্যিক মানুষ। তিনি একদিন আমাকে বললেন—ঠিক হয়েছে, এক লক্ষ অথবা পঞ্চাশ হাজার 'শরৎ

চন্দ্রের জীবনী ও বাণী' নামে ছোট আকারের একটা বই ছেপে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সরকার বিনামূল্যে বিতরণ করবেন। আপনি ঐ বইটা লিখে দিন।

অপর ডেপুটি ডাইরেকটর প্রশান্তবাবু, যাঁর উপর প্রদর্শনীর ভার— তিনিও একাধিক দিন আমার সঙ্গে আলোচনা করে বললেন—শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাঁর উপস্থিতির ছবি সহ শ'খানেক ছবি জোগাড় করে দিন। আর শরৎচন্দ্রের অন্ততঃ এক শ বাণী বেছে দিন। প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্য শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত কিছু জিনিষ, তাঁর গল্প উপন্যাসের কিছু পাণ্ডুলিপি, তাঁর লেখা কয়েকটা চিঠি ইত্যাদি সংগ্রহ করে দিন।

শচীনবাবু ও প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আলোচনা প্রায় প্রতিবারই ডেপুটি সেক্রেটারী দিলীপবাবুর সামনে তাঁর ঘরে বসেই হ'ত। একদিন দিলীপবাবু বললেন—আমাদের শতবার্ষিকী উৎসব হবে পূজার পর নভেম্বরে। কিন্তু তার আগে ৩১শে ভাদ্র অর্থাৎ ১৭ই সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্রের জন্ম দিনে একটা সভা করতেই হবে। সেই সভা হবে মহাজাতি সদনে। মহাজাতি সদনের ঐ সভায় কাকে সভাপতি, কাকে প্রধান অতিথি এবং কে কে বক্তা ইত্যাদি থাকবেন আসুন সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক্। সেদিন সকলে মিলে আলোচনা করে এইরূপ সূচী স্থির হ'ল—

মাঙ্গলিকী—কোন এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে দিয়ে

স্বাগত সম্ভাষণ—তথ্য মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়

উদ্বোধন—মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়

ভাষণ—শ্রী গোপালচন্দ্র রায়

শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য

সভাপতি—শ্রী বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

প্রধান অতিথি—শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের রচিত এবং তাঁর গাওয়া প্রিয় সংগীত পরিবেশন করবেন—শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাকে বক্তা না করে আমার বদলে অন্য কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিককে বক্তা করতে বলি, কিন্তু আমার সে কথায় কেউ রাজী হন নি। সভাপতি এবং প্রধান অতিথি দুজনেরই নাম আমি বলি।

বনফুল কলকাতায় ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দিলীপবাবুরা যোগাযোগ করেন। বিভূতিবাবু তখন দ্বারভাঙ্গায় তাঁর বাড়িতে ছিলেন, তাঁকে সমস্ত জানিয়ে আমি একটা চিঠি লিখি। আর সরকারের পক্ষ থেকে তথ্যমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দেন।

শরৎচন্দ্র কবে নিজে গান রচনা করেছিলেন, কার কোন্ গানটা কবে কোথায় গেয়েছিলেন, ইত্যাদি কথা আমি লিখে দিয়ে ছিলাম। ছবি দেবী শরৎচন্দ্রের রচিত এবং গাওয়া গান গাইবার আগে, সভায় সে ইতিহাস শোনান হয়েছিল। শুনিয়ে ছিলেন এবং সভাপতি প্রভৃতির নামও ঘোষণা করেছিলেন ঘোষক হিসাবে প্রখ্যাত আবৃত্তিকার প্রদীপ ঘোষ।

মহাজাতি সদনে সেদিনের এই শরৎ উৎসব সম্বন্ধে পরদিন ১লা আশ্বিন, ১৩৮৩ (১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৬) তারিখের দৈনিক যুগান্তর লিখেছিলেন—

'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ শরৎ জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসবের আয়োজন করেছিলেন মহাজাতি সদনে। এই উপলক্ষে গোটা মহাজাতি সদন নানাভাবে সাজান হয়েছিল। মঞ্চে শরৎচন্দ্রের মূর্তি রাখা হয়েছিল। চেয়ারে-বসা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা শরৎচন্দ্রের হাতে গড়গড়ার নল। আকার ও চরিত্রে এই জীবন্ত মূর্তিটি তৈরী করেছেন শিল্পী সুবীর পাল। শঙ্খধ্বনি ও মাঙ্গলিকী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সুরু। প্রদীপ জ্বালিয়ে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় জরুরী কাজে কলকাতার বাইরে যাওয়ায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে পারেন নি। তিনি লিখিতভাবে মার্জনা চেয়ে শরৎচন্দ্রের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, সেটি সভায় পড়ে শোনান হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন—'যত দিন আমাদের সমাজে বিভেদ অন্যায় নিপীড়ন থাকবে তত দিন মানুষের দরবারে মানুষের নালিশ তিনি জানাবেনই তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে।'

প্রধান অতিথি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংলার বাইরে বিশেষ করে বিহারে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন—আসলে শরৎচন্দ্র সারা দেশের মধ্যবিত্ত ও নীচুতলার মানুষের কাছে জনপ্রিয়। তিনি ভারতের চিত্ত জয় করেছেন। দেবানন্দপুরকে তীর্থস্থান হিসাবে গড়ে তোলার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

সভাপতি বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বলেন, শরৎচন্দ্র মনে প্রাণে বাঙ্গালী ছিলেন। গরিব মানুষের কথা অপরূপভাবে তিনি চিত্রিত করেছেন।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন গোপালচন্দ্র রায় ও জগদীশ ভট্টাচার্য।

লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা মন্মথ রায় রচিত 'শরৎ বিপ্লব' নাটক মঞ্চস্থ করেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।'

১৯৭৬ এর প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছিলেন—পূজার পর ময়দানে শরৎ-শত বার্ষিকী উৎসব হবে। কার্যতঃ কিন্তু সে উৎসব পূজার

পরেও হয়নি, আর ময়দানেও হয়নি ! হয়েছিল—পার্ক সার্কাস ময়দানে ১৯৭৭ এর ১৫ই জানুয়ারি থেকে ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আঠার দিন ধরে।

এখানে আঠার দিনের এই জাঁকজমক পূর্ণ মহা আড়ম্বরের উৎসবে সিনেমা মঞ্চে প্রতিদিন শরৎচন্দ্রের বইয়ের সিনেমা, নাটক মঞ্চে প্রতিদিন শরৎচন্দ্রের বইয়ের নাটক ও যাত্রা, বক্তৃতা মঞ্চে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে সর্ব ভারতীয় আলোচনা চক্র, বিতর্ক সভা, শরৎচন্দ্রের গাওয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুষ্ঠান, শিশুমঞ্চে প্রতিদিন অভিনয়, গান, ম্যাজিক ইত্যাদি হয়। এছাড়া 'শরৎ-দর্শন' নামক একটি পৃথক গৃহরূপ বিরাট মঞ্চে ব্রোমাইড করা শরৎচন্দ্রের বহু ফটো, শরৎচন্দ্রের শতাধিক বাণী, মাটির পুতুলের সাহায্যে (প্রতিটি প্রায় এক ফুট মাপের) শরৎচন্দ্রের সমগ্র জীবন কাহিনী এবং মহেশ গল্পটিরও ঐরূপ কাহিনী, শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত জিনিষপত্র প্রভৃতি দেখানো হয়।

এই শরৎ মেলায় সিনেমা ও নাটক বিভাগ বাদে প্রতিটি বিভাগের সঙ্গে বিশেষ করে 'শরৎ-দর্শন' বিভাগটির সঙ্গে আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতে হয়েছিল। এবং কয়েকদিন দিনরাত করে খাটতেও হয়েছিল। শরৎ-দর্শন মঞ্চের শরৎচন্দ্রের বাণী ইত্যাদি লিখে দেওয়া ছাড়াও, তাঁর ব্যবহৃত জিনিষপত্র-গুলি তাঁর এক আত্মীয়ার কাছে আছে জেনে, আমিই সেগুলি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করে দিই।

আমার নিজের সংগ্রহ থেকে শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' উপন্যাসের কিছু পাণ্ডুলিপি এবং শরৎচন্দ্রের লেখা কয়েকটি মূল চিঠিও ঐ 'শরৎ দর্শনে' আমি দিয়ে ছিলাম।

১৫ই জানুয়ারি শরৎ উৎসবের বা শরৎ মেলার উদ্বোধন করেছিলেন—মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়।

শরৎ মেলার বক্তৃতা মঞ্চে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে যে সব ভারতীয় আলোচনা চক্র হয়েছিল, তাতে আমাকে একদিন বক্তৃতা দিতে হয়েছিল।

শরৎ মেলায় শরৎচন্দ্রের গাওয়া প্রিয় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে সেই গানগুলি আমি ঠিক করে দিই এবং গায়ক হিসাবে শান্তিদেব ঘোষের নামও বলি।

শরৎ জন্মশত বার্ষিকীর সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার শরৎচন্দ্র বিষয়ে একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ছিলেন। ঐ রচনা প্রতিযোগিতারও অন্যতম বিচারক ছিলাম।

শরৎ-সাহিত্য সম্পাদনা—

শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবর্ষ শুরুর প্রায় বছর খানেক আগে কলকাতার 'শরৎ সমিতি' স্থির করেন, শরৎচন্দ্রের জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁরা শরৎচন্দ্রের

রচনাবলী প্রকাশ করবেন। তাঁরা প্রথমে এও স্থির করেন যে, শরৎ রচনাবলী সম্পাদনার জন্য কলকাতা, যাদবপুর ও রবীন্দ্র-ভারতী এই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরা, 'শরৎ সমিতি'র সভাপতি ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং গোপালচন্দ্র রায় (অর্থাৎ আমি) মোট এই পাঁচজন সম্পাদক মণ্ডলীতে থাকবেন।

আমাকে সম্পাদক-মণ্ডলীতে নেওয়া হবে শুনেই আমি একদিন 'শরৎ সমিতি'র সাধারণ সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে বলি—, সম্পাদক মণ্ডলীতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আমার এখন বহু কাজ। সব চেয়ে বড় কাজ হ'ল—আমার 'শরৎচন্দ্র-১ম খণ্ড' অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের জীবনী বইটা—এমনিতেই মস্ত বড়, তার উপর আরও বড় করে ২য় সংস্করণ ছাপা আরম্ভ করেছি। এজন্য প্রচুর খাটতে হচ্ছে। তাছাড়া এখন বাজারে প্রচলিত শরৎ-সাহিত্যে এত ভুল আছে যে, সে সব ভুল সংশোধনের জন্য শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন সংস্করণের বইগুলি দেখা দরকার। বিভিন্ন সংস্করণের বই দেখা এইজন্য প্রয়োজন যে, শরৎচন্দ্র তাঁর কোন কোন বই ১ম সংস্করণের পরে এক এক সংস্করণে কিছু কিছু অদল-বদল করেছেন। যেমন—শরৎচন্দ্র তাঁর 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসের ১৪শ সংস্করণে, 'পল্লী সমাজে'রও ১৪শ সংস্করণে, 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের ৫ম সংস্করণে, 'দত্তা'র ৬ষ্ঠ সংস্করণে কিছু কিছু সংশোধন করেছিলেন। ঐ সব সংশোধিত সংস্করণের প্রত্যেকটিতেই শরৎচন্দ্রের একটা করে ভুল সংশোধনের বিবৃতি আছে। আবার শরৎচন্দ্র তাঁর যে বইয়ে পরে ভুল সংশোধন বা দু এক লাইন বা দু একটা কথা সংযোজন করেছেন, অথচ এজন্য বইয়ে কোন বিবৃতি দিয়ে যান নি, সেক্ষেত্রেও তাঁর সেই সব বইএর বিভিন্ন সংস্করণ দেখতে হবে। ঐ সব বিভিন্ন সংস্করণের বই সংগ্রহ করা এক তো দুঃসাধ্য ব্যাপার, তার উপর ঐ সব বই মিলিয়ে প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ।—অতএব দাদা আমায় ক্ষমা করুন। আমার অত সময় এখন নেই।

আমার কথা শুনে শৈলেনবাবু বললেন—আপনার কোন কথা শুনতে চাই না। আপনাকে সম্পাদক মণ্ডলীতে থাকতেই হবে। আমরা জানি—গোপাল রায় ছাড়া শরৎ রচনাবলী প্রকাশ করা অসম্ভব।

আমাকে বাদ দেবার জন্য শৈলেনবাবুকে আরও কত কি বললাম। অনেক অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি আমার কোন কথাই শুনলেন না। সম্পাদক মণ্ডলী থেকে আমাকে বাদ দেবার জন্য আমার ঐ অনুরোধের কথা শরৎ সমিতির অন্যতম প্রধান সুশীল সোম সবই জানেন। তিনি আজও জীবিত।

শৈলেনবাবু যখন আমার শত অনুনয় বিনয়ে কান দিলেন না, তখন আমি বললাম—আমাকে যদি অন্যতম সম্পাদক করতেই চান, তাহলে এক কাজ করুন

—শরৎচন্দ্রের বইগুলি যখন যখন প্রকাশিত হয়েছে, সেই সেই বৎসর অনুসারে সাজিয়ে রচনাবলীতে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

শৈলেনবাবু বললেন—তাই হবে। তিনি আরও বললেন—আমরা প্রথমে ঠিক করে ছিলাম, পাঁচজনকে নিয়ে সম্পাদক মণ্ডলী হবে, এখন ঠিক হয়েছে—সুবোধবাবু, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান দেবীপদ ভট্টাচার্য, আর আপনি এই তিনজন সম্পাদক হবেন।

এরপর সংবাদপত্রে শরৎ রচনাবলীর সম্পাদক হিসাবে আমাদের তিনজনের নাম ঘোষিত হ'ল।

এই প্রসঙ্গে অন্যতম সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্যের কথাটাও বলা দরকার। তিনি আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত ছিলেন। সম্পাদক মণ্ডলীতে থাকার জন্য তিনিও আমাকে বহুবার বলেন। তিনি এও বলেছিলেন—সুবোধবাবু আপনার কথা বলেছেন। আপনি অন্ততঃ সুবোধবাবুর কথাটা রেখে সম্পাদক মণ্ডলীতে থাকুন।

শরৎ রচনাবলীর সম্পাদনার কাজে লেগে গেলাম। আমি যে বলেছিলাম—কালানুক্রমে শরৎচন্দ্রের বইগুলি রচনাবলীতে দেওয়া হবে, কার্যত দেখা গেল, আমার সে কথা রইল না। শরৎ রচনাবলীর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল—১৩৮২ সালের ১২ই ভাদ্র তারিখে, জন্মাষ্টমীর দিন। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের জন্মশত বর্ষ শুরুর ১৯ দিন আগে।

আমাদের শরৎ রচনাবলী ৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম খণ্ড প্রকাশের পর কয়েক মাস অন্তর অন্তর বাকি খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয়। ছাপাখানার গণ্ডগোলের জন্য একটা দুটা খণ্ড বেরুতে একটু দেরি হয়েছিল। এই ৫ খণ্ডে শরৎ রচনাবলী প্রথমে ছাপা হয়েছিল ৫০ হাজার করে।

শরৎ রচনাবলী ৫ম খণ্ডের শেষে 'শরৎ সাহিত্যের পাঠোদ্ধার' ও 'শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি" নামে দুটি প্রবন্ধ পর পর ছাপা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটির লেখক আমি, আর দ্বিতীয়টির লেখক দেবীপদ ভট্টাচার্য।

একদিন শরৎ রচনাবলীর প্রুফ রীডারদের ঘরে গিয়ে দেখি, আমার এবং দেবীবাবুর উভয়েরই ঐ লেখা দু'টির প্রুফ এসেছে। প্রুফ রীডারদের বললাম—আমার লেখার প্রুফটা আমিই দেখে দিয়ে যাই।—এই বলে প্রুফ দেখে দিই। এরপর আমার একটু কৌতূহল হওয়ায়, আমি একজন প্রুফ রীডারকে বলি—দেখি দেবীবাবুর লেখাটা। কি লিখেছেন দেখি।

প্রুফ রীডার দেবীবাবুর লেখাটা আমার হাতে দিলে পড়ে দেখি, দেবীবাবু তাঁর প্রবন্ধের প্রথম দিকেই লিখেছেন—'১৯২২ সালে যখন শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বের ইংরেজিতে অনুবাদ করেন শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন ও থিয়োডোসিয়া টমসন, সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয় ভাষায় তার অনুবাদ করেন Ferdinando Belloni Filippi (১৯২২)। ঐ অনুবাদ পড়ে ছিলেন রোমাঁ রলাঁ।

১৯২৬ সালে ২৫ জুন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রলাঁর যে কথোপকথন হয়, তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বলেন—'তিনি বাংলা সাহিত্যের সব চেয়ে বড়ো জীবিত আর্টিস্ট।' গুর্ণিজেলের সঙ্গে রলাঁ পড়েন শ্রীকান্তের ঐ ইতালীয় অনুবাদ এবং মুগ্ধ হন বিশেষ করে শ্রীকান্তের নিশীথ অভিযান ও শ্মশানে দুরাত্রির বর্ণনায়। (জর্নাল, অগষ্ট ১৯২৬)।'

দেবীবাবুর এই লেখাটা পড়েই দেখলাম, এতে কয়েকটা ভুল আছে। সেগুলো সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। এই ভেবে প্রুফ রীডারদের কাছ থেকে দেবীবাবুর লেখাটা নিয়ে পরদিন সকালে ঐ লেখা সহ দেবীবাবুর বাড়িতে গেলাম। গিয়ে বললাম—আপনি যে লিখেছেন, গুর্ণিজেলের সঙ্গে রলাঁ শ্রীকান্তের ইতালীয় অনুবাদ পড়েছিলেন, এটা তো ঠিক নয়। কারণ, গুর্ণিজেল কোন মানুষ নয়, গুর্ণিজেল একটা জায়গার নাম।

শুনে দেবীবাবু বললেন—অবন্তী কুমার সান্যাল 'ভারতবর্ষ' নাম দিয়ে রলাঁর Inde বইয়ের যে অনুবাদ করেছেন, তাতে তিনি পরিষ্কার লিখেছেন, গুর্ণিজেলের সঙ্গে। আমি ঐ লেখা দেখেই লিখেছি।

আমি বললাম—বছর দুই আগে ১৩৮০ সালে শরৎ সমিতিরই 'শরৎ-স্মরণিকা' নামক সাহিত্য বার্ষিকীতে 'রোমাঁ রোলাঁ ও শরৎচন্দ্র' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে আমি ফরাসী ভাষায় লেখা রোলাঁর মূল Inde বই থেকে ঐ অংশও উদ্ধৃত করে ছিলাম। সেখানে রোলাঁ লিখেছেন—Lectures à Gurnigel, এখানে ফরাসী à হ'ল ইংরাজি at, ইংরাজি with বা সঙ্গের ফরাসী হ'ল Avec. তাই ওটা গুর্ণিগেল বা গুর্ণিজেল যাই বলুন ওটা একটা জায়গার নাম। আমি আমার ঐ প্রবন্ধে Lippingcot নামক বিখ্যাত ভৌগলিক অভিধান দেখে Gurnigel জায়গাটা সুইজারল্যান্ডের কোথায় অবস্থিত ইত্যাদি সব বলেছি। অবন্তীবাবুর 'ভারতবর্ষ' বইএর প্রকাশক রেডিক্যাল বুক ক্লাবের মালিক বিমল মিত্রকে আমি একদিন এই ভুলের ব্যাপারটা বলেছিলাম। বিমলবাবু কথাটা অবন্তীবাবুকে জানালে তিনি বলেছিলেন—গোপালবাবু ভুলটা ঠিকই ধরে দিয়েছেন। Gurnigel একটা জায়গাই। সঙ্গে হ'লে avecই হ'ত।—আমার এই কথা শুনে, দেবীবাবু তাঁর লেখার 'গুর্ণিজেলের সঙ্গে' কেটে 'গুর্নিজেলে' করে দিলেন।

এরপর আমি বললাম—আপনি এই যে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ রলাঁকে বলেছিলেন—'শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে সব চেয়ে বড়ো জীবিত আর্টিস্ট।' আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠিক এ কথা বলেন নি, বলতে পারেন না। আর আপনি যে-অবন্তীবাবুর বই থেকে এই লেখা নিয়েছেন, সেই অবন্তীবাবুও তো তাঁর বইয়ে ঐ কথা লেখেন নি।

আমার এই কথা শুনে দেবীবাবু এবার বললেন—ওটা থাক্‌গে।

আমি বললাম—তাহলে রবীন্দ্রনাথের কথা বলে আপনি যে কথাটাকে

'ইন্‌ভারটেড কমা'র মধ্যে দিয়েছেন, সেই কমা দুটো অন্ততঃ তুলে দিন।

দেবীবাবু এবারও থাক্‌গে বলে আর ইন্‌ভারটেড কমা দুটা তুললেন না। ঐ অবস্থাতেই ভুল ছাপা হয়ে গেল।

এরপর আমি বললাম--শ্রীকান্তর ইংরাজি অনুবাদ হয় ১৯২২ সালে, সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ সালেই Ferdinando Belloni Filippi ইটালী ভাষায় অনুবাদ করেন, এটা আপনি কোথায় পেলেন?

দেবীবাবু বললেন—এক সময় একটি ইতালীয় ছাত্রী আমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়তে এসেছিল। সে-ই আমাকে এই কথা বলেছিল।

আমি দেবীবাবুর কাছে সেই ছাত্রীটির ঠিকানা চাইলে দেবীবাবু বললেন —সে বিয়ে করে এখন কোথায় থাকে, তার ঠিকানা জানি না।

১৯২২ সালেই শ্রীকান্তর ইংরাজি অনুবাদ থেকে ইতালীয় অনুবাদ হয়েছিল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও দেবীবাবুকে তখন জোর করে কিছু বলতে পারি নি। ফলে দেবীবাবুর লেখায় ১৯২২ সালই থেকে যায়। পরে ১৯৭৭ সালে কলকাতার 'অল বেঙ্গল শরৎ সেন্টিনারী কমিটি' থেকে যে "দি গোল্ডেন বুক অফ্‌ শরৎচন্দ্র' প্রকাশিত হয়, তাতে শরৎচন্দ্রের বইএর 'Translation in Indian and Foreign Languages' অধ্যায়ে ইতালীয় ভাষায় শ্রীকান্তের প্রথম অনুবাদ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে— Ferdinando Belloni Filippi, Vila France, near Verona, (Northern Etaly) 1925.

এঁদের লেখায় এই ১৯২৫ সালটাই ঠিক বলে মনে করি।

যাই হোক্‌, এই শরৎ রচনাবলী সম্পাদনা করতে গিয়ে একটা কাজ কিছুটা করতে সক্ষম হয়েছি বলে মনে করি। সে কাজটাকে আমি আমার অন্যতম জাতীয় কর্তব্য বলেই মনে করছি। কাজটা হ'ল, প্রভৃত পরিশ্রমে নানা জায়গা থেকে শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন সংস্করণের বইগুলি এনে পাঠ মিলিয়ে তখনকার বাজারে প্রচলিত শরৎ সাহিত্যের অনেক ভুল সংশোধন করে দিতে পেরেছি।

আমাদের শরৎ রচনাবলী ১ম খণ্ড প্রকাশের প্রায় সময় থেকেই সারা দেশে শরৎ জন্মশত বর্ষ উৎসব শুরু হয়ে যায়। আর আমাকেও ঐ উৎসবে অগণিত সভায় তখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়। না হ'লে হয়ত আরও সুষ্ঠু পাঠ উদ্ধার করতে পারতাম।

আমরা যখন শরৎ রচনাবলী ৫ খণ্ডে প্রকাশ করি, তার ঠিক আগে পর্যন্ত শরৎ সাহিত্যে কি রকম সব ভুল চলে আসছিল, তা দেখাবার জন্য আমাদের শরৎ রচনাবলী ৫ম খণ্ডের শেষে আমি আমার নাম দিয়ে 'শরৎ সাহিত্যের পাঠোদ্ধার' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। শরৎ-সাহিত্যে তখন কী রকম মারাত্মক মারাত্মক ভুল ছিল, আমার ঐ প্রবন্ধটা পড়লেই তা জানা যাবে।

এখানে ঐ প্রবন্ধ থেকে শুধু একটা মাত্র বই—তখনকার বাজারে প্রচলিত শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের কি পরিমাণ ভুল উদ্ধার করেছিলাম, তা উদ্ধৃত করছি—

'শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই তাঁর সাহিত্যে যে অনেক ভুলভ্রান্তি ও বিকৃতি ঘটেছে, এ-কথা জানতাম। এখন শরৎ সমিতি প্রকাশিত এই শরৎ রচনাবলী সম্পাদনা করতে এসে এটা আরও ভালভাবেই জানতে পারলাম। শরৎ-সাহিত্যে এই যে সব ভুল, ছাড়, ওলট-পালট, বিকৃতি প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে, এগুলি কিন্তু তথাকথিত 'ছাপাখানার ভুল' নয়। এগুলি হয়েছে প্রুফ-সংশোধকদের ত্রুটিতে। তাদের এ ত্রুটি হলেও বাজারে এই বিকৃত শরৎ-সাহিত্য প্রচারের জন্য দায়ী কিন্তু শরৎ-সাহিত্যের স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকরাই।

এই ক্রমবর্ধমান বিকৃত শরৎ-সাহিত্য প্রচারের ফলে বর্তমানে প্রকৃত শরৎ-সাহিত্য উদ্ধারের পথও বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে। কারণ, পাঠাগারে শরৎ-সাহিত্যের অগণিত মুগ্ধ পাঠক-পাঠিকারা বার বার পড়ার ফলে পুরাতন সংস্করণের বইগুলি ছিন্ন ও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার জায়গায় এইসব ভুলেভরা নতুন সংস্করণের বই আসছে। তাই আজ পুরাতন সংস্করণের বই সংগ্রহ করাও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালে তাঁর বইয়ে ভুল ঢুকেছে দেখলে, তিনি রেগেই হোক বা বকে-ঝকেই হোক, তবু সে ভুল সংশোধন করে দিতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আর সে উপায় না থাকায় তাঁর পুস্তকের স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক-দের অবহেলায় তাঁর বইয়ে আজ ক্রমশঃ ভুলের পাহাড় জমে যাচ্ছে।...

শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বে বহুকাল থেকে কী সব মারাত্মক ও অর্থবিকৃতিকর ভুল চলে আসছে, তার কয়েকটা এখানে দেখাই। আমার কাছে শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের ২য় সংস্করণের একটা বই আছে। সেই বইটাকে আদর্শ ধরে বর্তমানে বাজারে প্রচলিত শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের ভুলগুলো দেখাচ্ছি—

১. গত ২৪ বছর ধরে এই শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের শেষে এক জায়গায় ছাপা হচ্ছে—'আকাশের এক প্রান্তে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ পূর্ণ শশী।'

এখন কথা হচ্ছে—কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর পূর্ণ শশী হয়? তাছাড়া 'ক্ষীণ পূর্ণ শশী' সেটাই বা কি? এই অতি স্থূল ভুলটাও না প্রুফ-সংশোধক না প্রকাশক কারুরই কোনদিন চোখে পড়ল না? একই ভুল দীর্ঘকাল ধরে ছেপে যাওয়ায় পাঠক-পাঠিকারা স্বভাবতঃই ভাববেন—এটা তাহলে হয়ত শরৎচন্দ্রের নিজেরই লেখার ভুল।

শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব সমস্তটাই ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৩৯-এর বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রুফ-সংশোধক বা প্রকাশকরা প্রথম দিকের সংস্করণের শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব না পেয়ে, যদি বিচিত্রাটাও খুলে দেখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন, শরৎচন্দ্র ঐ বাক্যাংশটির

জায়গায় লিখে গেছেন—'আকাশের এক প্রান্তে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ শীর্ণ শশী।' পূর্ণ শশী নয়।

২. (ক) শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—'প্রবঞ্চনার পরিবাদে।' পরিবাদ শব্দের অর্থ হ'ল নিন্দা। এই প্রঞ্চনার পরিবাদে কথাটা ঐ ২৪ বছর ধরেই ছাপা হয়ে চলেছে—প্রবঞ্চনার পরিবর্তে।

(খ) বইয়ের এই পাতাতেই ক'লাইন পরে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—'এই একটি মাত্র চিন্তাই আমাকে এমন করিয়া যেন মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে।' এই বাক্যের মোহাচ্ছন্ন শব্দটা ঐ দীর্ঘকাল ধরেই ছাপা হচ্ছে—মেঘাচ্ছন্ন।

(গ) শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাসের একটা কবিতার ৪ লাইন উদ্ধৃত করেন। এখনকার বইয়ে ঐ চারটা লাইনেই ভুল ছাপা হচ্ছে। দ্বিতীয় লাইনের—'তুয়া দরশন আগে কছু নাহি জানলু—চির দুখ অব দূরে গেল'—এই 'দুখ'-এর জায়গায় ছাপা হচ্ছে সুখ। একেবারে সম্পূর্ণ উল্টো অর্থ।

(ঘ) শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—মাস দুই পূর্বেও বিধবা কন্যার মেয়ের বিয়ে বাবদ চক্রবর্তী শ' দুই টাকা গহরের কাছে আদায় করিয়াছে।—এইটা এখন ছাপা হচ্ছে এইভাবে—মাস দুই পূর্বেও বিধবা কন্যার বিয়ে বাবদ চক্রবর্তী শ দুই টাকা গহরের কাছে আদায় করিয়াছে।—'বিধবা কন্যার মেয়ের বিয়ে' হয়েছে 'বিধবা কন্যার বিয়ে।' এইটা পড়ে এখন অনেকেই বলতে পারেন—কে বললে শরৎচন্দ্র তাঁর বইয়ে বিধবা বিবাহ দেন নি? বিয়ে না দিলেও এইতো একটা তার সমর্থন।

(ঙ) শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—রাজলক্ষ্মী তার ন' বছর বয়সের সেই কিশোর বরটিকে—এটা এখন ছাপা হচ্ছে—রাজলক্ষ্মী তার ন' বছর বয়সেই সেই কিশোর বরটিকে।

(চ) এইভাবেই, 'আপাত দুঃখের সমাধান' এখন বইয়ে হয়েছে—'আপন দুঃখের সমাধান।' 'তোমাদের চোখে লাগল', হয়েছে—'আমাদের চোখে লাগল।' 'ঘাড়ে, মাথায় ও কাঁখে,' হয়েছে—'ঘাড়ে, মাথায় ও কাঁধে।' 'মুখ নীচু করিয়া একটুখানি হাসিল,' হয়েছে—'মাথা নীচু করিয়া একটুখানি মাথা নাড়িল।' 'সহসা উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া ফেলিল, শেষে মুখে আঁচল চাপিয়া কহিল'—এই বাক্যের মুখে আঁচল চাপিয়া, হয়েছে—'বুকে আঁচল চাপিয়া।' 'দেবতার আশীর্বাদ,' হয়েছে—'মায়ের আশীর্বাদ।' 'ছাড়তে পারি' হয়েছে—'ছাড়তে পারে।' এইরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত ভুলের ফলে বহু জায়গায় অর্থেরই ওলট্-পালট্ হয়ে গেছে।

৩. কয়েক জায়গায় দু একটা করে লাইনও বাদ গেছে।

৪. শরৎ-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকারা সকলেই জানেন, শরৎচন্দ্র লেখার মধ্যে বক্তব্যকে জোরালো ও শ্রুতিমধুর করবার জন্য বাক্যের মধ্যে কোন কোন

শব্দের শেষে ই, ও, ত প্রভৃতি দিয়েছেন। এখনকার প্রচারিত শরৎ-সাহিত্যে বহু ক্ষেত্রেই এইসব ই, ও, ত প্রভৃতি তুলে দেওয়া হয়েছে। যেমন—এই শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্বের প্রথম পাতাতেই শরৎচন্দ্র লিখেছেন—এমনি করিয়াই কি চির-জীবন কাটিবে?—এর 'এমনি করিয়াই'টা ছাপা হচ্ছে—'এমন করিয়া।' শরৎচন্দ্র লিখলেন—তুমি কি এখান থেকে সত্যিই চলে যাবে?—এখন 'সত্যিই' ছাপা হচ্ছে 'সত্যি' হয়ে। শরৎচন্দ্র লিখে ছিলেন—এই জায়গা ছাড়িয়া কাল আমাকে পালাইতেই হইবে।—এই পালাইতেই ছাপা হচ্ছে—'পালাইতে' হয়ে। শরৎচন্দ্র লিখে ছিলেন—আগে সকালবেলাটা ত কাটুক, ব্যাপারটা ত সহজ নয়।—এখন এই দু জায়গারই 'ত' তুলে দেওয়া হয়েছে। শরৎচন্দ্র লিখে ছিলেন—'না বলে যে থাকতে পারিনে গো।' 'কমললতা আর খুঁজে পাবে না গোঁসাইকে।' এই দুটো বাক্যের 'যে' ও 'আর' শব্দ দুটো তুলে দিয়েই ছাপা হচ্ছে।

এইরূপ শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত ই, ত, ও, আর, কিন্তু, যে প্রভৃতিকে বহুক্ষেত্রেই বেমালুম বাদ দিয়ে ছাপা হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি তুচ্ছ বলে মনে হলেও, এদের বাদ দিলে শরৎচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্যও ক্ষুন্ন হয়ে যায়।

শরৎ সমিতি এই শরৎ রচনাবলী শতবার্ষিকী সংস্করণ একটা নির্দিষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে ছেপে বার করবার জন্য শরৎচন্দ্রের গ্রন্থসমূহের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। এই অল্প সময়েই যতদূর সম্ভব পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা করা গেছে। সময় পেলে আরও ভালভাবে কাজ করা সম্ভব হত। কারণ, কয়েকটা বইয়ের আরও কয়েকটা সংস্করণ খুঁজে দেখার প্রয়োজন ছিল। সময়ের অভাবে তা সম্ভব হ'ল না।

তাই এই শরৎ রচনাবলীর সমস্ত পাঠই যে সম্পূর্ণ নির্ভুল হয়েছে, সে দাবী করি না। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর ভুল বার করে শরৎ-সাহিত্যের একটা নির্ভুল পাঠ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখন এই ভুলগুলো দেখিয়ে দেওয়ায় আরও দুটো উপকার হ'ল। (১) গত ৪০।৫০ বছর ধরে শরৎচন্দ্রের লক্ষ লক্ষ বই যা বাজারে বিক্রি হয়েছে বা এখনও হচ্ছে, সেই সব বইয়ের ক্রেতা ও মালিকরা প্রয়োজন বোধে শরৎ সমিতির প্রকাশিত এই বই দেখে তাঁদের বইয়ের ভুলগুলো সংশোধন করে নিতে পারবেন।

(২) শরৎ-সাহিত্যের স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকরা এখন থেকে সতর্ক হয়ে তাঁদের বইয়ের ভুলগুলো ত সংশোধন করবেনই, তাছাড়া, তাঁদের হাতে সময় ও সুযোগ থাকায় বইগুলি সম্পূর্ণ নিখুঁত করারও চেষ্টা করবেন। কারণ, শরৎ-সাহিত্য আজ জাতীয় সাহিত্য। আমাদের গর্বের বস্তু। তাই এই সাহিত্য নির্ভুল ও সুন্দরভাবে প্রচারিত হোক্, এটা আমরা সকলেই চাই।'

শরৎ সমিতির শরৎ রচনাবলী ১ম সংস্করণ ৫০ হাজার কপি কিছু দিনের মধ্যেই বিক্রি শেষ হয়ে যায়। তখন এঁরা শরৎ রচনাবলী আবার ২য় সংস্করণ ছাপাবার জন্য শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ সমূহের মালিকের সঙ্গে চুক্তি করেন। এবার এঁরা ছাপেন ২৫ হাজার কপি।

এই ২য় সংস্করণের চুক্তির কথা আমি জানতাম না। শরৎ সমিতি আমাকে জানানো প্রয়োজনও বোধ করেন নি। এঁরা ২য় সংস্করণ ছাপেন১ম সংস্করণের বই নিয়ে অফ্ সেটে।

আমার তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও, প্রথম সংস্করণের সময় আমাকে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল বলেই, প্রকাশক তথা শরৎ সমিতির সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় ১ম সংস্করণ ১ম খণ্ড গ্রন্থে 'প্রকাশকের কথা'য় আমার অনেক প্রশংসা করে শেষে লিখেছিলেন—গোপালবাবুকে আমাদের সম্পাদক মণ্ডলীতে পাওয়ায় আমাদের কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে।

২য় সংস্করণ অফ্ সেটে ছাপার সময় আমাকে আর সম্পাদনার কাজে প্রয়োজন নেই ভেবে, শৈলেনবাবু ১ম সংস্করণে তাঁর প্রকাশকের কথায় আমার সম্বন্ধে ঐ যে সব প্রশংসা-সূচক কথা লিখেছিলেন, সবই তুলে দেন। অথচ ১ম সংস্করণে প্রকাশকের কথায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও ঋণ স্বীকার করে আর আর যে সব কথা লেখা হয়েছিল, সে সবই থেকে যায়। শুধু আমার সম্বন্ধে লেখাটাই তুলে দেন। অথচ শরৎ সমিতির সঙ্গে আমার সদ্ভাব বরাবর সমানই আছে।

এবার প্রকাশকের কথায় আমার নাম না করুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু শরৎ রচনাবলী বইএর স্বার্থেই ২য় সংস্করণের কথা আমাকে জানানো উচিত ছিল।

শুনেছি ঐ ২য় সংস্করণের বইও অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ায়, এঁরা আবার চুক্তি করে ৩য় সংস্করণ আরও ২৫ হাজার সেট ঐ অফ্ সেটেই ছেপেছিলেন।

এ কথাও আমি জানতাম না। এঁরা আমাকে জানান নি।

শরৎ রচনাবলীর ১ম সংস্করণের শেষে আমার 'শরৎ-সাহিত্যের পাঠোদ্ধার' প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম—শরৎ-সমিতি যেহেতু একটা সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে শরৎ রচনাবলী ছেপে বার করার জন্য যুক্তিবদ্ধ, তাই সময়ের ঐ স্বল্পতা হেতু শরৎচন্দ্রের অনেক বইয়ের অনেক সংস্করণ দেখা গেল না। কয়েকটা বইএর আরও কয়েকটা সংস্করণ দেখা প্রয়োজন ছিল। সময় পেলে আরও ভাল ভাবে বই সম্পাদনা করা যেত।

শরৎ রচনাবলী ১ম সংস্করণ ৫ খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখন দেশে শরৎ শতবর্ষ উৎসবের বন্যা বয়ে চলেছে। আর সেই বন্যায় ভেসে আমাকেও নানা জায়গায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

শরৎ সমিতির শরৎ রচনাবলী যখন ২য় সংস্করণ ছাপা হয়, তখন দেশে শরৎ উৎসবের ঐ বন্যা থেমে গেছে। আমার শরৎচন্দ্র ১ম খণ্ড অর্থাৎ শরৎ-জীবনী ২য় সংস্করণও তখন অনেক আগেই ছেপে বেরিয়ে গেছে। কাজেই আমিও তখন অনেকটা অবসর পেয়েছিলেন।

শরৎ রচনাবলী ১ম সংস্করণের ১ম খণ্ডে আমরা তিনজন সম্পাদকে মিলে যুক্তভাবে একটা 'সম্পাদকীয়' লিখে ছিলাম। সেটা 'প্রকাশকের কথা'র পরেই ছাপা হয়েছিল। ২য় সংস্করণের ১ম খণ্ডে দেখছি, এবারও শৈলেনবাবুর প্রকাশকের কথার পরেই একটা সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে। তবে ঐ সম্পাদকীয় তিনজন সম্পাদকের লেখা নয়। ঐ সম্পাদকীয় অন্যতম সম্পাদক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর নিজের একার নামে লেখা। সুবোধবাবু লিখেছেন—

'আমরা প্রথম সংস্করণে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম, এবারও তাহাই অনুসৃত হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন সংস্করণ মিলিয়ে যে পাঠ সুষ্ঠু বলে মনে হয়েছে, তাহাই গ্রহণ করা হয়েছে।'

কে কিভাবে শরৎচন্দ্রের কোন্ বইএর কোন্ কোন্ সংস্করণের সঙ্গে পাঠ মিলিয়েছেন জানি না। তবে আমি তো দেখছি এবং পরে শরৎ সমিতির পরবর্তী সম্পাদক সুশীল সোমের কাছে শুনেওছি—দু একটা সংস্করণ দেখার একটা চেষ্টা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু কার্যকর হয়নি। ১ম সংস্করণ বই নিয়েই অফ্ সেটে ছাপা হয়েছে।

১ম সংস্করণে ৫ম খণ্ডের শেষে আমার 'শরৎ সাহিত্যের পাঠোদ্ধার' প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম—'আমাদের এই শরৎ রচনাবলীতে ছাপাখানা প্রভৃতির ভুলে ২য় খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় ১৩ সংখ্যক পংক্তির কথাগুলো ২১ সংখ্যক পংক্তিতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।' ২য় সংস্করণে আমার এই ভুল সংশোধনটাই শুধু সংশোধন করা হয়েছে।

১ম সংস্করণ ৫ খণ্ডই ছাপা শেষ হয়ে যাবার পরে এক সময় আমি এই বইগুলি পড়তে গিয়ে দেখি ১ম সংস্করণের বইয়ে মুদ্রাকর প্রমাদ প্রভৃতির কারণে বেশ কয়েকটি ভুলও থেকে গেছে।

সুবোধবাবুর কথা অনুযায়ী ২য় সংস্করণের সময় বিভিন্ন পাঠ মেলানো তো দূরের কথা, এই বইএরই পাঠের দিকে একটু চোখ দিলে ১ম সংস্করণের গুরুতর অথচ অতি স্থূল ভুলগুলো সংশোধন করা যেত।

শরৎ সমিতির শরৎ রচনাবলী ১ম সংস্করণে কি রকম সব স্থূল ভুল রয়েছে সেগুলো একটু পরেই দেখাচ্ছি। এখন বিপদ হয়েছে এই যে, বর্তমানে বাজারে যে সব শরৎ রচনাবলী প্রকাশিত হচ্ছে, সে সবই শরৎ সমিতির বইকে আদর্শ করায় ঐ সব বইয়েও এই ভুলগুলো থেকে যাচ্ছে।

প্রচুর সময় এবং কঠোর পরিশ্রমে শরৎচন্দ্রের বইয়ের বিভিন্ন সংস্করণ এবং পত্রিকায় প্রকাশিত মূল রচনার সঙ্গে নিজেরও বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে পাঠ উদ্ধার করলে কি দাঁড়ায় বইয়ের শেষে 'শ্রীকান্ত—১ম পর্ব : ৭৫তম প্রকাশ বর্ষ" প্রবন্ধে তা দেখিয়েছি।

শরৎ সমিতি তাঁদের বইএর ২য় সংস্করণের সময় আমাকে জানালে আমি সানন্দেই ঐ স্থূল ভুলগুলো তো সংশোধন করে দিতামই, তার উপর শরৎ সাহিত্যের আরও কিছু শুদ্ধ পাঠও হয়ত দিতে পারতাম।

এখন শরৎ-রচনাবলীর ১ম সংস্করণের ঐ ভুলগুলোর কথা কিছু বলছি—

'গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স' থেকে 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এই বইএর সংকলক ও সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বইএর নাম 'রচনাবলী' হলেও এতে শরৎচন্দ্রের রচনা নয়, এমন অনেক মৌখিক ভাষণ এবং মৌখিক আলাপ-আলোচনাও রয়েছে।

শরৎ সমিতির শরৎ রচনাবলী সম্পাদনার সময় আমি আমার নিজের সংগ্রহ —ব্রজেনবাবুর এই বইটি নিয়ে বইয়ে শরৎচন্দ্রের মৌখিক ভাষণ ও মৌখিক আলাপ-আলোচনাগুলি বাদ দিয়ে বাকি অংশ শরৎ রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি হিসাবে কম্পোজের জন্য প্রেসে দিই।

শরৎ রচনাবলীর প্রুফ সংশোধনের জন্য একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা সমেত মোট চার জন প্রুফ রীডার ছিলেন। একজন কপি বা পাণ্ডুলিপি ধরে পড়ে যেতেন, আর একজন ঐ পড়া শুনে মিলিয়ে প্রুফ সংশোধন করতেন।

এরূপ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও শরৎ রচনাবলী পাঁচ খণ্ডই ছাপা শেষ হয়ে যাওয়ার অনেক পরে হঠাৎ একদিন আমার চোখে পড়ল—ঐ 'শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী' থেকে শরৎচন্দ্রের 'আত্মকথা' শিরোনামে যে ইংরাজি লেখা ও তার বাংলা অনুবাদ শরৎ রচনাবলীতে ছাপা হয়েছে, তাতে সব শেষে তিনটি তারকা (* * *) চিহ্ন দিয়ে এ প্রসঙ্গে পাদটীকায় লেখা হয়েছে—'নিরুপমা দেবী কর্তৃক লিখিত এবং ১৩৪২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'জয়শ্রী' পত্রিকায় প্রকাশিত।'

পাদটীকার এই লেখাটা সম্পূর্ণ ভুল। মূল পাণ্ডুলিপিতে অর্থাৎ ব্রজেন-বাবুর ঐ বইয়ে এ কথা মোটেই নেই। আমাদের বইয়ের কম্পোজিটার ও প্রুফ সংশোধকদের ভুলেই ঐ লেখাটা অকারণ এসে বসে গেছে।

ব্রজেনবাবুর ঐ বইয়ে 'আত্মকথা' প্রবন্ধের কয়েক পাতা পরেই শরৎচন্দ্রের 'বাল্যকথা' নামে একটা প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধেই এক জায়গায় পাদটীকায় আছে—নিরুপমা দেবী কর্তৃক লিখিত এবং ১৩৪২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা জয়শ্রী পত্রিকায় প্রকশিত।'—এটা ঠিক।

শরৎ রচনাবলী কম্পোজ হয়েছিল লাইনো টাইপে। এই লাইনোর কম্পোজে হাতে কম্পোজের মত এক একটা অক্ষর পৃথক থাকে না। একটা লাইনের সমস্ত অক্ষর এক সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। এই ভাবে লাইন কম্পোজ করে করে পরে লাইনগুলো পর পর বসানো হয়।

আমার অনুমান 'বাল্যস্মৃতি' প্রবন্ধের পাদটীকার ঐ লাইনটা কিভাবে ভুল করে 'আত্মকথা' প্রবন্ধের পাদটীকায় এসে বসে গেছে। তবুও * * * চিহ্ন দিয়ে এখানে পাদটীকা করাই ভুল। ছাপার আগে যিনি 'প্রিন্ট অর্ডার' দিতেন তিনিও এটা লক্ষ্য করেন নি।

শরৎ রচনাবলী ছাপার সময় শেষ প্রুফ দেখে প্রিন্ট অর্ডার দিতেন প্রধানতঃ অন্যতম সম্পাদক দেবীপদ ভট্টাচার্য। তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রিন্ট অর্ডার দিতেন আমাদের হেড প্রুফ রীডার।

২. শরৎ রচনাবলীর ৫ম খণ্ডে 'অজ্ঞাত রচনা' নামে একটা অধ্যায় আছে। আমার 'শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা' বইটি থেকেই ঐ অধ্যায়ের রচনাগুলি নেওয়া হয়েছে। আমার এই 'শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা' বইয়ে 'বারোয়ারি উপন্যাস' নামে শরৎচন্দ্রের একটা লেখা আছে। আমি আমার বইয়ে ঐ বারোয়ারি উপন্যাসের প্রসঙ্গ-কথায় প্রথমেই বলেছি—১৩২৭ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

শরৎ সমিতির 'শরৎ রচনাবলী'র ৫ম খণ্ডের ঐ 'অজ্ঞাত রচনা অধ্যায়' আমার বই দেখেই কম্পোজ হলেও কম্পোজিটার, প্রুফ সংশোধক এবং যিনি প্রিন্ট অর্ডার দিয়েছেন, তাঁরও ভুলে 'ভারতী' ছাপা হয়েছে 'ভারত' হয়ে।

৩. এই 'অজ্ঞাত রচনা' অধ্যায়ে ৬১২—৬১৫ পৃষ্ঠায় 'একটি অসমাপ্ত গল্প' আছে। ৬১২ পৃষ্ঠায় এই গল্পের একটি বাক্য—'এই মাত্র চিলের ছাদে বাসিয়া একটা দাঁড়কাক অতি কর্কশ কণ্ঠে খা খা করিয়া চীৎকার করিতেছিল।'

আর ৬১৪ পৃষ্ঠায় আছে—'ওরা যে যমের বাহন জ্যাঠামশাই। চিলের ছাতে বসে ডেকে ডেকে বাড়ি চিনিয়ে দেয়, তাইত যমের দূত চিনতে পারে।'

৬১৪ পৃষ্ঠায় 'চিলের ছাতে বসে' মুদ্রাকর প্রমাদে বইয়ে ছাপা হয়েছে—'চিলেরা ছাতে বসে'।

৪. শরৎ সমিতির শরৎ-রচনাবলীর ৫ম খণ্ডে শরৎচন্দ্রের 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থটি ছাপা হয়েছে। 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'স্বরাজ সাধনায় নারী' নামে একটা প্রবন্ধ আছে। শরৎ সমিতির বইয়ে এই 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধেও একটা ভুল ছাপা হয়েছে। এই প্রবন্ধের ২য় প্যারার প্রথমেই ছাপা হয়েছে 'তোমার দীর্ঘ অবকাশের প্রাক্‌কালে, তোমাদের এবং আমার পরমবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়…'

এখানে 'তোমার'টা ভুল, হবে—তোমাদের।

শরৎচন্দ্রের 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রকাশক (স্বত্বাধিকারীও, কারণ এই বইটি শরৎচন্দ্র ঐ প্রকাশককে দান করেন) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে শরৎ-চন্দ্রের কয়েকটি অগ্রন্থভুক্ত রচনা নিয়ে এই বইটি করেছিলেন। ঐ প্রকাশক শরৎচন্দ্রের কোন্ প্রবন্ধ কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন, সে সম্বন্ধে তাঁর বইয়ে কিছুই বলেন নি। তবুও আমি খোঁজ করে জানতে পারি প্রকাশক শরৎচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি সংগ্রহ করেন ১৩২৮ সালের পৌষ সংখ্যা 'নব্যভারত' পত্রিকা থেকে। তিনি নব্য-ভারত থেকে এই প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করতে গিয়ে উদ্ধৃতিতে প্রচুর ভুল করেছেন।

শরৎচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৬৩ সালের ১৯শে ফাল্গুন তারিখে যে 'শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহ' দশম ভাগ প্রকাশ করেন, তাতে এই প্রবন্ধটি ঐ ভুল সমেতই হুবহু ছাপা হয়েছে। পরে এই শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ যখন এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স থেকে ছাপা হয়, তাতেও ঐ সব ভুলই থেকে যায়।

শরৎ-সমিতির শরৎ-রচনাবলীর ৫ম খণ্ডের শেষে 'শরৎ-সাহিত্যের পাঠোদ্ধার' নামে আমি যে একটি প্রবন্ধ লিখেছি, তাতে 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থের 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধের ভুলগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

আমার নিজের সংগ্রহে শরৎচন্দ্রের এই 'স্বদেশ ও সাহিত্য' বই একখানি ছিল। শবৎ সমিতির শরৎ-রচনাবলীর জন্য ঐ 'স্বদেশ ও সাহিত্য' বইএর প্রেস কপি হিসাবে আমার নিজের ঐ বইটিই তখন ভুল সংশোধন করে কম্পোজ করতে দিয়েছিলাম।

আমাদের শরৎ-রচনাবলীতে মূলতঃ আমার সংশোধন অনুযায়ী 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে।

'স্বদেশ ও সাহিত্য' মূল বইয়ে 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধে অনেক ভুল থাকলেও, এঁরা যে ছেপেছিলেন 'তোমাদের দীর্ঘ অবকাশের প্রাক্‌কালে...' এটা ঠিকই ছেপেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার শরৎ রচনাবলীর বইয়ের কম্পোজিটার, প্রুফ সংশোধক এবং যিনি প্রিণ্ট অর্ডার দিয়েছিলেন তাঁরও ভুলে এটা হয়ে গেছে—'তোমার দীর্ঘ অবকাশের প্রাক্‌কালে...।'

অথচ যে কেউ একটু মন দিয়ে ঐ লেখাটা পড়লেই অতি সহজেই ধরতে পারতেন—শরৎচন্দ্র শিবপুর বি. ই. কলেজের ছাত্রদের বলেছেন—'তোমাদের'। তোমার হতেই পারে না।

কলকাতার একটি বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন সংস্থা শরৎচন্দ্রের গ্রন্থসমূহের কপিরাইট যাওয়ার আগে 'শরৎ-সাহিত্য সমগ্র' নামে শরৎচন্দ্রের রচনাবলী প্রকাশ করেন। 'শরৎ-সাহিত্য সমগ্রে' কোথাও উল্লেখ না থাকলেও, পরিষ্কার

দেখা যাচ্ছে, 'শরৎ-সাহিত্য সমগ্র'র পাঠ শরৎ-সমিতির 'শরৎ-রচনাবলী' থেকেই নেওয়া। আমি এখানে শরৎ-সমিতির শরৎ-রচনাবলীতে যে ক'টা ভুলের উল্লেখ করলাম, ঐ প্রকাশন সংস্থার 'শরৎ-সাহিত্য সমগ্রে' ঐ সব ভুলই হুবহু হয়েছে।

শরৎ-সমিতির শরৎ-রচনাবলীর ২য় খণ্ডে ৬০৬ পৃষ্ঠায় 'গ্রন্থ-পরিচিতি' অংশে লেখা হয়েছে—শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স থেকে। এটা ভুল। এটা হবে, প্রথম প্রকাশিত হয় এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স থেকে।

শরৎ-সমিতির শরৎ-রচনাবলীর ৫ম খণ্ডের শেষে 'শরৎ-সাহিত্যের পাঠোদ্ধার' নামে আমি যে প্রবন্ধটি লিখেছি, তাতে এই ভুলটা সংশোধন করে দিয়েছি। পূর্বোক্ত 'শরৎ-সাহিত্য সমগ্র' বইয়ের যিনি 'গ্রন্থ পরিচিতি' লিখেছেন—তিনি সম্ভবতঃ শরৎ সমিতির বইয়ের ৫ম খণ্ডের শেষে আমার ঐ 'শরৎ সাহিত্যের পাঠোদ্ধার' প্রবন্ধটি পড়েন নি। না পড়ায় শরৎ সমিতির বই-এর ২য় খণ্ডে ৬০৬ পৃষ্ঠায় 'নিষ্কৃতি'র প্রথম প্রকাশকের নামে যে ভুলটা আছে, তিনি ঠিক সেই ভুলই করে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্সের মালিক সুধীর চন্দ্র সরকার তাঁর 'আমার কাল ও আমার দেশ' বইয়ে যে লিখেছেন—'শরৎচন্দ্রের ছয়খানি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ভার আমরা পেলাম। এই বইগুলি হোলো—চন্দ্রনাথ, নারীর মূল্য, পরিণীতা, নিষ্কৃতি, বৈকুণ্ঠের উইল, চরিত্রহীন।'—এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সুধীরবাবুরা তাঁদের বইএর দোকান থেকে শরৎচন্দ্রের ছটা বইএর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন ঠিকই, তবে সে ছটা বই হ'ল—চন্দ্রনাথ, নারীর মূল্য, পরিণীতা, নিষ্কৃতি, পণ্ডিত মশাই ও চরিত্রহীন। 'বৈকুণ্ঠের উইল' এর প্রথম প্রকাশক ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর ৫০ বছর পরে আন্তর্জাতিক কপি রাইট আইন অনুযায়ী, তাঁরও বইএর কপি রাইট বা সত্ব তাঁর বংশধরদের হাত থেকে চলে গিয়ে সাধারণের সম্পত্তি হয়ে যায়। শরৎচন্দ্রের মৃত্যু তারিখ ২. ১. ১৯৩৮, সেই হিসাবে ২. ১. ১৯৮৮তেই কপি রাইট শেষ হয়ে গেলেও ঐ কপি রাইট আইনেই আছে, বছরের মধ্যে কোন একদিন ৫০ বছর পূর্ণ হলেও, সেই পুরা বছর শেষ হলেই তবে কপি রাইট যাবে।

সেই হিসাবে ১৯৮৮র ৩১শে ডিসেম্বর শরৎচন্দ্রের বইএর কপি রাইট শেষ হয় এবং ১৯৮৯ এর ১লা জানুয়ারি থেকে শরৎ সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ ঐ সময় থেকে যে কেউ শরৎচন্দ্রের বই প্রকাশ করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথের বইএর কপি-রাইট চলে যাওয়ার মুখে ভারত সরকার ১৯৬৬ সালে আমাদের দেশে কপি রাইট আইন ৫০ বছরকে ৬০ বছর করেছেন।

শরৎ-সাহিত্যে এই সব ভুলের প্রসঙ্গে এখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন—শরৎ-সাহিত্যের কপি রাইট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকের ন্যায় কলকাতার একটি বিশিষ্ট পুস্তক প্রকাশন সংস্থাও ঐ ১. ২. ৮৯ তারিখেই 'শরৎ সমগ্র' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই 'শরৎ-সমগ্র' বইয়েও সম্পাদক হিসাবে আমার নাম আছে। 'শরৎ-সমগ্র' বই প্রকাশিত হওয়ার মাত্র দেড় মাস আগে ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তখন এঁদের বইএর তিন-চতুর্থাংশ ছাপা হয়ে গেছে, বাকি এক-চতুর্থাংশ ছাপা শেষ হওয়ার মুখে। এঁরা আমাকে বললেন—'শরৎ-সাহিত্য সমগ্র' বই দেখে আমাদের বই ছেপেছি। ছাপায় ভুল নেই। বেশ কয়েকবার প্রুফ দেখাও হয়েছে।

জানতাম, ঐ বই শরৎ সমিতির বইএরই নকল।

এই সময় এঁরা আমাকে এঁদের বইয়ে সম্পাদক হিসাবে নাম দিতে অনুরোধ করেন। বললেন, এজন্য আপনার বাড়িতে ধর্ণা দোব ঠিক করে ছিলাম।

আমি বলি, আপনাদের বই কিভাবে ছেপেছেন তা তো আমি জানি না। তবুও আপনার ঐ কথা বিশ্বাস করেই বলছি—আমার তিনটে কথা যদি আপনারা শোনেন তো আপনাদের বইয়ে সম্পাদক হিসাবে নাম দিতে পারি—১. শরৎচন্দ্রের বহু ছবি বা ফটো ইত্যাদি—আমার কাছে আছে, সেগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ঐগুলো আপনাদের বইয়ে ছাপতে হবে। ২. শরৎচন্দ্রের কিছু অজ্ঞাত রচনা, যা শরৎ সমিতির 'শরৎ-রচনাবলী'তে ছাপতে পারিনি, সেগুলো ছাপতে হবে। ৩. শরৎ-সমিতির শরৎ-রচনাবলীতে যে সব মুদ্রাকর প্রমাদ ইত্যাদি আছে, সেগুলো সংশোধন করে দোব, ছাপতে হবে।

বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত শরৎচন্দ্রের ফটো বা ছবিগুলি নিয়ে আমার একটা মস্ত ভাবনা ছিল। পড়ে থেকে থেকে অনেক ছবি বিবর্ণ হয়ে আসছিল। অথচ ছবিগুলিকে ছাপিয়ে স্থায়ীভাবে রেখে যাওয়া আমার একটা প্রবল ইচ্ছা।

'ছবিতে শরৎচন্দ্র' নামে একটা বই করার জন্য শরৎ সমিতিকে একবার বলে ছিলাম। এঁরা তখন শরৎচন্দ্রের শুধু ছবিই নয়, আমার শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প, শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী প্রভৃতি বইগুলিও পুণর্মুদ্রণের আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তবে এঁরা লিখিতভাবে আমাকে একটা সর্ত দিয়েছিলেন। সর্তটা ছিল—এজন্য ৩/৪ জনকে নিয়ে একটা সম্পাদক মণ্ডলী হবে। তার মধ্যে আমি হব একজন, অপর সকলে হবেন শরৎ সমিতির।

ছবি, চিঠি, বৈঠকী গল্প সবই আমার সংগ্রহ এবং প্রসঙ্গ-কথা ইত্যাদি সবই আমার লেখা। এতে শুধু শুধু অন্য কয়েক জনের নাম দিতে যাব কেন? তাই শরৎ সমিতির ঐ সর্ত আমি মানতে পারি নি।

'শরৎ-সমগ্র'র মালিক শরৎচন্দ্রের ছবিগুলি ছাপবেন বলায় এবং আমার অপর দুটো কথায়ও সম্মতি দিলে আমি এঁদের বইয়ে সম্পাদক হিসাবে নাম দিই। তখন শরৎচন্দ্রের গ্রন্থসমূহের প্রকাশের কাল অনুসারে প্রতিটি গ্রন্থের বিস্তৃত প্রসঙ্গ-কথা লিখে দিই। যা শরৎ-সমিতির বইয়ে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দিতে পারি নি।

এঁরা আমার পূর্বোক্ত ৩টা সর্তই মেনেছেন সত্য, কিন্তু তাড়াতাড়ি করে বই ছেপে বার করার জন্য ঐ ৩টাতেই কিছু কিছু ভুল করেছেন। এঁদের 'শরৎ-সমগ্র' বইয়ে আমার 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী' দিতে নিষেধ করে ছিলাম, কিন্তু আমার কথা শোনেন নি। 'শরৎ-সমগ্র'র সব শেষে এই পত্রাবলী দিতে গিয়ে অত্যন্ত তাড়াতাড়ির জন্য কয়েকটা গুরুতর ভুলও করেছেন। এত তাড়াতাড়ির হেতু শরৎ সাহিত্যের কপি রাইট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ১. ১. ৮৯ তারিখে অন্যান্য প্রতিযোগিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজারে বই ছাড়তে হবে, এই ছিল তখন প্রধান লক্ষ্য। 'শরৎ-সমগ্র' বইয়ে এই 'পত্রাবলী' অধ্যায়ে যে ভুলগুলো হয়েছে, সেগুলোর কথা এখানে বলছি—

আমার 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী' বা 'শরৎচন্দ্র—৩য় খণ্ড গ্রন্থে সুধীরচন্দ্র সরকার এবং হরিদাস শাস্ত্রী ('শিবপুরের চিঠি'র মধ্যে), গারট্রুড সেন এবং হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে ('না-পাঠানো চিঠি'র মধ্যে) লেখা চিঠির পরে পরে যে একটা করে চিঠি ছেপেছি, সেই চিঠিগুলো কাকে কাকে লেখা তা জানতে পারি নি। তাই ঐ চিঠিগুলোর মাথায় '?' চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় লিখেছিলাম কাকে লেখা তা জানা যায় নি।

'শরৎ-সমগ্র'র মালিক তাঁর বই অফসেটে ছাপাবার জন্য তাড়াতাড়ি করে আমার বইএর পাতা কেটে ফিল্ম বা নেগেটিভ করতে দেবার সময় চিঠির মাথার ঐ '?' চিহ্নগুলো যে বাদ গেল তা আর লক্ষ্যই করলেন না। আর যেহেতু তিনি তাঁর বইয়ে চিঠির সঙ্গে কোন চিঠিরই প্রসঙ্গ-কথা দিতে পারেন নি, তাই পাদটীকায় ঐ 'কাকে লেখা তা জানা যায় নি'—তাও দেন নি। ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, '?' চিহ্নিত চিঠি এর আগের চিঠির প্রাপককেই যেন লেখা হয়ে গেছে। তাতে বেশ ভুলেরও সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে সম্বোধন আছে—ভায়া ; এর পরের '?' চিহ্নিত চিঠিতে সম্বোধন আছে—শ্রীচরণ কমলেষু।

আমার বইয়ে 'শিবপুরের চিঠি'র মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা চিঠির পর কাজী আবদুল ওদুদকে লেখা একটা চিঠি আছে। কিন্তু লাইনোর ছাপা কালে মুদ্রাকর প্রমাদে—'কাজী আবদুল ওদুদকে লেখা'—এই লাইনটা উঠে গেছে। বইয়ে 'ভ্রম সংশোধন' দিয়ে ওটা সংশোধন করে দেওয়া হয়েছে। 'শরৎ-সমগ্র'র মালিক তাড়াতাড়িতে ঐ 'ভ্রম সংশোধন'টাও আর দেন নি।

ফলে 'শরৎ-সমগ্রে' কাজী আবদুল ওদুদকে লেখা চিঠিটি দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রকে লেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'শরৎ-সমগ্র' গ্রন্থের মালিক ১ খণ্ডে, ২ খণ্ডে এবং ৫ খণ্ডে—এই তিন রকমের বই বার করেছিলেন। বই বেরুলে—বিক্রি শুরু হওয়ার আগেই—বই হাতে নিয়ে ছবিগুলো খুলে দেখি—কয়েকটা ছবিতেও ছবির পরিচিতি বা ক্যাপশানে বেশ ভুল হয়েছে। শেষ ছবির ভুলটা গুরুতর। ঐ ছবির পরিচিতিতে 'সামতাবেড়েয় শরৎচন্দ্রের সমাধি'র জায়গায় লেখা হয়েছে 'দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের সমাধি'।

এই দেখেই আমি তখনি 'শরৎ-সমগ্র'র মালিককে বললাম—এ ছবি পেলেন কোথায়? এ ছবি তো আমি আপনাকে দিইনি। তাছাড়া ছবির পরিচিতিতে দেবানন্দপুরে লিখেছেন কেন? হবে তো সামতাবেড়েয়!

উত্তর এল—দেবলীনা বন্দ্যোপাধ্যায় কাঞ্জিয়াল 'ছন্নছাড়া মহাপ্রাণ' নামে বিষ্ণু প্রভাকরের 'আওয়ারা মসীহা' নামক হিন্দী বইয়ের যে বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ করেছেন, তা থেকে এই ছবি এবং ছবির পরিচিতি নিয়েছি। ঐ বই প্রকাশ করেছেন—কলকাতার একটি বিখ্যাত পুস্তক প্রতিষ্ঠান।

আমি বললাম—বিষ্ণু প্রভাকর নিজে তাঁর বইয়ে এই ছবির পরিচিতি হিসাবে লিখেছেন—সামতাবেড়েয় শরৎচন্দ্রের সমাধি। লেখকের অজ্ঞাতে, সম্ভবতঃ অনুবাদিকারও অজ্ঞাতেই প্রকাশক এই ভুলটা করেছেন। এঁদের ঐ বইয়ে এমনই 'পথের দাবী'র কভারের ছবি ছেপে লিখেছেন—ছবিটা শরৎ-চন্দ্রের আঁকা। মোটেই কিন্তু তা নয়। ও ছবি শিল্পী নন্দলাল বসুর আঁকা। আর ছবির সঙ্গে 'পথের দাবী' এই লেখাটা শিল্পী গোপাল ঘোষের লেখা।—এঁদের কথা যাক্। আপনি এখনই এক কাজ করুন—আপনার বইএর এই শেষ ছবিতে আপনি যে লিখেছেন—'দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের সমাধি' এর 'দেবানন্দপুরে' শব্দটা অন্ততঃ কেটে দিন—শুধু থাক, 'শরৎ-চন্দ্রের সমাধি'। এক তো ওটা ঠিক সমাধি নয়। কেন না, শরৎচন্দ্রের মৃত দেহ দাহ হয়েছিল কলকাতায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে। শবদাহের পর কিছু চিতাভস্ম নিয়ে গিয়ে তাঁর হাওড়া জেলায় গ্রামের বাড়ি সামতাবেড়েয় রূপনারায়ণের তীরে এই স্মৃতি স্তম্ভটি হয়েছে।

প্রতি বছর শত শত লোক হুগলীর ব্যাণ্ডেল চার্চ দেখতে গিয়ে নিকটেই দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মস্থানও দেখতে যান। তাঁদের কেউ যদি আপনার এই বই পড়ে দেবানন্দপুরে গিয়ে স্থির করেন, গোপালবাবুর সম্পাদিত 'শরৎ-সমগ্র' বইয়ে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের সমাধির কথা পড়েছি, এখানে সমাধিটাও একবার দেখে যাই—তাঁরা সমাধি দেখতে গিয়ে কী দেখবেন? আর স্থানীয় লোকের কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে তাঁরাই বা কী বলবেন?

সমস্ত শুনেও 'শরৎ-সমগ্র'র মালিক উত্তর দিলেন—এখন আর বইয়ে কোন শব্দ কাটা চলবে না। বইয়ে কাটাকাটি দেখলে আমার বই বিক্রি হবে না। সব কাগজের প্রথম পাতায় আজ বহু টাকার বড় বড় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। ক্রেতারা এখনি এসে যাবে।

পরেও বলেছি—কাটাকাটি থাক, 'সামতাবেড়ের' শব্দটা কম্পোজ করে ছাপিয়ে এনে 'দেবানন্দপুরে'র উপর তাপ্পি দিন। আমিই এর সমস্ত খরচ দিচ্ছি।—তখনও উত্তর পেয়েছি—তাপ্পি দেওয়া দেখলে কেউ বই কিনবে না।

এই নিয়ে তখন বেশ কিছুদিন রীতিমত অস্বস্তিও বোধ করেছি। শেষে একদিন ৫ খণ্ডের 'শরৎ-সমগ্র'র মুদ্রাকরের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে বলে কোন রকমে ফিল্মের নেগেভিট থেকে 'দেবানন্দপুরে'টা মুছে দেওয়াই। এবং চিঠি-পত্রের অংশে কাজী আবদুল ওদুদকে লেখা এবং সর্বশেষ চিঠির মাথায় '?' (হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠির পরের চিঠিটায়) বসাবার ব্যবস্থা করি। তখন কিন্তু ঐ তিন প্রকারেরই 'শরৎ-সমগ্র' হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে।

পরে তিন রকমেরই ঐ 'শরৎ-সমগ্র' বইয়ে চিঠি, ছবি এবং বইয়েও ছাপার ভুল ইত্যাদি দেখিয়ে একটা কাগজে লিখে ঐ বইয়ের মালিককে দিয়েছিলাম। তিনি সে সব সংশোধন করেছেন কিনা জানি না। কেন না, এরপর থেকে ও বইয়ের আর কোন খোঁজই আমি রাখি না।

কিন্তু খোঁজ না রাখলে কি হবে ? একদিন আমার পরিচিত কলকাতার সেঞ্চুরী প্রেসের মালিক রবীন সরকার আমাকে বললেন—এম. সি. সরকারের দোকানে শুনে এলাম—একজন বলছেন, 'শরৎ-সমগ্র' বইয়ে গোপালবাবু কি সব ভুল করেছেন ?

এইরূপ আরও কতজন হয়ত বলছেন, এবং পরেও হয়ত বলবেন। তাই এর কৈফিয়ৎ হিসাবে এখানে ক'টা কথা বললাম। আর যাঁরা 'শরৎ-সমগ্র' বই কিনেছেন, তাঁরা আমার এই লেখা পড়লে তাঁদের কেনা ঐ বইয়ে এই ভুলগুলো সংশোধন করে নিতে পারবেন।

প্রকাশকের ত্রুটিতে আমার মতই নির্দোষ বিষ্ণু প্রভাকরকেও হয়ত শুনতে হবে—প্রভাকরজী কি ভুল করেছেন ?

প্রকাশকদের এবং তাঁদের নিযুক্ত অদক্ষ প্রুফ সংশোধকদেরও ভুলের জন্য শরৎচন্দ্রকেও অনেক নিন্দা শুনতে হচ্ছে।

শ্রীকান্ত—১ম পর্ব : ৭৫ তম প্রকাশ বর্ষ—

শরৎ-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই জানেন, শ্রীকান্ত—১ম পর্ব শরৎ-চন্দ্রের একটি সুপ্রসিদ্ধ বই ! এই বইএর ৭৫ তম প্রকাশ বর্ষ উপলক্ষে ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'চতুরঙ্গ' মাসিক পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম।

দীর্ঘদিন ধরে বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষে এক জায়গা থেকে অনেক কষ্টে শ্রীকান্ত—১ম পর্ব বইএর ২য় সংস্করণের একটা জেরক্স কপি সংগ্রহ করি। এই বইএর ১ম সংস্করণ আজও চোখে দেখি নি। শরৎ-সমিতির শরৎ-রচনাবলী সম্পাদনা কালে তখন বহু খোঁজা-খুঁজি করেও এই ২য় সংস্করণ বইও জোগাড় করতে পারি নি।

এখন শ্রীকান্ত—১ম পর্ব বইএর এই ২য় সংস্করণ, অন্যান্য সংস্করণ এবং ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীকান্ত—১ম পর্বের মূল লেখা—সব মিলিয়ে বেশ কিছু দিন সময় দিয়ে এই বইএর একটা পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা করেছি। এই পাঠোদ্ধার নিয়েই লেখা 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত আমার সেই প্রবন্ধটাই একরূপ এখানে দিচ্ছি—

১৩২৩ সালের মাঘ মাসে শরৎচন্দ্রের সুবিখ্যাত 'শ্রীকান্ত—১ম পর্ব' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বই প্রথম প্রকাশ করেন কলকাতার গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স।

শ্রীকান্ত—১ম পর্ব বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে ১৩২২ সালের মাঘ থেকে ১৩২৩ সালের মাঘ—এই ১৩ মাস 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' নামে 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পরে গুরুদাস ছাড়া আরও অনেক প্রকাশকই এ বই প্রকাশ করেন।

সেই গুরুদাস থেকে শুরু করে এখন শরৎ-সাহিত্যের কপি রাইট চলে যাওয়ায়, এ পর্যন্ত সকল প্রকাশক মিলে 'শ্রীকান্ত-১ম পর্ব' বইটি বোধ করি দশ লক্ষেরও অধিক কপি বিক্রয় করেছেন।

ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে এই বইটিরও অনুবাদ হয়েছে। আর ইংরাজি, ফরাসি, ইতালীয় এবং রুশ ভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে। 'শ্রীকান্ত-১ম পর্বে'র ইতালীয় অনুবাদ পড়ে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং শরৎচন্দ্রকে প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলেছিলেন।

পঁচাত্তর বছর ধরে এই বাঙলা বইটির এত বেশি প্রচার এবং সম্মান দেখে বাঙালি মাত্রেই গর্ব বা আনন্দ বোধ করতে পারেন। কিন্তু এই পঁচাত্তর বছর

ধরেই অর্থাৎ বইটি প্রথম প্রকাশের সময় থেকেই প্রকাশকের ভুলে, এমন কী শরৎচন্দ্রের নিজেরও কিছু অসবধানতায় বইয়ে যে সব মুদ্রাকর প্রমাদ, ছাড় ইত্যাদি ছোটো-বড়ো ভুল আজও চলে আসছে, সেজন্য বড় দুঃখও হয়। এখানে এই বইয়ের সেই ভুলগুলো নিয়েই কিছু আলোচনা করছি।

শরৎচন্দ্রের জীবিতকালেই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে 'শ্রীকান্ত—১ম পর্বে'র বহুবার পুনরমুদ্রণ হয়েছে। দেখা যায়, এইসব পুনরমুদ্রণকালে কোনো বার বইয়ে কোথাও কোনো পংক্তি বাদ পড়েছে, কোনো শব্দ বিকৃত হয়ে বসেছে। আবার কোথাও বা কোনো এক পুনরমুদ্রণকালে সেই বইয়ের প্রফ-সংশোধক নিজের ইচ্ছামতো এক-একটা শব্দও বসিয়েছেন। তাই গুরুদাসের এইসব পুনরমুদ্রণের বইয়ে একবারের সঙ্গে অন্যবারের কিছু-কিছু পাঠভেদও হয়েছে।

গুরুদাসের এই ধরণের কোনো এক পুনরমুদ্রণের বইকে আদর্শ করে এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স তাঁদের 'শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ' প্রকাশ করেন। ঐভাবেই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানিও তাঁদের শ্রীকান্ত বই ছাপান। এঁদের পরস্পরের 'শ্রীকান্ত—১ম পর্ব' বইয়েও একটু-আধটু ইতর-বিশেষ বা পাঠভেদ হয়েছে। আবার এম. সি. সরকারের বইয়ের সব পুনরমুদ্রণও হুবহু এক নয়।

শরৎ সমিতির 'শরৎ-রচনাবলী' সম্পাদনাকালে শরৎচন্দ্রের ঐসব গ্রন্থের সংশোধিত পাঠ-সহ তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের বিভিন্ন মুদ্রণের বা সংস্করণের পাঠ মিলিয়ে একটা সুষ্ঠু পাঠ উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলাম। তখন ভেবেছিলাম, মাসিকে প্রকাশিত রচনা যখন শরৎচন্দ্র কিছু-কিছু পরিবর্তন বা সংশোধন করে দিয়েই হোক বা হুবহু দিয়েই হোক প্রকাশককে বই করতে বলেছিলেন এবং পরেও কোনো-কোনো বইয়ের পাঠসংশোধন, এমনকি নতুন পাঠও সংযোজন করেছিলেন ('শরৎ-সাহিত্যের পাঠোদ্ধার' প্রবন্ধে এই নতুন সংযোজনের উদাহরণ দিয়েছি), তখন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম লেখার পাঠ আর মেলাবার প্রয়োজন হবে না। এই ভেবেই তখন সময়ের স্বল্পতাহেতু পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম লেখার সঙ্গে বইয়ের লেখা আর মেলাই নি। তবে একেবারে যে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম লেখার সঙ্গে মেলানো হয় নি, তা নয়, অনেক সময় মেলানো হয়েছে। যেমন একটা বলি—

'শ্রীকান্ত—৪র্থ পর্বে'র যতগুলো মুদ্রণ বা সংস্করণ ঐ সময় দেখেছিলাম, সব কটাতেই বইয়ের শেষ দিকে এক জায়গায় লেখা ছিল—'আকাশের এক প্রান্তে কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ পূর্ণ শশী।' সব বইয়েই এই অর্থহীন লেখাটা পড়ে তখন 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকা দেখে ভুল সংশোধন করে ছিলাম।

শরৎ সমিতির 'শরৎ-রচনাবলী' সম্পাদনাকালে তখন সময়ের অভাববশতঃই 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে

মিলিয়ে দেখা হয়নি, এই না দেখার জন্য, এখন দেখছি শরৎ সমিতির বইয়ের পাঠে ছোটো-বড়ো কিছু ভুল থেকে গেছে।

এখন দেখছি যে বললাম—এই দেখার অবশ্য একটা কারণও ঘটেছিল। সেই কারণ ইত্যাদির কথাই এখানে বিস্তৃত বলছি—

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন, 'শ্রীকান্ত—১ম পর্বে'র ইন্দ্রনাথ হলেন ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মামাদের প্রতিবেশী রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার। শরৎচন্দ্র ছেলেবেলায় বেশ কয়েক বছর ভাগলপুরে মামার বাড়িতে ছিলেন। তখন রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং বন্ধুত্ব হয়।

শরৎচন্দ্রের মাতুল এবং বাল্যবন্ধু সুলেখক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' গ্রন্থে এই রাজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছেন—'ইন্দ্রনাথ একটি কাল্পনিক নাম। ইন্দ্রনাথকে আমরা রাজেন্দ্রনাথ বলিয়া জানি। তাঁহার ডাক-নাম ছিল রাজু। রাজেন্দ্রনাথ আমাদের চেয়ে বয়সে পাঁচ-ছয় বৎসরের বড়ো ছিলেন। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশা সম্ভব হয় নাই। তবে দূরে থাকিয়া তাঁহার বীরত্বের কার্যকলাপ দেখিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে এবং আনন্দে বিমোহিত হইতাম।'

এই রাজেন্দ্রনাথ বা রাজুর এক ভাই মণীন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর একটি খাতায় 'রাজুদার কীর্তি' নামে সাতটি কাহিনী লিখে গেছেন। এই কাহিনী-গুলো নিয়ে আমি এক সময় 'দেশ' পত্রিকায় দু সংখ্যায় 'শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। মণিবাবুর লেখা ঐ সাতটি কাহিনীর মধ্যে ভাগলপুরে গঙ্গায় জেলেদের জাল থেকে রাজুর মাছ চুরির দুটি কাহিনীও আছে। একবারের মাছ চুরির কাহিনী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মণিবাবু প্রথমেই লিখেছেন—'রাজুদা একদিন বললেন, চলু জেলেদের জাল থেকে কিছু মাছ নিয়ে আসি।

গেলাম। এইভাবে গিয়ে মাঝে-মাঝে বিপদেও পড়তাম। জেলেরা গঙ্গায় মহাজাল ফেলে বড-বড় মাছ আটকে রেখেছে, রাজুদা এক-এক করে গোটা দুই বড় রুই মাছ তাঁর ডিঙিতে তুলে নিলেন।'

জেলেদের জাল থেকে ইন্দ্রর মাছচুরির প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তে লিখেছেন—'ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না, তখন এ-ধার হইতে ও-ধার পর্যন্ত উঁচু-উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দিকে জাল টাঙাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড় বড় রুই-কাৎলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনের, বিশ সের রুই-কাৎলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চোখের নিমেষে

নৌকায় তুলিয়া ফেলিল।'

মণিবাবুর লেখায় জেলেদের জাল পড়লাম—মহাজাল। অথচ শরৎচন্দ্রের লেখায় দেখছি ঐ জাল—মায়াজাল। এখন কোন্‌টা ঠিক? এই সমস্যার পড়ে ঠিক করলাম, 'শ্রীকান্ত—১ম পর্ব' বই হয়ে বেরোবার আগে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন শরৎচন্দ্র এই জালকে কী জাল বলেছিলেন দেখা যাক। এই স্থির করে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা খুলে দেখি, শরৎচন্দ্র সেখানে পরিষ্কার লিখে গেছেন 'মহাজাল'।

শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন 'মহাজাল'। মণিবাবুও লিখেছেন, 'মহাজাল', ভাগলপুরে ঐ অঞ্চলের লোকের মুখেও শুনেছি ঐ জাল মহাজাল। অন্যত্রও কারো-কারো কাছে শুনেছি, যে জাল দিয়ে বড় মাছ ধরা হয় বা যে জালে বড় মাছ জলে জিইয়ে রাখা হয়, তাকে মহাজালই বলে।

শরৎচন্দ্রের মূল লেখা 'মহাজাল' বইয়ে মায়াজাল হয়েছে দেখে ভাবলাম, তাহলে ভারতবর্ষে 'শ্রীকান্ত' মূল লেখা, বইয়ে আরও কত কীভাবে বদলেছে কিনা দেখি। এই ভেবে ভারতবর্ষে শ্রীকান্ত মূল লেখা, আমার বহু কষ্টের সংগৃহীত শ্রীকান্ত—১ম পর্ব ২য় সংস্করণের জেরক্স কপি এবং বিভিন্ন সংস্করণের এই বই নিয়ে মেলাতে বসি। বসে দেখি—

'শ্রীকান্ত—১ম পর্ব' বই হয়ে বেরুলে তাতে মুদ্রাকর-প্রমাদ ইত্যাদি কিছু-কিছু ছোটো-বড় ভুল থেকে যায়, যা শরৎচন্দ্র পরে আর কোনো দিনই লক্ষ্য করেন নি বা লক্ষ্য করলেও আলস্যবশতঃ আর সংশোধনের চেষ্টাও করেন নি। ফলে সেসব ভুল আজও সমানে চলে আসছে। এই ধরণের ভুল যা শ্রীকান্ত-১ম পর্বের ২য় সংস্করণেও দেখছি, (সম্ভবত ১ম সংস্করণেও এই ভুলই ছিল, ১ম সংস্করণটি আমি পাই নি) তার কয়েকটা উল্লেখ করছি—

১. শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লিখেছিলেন—'ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুৎগতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সে ইন্দ্রনাথ।'

শরৎচন্দ্র বই করার সময় বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে 'ভারতবর্ষে'র এই লেখাই যে দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যখন বই বেরুল, তখন দেখা গেল. এই লেখাই ছাপা হয়েছে এইভাবে—'ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুৎগতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সেই ইন্দ্রনাথ।'

ফুটবল ম্যাচে মারামারির সময় শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথকে প্রথম দেখে। এর আগে কোনদিন দেখে নি বা তার নামও শোনে নি। তাই এখানে 'সেই ইন্দ্রনাথ' হবে কেন? এ ছাড়া আগে 'যে মানুষটি' বলা হয়েছে যখন, তখন শেষে 'সে মানুষটি' বা 'সে ইন্দ্রনাথ' হওয়াই তো স্বাভাবিক।

এখানে 'সে'র বদলে 'সেই' মুদ্রাকর-প্রমাদ বলেই মনে হয়। বইয়ে শরৎচন্দ্র এটা আর লক্ষ্য করেন নি। বা লক্ষ্য করলেও সংশোধনের কোনো চেষ্টা করেন নি।

২. শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন—'মিনিট দুয়ের মধ্যেই তাহার পিঠ ঘেঁসিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা আড়ম্বরে কহিল—পালা।'

নিঃসন্দেহ যে শরৎচন্দ্র এই লেখাই বইয়ের পাণ্ডুলিপি করেই দিয়েছিলেন। কিন্তু 'শ্রীকান্ত—১ম পর্বে'র ২য় সংস্করণ (১ম সং?) থেকেই দেখছি—এই লেখার 'মধ্যেই' হয়ে গেছে 'মধ্যে'।

আগের উদাহরণে 'সেই ইন্দ্রনাথ'য়ে যেমন একটা 'ই' বসেছে, এখানে আবার 'মধ্যেই'-এর 'ই'টা উঠে গেছে।

৩. শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিতেও নিশ্চয় দিয়েছিলেন, 'এমন আস্ত দুটা ছাতির বাঁট পিঠের উপর কোনদিনও ভাঙে নাই।'

এইটাই বইয়ে একেবারে প্রথম থেকেই ছাপা হচ্ছে—এমন আস্ত দুটা ছাতির বাঁট পিঠের উপরও কোনদিন ভাঙে নাই।

৪. শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিতেও রেখেছিলেন—'চড়াটার নাম শুনিয়াছি; কহিলাম, সতুয়া চড়া ত ঘোরনালার সমুখে সে ত অনেক দূর।'

বইয়ে প্রথম থেকেই এই লেখার 'সতুয়া চড়া' ছাপা হচ্ছে 'সতুয়ার চড়া' হয়ে। 'ভারতবর্ষে' প্রথম লেখা 'সতুয়া চড়া'-ই ঠিক বলে মনে হয়। কারণ, আমি যখন প্রথম বার শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সন্ধানে ভাগলপুরে যাই, তখন সেখানে শরৎচন্দ্রের মামাদের একেবারে নিকট প্রতিবেশী ৮৪ বৎসর বয়স্ক চণ্ডীচরণ ঘোষের কাছে জানি যে, ওটা আসলে কোনো সতীর স্মৃতি-বিজড়িত চড়া। তা থেকে বিহারী নাম হয়েছে সতুয়া চড়া।

৫. শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন, 'প্রায়ই দেখিতেছি, এক-একটা জনার বা ভুট্টা গাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া ছপাৎ করিয়া শব্দ হইতেছে, একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই হইতে সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম।'

বইয়ের পাণ্ডুলিপিতেও শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই এই লেখাই রেখেছিলেন। কিন্তু বইয়ে প্রথম থেকেই 'হাতের কাছেই'-এর পর পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি দেওয়া হয়েছে। দাঁড়ি দেওয়ায় বাক্যটা সম্পূর্ণ হয় না। তাই 'ভারতবর্ষে'র' লেখাটাই ঠিক ছিল বলে মনে করি। গুরুদাসের প্রকাশিত বইয়ের ৭ম সংস্করণে কেবল দেখছি, কেউ নিজের বুদ্ধিতে 'হাতের কাছেই হইল।' লিখে পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে বাক্যটা সম্পূর্ণ করেছেন। তিনি ভারতবর্ষে মূল লেখার কথা না জেনে বা

না দেখে নিজের বুদ্ধিমতোই ঐরূপ করেছিলেন। এটা শরৎচন্দ্রের সংশোধন নয়, তাঁর সংশোধন হলে পরের সংস্করণেও এটাই থাকত।

এই গেল বইয়ের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদে কয়েকটা ভুলের কথা।

৬. 'শ্রীকান্ত—১ম পর্বে'র সমগ্র ৩য় পরিচ্ছেদটি প্রথম ১৩২২ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ ৩য় পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা নিয়ে ভক্তদের গাওয়া গান প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'যাহাদের রুচির সহিত মিশ খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল—এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কেহ গাহিতে পারিল না; এমন পাষাণ গলাইয়া স্রোত বহাইয়া দিতে আর কোথাও শুনিলাম না।'

গুরুদাসের প্রকাশিত ২য় সংস্করণ (১ম সং ?) সহ এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকাশকের প্রচলিত যতগুলি এ বই দেখেছি, সবেতেই দেখি, এই অংশটা ছাপা হয়েছে এইভাবে—'যাহাদের রুচির সহিত মিশ খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল—এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।'

'কেহ গাহিতে পারিল না; এমন পাষাণ গলাইয়া স্রোত বহাইয়া দিতে আর'—এই অংশটি বাদ গেছে।

ভারতবর্ষে'র মূলে লেখাটার মধ্যে দুটো 'আর' আছে। আমার অনুমান কম্পোজিটর এই অংশটা কম্পোজ করার সময় প্রথম 'আর' শব্দটা কম্পোজ করে অনামনস্ক হয়ে তার পরের অংশটা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় আর-এর পরের অংশটা কম্পোজ করেছিলেন। প্রুফসংশোধক ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি। পরে শরৎচন্দ্রও খেয়াল করেন নি। ফলে এই ভুল সমানে আজও চলে আসছে।

৭. শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিতেও নিশ্চয় দিয়েছিলেন, 'একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া দিদি উঠানে বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহজীর মাথা। তাঁহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে।'

এই লেখায় 'উঠানে' এবং 'পড়িয়া' শব্দ দুটি বইয়ে বাদ গেছে।

৮. ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তকে কিছু না জানিয়ে অন্নদাদিদির নিরুদ্দেশ হওয়ার প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন, 'পাছে তাঁহার এই স্নেহাস্পদ বালক দুটি তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয়'…।

বইয়ে ৭ম পরিচ্ছেদের ১ম অনুচ্ছেদে এই লেখাটাই একেবারে প্রথম থেকে ছাপা হচ্ছে 'এই স্নেহাস্পদ'র বদলে 'সেই স্নেহাস্পদ' হয়ে।

শরৎচন্দ্র নিজেও তাঁর 'ভারতবর্ষে'র প্রথম লেখায় কয়েকটা ভুল করে-

ছিলেন। পরে অবশ্য বই করার সময় কিছু সংশোধন করে দেন, আবার দু-একটা সংশোধন করেনও নি। সেজন্য সেসব ভুল আজও চলে আসছে। এখানে তারই উদাহরণ দিচ্ছি—

বইয়ের ২য় পরিচ্ছেদটি আগে ১৩২২ সালের ফাল্গুন সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'তারপর মজা করে সত্তুয়ার চড়ায় উঠে ভোর বেলায় সাঁতরে ওপারে গিয়ে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ি ফিরে গেলেই বাস্।'

বই করার সময় এই লেখার 'ওপারে গিয়ে' সংশোধন করে লেখেন 'এপারে এসে'।

'গঙ্গার ধারে ধারে', এটা এখন অনেক বইয়ে ছাপা হচ্ছে 'গঙ্গার ধার ধরে।' শরৎচন্দ্র এটার কোনো অদল-বদল করেন নি। 'ধারে ধারে'ই রেখেছিলেন।

শরৎচন্দ্র এই ২য় পরিচ্ছেদেই কেবল দু জায়গায় 'শ্রীকান্ত'র নামের বদলে লিখেছিলেন 'চন্দর'। (১) ইন্দ্রনাথের কথা—'দ্যাখ চন্দর, কিছু ভয় নেই, ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস্ ঘিরে ফেললে বলে, আর পালাবার যো নেই, তখন ঝুপ্ করে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল।' (২) জলমগ্ন চড়ায় ভুট্টা-জনারের ক্ষেতে ডিঙিতে বসে শ্রীকান্তর নিজের মনের কথা বা স্বগতোক্তি—'একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—চন্দর তুই একবার নেমে যা'।

এই মাছচুরি করতে আসার একটু আগেই ইন্দ্র শ্রীকান্তর পিসির বাড়িতে ছিনাথ বহুরূপীকে নিয়ে ঘটনাটার সময় সেখানে গিয়েছিল। তখন সেখানে শ্রীকান্তকে দেখে ইন্দ্র বলেছিল, 'তুই বুঝি এ বাড়িতে থাকিস্ শ্রীকান্ত?'

এরপর শ্রীকান্তর সঙ্গে মাত্র কয়েকটা কথা বলেই ইন্দ্র তাকে সঙ্গে করে মাছচুরির কাজে ডিঙিতে নিয়ে আসে। অতএব যে একটু আগে শ্রীকান্ত বলেছে, সে একটু পরেই তাকে চন্দর বলবে কেন? আর শ্রীকান্তও একটু পরে ডিঙিতে বসে মনে-মনে বলবে কেন—'একবারও বল্‌ল না, চন্দর তুই একবার নেমে যা।'

ফুটবল খেলার মাঠে শ্রীকান্তর সঙ্গে ইন্দ্রর প্রথম সাক্ষাৎ, দ্বিতীয় সাক্ষাৎ শ্রীকান্তর পিসির বাড়িতে ছিনাথ বহুরূপীর ঘটনার সময়, এই দ্বিতীয় সাক্ষাতের পরই শ্রীকান্তকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্রর গঙ্গাতীরে নিজের ডিঙিতে নিয়ে আসা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা তিনি লিখেছিলেন ১৩২২ সালের মাঘ মাসের 'ভারতবর্ষে'। আর মাছ চুরির ঘটনাটা ছাপা হয়েছিল 'ভারতবর্ষে' এক মাস পরে, অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের 'ভারতবর্ষে'। তখন মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার লেখা দুটো শরৎচন্দ্র একসঙ্গে লেখেন নি। ফাল্গুন সংখ্যার লেখাটা লিখতে গিয়ে পরে তিনি সম্ভবতঃ ইচ্ছা করেই শ্রীকান্ত না লিখে লিখেছিলেন চন্দর।

শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ-কাহিনী' নাম দিয়ে তাঁর 'শ্রীকান্ত—১ম পর্ব" বইয়ের প্রথমাংশের অনেকটা লিখেছিলেন রেঙ্গুনে বসে।

'ভারতবর্ষ" পত্রিকার মালিক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের ঐ সময়কার দুটো চিঠির কিছু-কিছু এখানে উদ্ধৃত করছি। প্রথম চিঠিতে লেখেন—'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না।...যদি বলেন ত আরও লিখি—আরও অনেক কথা লিখিবার রহিয়াছে।' এই চিঠি ১৫. ১১. ১৯১৫ তারিখের।

এরপর ৭. ১২. ১৯১৫ তারিখে দ্বিতীয় চিঠিতে লেখেন—'একটা ছোট গল্প পাঠাইয়া দিব। কারণ অসম্পূর্ণ গল্প আপনাকে আমিও পাঠাইতে চাহি না এবং তাহা সম্পূর্ণ হইবার ভরসায় ছাপাইতে বলিতেও আমি পারি না। তবে চন্দর কান্তের কাহিনী স্বতন্ত্র।'

ঐ চিঠি দুটি থেকেও বোঝা যায়—শরৎচন্দ্র মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে"র জন্য লেখাটা আগে এবং ফাল্গুন সংখ্যার লেখাটা পরে লিখেছিলেন। ধারাবাহিক রচনা 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'র ফাল্গুন সংখ্যার লেখাটায় শরৎচন্দ্র নিজেই বদলে চন্দর লিখেছিলেন বলেই, তখন তিনি হরিদাসবাবুকেও চিঠিতে লিখে-ছিলেন—'তবে চন্দর কান্তের কাহিনী স্বতন্ত্র।'

বইয়ের নাম 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'। লেখার প্রথম যে অংশ মাঘ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়, তাতে শরৎচন্দ্র দু জায়গায় শ্রীকান্তের নাম 'শ্রীকান্ত'ই লেখেন। চন্দর লেখেন নি।

তাই এখন প্রশ্ন: শরৎচন্দ্র হঠাৎ 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীকান্ত না লিখে চন্দর লিখলেন কেন? আর কেনই বা হরিদাস-বাবুকে লিখলেন 'চন্দর কান্তের কাহিনী'? তবে কি শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'কে 'চন্দর কান্তের কাহিনী' বলে লিখবার কথাও শরৎচন্দ্রের মনের মধ্যে তখন উঁকি দিয়েছিল?

এবার শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষে" লিখলেও পরে বই করার সময় সংশোধন করেন নি এবং আজও যা চলে আসছে, তারই উদাহরণ দিচ্ছি—

শরৎচন্দ্র ১ম পরিচ্ছেদের গোড়ার দিকে ইন্দ্রনাথের সিগারেট খাওয়া প্রসঙ্গে লিখেছেন—'আচ্ছা তা হলে সিগারেট খা। বলিয়া আর একটা পকেট হইতে গোটা দুই সিগারেট ও দেশলাই বাহির করিয়া একটি আমার হাতে দিয়া অপরটা নিজে ধরাইয়া ফেলিল। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফেলে?'

এখানে শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের জবানিতে ইন্দ্রনাথের সিগারেট খাওয়ার কথা বলেও পরে সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীকান্তর মুখ দিয়ে 'চুরুট খাওয়ার' কথা বলালেন। সিগারেট এবং চুরুট দুটো তো আলাদা? নাকি?

শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন—'ও তাই ত কাল জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙে পড়লে ডিঙি শুদ্ধ আমরা শুদ্ধ সব গুঁড়িয়ে যাব।' এই লেখাটা বইয়ের ২য় পরিচ্ছেদে আছে। ২য় সংস্করণ বইয়েও দেখছি, এই লেখাই হুবহু ছাপা হয়েছে। পরে বইয়ের কোনো সংস্করণে প্রুফ-সংশোধকই সম্ভবতঃ 'আমরা শুদ্ধ'র শুদ্ধটা তুলে দিয়ে করে দেন 'ডিঙি শুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব'। এখনকার বইয়ে এইটাই ছাপা হচ্ছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র যে লিখলেন, 'কাল জল হয়ে গেছে'—এই কথাটায় আমার একটু বক্তব্য আছে—কাল জল হতে পারে। কিন্তু একটু আগেই বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদে এই মাছচুরি করতে আসার রাত্রিটার সন্ধ্যার সময়কার কথায় শরৎচন্দ্র নিজেই তো লিখেছেন—'সারাদিন অবিশ্রান্ত (ভারতবর্ষে ছিল অবিশ্রামে) বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে।'

এখানে শরৎচন্দ্র যদি গতকাল বৃষ্টি হওয়ার কথা রেখেও লিখতেন—কাল জল হয়ে গেছে, আজও সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েছে, তাই আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না—তাহলেই মনে করি বলাটা ঠিক হ'ত। শরৎচন্দ্র এখানে আজ সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের কথাটা একেবারে ভুলে গেছেন।

এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের 'শরৎ সাহিত্য সংগ্রহে'র 'শ্রীকান্ত ১ম পর্বে'র সপ্তম মুদ্রণের বইয়ে কেবল প্রুফ-সংশোধক শরৎচন্দ্রের এখানে এই 'কাল'টা ধরেছিলেন, তাই তিনি ঐ ৭ম মুদ্রণের বইয়ে করে দেন—'ও তাই ত কালো জল হয়ে গেছে।' কালো অর্থাৎ কাল-ও।

শরৎচন্দ্রের কেন এ ভুলটা হ'ল? এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—এই বইয়ের শুধু প্রথম পরিচ্ছেদেই আছে সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা যাতে 'কাল জল হয়ে গেছে' আছে,—এটা পরের মাসের 'ভারতবর্ষে' ছাপা হয়েছিল। মনে হয় এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা লেখার সময়, আগে যে লিখেছিলেন—'সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হয়েছে'—এ কথাটা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই ঐ সারাদিনের বৃষ্টির কথাটা আর লেখেন নি।

শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লিখেছিলেন—(ইন্দ্র) 'কহিল, চুপ শালারা টের পেয়েছে—চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এ দিকে আসছে, ঐ দ্যাখ্।—তাই তো বটে! প্রবল জলতাড়নায় ছপাছপ্ শব্দ করিয়া তিনখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে।'

'শ্রীকান্ত—১ম পর্বে' ২য় সংস্করণেও (১ম সং?) দেখছি হুবহু এই লেখাই ছাপা হয়েছে।

এখানে একটা কথা—ইন্দ্র বল্‌ল, চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসছে—ঐ দ্যাখ।' ইন্দ্রর এই কথা শুনে শ্রীকান্ত নৌকা দেখে যখন বুঝল বা বুঝে বল্‌ল—তাই ত বটে, তখন শ্রীকান্তের দৃষ্টিতে চারখানা না হয়ে আবার তিনখানা হবে কেন ? চারখানা হওয়াই তো ঠিক ?

তবে এখানে এ সম্পর্কে শুধু বলা যেতে পারে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল—চুপ……' ইত্যাদি। নৌকাখানা আরো খানিকটা ভুট্টা-জনারের ক্ষেতের ভিতর পাঠিয়ে দেওয়ায় শ্রীকান্ত সেই ভুট্টা-জনারের ক্ষেতের ভিতর থেকে হয়তো তিনখানা নৌকা দেখতে পেয়েছিল, গাছের আড়ালে একটা দেখতে পায় নি। তাই তিনখানা দেখার কথা হয়েছে।

শ্রীকান্ত—১ম পর্ব, ২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে এখন একদিকে যেমন দেখছি—শরৎচন্দ্র নিজেই লক্ষ্য না করায় বইয়ে প্রথম থেকেই কিছু ভুল চলে আসছে, তেমনি এই বইটি পেয়ে আবার সুষ্ঠু পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে অনেক উপকারও হয়েছে। সেই পাঠ উদ্ধারের কয়েকটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি—

শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত-১ম পর্ব' বইয়ের ৩য় পরিচ্ছেদে এক জায়গায় লিখে-ছিলেন—'দক্ষিণ দিকের চরের বিস্তৃতি বশতঃ এ জায়গাটা একটি ছোটখাটো হ্রদের মত হইয়াছিল—শুধু উভয় দিকের মুখ খোলা ছিল।'

গুরুদাসের শেষের দিকের বই থেকে শুরু করে যত প্রকাশকের বই পেয়েছি, সবেতেই দেখেছি 'উভয় দিকের মুখ খোলা'র বদলে 'উত্তর দিকের মুখ খোলা।'

এখন ২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে এর সঙ্গে 'ভারতবর্ষে'র লেখা মিলিয়ে দেখলাম, দু জায়গাতেই আছে 'উভয় দিক'। ২য় সংস্করণের বইটা পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম যে, শরৎচন্দ্র 'উভয় দিকই' লিখেছিলেন। এই ভুলটা মুদ্রাকর প্রমাদ বা প্রুফ-সংশোধকের কাজ।

'শ্রীকান্তে'র ১ম পর্বের ৮ম পরিচ্ছেদে এক জায়গায় শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—'মুহূর্তের জন্য পিয়ারীর মুখের উপর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সজল হাসির আভা দেখা দিল।'

এইটাই এখন বাজারে প্রচলিত সমস্ত বইয়েই ছাপা হয়েছে এবং হচ্ছে—'সজল হাসি'র পরিবর্তে 'সহজ হাসি'। 'মেঘলা জ্যোৎস্না'র মতো যখন, তখন 'সজল হাসি' হওয়াই তো স্বাভাবিক।

২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে দেখছি, তাতে পরিষ্কার লেখা রয়েছে 'সজল হাসি'। এখানেও ঐ মুদ্রাকর প্রমাদ বা প্রুফ-সংশোধকের কাণ্ড।

বইয়ে ঐ ৮ম পরিচ্ছেদেই শরৎচন্দ্র মুমূর্ষু নিরুদিদির প্রসঙ্গে লিখে ছিলেন—'নিরুদিদি স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া হাত তুলিয়া আমার কানটা তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন—শ্রীকান্ত, তুই বাড়ি যা।'

এখনকার সমস্ত বইয়ে 'স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে' ভুল করে ছাপা হচ্ছে 'স্বাভাবিক মুক্তকণ্ঠে' হয়ে। এখানেও ঐ মুদ্রাকর প্রমাদ অথবা প্রুফ-সংশোধকের ভুল।

গুরুদাসের বইয়ের ৭ম সংস্করণের প্রুফ-সংশোধক মুমূর্ষুর ক্ষেত্রে 'মুক্ত-কণ্ঠ' হতে পারে না, ভেবেই হয়তো করেছিলেন 'স্বাভাবিক স্নিগ্ধকণ্ঠে'। ঐ প্রুফ-সংশোধক ভারতবর্ষের লেখা বা ২য় সংস্করণের পাঠ না দেখে বা দেখার সুযোগ না পেয়ে নিজের বুদ্ধিতেই এটা করেছিলেন। 'স্বাভাবিক মুক্তকণ্ঠ'কে করে দেন 'স্বাভাবিক স্নিগ্ধকণ্ঠ'।

বইয়ের ঐ ৮ম পরিচ্ছেদেই শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—'কিন্তু এই বাইজীর প্রতি আমার কি যে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল, সে হাজির হইলেই আমাকে কিসে যেন মারিতে থাকিত; উঠিয়া গিয়া তবে স্বস্তি পাইতাম।'

এখনকার সমস্ত বইয়ে 'তবে স্বস্তি পাইতাম'-এর 'তবে'টা নেই। শুধু আছে—স্বস্তি পাইতাম।

'ভারতবর্ষে'র প্রথম লেখায় এবং ২য় সংস্করণের বইয়েও 'তবে' আছে দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, শরৎচন্দ্রের মূল লেখা থেকে যে-কোনো কারণেই হোক 'তবে' বাদ গেছে।

শরৎচন্দ্র ১৩২৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (পৃ ৯২৯) লিখে ছিলেন,—পিয়ারী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, তাহলে তাঁবু থেকে তোমাকে ভূতে উড়িয়ে এনেচে, বোধ করি বলতে চাও ?

—না, তা বলতে চাইনে, উড়িয়ে কেউ আনে নি; নিজেই পায়ে হেঁটে এসেছি সত্যি। কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পারিনে।'

এখন দেখা যাচ্ছে, সকল প্রকাশকের বইয়েই 'ভূতে'টা নেই। আর 'নিজেই'-এর জায়গায় হয়েছে 'নিজের'।

এখানে প্রথম প্রকাশক গুরুদাসের ২য় সংস্করণের বইয়ে যখন দেখলাম, 'ভারতবর্ষে'র লেখাই হুবহু ২য় সংস্করণেও ছাপা হয়েছে, তখন পরিষ্কার বোঝা গেল—পরে যেভাবেই হোক বিকৃতি ঘটেছে। শরৎচন্দ্র নিজে কিছুই করেন নি এবং পরে তিনি এটা লক্ষ্যও করেন নি।

দ্বিতীয় সংস্করণের বইটি না পেলে এই বিকৃতিটা কিছুতেই ধরা পড়ত না। মনে হ'ত—হয়তো শরৎচন্দ্রই ঐরূপ বদল করে গেছেন।

এখনকার সমস্ত বইয়ে ছাপা হয়েছে—'অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম, রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া

টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া ও-দিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল।' (১২শ পরিচ্ছেদ)

এই লেখায় 'ওদিকে দরজার কোণে'র জায়গায় শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষে' লিখে ছিলেন—'ও-দিকের দরজার কোণে'। ২য় সংস্করণের বইয়েও দেখেছি আছে, 'ও-দিকের দরজার কোণে'—এই দেখে বোঝা গেল যে শরৎচন্দ্র 'ও-দিকের'ই লিখেছিলেন। 'ও-দিকের' পরে কিভাবে 'ও-দিকে' হয়ে গেছে।

পাঠ উদ্ধারের ব্যাপারে ২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে এই যেমন কিছু উপকার হয়েছে, তেমনি ২য় সংস্করণের বই পেয়েও কয়েকটা ক্ষেত্রে প্রকৃত পাঠ নিয়ে সন্দেহ থেকেও যাচ্ছে, নিশ্চিত হতে পারা যাচ্ছে না। যেমন—'শ্রীকান্ত-১ম পর্ব' গ্রন্থের ১২শ পরিচ্ছেদে এক জায়গায়, এ পর্যন্ত সকল প্রকাশকের বইতেই, গুরুদাসের ঐ ২য় সংস্করণেও (১ম সং ?) আছে—'একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ি একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসবাবপত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম।

বহুলোকের বহুবিধ কামনা-সাধনার উপহার রাশি এমনি ঠাসাঠাসি গাদা-গাদি ভাবে চোখে পড়ে যে, দৃষ্টিপাত মাত্রই মনে হয় এই অচেতন জিনিসগুলোর মত তাহাদের সচেতন দাতারাও যেন এই বাড়ির মধ্যে একটুখানি জায়গার জন্য এমনি ভীড় করিয়া পরস্পরের সহিত রেষারেষি ঠেলাঠেলি করিতেছে।'

গুরুদাসের ২ম সংস্করণের বইয়ে ছাপা হয়েছে 'একদিন সকালে একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া,' 'পিয়ারীর বাড়ি'—বাদ। অথচ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথমে শরৎচন্দ্রের যে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী' প্রকাশিত হয়, তাতে এই লেখাটায়—'একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ি একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া'র জায়গায় ছিল 'একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ি এবং ঘরে ঘরে ঘুরিয়া', আর 'বহু লোকের বহুবিধ কামনা-সাধনার' জায়গায় ছিল 'বহু লোকের বহুবিধ কামনা-বাসনার।' এখানে আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষে' যা লিখে-ছিলেন সেটাই ঠিক।

শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন—'সহসা মনে হইল, তাইত। তাঁহার ঐ নির্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অন্ত্যজ হীন অন্তেবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য ?'

এই লেখার 'অন্ত্যজ হীন অন্তেবাসীর মত' অংশটা সেই ১৩২৫ সালের ২য় সংস্করণের (১ম সং ?) বই থেকে শুরু করে আজও সবার বইয়েই ছাপা হচ্ছে 'অত্যন্ত হীন অন্তেবাসীর মত'। আমার দৃঢ় ধারণা শরৎচন্দ্র বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে 'অন্ত্যজ'ই রেখেছিলেন। পরে ছাপা হলে বইয়ের এই ভুলটা তিনি আর কোনো দিনই লক্ষ্য করেন নি।

এই দৃঢ় ধারণা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—শরৎচন্দ্র এখানে যার নির্বাক

আহ্বানের কথা বলেছেন, একটু আগেই বইয়ে তার আহ্বানের প্রসঙ্গে লিখছেন, 'সেই ধুলোবালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দুটি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। মনে হইল সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল, ছি-ছি ; ও তুই কি করিলি ? তোকে এতটা পথ যে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সেকি ঐখানে বসিয়া পড়িবার জন্য ? আয় আয় ! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়। এমন অশুচি অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে বসিস না—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস।'

এখানে আহ্বানকারীই তো শ্রীকান্তকে বলেছে—'অশুচি অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে বসিস না'—অতএব শ্রীকান্তও যখন আহ্বানকারীর কথা স্মরণ করে বা পুনরাবৃত্তি করে বলছে, তখন সে তো 'অন্ত্যজ হীন অন্তে-বাসী'ই বলবে।

এখনকার সকল প্রকাশকেরই এই বইয়ের ৯ম পরিচ্ছেদের ১ম অনুচ্ছেদে প্রথমেই লেখা হয়েছে, 'মানুষের অন্তর জিনিসটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে কাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না—আমি শুনিয়া লজ্জায় আর বাঁচি না। আমার শুধু নিজের মনটাই নয় ; পরের সম্বন্ধেও দেখি, তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই।'

এই লেখায় 'আমার শুধু নিজের মনটাই নয়'-এর স্থানে শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন 'আবার শুধু নিজের মনটাই নয়'। ২য় সংস্করণের বইয়েও দেখেছি 'আবার'ই আছে। এ থেকে বোঝা যায় পরবর্তী কালে শরৎচন্দ্রের লেখা 'আবার'কে 'আমার' করা হয়েছে। গরুদাসের বইয়ের ৭ম সংস্করণে 'আবার' আছে।

ঐ প্রথম অনুচ্ছেদেই শেষ দিকে এখনকার সব বইয়েই ছাপা হচ্ছে—'তোমার কোটী-কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভুয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞান-ভাণ্ডটুকু এক মুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটা কি একটিবারও মনে পড়ে না।'

এই লেখায় 'হঠাৎ জাগরিত হইয়া'র স্থানে শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষে' প্রথমে লিখেছিলেন 'হঠাৎ জাগ্রত হইয়া'। ২য় সংস্করণেও তাই আছে।

২য় সংস্করণের (১ম সং ?) বই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল বইয়েই ছাপা হচ্ছে 'এক মুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে,' এইটাই কিন্তু শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষে' লিখে ছিলেন এইভাবে—'এক মুহূর্তে গুঁড়া না করিয়া দিতে পারে।'

এখানেই সমস্যা দেখা দিচ্ছে—তাহলে কি শরৎচন্দ্র নিজেই ভারতবর্ষের লেখা নিয়ে বই করার সময় ভারতবর্ষের ঐ লেখা থেকে 'না' তুলে দিয়েছিলেন, না, প্রুফ-সংশোধক এ কাজ করেছিলেন ?

আমরা তো জানি. বাঙলা ভাষায় কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য সেই বাক্যের পরে 'না' বসিয়ে ক্রিয়া দেখানো হয়। যেমন—শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।' এখানে 'না'র অর্থ সত্যকার 'না' নয়, বরং 'হাঁ'ই।

শরৎ সমিতির 'শরৎ রচনাবলী' সম্পাদনা-কালে ঐ রচনাবলীর ৫ম খণ্ডের শেষে 'শরৎ সাহিত্যের পাঠোদ্ধার' নামে যে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তাতে এক জায়গায় লিখেছিলাম—

'শরৎ-সাহিত্যে'র পাঠক-পাঠিকারা সকলেই জানেন, তিনি লেখার মধ্যে বক্তব্যকে জোরালো এবং শ্রুতিমধুর করবার জন্য বাক্যের মধ্যে কোনো-কোনো শব্দের শেষে ই, ও, ত প্রভৃতি দিয়েছেন। এখনকার প্রচলিত শরৎ-সাহিত্যে বহু ক্ষেত্রেই সেগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে।'

ঐ প্রবন্ধে অনেক উদাহরণ দিয়েছি।

'শরৎ রচনাবলী' সম্পাদনা কালে এই ধরণের প্রচুর ভুল সংশোধন করলেও এখন ২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে দেখছি, শরৎ সমিতির বইয়েও এই রকম ভুল আরও কিছু রয়ে গেছে। যেমন—১. হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বরই কানে আসিয়া লাগিল। (১ম পরিচ্ছেদ)। 'বংশীস্বরই' ছাপা হয়েছে 'বংশীস্বর' হয়ে।

২. ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজ খবর লইত না। সমস্তটা নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। (১ম পরিচ্ছেদ), 'সমস্তটা' হয়েছে 'সমস্ত'।

৩. ঠিক আমার মত হয়েও যদি কেউ আসে, তবু দিবি নে। (৩য় পরিচ্ছেদ)। 'আমার মত হয়েও' হয়েছে 'আমার মত হয়ে।'

৪. নিতান্ত শিশুটি ত নহি যে তাহার ইঙ্গিতের মর্ম অনুমান করিতে পারি নাই। (৩য় পরিচ্ছেদ)। বইয়ে 'শিশুটি ত নহি' থেকে ত বাদ গেছে।

বলা বাহুল্য বাজারে প্রচলিত সকল প্রকাশকের বইয়ে এ সব ভুল তো আছেই। আবার শরৎ সমিতির বইকে অনুসরণ করে যাঁরা বই ছাপছেন, তাঁদের বইয়েও, এ সব ভুল থেকে যাচ্ছে।

২য় সংস্করণের বইটি পেয়ে এই বইয়ের লেখার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'ভারত-বর্ষে'র প্রথম লেখা মেলাতে গিয়ে দেখছি, ২য় সংস্করণের বইয়েও এইরূপ ই,

ও, ত প্রভৃতি অনেক বাদ গেছে। যেমন ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের সাময়িক বিচ্ছেদের প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন—

১. 'তারপর অনেকদিন সেও আমার সন্ধান করিল না, আমিও না। দৈবাৎ পথে ঘাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমনি করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতেই পাই নাই। কিন্তু আমার এই 'যেন'টা আমাকেই ত শুধু সারাদিন তুষের আগুনের মত দগ্ধ করিত, তাহার কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত।'—এই অংশটা বইয়ের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১ম অনুচ্ছেদ। এই লেখায় 'আমার সন্ধান করিল না'—হয়েছে 'আর সন্ধান করিল না' এবং 'দেখিতেই' 'দেখিতে' হয়ে বইয়ে ছাপা হচ্ছে, আর 'আমাকেই ত শুধু'র 'ত' বাদ গেছে। ২য় সংস্করণের বইয়ে 'আমার সন্ধান করিল না' থাকলেও 'দেখিতেই'-এর 'ই' এবং 'আমাকেই ত শুধু'র 'ত' বাদ গেছে।

২. শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রথমে লিখেছিলেন—'বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়েই তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম। আর, আর একজন আমাদেরই কোলের কাছে মৃত্তিকাতলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া রহিল।'

শাহজীকে কবর দেওয়ার পরের এই ঘটনাটা বইয়ের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে রয়েছে। এই লেখার 'হৃদয়েই' এবং 'আমাদেরই' শব্দ দুটি থেকে শেষের 'ই' এবং 'আর, আর একজন' এর কমাচিহ্ন সমেত প্রথম 'আর' শব্দটা একেবারে ২য় সংস্করণ (১ম সং?) থেকেই নেই।

৩. বইয়ের ৯ম পরিচ্ছেদের শেষ বাক্য সেই ২য় সংস্করণ থেকেই আজও সর্বত্র ছাপা হচ্ছে—'সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙা ঘাটের উপর গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ঐ সম্মুখে মিলাইল।'

শরৎচন্দ্র 'ভারতবর্ষে' তাঁর প্রথম লেখায় 'তাহার পদশব্দ'র বদলে লিখেছিলেন 'তাহারই পদশব্দ'।

২য় সংস্করণের বইয়ে যে এই ধরণের ভুলগুলো ছিল, শরৎচন্দ্র পরে তা লক্ষ্য করেন নি, কিংবা লক্ষ্য করলেও তা আর সংশোধনের চেষ্টা করেন নি।

৪. শরৎচন্দ্র প্রথমে 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন—

'বড় ঘুম পেয়েছে ইন্দ্র, বাড়ি ফিরে চল না ভাই। ইন্দ্র বলিল, ঘুম ত পাবার কথাই ভাই। কি করব শ্রীকান্ত আজ একটু দেরি হবেই—অনেক কাজ আছে। আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন, ঐখানেই একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নে না।'

এইটাই বইয়ে ৩য় পরিচ্ছেদের প্রথমেই ছাপা হয়েছে। কিন্তু একেবারে ২য় সংস্করণের (১ম সং?) বই থেকেই আজও এই লেখায় 'ঐখানেই' ছাপা হয়েছে এবং হচ্ছে 'ঐখানে'।

৫. এই ৩য় পরিচ্ছেদেই শেষদিকে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—এক 'বিলাত-

ফেরত' 'একঘরের' বাড়িতে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হলে শ্রীকান্ত প্রভৃতি সেই মৃতদেহ দাহ করতে যায়। এতে স্থানীয় সমাজপতিরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন—এজন্য শ্রীকান্তদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শ্রীকান্ত ও তার দল তখন স্থানীয় ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হয়। তিনি বিনা দক্ষিণায় বাঙালির বাড়িতে চিকিৎসা করতেন। ডাক্তারবাবু শ্রীকান্তদের কথা শুনে রেগে গিয়ে প্রকাশ করেন—তিনি ঐ সমাজপতিদের বাড়িতে আর চিকিৎসা করতে যাবেন না।—ডাক্তারবাবুর এই ঘোষণা শুনে সমাজপতিরা শ্রীকান্তদের উপর থেকে প্রায়শ্চিত্তের দণ্ডাদেশ তুলে নেন।

এর পরের কথায় শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'কিন্তু ডাক্তারবাবু কহিলেন—প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নেই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে এই দুটা দিন ইহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছেন, সেইজন্য যদি প্রত্যেকে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান, তাহা হইলে তাঁহার যে কথা সেই কাজ, অর্থাৎ কাহারও বাটিতে যাইবেন না। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলাতেই ডাক্তারবাবুর বাটিতে এক-এক বৃদ্ধ সমাজ-পতিদিগের শুভাগমন হইয়াছিল। আশীর্বাদ করিয়া তাঁহারা কি কি বলিয়া-ছিলেন, তাহা অবশ্য শুনিতে পাই নাই, কিন্তু পরদিন ডাক্তারবাবুরও আর ক্রোধ ছিল না।'

এখানে উদ্ধৃত এই লেখাটাই প্রথমে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ২য় সংস্করণের (১ম সং ?) বই থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সব বইয়েই দেখা যাচ্ছে 'ডাক্তারবাবুরও আর ক্রোধ ছিল না'র জায়গায় 'ডাক্তারবাবুর আর ক্রোধ ছিল না।' 'ও' উঠে গেছে।

এম. সি. সরকারের ৭ম মুদ্রণের বইয়ে আবার 'ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান' ছাপা হয়েছে 'ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যান' হয়ে। 'না' শব্দটা উঠে যাওয়ায় উলটো অর্থ দাঁড়িয়েছে।

এখনকার প্রচলিত সমস্ত শ্রীকান্ত—১ম পর্ব বইয়েই এখানে আলোচিত এই ভুলগুলো তো বটেই, এছাড়া আরো কিছু-কিছু এই ধরণের ছোটোখাটো ভুল চলে আসছে। এই বইয়ের নির্ভুল পাঠের জন্য এগুলো সংশোধন হওয়া একান্তই প্রয়োজন। মূল লেখায় শরৎচন্দ্র নিজে যেখানে কিছু ভুল করেছেন, তাতে হাত না দিয়ে, সেখানে মন্তব্য করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকাশকরা বইয়ে যেসব ভুল করেছেন, সেগুলোর সংশোধন দরকার। দীর্ঘকাল ধরে বইয়ে প্রকাশকের কৃত ভুল চলতে থাকলে পাঠক-পাঠিকারা নিঃসন্দেহেই মনে করবেন শরৎচন্দ্র নিজেই এইসব ভুল লিখে গেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ-মাধ্যমিকের বাংলা সংকলন গ্রন্থে শ্রীকান্ত—১ম পর্বের সমস্ত ২য় পরিচ্ছেদটি নিয়ে 'নৈশ অভিযান' নাম দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য করা হয়েছে। ঐ ২য় পরিচ্ছেদের এক স্থানে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—'আত্ম-

রক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিকচিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্তসংকুল গভীর তীব্র জলপ্রবাহে সাতক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা।

বস্তুটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াই আমার বীর-হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল।'

এই অংশটার 'আমার বীরহৃদয়' উচ্চ মাধ্যমিকের বাংলা সংকলন-গ্রন্থে ছাপা হয়েছে 'আমাদের বীরহৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল।'

উচ্চ মাধ্যমিকের একজন বাংলার শিক্ষক মশায় 'আমাদের বীরহৃদয়'—দেখে আমাকে একদিন বলেছিলেন 'দেখুন তো মশায়, শরৎচন্দ্র কী সব ভুল লিখেছেন।' এখানে 'আমাদের' হতেই পারে না।

শিক্ষক মশায়কে বললাম—শরৎচন্দ্র কোথাও 'আমাদের বীরহৃদয়' লেখেন নি। লিখেছেন 'আমার বীরহৃদয়'।

আমার এই কথা শুনে শিক্ষক মশায় আশ্বস্ত হন। কিন্তু তিনি শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আরো একটা অভিযোগ এনে বললেন—'তিনি লিখেছেন, 'তবে মাছ চুরি করে কাজ নেই ভাই—বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল।' অথচ তিনি এর আগেই লিখেছেন, 'লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে—সে যে কত বড় পাকা মাঝি'...ইত্যাদি।

একজন পাকা মাঝি হাল ধরে থাকলে, দাঁড়ি দাঁড় তুলে নিলেও নৌকা কখনই পাক খেয়ে পিছিয়ে যেতে পারে না। শরৎচন্দ্রের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি এখানে ভুল লিখে গেছেন।'

সেদিন ঐ শিক্ষক মশায়কে বলেছিলাম, শরৎচন্দ্র বহুবার বহু জায়গায় বলেছেন এবং লিখেছেনও—তিনি তাঁর জানা জিনিস ছাড়া লেখেন নি।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বলছি—ভাগলপুরের গঙ্গা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বয়ে চলেছে। এখানে জোয়ার ভাটা না থাকায় গঙ্গা সমানেই পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে বয়ে যাচ্ছে। ভাগলপুরের অদূরে পশ্চিমে এই গঙ্গার একটা শাখা বেরিয়ে ভাগলপুরের গা দিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে। গঙ্গার এই শাখাকে ভাগলপুরের লোকেরা গঙ্গা, গঙ্গার ছাড়, আবার যমুনিয়া—এও বলে থাকেন। ইন্দ্র এবং শ্রীকান্ত মাছ চুরি করার জন্য ডিঙি নিয়ে রওনা হয় যমুনিয়ার দক্ষিণ তীর থেকে। শরৎচন্দ্র শ্রীকান্তের জবানিতে লিখেছেন, 'আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে।'

বর্ষার যমুনিয়ায় বা গঙ্গায় স্রোত তো আছেই, আর যমুনিয়ার দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ যেদিক থেকে ইন্দ্ররা রওনা হয়েছিল, সেই দিকেই 'গঙ্গায় ভীষণ ভাঙন ধরিয়া জলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে।' তাই কোণাকুণি যাত্রায় ইন্দ্র হাল ধরে থাকলেও দাঁড় তুলে নিলে যমুনিয়ার বা গঙ্গার ভীষণ স্রোতে

ছোটো ডিঙি পাক খাবেই। আর যেহেতু গঙ্গার ভীষণ জলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে দক্ষিণের তীর ঘেঁষে চলেছে, তাই পাক খাওয়া সম্ভব।'

আমি এই কথা বলায় সেদিন ঐ শিক্ষক মশায় শরৎচন্দ্র নির্ভুল লিখেছেন বলে স্বীকার করেছিলেন।

উচ্চ-মাধ্যমিকের বাঙলা সংকলন-গ্রন্থের 'নৈশ অভিযানে' ভুল আরো কয়েকটা আছে—

১. 'কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি।' 'নৈশ অভিযানে' এই লেখার শেষের 'কত'-টা বাদ গেছে।

২. শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটে হাতে করিয়া উন্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। 'নৈশ অভিযানে' 'বোটে' 'বৈটে' হয়ে ছাপা হয়েছে।

৩. শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 'সে দয়ামায়াও কি ঐ পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল?' কিন্তু 'নৈশ অভিযানে' 'ঐ পাথরের' জায়গায় 'ও পাথরের' ছাপা হয়েছে।

শরৎ সমিতির 'শরৎ রচনাবলী' সম্পাদনাকালে তখনকার সবচেয়ে বেশি বিক্রীত এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের 'শরৎ সাহিত্য-সংগ্রহ' নিয়ে তাতে ভুলগুলো সংশোধন করে, সেই সংশোধিত বইই পাণ্ডুলিপি হিসাবে প্রেসে দিই। শ্রীকান্তর—১ম পর্বের ক্ষেত্রেও তাই করি। এইভাবে পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিলেও শরৎ সমিতির বইয়ের প্রুফ সংশোধকরা অসাবধানে নিজেরাই কয়েকটা বানানে একটু-আধটু ভুল করেছেন। যেমন, এম. সি. সরকারের শ্রীকান্ত—১ম পর্বের ২য় পরিচ্ছেদে 'পুতিয়া' বানান ঠিক থাকলেও শরৎ সমিতির বইয়ে হয়েছে পুঁতিয়া। এই পুঁতিয়া ভুল বানান ২য় পরিচ্ছেদে কয়েকবারই বসেছে।

এম. সি. সরকারের বইয়ে (যা আমাদের সংশোধিত পাণ্ডুলিপি) 'ডিঙাইয়া' বানান থাকলেও শরৎ সমিতির প্রুফ-সংশোধকরা একে করেছেন 'ডিঙ্গাইয়া'। ঐ ২য় পরিচ্ছেদের একটা অনুচ্ছেদে বানানে 'নৌকাগুলি' এবং 'অনেকগুলি' থাকলেও শরৎ সমিতির প্রুফ-সংশোধকদের ভুলে একবার 'নৌকাগুলো' এবং 'অনেকগুলো' ছাপা হয়েছে। শরৎ সমিতির বইকে আদর্শ করে যাঁরা বই ছাপছেন, তাঁরাও ঐ ভুলগুলো করছেন। ফলে 'নৈশ অভিযানে'ও তাই হয়েছে।

এম. সি. সরকারের এখানে আলোচ্য 'শ্রীকান্ত—১ম পর্ব'র ২য় পরিচ্ছেদের প্রচুর ভুল সংশোধন করে দিলেও এই বইয়ের এই পরিচ্ছেদের সঠিক 'দমক্ মারিয়া' আবার কিভাবে শরৎ সমিতির বইয়ে হয়েছে 'দম্‌কা মারিয়া।' এটা হওয়া উচিত 'দমক্ মারিয়া'ই। শরৎচন্দ্র এই-ই লিখেছেন। শরৎ সমিতির বইকে

যাঁরা আদর্শ মেনেছেন, তাঁদের, এমন কি উচ্চ মাধ্যমিকের বাঙলা বইয়েও এই ভুলই হয়েছে।

শরৎচন্দ্র ঐ ২য় পরিচ্ছেদেই প্রথমে 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন—'প্রকৃতি দেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীররূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহা নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজিও ভুলিতে পারি নাই।' 'ইন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, এই ত চাই—সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের! প্রত্যুত্তরে আমি শুধু একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়।'

১৩২৫ সালে প্রকাশিত 'শ্রীকান্ত—১ম পর্ব'র ২য় সংস্করণে দেখছি—ঠিক এই লেখাই আছে। কিন্তু এখনকার বইয়ে 'বয়স তাহা নহে'র বদলে 'বয়স তাহাদের নহে' এবং 'আজিও ভুলিতে পারি নাই' এর জায়গায় 'আজও ভুলিতে পারি নাই' ছাপা হয়েছে। আর 'প্রত্যুত্তরে আমি শুধু'র 'শুধু'টা বাদ গেছে।

এখনকার প্রচলিত বইয়ের ২য় পরিচ্ছেদের ভুলগুলো নিয়ে এখানে বিস্তৃত আলোচনার হেতু—এই অংশটা 'নৈশ অভিযান' নামে উচ্চ-মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য আছে বলেই।

সব শেষে একটা কথা—এই প্রবন্ধে পরলোকগত লেখক শরৎচন্দ্রের সামান্য দু-একটা ভুল বা অবহেলার কথার সঙ্গে কয়েকজন প্রকাশক এবং তাঁদের নিযুক্ত প্রুফ-সংশোধকদের নানা ত্রুটির কথা বলেছি। এই ভুল দেখিয়ে দেওয়ার জন্য এখন প্রকাশকরা আমার উপর ক্ষুণ্ণ হবেন কি হবেন না—জানি না। তবে এটা জানি যে ভুল দেখিয়ে দিলে অনেকে খুশীই হন এবং নির্ভুল হওয়ার সুযোগ পান। এ সম্পর্কে আগে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলেছি।

'শ্রীকান্ত-১ম পর্বে'র ২য় পরিচ্ছেদটি যেমন উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্য, তেমনি এই বইয়ের ছিনাম বহুরূপীর কাহিনী বা নতুনদার কাহিনী প্রায়ই বহু স্কুল-পাঠ্য বইয়েরও অন্তর্ভুক্ত হয়। তা ছাড়া 'শ্রীকান্ত—১ম পর্ব' বইটি দীর্ঘ-কাল ধরেই দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. এবং এম. এ. ক্লাসেও পাঠ্য হয়ে আসছে, পরেও হবে।

আজ পর্যন্ত এ বই বহু লক্ষ কপি ছাপা হয়েছে এবং কোটি কোটি মানুষ পড়েছেন। আর পরেও ছাপা হবে এবং আরো কত মানুষ পড়বেন। তাই বর্তমান আর ভাবী কালেরও ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের মুখ চেয়েই এই প্রবন্ধে যতটা পেরেছি, 'শ্রীকান্ত—১ম পর্ব' বইয়ের একটা শুদ্ধ পাঠের কথা বলেছি।

শরৎ সমিতির শরৎ রচনাবলী সম্পাদনা কালে সীমিত সময়ের মধ্যে শরৎ সাহিত্যে তখনকার প্রচলিত বহু ভুল সংশোধন করা হলেও, দেখা যাচ্ছে এখনও বেশ ভুল রয়েছে।

শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' বইটা নিয়ে একদিন 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত প্রথম বা মূল 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র পাঠ মিলিয়ে দেখছিলাম। দেখি—মূলের সঙ্গে বর্তমানে বাজারে প্রচলিত 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র এইরূপ পার্থক্য ঘটেছে—

'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসে বৈকুণ্ঠ যখন স্ত্রী ভবানীকে বলল—'ছোট বৌ নির্ভয়ে গোকুলের উপর ভর দিতে পারবে।'

এই সময়কার কথায় শরৎচন্দ্র লেখেন, বৈকুণ্ঠের ঐ কথার উত্তরে তার স্ত্রী বলেছিল—'…কিন্তু গোকুল আমার যে বড্ড সোজা মানুষ—ওকি তোমার ব্যবসার ঘোর-প্যাঁচই বুঝতে পারবে ?'

সকল প্রকাশকের বইয়েই এবং শরৎ সমিতির বইয়েও 'গোকুল আমার যে বড্ড সোজা মানুষ' এই লেখার 'আমার' শব্দটা বাদ গেছে। এখানে 'আমার' শব্দটা দিয়ে শরৎচন্দ্র স্কুলের ছাত্র বালক গোকুলের প্রতি তার বিমাতার স্নেহ-মমতা আরও ভালভাবে দেখিয়ে ছিলেন। 'আমার' শব্দটা বাদ যাওয়ায় শরৎ-চন্দ্রের বর্ণিত গোকুলের প্রতি ভবানীর সেই স্নেহের কিছুটা লাঘব হ'ল না কি ?

'বৈকুণ্ঠের উইল' বইয়ে ৫ম পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে একটা জায়গায় শরৎ-চন্দ্র লিখেছিলেন—'গোকুল এক নিমেষেই সপ্তমে চড়িয়া ধমকাইয়া উঠিল।' এই লেখার 'এক নিমেষেই' সমস্ত বইয়ে ছাপা হয়েছে—'এক মিনিটেই'।

'বৈকুণ্ঠের উইল' উপন্যাসের ঐ ৫ম পরিচ্ছেদের শেষ দিকে শরৎচন্দ্র গোকুলের স্ত্রী মনোরমার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—'…বলিয়া সে তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া গুম্ গুম্ পায়ের শব্দে অবস্থাটা জানাইয়া চলিয়া গেল।'

এই লেখার 'গুম্ গুম্ পায়ের শব্দে' এখন সব বইয়ে ছাপা হয়েছে—'গুম্ গুম্ পায়ে।'

শরৎচন্দ্র ঐ ৫ম পরিচ্ছেদেই এই লেখার একটু পরেই লেখেন—'কিন্তু বড় বৌ একেবারে চলিয়া যায় নাই। সে বারান্দার এক প্রান্ত হইতে—কাহারো শুনিতে অসুবিধা না হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় বলিল—…মুখ্যু দাদা পেয়েচে, যত পেরেচে তত ঠকিয়েচে। ঠকাগ্, আমার কি ? ওর নিজের ছেলেমেয়েই পথে বসবে—বলিয়া এইবার বড় বৌ সত্য সত্যই চলিয়া গেল।'

এখনকার বইয়ে 'এইবার বড়বৌ সত্য সত্যই চলিয়া গেল' এই লেখার 'এইবার'টা বাদ গেছে। অথচ এখানে 'এইবার' কথাটার কত গুরুত্ব!

মনে হচ্ছে, এই 'শ্রীকন্ত-১ম পর্ব' এবং 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র ন্যায় শরৎ-সমিতির শরৎ রচনাবলীর অন্যান্য গ্রন্থেও হয়ত কম বেশী কিছু কিছু ভুল আজও থেকে গেছে।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ-সমূহের প্রথম দিকের সংস্করণ সংগ্রহ করা প্রায় অসাধ্য। সংগ্রহ করা গেলেও পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর লেখার সঙ্গে মেলানোও বেশ সময় সাপেক্ষ এবং কষ্ট সাধ্যও। পত্রিকায় প্রকাশিত সব লেখাকেই আবার আদর্শ করারও বিপদ আছে। কারণ, শরৎচন্দ্র তাঁর কোন কোন বইয়ে প্রথম পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাকেও কাটছাঁট বা অদল-বদল করেছেন।

আসলে প্রথম দিকের সংস্করণগুলি পাওয়া দুর্লভ হলেও, অতি কষ্টে পাওয়া গেলেও সেগুলোর সঙ্গে নিজেরও বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে পাঠ মেলাতে হবে। শ্রীকান্ত—১ম পর্ব, ২য় সংস্করণ বই পেয়ে এবং ভারতবর্ষের মূল লেখা মিলিয়েও তাই দেখলাম।

এই পাঠ উদ্ধার রীতিমত কষ্টকর ও দীর্ঘদিনের ব্যাপার হলেও ৭৭ বৎসর বয়সে নানা কাজের মধ্যে এখনও আমি যতটা পারছি, করে যাচ্ছি।

কঠোর পরিশ্রমে এবং সুদীর্ঘ কালের সাধনায় কেউ কোনদিন শরৎ-সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও ত্রুটিমুক্ত করতে পারবেন কিনা জানি না। ভগবান জানেন।

বাদ-প্রতিবাদ

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই তিন মহান্ সাহিত্যিকের সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে কারও কারও সঙ্গে আমাকে বাদ-প্রতিবাদেও লিপ্ত হতে হয়েছে। এই তিন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রথী সম্পর্কে কারও কারও লেখায় ভুল আছে দেখালে, কেউ কেউ ভুল স্বীকার করেছেন, আবার কেউ কেউ ফোঁস করে গর্জে উঠেছেন, এমন কি আমাকে গালিগালাজও করেছেন। আবার কেউবা অমনিই আমার কথায় আপত্তি জানিয়েছেন।

যাঁরা ভুল স্বীকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভবতোষ দত্ত, অধ্যাপক প্রশান্তকুমার পাল প্রভৃতি। প্রভাতবাবুর কথা আগে এই বইয়ে বলেছি। ডঃ ভবতোষ দত্ত তাঁর 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের ৩য় সংস্করণে, প্রশান্তবাবু তাঁর 'রবিজীবনী' গ্রন্থ ২য় খণ্ডের পুনর্মুদ্রণে প্রথমেই আমার কথা উল্লেখ করে, তাঁদের ভুল স্বীকার করেছেন।

যাঁরা ফোঁস্ করে গর্জে উঠেছেন বা অমনিই আপত্তি জানিয়েছেন, এই অধ্যায়ে তাঁদের কারও কারও কথার কিছু কিছু উত্তর দিয়ে যাচ্ছি। বর্তমানের ও ভাবীকালের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা এর বিচার করবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে

কলকাতায় অধরলাল সেনের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা হয়েছিল এবং উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হয়েছিল—বলে শ্রীম তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' গ্রন্থের ৫ম ভাগের 'পরিশিষ্টে' ২৭ পাতা ধরে বিস্তৃত লিখে গেছেন।

আমি আমার 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইয়ে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সাক্ষাৎকার হয়েছিল কিনা, আর হলেও সেই সাক্ষাৎকারের সময় ঐ অত সব কথা হয়েছিল কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করি।

আমার 'বঙ্কিমচন্দ্র' বই প্রকাশিত হওয়ার ছ বছর চার মাস পরে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী স্বামী হিরন্ময়ানন্দ আমার ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে ১৩৯৪ সালের কার্তিক সংখ্যা 'উদ্বোধন' পত্রিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। নিজেদের ঐ কাগজে তিনি আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে প্রচুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালি-গালাজ করেন। আর তাঁর লেখায় অত্যন্ত জোরের সহিতই বার বার বলেন—শ্রীম-র বইএর শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সাক্ষাৎ ও কথোপকথন শ্রীম-র প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত অর্থাৎ ঐ সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন শ্রীম নিজের চোখে দেখে ও নিজের কানে শুনে তবেই তাঁর বইয়ে লিখেছেন।

স্বামী হিরন্ময়ানন্দ লেখেন—'শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এমন একজন ব্যক্তি নন, তাঁর অভিমতকে কোন গুরুত্ব দিতে হবে।...প্রত্যক্ষদর্শী, সত্যবাদী, মহাধার্মিক পুরুষ শ্রীম যা লিখেছেন, সেগুলিই ঠিক এবং সত্য। কিন্তু লেখকের তা বোঝবার মত শক্তি নেই।'...'প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত শ্রীম-বর্ণিত বঙ্কিম-শ্রীরামকৃষ্ণের কথোপকথন।'...'শ্রীম শ্রুতিধর ছিলেন এবং স্মৃতিধরও ছিলেন। সুতরাং শ্রীম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকায় লেখকের অর্বাচীনতার ও অজ্ঞানতার পরিচায়ক।' ইত্যাদি ইত্যাদি

স্বামী হিরন্ময়ানন্দ তাঁর লেখায় আবার আমাকে নির্বোধ, মহামূর্খ, আবোল-তাবোল লেখক যেমন বলেছেন, তেমনি ব্যঙ্গ করে বিদ্যাধুরন্ধর, পণ্ডিতম্মন্য ইত্যাদি বলেছেন, আবার আমাকে এও বলেছেন—প্রাজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট রূপে অজ্ঞ।

যাক্। স্বামী হিরন্ময়ানন্দ আমাকে আক্রমণ করে বার বার বঙ্কিম-

শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ও কথোপকথন শ্রীম-র প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত বললেও, ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সাক্ষাৎ ও কথোপকথন শ্রী-মর আদৌ প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত নয়। এখন এ সম্পর্কে শ্রীম-র নিজেরই কথা দিয়ে এর প্রমাণ দিচ্ছি।

শ্রীম-র এক ভক্ত স্বামী নিত্যাত্মানন্দ তাঁর ১৫ খণ্ডে সমাপ্ত 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থের ৯ম খণ্ডে বা ৯ম ভাগে (এই বইএর প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬ সালে) লিখেছেন—

'অন্তেবাসী—অশ্বিনী দত্তর স্মৃতি-কথা, বরাহনগর মঠের কথা প্রভৃতিও তো কথামৃতে স্থান লাভ করেছে।

শ্রীম—মূল গ্রন্থে নয়। পরিশিষ্টে লেখা হয়েছে। মূল গ্রন্থে সব direct evidence (যা নিজ চক্ষে দেখেছি, নিজ কানে শুনেছি)।'

এখানে এই লেখায় 'অন্তেবাসী' হলেন স্বামী নিত্যাত্মানন্দ নিজে।

শ্রীম তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম' লেখাটি তাঁর মূল গ্রন্থে দেন নি। দিয়েছেন পরিশিষ্টে। অতএব তাঁর নিজের কথা অনুযায়ীই তাঁর এই লেখাটি 'নিজ চক্ষে দেখা ও নিজ কানে শোনা' নয়।

শ্রীম-র বই-এর পরিশিষ্টের লেখাগুলিতে যে জোর [সত্যতার ?] নেই, এ কথাও শ্রীম সেদিন অন্তেবাসী বা স্বামী নিত্যাত্মানন্দকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

'আপনারা পড়েন নাই Laws of evidence, Criminal Procedure Code ?

অন্তেবাসী—আজ্ঞে হ্যাঁ পড়েছি। কলেজে যেমন পড়া হয় তেমনি, মোটামুটি পড়া আছে।

শ্রীম—দেখেছেন তো ওতে—সাক্ষীর একটু ভুল বের করতে পারলে, সেই Caseটা প্রায় নষ্ট হয়ে গেল। উকিল বলেন জজকে—My Lord, he is not reliable (মহামান্য মহোদয়! এই সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য নয়)। Direct evidence-এর যে force (প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের যে শক্তি) অপরের কাছ থেকে শোনা কথায় সেই শক্তি থাকে না। তাই তো জজ জিজ্ঞাসা করেন—তুমি নিজে দেখেছ ? নিজে দেখলে বা শুনলে জোর হয় বেশী। আর যদি বলে শুনেছি, তাহলে তত জোর হয় না।'

[শ্রীম-র এই আলোচনার তারিখ ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ।]

এখানে আর একটা কথা বলার আছে—

'কথামৃতে' যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের বর্ণনা আছে, এই লেখাই প্রায় হুবহু-ই প্রকাশিত হয়েছিল, 'কথামৃতে'

প্রকাশিত হওয়ার সুদীর্ঘ ৩০ বছর আগেই। শ্রীম তখন ১৩০৯ সালের পৌষ ও ফাল্গুন এই দুই সংখ্যা 'তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' শ্রীম-কথিত বলেই সে লেখাটি লিখে ছিলেন। 'তত্ত্বমঞ্জরী' ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের তখনকার অন্যতম প্রধান ভক্ত, শিষ্য রামচন্দ্র দত্তর কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান আশ্রমের কাগজ।

এখানে যে বললাম—১৩০৯ সালের পৌষ ও ফাল্গুন সংখ্যা 'তত্ত্বমঞ্জরী'তে প্রকাশিত শ্রীম-র লেখা 'প্রায় হুবহু'-ই 'কথামৃতে' ছাপা হয়েছিল, এখন সেই 'প্রায়'টা কি বলি—

শ্রীম 'তত্ত্বমঞ্জরী'তে প্রথমেই লিখে ছিলেন—

'আজ ঠাকুর অধরের বাড়ি আসিয়াছেন, ২২শে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা ৪র্থী তিথি শনিবার, ইংরাজি ৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খৃঃ অঃ। ঠাকুর পুষ্যা নক্ষত্রে আগমন করিয়াছেন।

রাখাল, শরৎ, দেবেন্দ্র, সান্যাল, মাষ্টার প্রভৃতি অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল গান করিতে ছিলেন।'

'কথামৃতে' শ্রীম 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিম' লিখতে গিয়ে এখানে 'তত্ত্বমঞ্জরী' থেকে এই উদ্ধৃতির প্রথমাংশটা দিলেও শেষের 'রাখাল, শরৎ, দেবেন্দ্র, সান্যাল, মাষ্টার প্রভৃতি অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল গান করিতে ছিলেন।'—এই দুটি বাক্য 'কথামৃতে' বাদ দিয়ে দেন।

আর 'তত্ত্বমঞ্জরী'তে ছিল না, এমন একটু লেখা নতুন লিখে 'কথামৃতে' প্রকাশিত লেখাটির শেষাংশে যোগ করে দেন। সেই লেখাটি হ'ল—কথামৃতে প্রকাশিত'...তাঁহারা অদ্ভুত প্রেমের ছবি হৃদয়ে গ্রহণপূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন'—এই বাক্যের পরের অংশটা, অর্থাৎ শ্রীযুক্ত গিরিশের সঙ্গে মাষ্টারের বঙ্কিমের সানুকিভাঙ্গার বাসায় যাওয়ার কথা এবং ২৭শে ডিসেম্বর (১৮৮৪) দক্ষিণেশ্বরে বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের কতক অংশ পাঠের কথা।

এখানে বলা বাহুল্য সকলেই জানেন শ্রীম আর মাষ্টার একই ব্যক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সাক্ষাতের সময় শ্রীম যদি সত্যই সেখানে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে তিনি নিজের উপস্থিতির কথা রেখে দিতেন এবং ঐ সাক্ষাৎকারের কথা তাঁর বইএর মূল অংশই দিতেন। দীর্ঘদিন ফেলে রেখে অপরের কাছে শোনা কথা—যে কথার 'জোর' বা 'শক্তি' নেই—তাঁর গ্রন্থের পরিশিষ্টে না-দেখা ঘটনা সমূহের মধ্যে কখনই দিতেন না।

শ্রীম-র কথামৃত গ্রন্থে আমরা দেখছি—

১. তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বঙ্কিম সাক্ষাতের কথা লিখতে গিয়ে প্রথমে নিজেরও উপস্থিতির কথা লিখেছিলেন। পরে যে কোন কারণেই হোক্, নিজের ঐ উপস্থিতির কথা বাদ দিয়েছেন বা দিতে বাধ্য হয়েছেন।

২. শ্রীম তাঁর বইয়ে শ্রীযুক্ত গিরিশের সঙ্গে শ্রীম-র বঙ্কিমের নিকট যাওয়া নিয়ে দুবার দু রকম কথা বলেছেন।

৩. শ্রীম তাঁর কথামৃত গ্রন্থের উপকরণ প্রসঙ্গে এক এক বার এক এক রকম কথা বলেছেন।

সর্ব দেশে ও সর্বকালে সত্যের একটা রূপই হয়। কখনও দ্বিরূপ হয় না। আমরা শ্রীম-র লেখায় এখানে দ্বিরূপ দেখছি।

শ্রীম-র গ্রন্থে আমরা আরও দেখছি—

শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেন নি বা কখনই বলতে পারেন না (এমন কি একজন অতি সাধারণ মানুষও যা বলতে পারেন না)—সে কথাও শ্রীম কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। কথামৃত ২য় ভাগ গ্রন্থের ১৩শ খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—'যদি শুনি পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয়। তা না হলে কুকুর ছাগল জ্ঞান হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এ কথা কখনই বলেন নি। আমার 'শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম' বইয়ে এ নিয়ে বিস্তৃত লিখেছি।

শ্রীম বলেছেন—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথা শুনে সেই কথা তাঁর ডায়রিতে লিখে রাখতেন।

শ্রীম-র ডায়রি দেখি নি। কেবল 'মৌসুমী' প্রকাশন সংস্থা থেকে প্রকাশিত শ্রীম-র কথামৃত গ্রন্থের মধ্যে তাঁর ডায়রির একটা পাতার প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে দেখেছি।

এতে দেখছি, শ্রীম তাঁর ডায়রিতে ১৮.৬.৩৩ তারিখে নবদ্বীপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বলে লিখে রাখেন—'এই বলে প্রার্থনা করবে, মা তোর ভুবন মোহিনী মায়ায় যেন মুগ্ধ না হই।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের এই কথাকেই পরে শ্রীম তাঁর বইয়ে লেখেন এইভাবে—'এখন কেবল তাঁকে প্রার্থনা কর, আন্তরিক প্রার্থনা—হে ঈশ্বর, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য আমি চাই না—আমি তোমায় চাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথাকে এইভাবে পরিবর্তন করার কোনও প্রয়োজন ছিল না বলেই মনে করি। কারণ, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মা ভবতারিণী বা কালীর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে—ঈশ্বরের পরিবর্তে 'মা' থাকাই ছিল স্বাভাবিক।

শ্রীম-র ডায়রির ঐ ১৮.৬.৩৩ তারিখের অন্যান্য সাংকেতিক লেখাগুলি নিয়েও আমি আমার 'শ্রীরামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীম' বইয়ে আলোচনা করেছি।

এখন শ্রীম-র বই সম্বন্ধে আমার একটা কথা—

শ্রীম অসীম শ্রদ্ধাসহকারে, প্রভূত পরিশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের বাণী

সমূহ সংকলন করে রেখে গেছেন তাঁর বইয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ভক্তদের মধ্যে আর কেউই এমন ভাবে সংকলন করে যান নি। শ্রীম এইভাবে রেখে না গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের অনেক কথাই আমরা জানতে পারতাম না।

তবে ঐ একটা কথা—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথার সঙ্গে নিজের কথা যোগ না করলেই ভাল করতেন। এজন্য স্বামী অভেদানন্দ শ্রীম-কে বলেছিলেন—'তোমার মতামত কেন কথামৃতে চালিয়েছ? তুমি কি ভাবছ, না ভাবছ, তা লিখবার দরকার কি? তোমার ভাব তোমার থাক। লোকের নিজ নিজ ভাবে ভাবতে দাও। তুমি শুধু ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) ভাব দিয়ে যাও।'—কথা-প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ সংকলিত—পৃঃ ৬৩ (নব ভারত পাবলিশার্স, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড)।

এবার, এক সময় বেলুড় মাঠের সন্ন্যাসীরাই শ্রী-র 'কথামৃত' সম্বন্ধে কি বলেছিলেন তারই একটা উদাহরণ স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র 'স্বামী বিবেকানন্দ' বই থেকে এখানে দিচ্ছি। ভূপেন-বাবু লিখেছেন—

'শ্রীম বিরচিত 'কথামৃত' যখন 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নিয়ে বিশেষ আলোড়ন উপস্থিত হয়। সে সময় লেখক একবার বেলুড় মঠে গিয়ে দু একদিন থাকেন। একদিন সকালে 'কথামৃত' সম্পর্কে তিনি নানা রকম সমালোচনা শোনেন। অবশেষে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বললেন—আমরাও তো তিন বৎসর তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এই লেখা egg without salt (লবণহীন ডিম)।'

আর একটা কথা—

শ্রীম আরও সতর্ক হয়ে 'কথামৃত' লিখলে ভাল করতেন। শ্রীম তাঁর কথামৃত ৪র্থ ভাগ গ্রন্থে ১০ম খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে লিখেছেন—১৮৮৪-র ২রা ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের বলেছিলেন—আমার কলকাতার ডাক্তারদের তত বিশ্বাস হয় না।'—পৃঃ ৯৭

শ্রীম তাঁর বইয়ে এই কথা লেখার কয়েক পাতা পরেই ১১৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮৪র ২৩শে মার্চ দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত রামকে বলে-ছিলেন—তিনিই ডাক্তার কবিরাজ হয়েছেন। তাই সকল চিকিৎসককেই বিশ্বাস করতে হয়।

শ্রীম তাঁর এই ৪র্থ ভাগ গ্রন্থের ২০শ খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদে লিখেছেন—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামীকে বলেছিলেন, 'আমিও বৃন্দাবনে ভেক নিয়েছিলাম, পনের দিন রেখেছিলাম।'

শ্রীম তাঁর কথামৃত ৫ম ভাগে ১০ম খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে লিখেছেন- ১৮৮৩র ১০ই অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম-কে বলেছিলেন—'আমিও বৃন্দাবনে বৈষ্ণব বৈরাগীদের ভেক লয়েছিলাম। তিন দিন ঐভাবে ছিলাম।'

এরূপ স্ববিরোধী উক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের নয় বলেই মনে হয়। তবে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, শ্রীরামকৃষ্ণ কখনই বলেন নি—'যদি শুনি পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য আছে, তবে ভয় হয়।'

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য 'বঙ্কিম-চন্দ্র জীবনী' নামে একটা বই লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে ঐ বইটি সমালোচনার জন্য এলে, ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক নিখিল সরকার বইটি আমাকে দেন একটি সমালোচনা লিখে দেবার জন্য। আমি লিখে দিই এবং সে লেখা ছাপাও হয়।

আমার ঐ লেখা পড়ে অমিত্রবাবু একটা প্রতিবাদ পাঠান আনন্দবাজারে ছাপার জন্য। তখন নিখিলবাবু একদিন অমিত্রবাবুর প্রতিবাদ পত্রটি আমাকে দিয়ে বলেন—আপনি যদি পারেন তো এর একটা উত্তর দেবেন। তাহলে অমিত্রবাবুর লেখার সঙ্গে আপনার ঐ লেখাটাও ছেপে দোব।

আমি অমিত্রবাবুর প্রতিবাদের একটা উত্তর লিখে নিখিলবাবুর হাতে দিলে, তিনি লেখাটা নিয়ে বললেন—আমাদের পত্রিকার মালিক অমিত্রবাবুর প্রতিবাদ ছাপতে মানা করেছেন। তাই অমিত্রবাবুর প্রতিবাদ ছাপা হবে না, তবে আপনার এই লেখাটা অমিত্রবাবুর কাছে পাঠিয়ে দোব।

আমি অমিত্রবাবুর প্রতিবাদের যে যে উত্তর দিয়েছিলাম, তার শুধু মাত্র একটার কথা এখানে বলছি—

১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'ঢাকা ও পূর্ব বাঙ্গালা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকায় প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের নাম ছিল না।

এই প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে—'ঢাকার অনেক হিন্দু মুসলমানের হুঁকাতে তামাক খায় ও এক আসনে বসে।'

এই বাক্যটা নিয়ে অমিত্রবাবু তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী, গ্রন্থে (পৃ ৫৩৮) লিখেছেন—'ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান এক হুঁকাতে তামাক খায়, একথা বঙ্গদর্শন সগৌরবে মুদ্রিত করেন।'

এখন আমার বক্তব্য—'ঢাকা ও পূর্ব বাঙ্গালা' একটি অতি জঘন্য রচনা। এতে লেখক নিজেকে রাঢ়ের বা পশ্চিমবঙ্গের লোক বলে জাহির করে ঢাকা ও তৎপার্শ্ববর্তী পূর্ব বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষকে অত্যন্ত হেয় করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের তুলনা করে নিজেদের পশ্চিমবঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এই তুলনা করতে গিয়েই

লেখক বলেছেন—ঢাকার হিন্দুরা মুসলমানের হুঁকায় তামাক খায় ও এক আসনে বসে। অর্থাৎ লেখকের মনের কথা ঢাকার হিন্দুরা ঐরূপ করলেও আমরা পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা তা করি না।

তাই এখানে মুসলমানের হুঁকায় হিন্দুর তামাক খাওয়ার কথাটা লেখকের কলম থেকে সগৌরবে প্রকাশ নয়। ঢাকার হিন্দুকে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর চেয়ে হেয় করে অগৌরব প্রকাশ।

প্রবন্ধকারকে অমিত্রবাবু না জানলেও আমি জেনেছি—ইনি ছিলেন ঢাকার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতের অধ্যাপক—নাম রমানাথ সরস্বতী। ইনি সারা প্রবন্ধে আগাগোড়া ঢাকার হিন্দুদের এত হেয় করেছেন যে, তাঁরা কিভাবে এই প্রবন্ধ লেখককে চিনতে পেরে তাঁরা এঁকে মারবার বা একেবারে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন। তখন রমানাথ পণ্ডিত নিজের বিপদের কথা জানিয়ে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করে লিখেছিলেন —আপনি দয়া করে পরের সংখ্যা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করুন যে, আমি ঐ প্রবন্ধের লেখক নই।

রমানাথের ঐ সব চিঠি নৈহাটীর ঋষি বঙ্কিম সংগ্রহশালায় আজও রয়েছে।

রমানাথ তাঁর প্রবন্ধে মুসলমানদের আরও যেভাবে হিন্দুদের চেয়েও হেয় করেছেন, তাঁরা এঁকে চিনতে পারলে বোধ করি জবাই-ই করতেন।

অমিত্রবাবু এই বাজে প্রবন্ধের মূল সুরটাই যে ধরতে পারলেন না, সেইটাই আশ্চর্য!